অলৌকিক নয়, লৌকিক

১
প্রথম খণ্ড

প্রবীর ঘোষ

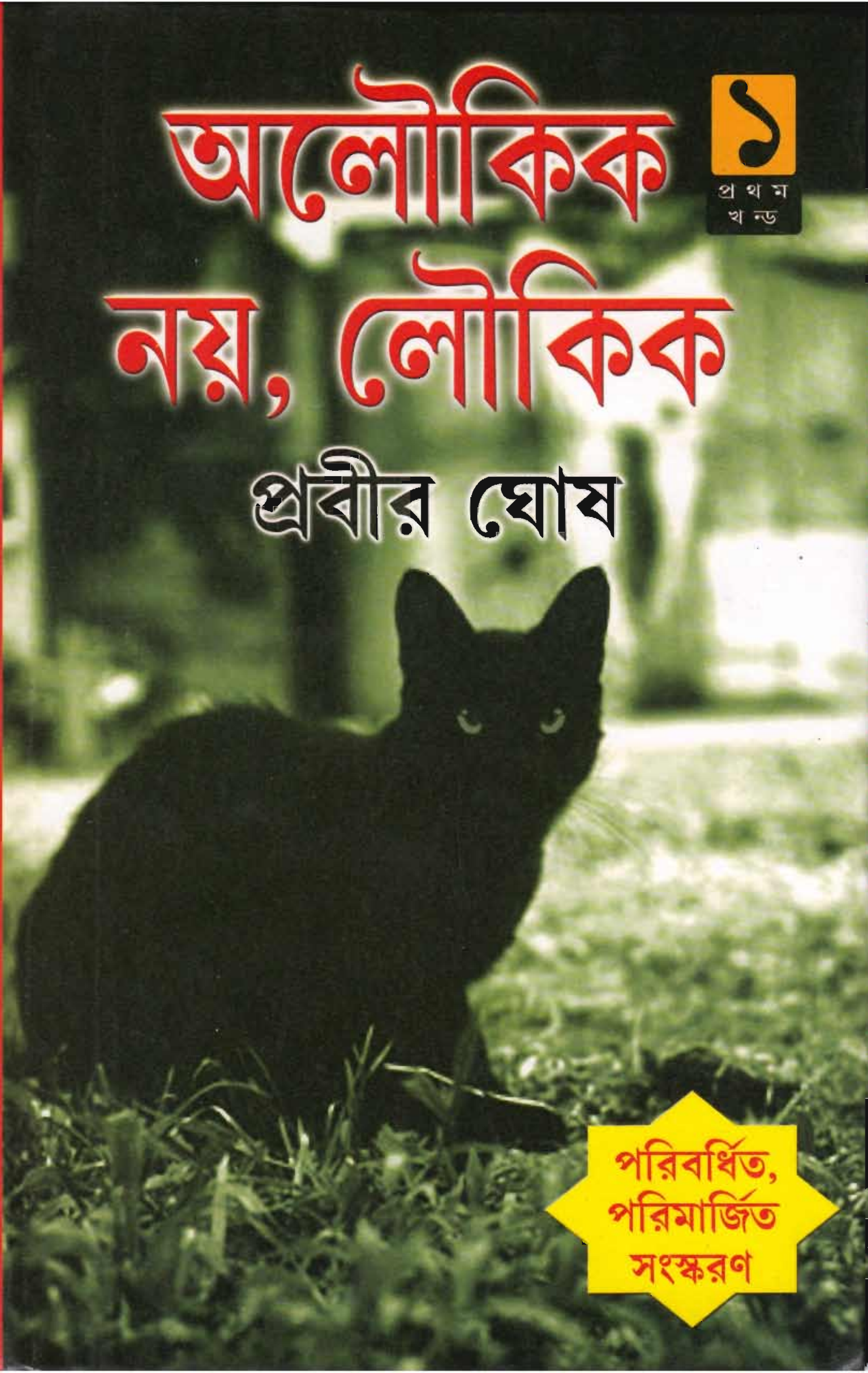

পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত সংস্করণ

অলৌকিক নয়, লৌকিক

[প্রথম খণ্ড]

অলৌকিক নয়, লৌকিক

[প্রথম খণ্ড]

প্রবীর ঘোষ

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শিক্ষাগুরু শ্রীশুভেন্দুকুমার রায়
শ্রদ্ধাভাজনেষু

ও

যুক্তিবাদী কাজকর্মের সঙ্গী পিনাকী ঘোষ
প্রিয়বরেষু

নং- ২৭২৮ ডি. ও. সি. এম
১৬/৩/৯০

মুখমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মধ্যে সংস্কারমুক্তি ও বিজ্ঞান-মনস্কতার প্রসার ঘটবে, এটা স্বাভাবিক। অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও চিরাচরিত প্রথার প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য মানুষের এগিয়ে যাওয়ার পথে সর্বদাই অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকে। আজ সময় এসেছে যখন শোষিত ও বঞ্চিত মানুষ এসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সামিল হবেন এবং যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির যথোচিত প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করবেন।

অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে এবং নিজস্ব সচেতনতার বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে। এ বোধ যত-বেশী সমাজের সকল অংশের মধ্যে সঞ্চারিত হবে ততই মঙ্গল। শ্রী প্রবীর ঘোষের লেখা "অলৌকিক নয়, লৌকিক" বইটি সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত হয়েছে। অলৌকিক তত্ত্বের অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রতিভাত করাই এ বইটির উদ্দেশ্য। পৃথিবীতে প্রচলিত নানান তথাকথিত অলৌকিক ঘটনাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে শ্রী ঘোষ বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে এইসব অলৌকিক ঘটনা মূলতঃ লৌকিক। শ্রী ঘোষের বিচার-বিশ্লেষণ আমাদের মনোযোগের দাবী রাখে। এধরনের কাজ নির্ভীক ও বিজ্ঞানসম্মত মনোভঙ্গী-গঠনে সাহায্য করে থাকে। বইটি পাঠক-সমাজে উপযুক্ত সমাদর পাবে বলে আমি মনে করি।

জ্যোতি বসু

(জ্যোতি বসু)

সূচিপত্র

❑ ভূমিকা ৩

❑ কিছুকথা ১৬

❑ নতুন 'কিছু কথা' ২১

অধ্যায় : এক ৩৭-৪৯

❑ প্রস্তাবনা ৩৭ / আকস্মিকতার চেয়ে ধারাবাহিকতাই বেশি ৩৭ / মানুষ ও দেবতা ৪১ / যুক্তিবাদী, মুক্তচিন্তার সেইসব মানুষ ৪২ / আমরা কোথায় আছি ৪৭

অধ্যায় : দুই ৫০-৫৫

❑ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান ৪৯ / শাসক শ্রেণির স্বার্থে কুসংস্কার পুষ্ট হচ্ছে ৫৩

অধ্যায় : তিন ৫৬-১৩৮

❑ সাধুসন্তদের অলৌকিক ক্ষমতা ৫৬ / ব্রহ্মচারী বাবা ৫৬ / বিখ্যাত মহারাজের শূন্যে ভাসা ৬০ / ব্ল্যাক আর্ট-ছাড়া সাধিকার শূন্যে ভাসা ৬৩/ লাঠিতে হাতকে বিশ্রাম দিয়ে শূন্যে ভাসা ৬৫ / বেদে-বেদেনীদের শূন্যে ভাসা ৬৯ / মন্ত্রে যজ্ঞের আগুন জ্বলে ৭৩ / সত্য সাঁইবাবা ৭৫ / সাঁইবাবার ঘড়ি-রহস্য ৭৫ / কেন এমন হয় ৭৭ / সাঁইবাবার ছবিতে জ্যোতি ৭৭/ সাঁইবাবার বিভূতি ৭৮ / শূন্য থেকে হার আনলেন ও হার মানলেন সাঁই ৮১ / সাঁইবাবার চ্যালেঞ্জ : পেটে হবে মোহর ৮২ / ছবি থেকে ছাই ৮৭ / শূন্য থেকে হিরের আংটি ৮৭ / কৃষ্ণ অবতার কিট্টি ৮৮ যে সাধকরা একই সময়ে একাধিক স্থানে হাজির ছিলেন ৮৮ / অতিন্দ্রীয় ক্ষমতার তান্ত্রিক ও সন্ন্যাসীরা ৯১ / কামদেবপুরের ফকিরবাবা ৯৫ / আগরতলার ফুলবাবা ৯৬ / অবতারদের নিজ দেহে রোগগ্রহণ ১০০ / বিশ্বাসে অসুখ সারে ১০১/ ফুঁ বাবা ১১১ / ডাব বাবা ১১২ / ডাইনী সম্রাজ্ঞী ইপ্সিতা ১১৭ / বকনা গরুর অলৌকিক দুধ ও মেহেবুব আলি ১১৮ / বাবা তারক ভোলার মন্দির ও শ্রীশ্রী বাসুদেব ১২২ / যোগে বৃষ্টি আনলেন শিববাল যোগী ১২৫ / চন্দননগরে সাধুর মৃতকে প্রাণ-দান ১২৮/ ভগবান শ্রীসদানন্দ দেবঠাকুর ১২৯ / আগুনে হাঁটার অলৌকিক ঘটনা ১৩৫

অধ্যায় : চার ১৩৯-১৪৯

❑ সম্মোহন-আত্ম-সম্মোহন ১৩৯ / সম্মোহনের ইতিহাস, নানা মত ১৪১ / পাভলভ ও ফ্রয়েড ১৪৩ / সম্মোহন নিয়ে কিছু কথা ১৪৩ / ঘুম ও সম্মোহন ১৪৪ / পাভলভ কি বলেন ১৪৫

অধ্যায় : পাঁচ ১৫০-১৫৪

❑ সমব্যথী চিহ্নের মহাপুরুষ ১৫০

অধ্যায় : ছয় ১৫৫-১৬৩

❑ হিস্টিরিয়া, গণ-হিস্টিরিয়া, আত্ম-সম্মোহন নির্দেশ ১৫৫ / ফোটো সম্মোহন ১৬২

অধ্যায় : সাত ১৬৪-১৭০

❑ সম্মোহন কীভাবে করবেন? ১৬৪ / সম্মোহনে আত্মা এলো 'সানন্দা'য় ১৬৫ / সম্মোহন নিয়ে নানা ভুল ধারণা ১৬৭ / প্রাক-সম্মোহন প্রস্তুতি ১৬৭ / রোগীর ক্ষেত্রে যে'ভাবে সাজেশন দেওয়া হয় ১৬৮ / সাজেশনের রকম-ফের ১৭০

অধ্যায় : আট ১৭১-১৭৯

❑ ঈশ্বর দর্শন ও ভ্রান্ত অনুভূতির রকমফের ১৭১ / Illusion (ভ্রান্ত অনুভূতি) ১৭১ / Hallucination (অলীক বিশ্বাস) ১৭৫ / Delusion (মোহ, অন্ধ ভ্রান্ত ধারণা) ১৭৭ / Paranoia ১৭৯

অধ্যায় : নয় ১৮০-২১৩

❑ পীঠস্থান ও স্থান মাহাত্ম্য রহস্য ১৮০ / আদ্যা'মা রহস্য ১৮০ / ধর্মের নামে লোক ঠকাবার উপদেশ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ১৮২ / সোমনাথ মন্দিরের অলৌকিক রহস্য ১৮৪ / প্রাচীন মিশরের ধর্মস্থান রহস্য ১৮৫ / কলকাতায় জীবন্ত শীতলাদেবী ও মা দুর্গা ১৮৭ / জব্বলপুরে জীবন্ত দুর্গা ১৮৭ / খেজুর তলার মাটি সারায় যত রোগ ১৮৯ / পক্ষিতীর্থমের অমর পাখি ২০০ / যে গাছ কাটা যায় না ২০২ / গাইঘাটার অলৌকিক কালী ২০৩ / যে পাথর শূন্যে ভাসে ২০৫ / অলৌকিক প্রদীপে মৃত বাঁচে ২০৮ / বারমুডা ট্রাঙ্গেল রহস্য ২০৯

অধ্যায় : দশ ২১৪-২২১

❑ পরামনোবিদ্যা ও অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি (Parapsychology & E. S. P.) ২১৪ / Parapsychology (পরামনোবিদ্যা) ২১৪ / E. S. P. (অতীন্দ্রিয় অনুভূতি) ২২১

অধ্যায় : এগারো ২২২-২৪৯

❑ Telepathy (দুরচিন্তা) ২২২ / ডুবোজাহাজে টেলিপ্যাথির পরীক্ষা ২২৩/ টেলিপ্যাথির সাহায্যে নোটের নম্বর বলা ২২৪ / 'সাপ্তাহিক পরিবর্তন' পত্রিকার ব্যবস্থাপনায় টেলিপ্যাথি ২২৫ / টেলিফোনে টেলিপ্যাথি : আয়োজক 'সানডে মিরর' ২২৫ / পরীক্ষক হিসেবে কারা ছিলেন ২২৬ / পরীক্ষা কেমন হল ২২৭ / 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকা কী বলছে ২২৮ / টেলিফোন টেলিপ্যাথির আর এক আকর্ষণীয় ঘটনা ২৩০ / 'ডেইলি মেল' ও 'রিভিউ অফ রিভিউজ'-এর টেলিপ্যাথির পরীক্ষা ২৩১ / এমিল উদ্যাঁ ও রবেয়ার উদ্যাঁ'র টেলিপ্যাথি ২৩৩ / এই খেলা আমাদের দেশে ২৩৩ / এই ধরনের টেলিপ্যাথির আসল রহস্য ২৩৩ / অতীন্দ্রিয় ইউরি গেলার কে নিয়ে 'নেচার'-এর রিপোর্ট ২৩৫ / আই আই টি-তে টেলিপ্যাথি দেখালেন দীপক রাও ২৪৪ / দীপক রাও ও শ্রীমতী রাও-এর টেলিপ্যাথি ২৪৫ / তবু প্রমাণ করা যায় টেলিপ্যাথি আছে ২৪৭

অধ্যায় : বারো ২৫০-২৫৪

❑ Precognition (ভবিষ্যত দৃষ্টি) ২৫০ / আব্রাহম লিংকন না কী নিজের মৃত্যু স্বপ্নে দেখেছিলেন ২৫০ / ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার রায় সত্যজিতের বেলায় মেলেনি ২৫২ / নায়াগ্রা জলপ্রপাত ভেঙ্গে পড়ার ভবিষ্যদ্বাণী ২৫২

অধ্যায় : তেরো ২৫৫-২৫৮

❑ Clairvoyance (অতীন্দ্রিয় অনুভূতি) ২৫৫ / সাধু-সন্ন্যাসীর অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ২৫৫ / ইউরি গেলারের 'থট্ রিডিং'-এর অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা ২৫৭ / ইউরি গেলারের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ২৫৭

অধ্যায় : চোদ্দ ২৫৯-২৬৯

❑ Psycho-Kanesis বা Pk (মানসিক শক্তি) ২৫৯ / মানসিক শক্তিতে রেলগাড়ি থামানো ২৫৯ / খড়্গপুরের সেই পীর ২৬১ / স্টীমার বন্ধ করলেন পি. সি. সরকার ২৬৩ / সাধুজির স্টীমার খাওয়া ২৬৪ / লিফট ও কেবল-কার দাঁড় করিয়েছিলেন ইউরি গেলার ২৬৫ / মানসিক শক্তি দিয়ে গেলারের চামচ বাঁকানো ২৬৬ / ধাতু বাঁকার আসল রহস্য ২৬৬ / 'নিউ সায়েন্টিস্ট'-এর পরীক্ষায় ইউরি এলেন না ২৬৮ / এক ঝলকে ইউরি ২৬৯

অধ্যায় : পনের ২৭০-২৮২

❑ কিছু ভারতীয় আধ্যাত্মবাদীদের অলৌকিক ক্ষমতা ২৭০ / যোগ সমাধিতে নাড়ি বন্ধ ২৭০ / জলের তলায় বারো ঘন্টা ২৭৪ / জলপরী (পুং) রূপরাজ ২৭৫ / শরীর থেকে বিদ্যুৎ ২৭৯ / ভূ-সমাধি ২৮০

অধ্যায় : ষোলো ২৮৩-৩০৮

❑ ভাববাদ বনাম যুক্তিবাদ বা বস্তুবাদ ২৮৩ / মুক্তচিন্তার বিরোধী 'মনু সংহিতা' ২৮৪ / মুক্তমনের বিরোধী তর্কবিদ্যা কেন ভাববাদী দর্শনের গৌরব ২৮৫ / আধ্যাত্মবাদ ও যুক্তিবাদের চোখে আত্মা ২৮৬ / আত্মা, পরলোক ও জন্মান্তর বিষয়ে স্বামী অভেদানন্দ ২৯০ / স্বামী বিবেকানন্দের চোখে আত্মা ৩০১ / আত্মা নিয়ে আরও কিছু বিশিষ্ট ভাববাদীর মত ৩০২ / আত্মার শান্তিতে শ্রাদ্ধ ৩০৩ / আত্মা প্রসঙ্গে চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন ৩০৫

অধ্যায় : সতেরো ৩০৯-৩১০

❑ জাতিস্মররা হয় মানসিক রোগী, নয় প্রতারক ৩০৯

অধ্যায় : আঠারো ৩১১-৩২২

❑ জাতিস্মর তদন্ত ১ : দোলন চাঁপা ৩১১ / তদন্ত ২ : জ্ঞানতিলক ৩১৪/ তদন্ত ৩ : ফ্রান্সিস পুনর্জন্ম ৩১৫ / তদন্ত ৪ : সুনীল দত্ত সাক্সেনা ৩১৬/ তদন্ত ৫ : প্রদীপ ৩১৮ / তদন্ত ৬ : কলকাতায় জাতিস্মর ৩২১

অধ্যায় : উনিশ ৩২৩-৩৪৭

❑ প্ল্যানচেট (Planchette) বা প্রেত ৩২৩ / মিডিয়াম বনাম জাদুকর ৩২৩/ উনিশ শতকের দুই সেরা মিডিয়া ও দুই জাদুকর ৩২৬ / প্ল্যানচেটের ওপর আঘাত হেনেছিল যে বই ৩৩০ / স্বামী অভেদানন্দ ও প্রেত-বৈঠক ৩৩৪/ স্বামী অভেদানন্দের সামনে আত্মা লিখল শ্লেটে ৩৩৪ / বন্ধনমুক্তির খেলায় ভারতীয় জাদুকর ৩৩৭ / রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেট-চর্চা ৩৩৯ / আমার দেখা প্ল্যানচেট ৩৪৩

অধ্যায় : কুড়ি ৩৪৮-৩৫০

❑ 'অলৌকিক' শক্তিধরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ৩৪৮

❑ গ্রন্থটির সাহায্যকারী সূত্র ৩৫১

ভূমিকা

বিজ্ঞানকে এবং বিজ্ঞানের দৌলতে পাওয়া কৃতকৌশল প্রযুক্তিবিদ্যাকে জীবনের সর্বস্তরে ব্যবহার করেও আমরা অনেকেই বিজ্ঞান-বিরোধী। বিজ্ঞান বিরোধিতার স্থূল ও সূক্ষ্ম চেষ্টা অনেকদিন ধরেই চলছে। কোপারনিকাস, ডারউইন, ফ্রেজার, মার্কস, এঙ্গেলস, ফ্রয়েড, পাভলভের বই লক্ষ লক্ষ বিক্রি হয়েছে। সব দেশেই ম্যাক্রো-ওয়ার্ল্ড, মাইক্রো-ওয়ার্ল্ড, মহাকাশবিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান ও গবেষণা বৃদ্ধির ব্যাপক চেষ্টা চলছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে ধারণা আমাদের ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসছে। বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষ মন্ত্রতন্ত্র ছেড়ে যন্ত্র ও প্রযুক্তিবিদ্যার আরাধনায় রত হয়েছে। তবু কেন মানুষের বিজ্ঞানমনস্কতা বাড়ছে না? কেন এখনও বেশির ভাগ দেশের সংস্কৃতির ও ধর্মের মধ্যে অতিপ্রাকৃত, অস্বাভাবিক, অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ? এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে সেইসব ঘটনায় গুরুত্ব আরোপ এবং অলৌকিক ঐশীমহিমা প্রচারে ধর্মীয় সংস্থার ও সাধুসন্তদের পরিকল্পিত প্রচার ও প্রচেষ্টা? অলৌকিক অবৈজ্ঞানিক রহস্যময়তার প্রতি মানুষের দুর্বলতা না থাকলে প্রচার সংস্থাগুলি এ'সব নিয়ে সক্রিয় থাকত না। অতিপ্রাকৃত ঘটনার প্রতি এই দুর্বলতা অনেকের মানসিকতার বৈশিষ্ট্য হলেও আমরা একে স্বভাবগত বলতে পারি না। অনেককিছু প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা না জানার জন্যে আদিম যুগের মানুষের ভয়ই যে কাল্পনিক ভূত ও ভগবানে রূপান্তরিত হয়েছে, একথা অনেকে লিখছেন, কাজেই অনেকেই পড়েছেন। কিন্তু পুরনো শর্তাধীনতা (conditioning) থেকে মুক্ত হয়েছেন ক'জন? না হবার কারণ বুঝতে না পারলে অলৌকিক ঘটনার জাদু জানলেও মানুষের আদিম সংস্কার দূর হবে না। বৈজ্ঞানিক কি সব ব্যাখ্যা করতে পারে? বৈজ্ঞানিক কি বন্যা, অনাবৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস, ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্পকে প্রতিরোধ করতে পারে? বৈজ্ঞানিক কি মৃতকে জীবন্ত করতে পারে? ঠিক কি ভাবে ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হল, প্রাণের উদ্ভব হল—এর উত্তর কি দিতে পারে আধুনিক বিজ্ঞান?

সৎ বিজ্ঞানী মাত্রেই বলবেন, —না জানি না, পারি না। কিন্তু মাত্র কয়েক হাজার বছরের চেষ্টায় আমরা কি প্রকৃতির অনেক রহস্য জানতে পারিনি? প্রকৃতির অনেক ক্রিয়াকলাপের অনুকরণে বা অনুসরণে প্রকৃতিকে কিছুটা বশীভূত করে মানবসমাজের কল্যাণে নিয়োগ করিনি? বিজ্ঞান সৃষ্টির ও মানবধর্মের আদি ও অনন্ত সম্পর্কে এখনও অনেকখানি অজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও মানুষের জীবনকে অনেক উন্নত করেনি কি? মানুষের ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানকে গড়ে তুলতে সময় দিন।

বিজ্ঞান অনেক কিছু করেছে ও আরও কিছু করতে পারে, এ নিয়ে কেউ কোমর বেঁধে তর্কে নামবেন না জানি; কিন্তু বিজ্ঞানকে মানুষের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার স্বাধীনতা কোনো দেশের রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত শাসকশ্রেণি, পূজিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা—(বিজ্ঞানীরা ও নামি-দামী বিজ্ঞানীরাও এর মধ্যে আছেন) দেবেন না। সেই পুরনো কথাই তুলবেন। বিজ্ঞান বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ ও সমাজকে দেখতে চায় ও তাদের সম্পর্ক নিরূপণ করতে চায় এবং সৎ বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানসম্মত শোষণহীন সমাজ সংগঠিত করতে চায়। অধিকাংশ দেশের শাসকশ্রেণি তাদের স্বার্থরক্ষক সমাজ সংগঠনের পরিবর্তন চায় না। কাজেই আমরা সব পণ্ডিতদের মুখ ও কলম থেকেই এই একই প্রচার শুনছি গত তিন চার দশক ধরে। বিজ্ঞান মানুষের জৈবিক সমস্যা হয়তো নিরসন করতে পারে, কিন্তু আত্মিক ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত করে মানুষকে অমানুষ করে তুলছে। যে বিজ্ঞানের মধ্যে নীতিবোধ, সৌন্দর্যবোধ ও দর্শনচিন্তা নেই—সেই বিজ্ঞান চাঁদে পাড়ি দিতে পারলেও মূল্যবোধ বাড়াতে পারে না, মনুষ্যত্ব উন্মেষে অক্ষম। ভারতের দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিজ্ঞান-বিশারদরা বিজ্ঞানের প্রযুক্তিবিদ্যা ও প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যার কুশলী মিশ্রণের ফর্মুলা আবিষ্কারের জন্য আলোচনা ও চর্চায় রত। এদেশের শাসক মনে করে শুধু ভাত রুটির জোগান দিলে মানুষ গড়া যাবে না! মনুষ্যত্বের উন্মেষে প্রয়োজন বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের নির্যাসের সঠিক পরিমাণে সংযোজন।

বিজ্ঞান বিরোধিতায় তাই স্থূল চেষ্টা এখন আর আগের মতো নজরে পড়ে না। অলৌকিকতার ও রহস্যময়তার ধাঁধার সৃষ্টি করে কিছু বিজ্ঞানী সাধুসন্তদের বিজ্ঞান বিরোধিতায় মদত জোগাচ্ছেন। আজ যোগবলে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়েছেন কোনও স্বামীজি বা বাবাজি—এই প্রচার বা এই ধরনের প্রদর্শনী আগের মতো বিস্ময় উৎপাদন করে না। আজকের রকেট—কম্পিউটার যুগের মানুষ আর আগের মতো প্রয়াত আত্মার বাক্যালাপ শুনে শিহরিত হয় না। আজ বিজ্ঞানের মর্যাদা পাবার জন্য উৎসুক পরাসনোবিদ্যা, জ্যোতিষ ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির মধ্যে আসতে চায়। ভারতীয় যোগী থেকে ইউরি গেলারেরা মাঝে মাঝে মিডিয়া মারফত নিজেদের জাহির করার চেষ্টা করলেও অলৌকিককে বিজ্ঞানীদের রবার স্ট্যাম্পে লৌকিক করে তুলতে পারেননি। যদি কোনোদিন ল্যাবরেটরিতে পদার্থকণার বিশেষ কোনও শক্তি আবিষ্কৃত হয় যা টেলিপ্যাথি বা ক্লেয়ারোভয়েনসের রহস্যভেদে সক্ষম, তাহলেও ESP-র মর্যাদা বৃদ্ধি হবে না। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে বস্তুকণা ও শক্তির অভিব্যক্তি অজস্রভাবে ঘটতে পারে—সপক্ষে আর একটি তথ্য সংযোজিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে এও প্রমাণিত হবে যে, এই বস্তুকণা তথাকথিত অলৌকিক শক্তি বিজ্ঞানীর পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোন একটির কাছেই অভিব্যক্ত হয়েছে প্রকৃতিবিজ্ঞানের মেথডোলজির মাধ্যমেই।

ঐশীশক্তি, অলৌকিক শক্তি, অতিপ্রাকৃত শক্তি—প্রভৃতি কথাগুলো পরিহার

করলেও প্রেতলোকের অস্তিত্ব, জন্মান্তরের রহস্য, পীরের সমাধির (মাজার) অলৌকিকত্ব, ব্যক্তিবিশেষের সমাধি-মাধ্যমে ভগবদ্দর্শন—ইত্যাদিকে বিজ্ঞানগ্রাহ্য করার চেষ্টা সফল হবার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

প্রবীর ঘোষ দীর্ঘকালের পরিশ্রমলব্ধ গবেষণায় ও অসাধারণ মননশীলতায় পৃথিবীর বিভিন্ন রহস্যাবৃত অলৌকিক ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণের কাজে হাত দিয়েছেন। বইটি একাধিক খণ্ডে প্রকাশিত হবে। এটি প্রথম খণ্ড। এই খণ্ডে পরাবিদ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বইটির গুরুত্ব বাড়িয়েছেন, বেশি উপভোগ্য করেছেন; আমাদের ধন্যভাজন হয়েছেন। কারণ, ভারতীয় কোনও ভাষায় অথবা ভারত থেকে প্রকাশিত কোনও গ্রন্থে পরাবিদ্যার ওপর এতো বিস্তৃত আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বিষয়টা অ্যাকাডেমিক হলেও লেখার সহজবোধ্যতা ও সাবলীলতার দরুন সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য হয়েছে।

প্রবীর সাধুসন্তদের ঘটানো অনেক ঘটনাই আমাদের লৌকিক কৌশলে ঘটিয়ে দেখিয়েছেন। প্রবীর পৃথিবীর সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতাধর এবং জ্যোতিষীদের বুজরুকির বিরুদ্ধে এক অসাধারণ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। ঘোষণা করেছেন—বিশ্বের যে কেউ অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ রাখলে বা কোনও জ্যোতিষী অভ্রান্ত গণনার পরিচয় দিলে দেবেন ৫০ হাজার ভারতীয় টাকা। লেখক চান, এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে আরও কিছু মানুষ বুঝতে শিখুন, বাস্তবে অলৌকিক বলে কিছু নেই, অলৌকিকের অস্তিত্ব আছে শুধু পত্র-পত্রিকা, ধর্মগ্রন্থ, বইয়ের পাতায় এবং অতিরঞ্জিত গল্প বলিয়েদের গল্পে।

ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রবীর ঘোষের নির্ভিক যুক্তিবাদী সংগ্রাম নিশ্চয়ই সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণ করবে। প্রথম খণ্ডের আলোচ্য বিষয়গুলোর ওপর বিস্তৃত আলোচনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। পরবর্তী খণ্ডের জন্য তীব্র আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় রইলাম।

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
১অক্টোবর, ১৯৮৯

ডিরেক্টর
পাভলভ ইনস্টিটিউট অ্যান্ড হসপিটাল
১৩২/১ এ, বিধান সরণি
কলকাতা-৪

কিছু কথা

আজ বিংশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে মানুষের বিজ্ঞান দুর্বার। অভাবিতপূর্ব তার উন্নতি। তবু আজ জনমনে অন্ধ-বিশ্বাস এবং অলৌকিকের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে চাইছে। এমনতর হওয়ার কারণটি আমাদেরই সমাজব্যবস্থার মধ্যে নিহিত। সমাজের হুজুরের দল চান না মজুরের দল জানুক তাদের প্রতিটি বঞ্চনার কারণ তাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। স্বর্গের দেবতা, আকাশের নক্ষত্র, পূর্বজন্মের কর্মফল ইত্যাদিকে বঞ্চনার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারলে, বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারলে, প্রতিবাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিয়ে হুজুর-মজুরের সম্পর্কটা বজায় রাখা যায়।

ইতিহাসের অনিবার্য গতি বিশ্বাসের বিপরীতে যুক্তির অভিমুখে। তাই আমরা যুক্তিবাদীরা বাড়ছি। প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্তে বেড়েই চলেছি। যুক্তিবাদ আজ আন্দোলনের রূপ নিতে চলেছে। আমরা সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন। জানি, যে সমাজব্যবস্থায় পদে পদে অনিশ্চয়তা, সে সমাজের মানুষগুলোর সাধুবাবা, গুরুজি, অলৌকিকতা ও গ্রহরত্নের প্রতি নির্ভরশীলতাও বেশি।

যুক্তিহীন অন্ধ-বিশ্বাসগুলোকে হুজুরের দল ও তার উচ্ছিষ্টভোগীরা প্রতিনিয়ত বাঁচিয়ে রাখতে ও পুষ্ট করতে সচেষ্ট। তারই ফলশ্রুতিতে মানুষের মনের স্বাভাবিক যুক্তিকে গুলিয়ে দিতে গড়ে উঠেছে ভাববাদী দর্শন অর্থাৎ অধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারা, বিশ্বাসবাদ, গুরুবাদ, ঈশ্বরবাদ ও ধর্মের নানা আচার-অনুষ্ঠান। যুক্তিবাদী চিন্তা ও চেতনাকে ঠেকিয়ে রাখতে সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ধর্ম-উন্মাদনা সৃষ্টি করা হচ্ছে। আজ তাই বোঝার সময় এসেছে, শোষিত মানুষের হাতিয়ার যুক্তিবাদী চিন্তার প্রবলতম শত্রু তথাকথিত ধর্ম, অধ্যাত্মবাদ, ভাববাদী দর্শন, বিশ্বাসবাদ ইত্যাদি। তথাকথিত ধর্মের এই যুক্তি-বিরোধী চরিত্রের স্বরূপকে সঠিকভাবে সাধারণ-মানুষের কাছে তুলে ধরতে না পারলে কুসংস্কার মুক্তির, হুজুর-মজুর সম্পর্ক অবসানের কল্পনা শুধুমাত্র কল্পনাই থেকে যাবে।

ডান-বাম নির্বিশেষে ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলকেই সংসদীয় নির্বাচনের কথা মাথায় রাখতে হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনই ক্ষমতা দখলের একমাত্র পথ।

হুজুর-মজুর সম্পর্কের অবসানের কথা বলা রাজনৈতিক দলগুলোও সংসদীয় নির্বাচনে অংশ নিতে গিয়ে ভোট সংগ্রহকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছে। ফলে মানুষের অন্ধ-বিশ্বাস, ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে গিয়ে মানুষের বিশ্বাসকে আঘাত করার চেয়ে ভোটার-তোষণনীতিকেই অভ্রান্ত অস্ত্র হিসেবে মনে করতে শুরু করেছে।

তাই তথাকথিত ধর্ম-বিশ্বাসকে আঘাত হানার সময় এলে কৌশল হিসেবে কে কখন কতটুকু মুখ খুলবে—এটাই তাদের কাছে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিচ্ছে। কেন সংসদীয় গণতন্ত্রে ঢোকা, তা বিস্মৃত হলে উপলক্ষই লক্ষ্যকে ছাপিয়ে যাবে—এটাই স্বাভাবিক।

এটা মনে রাখা একান্তই প্রয়োজন সমস্যার মূল উৎপাটনের চেষ্টা না করে বিচ্ছিন্নভাবে সতী মন্দির বা রাম-শিলা পুজোর বিরোধিতা করে কুসংস্কারের নোংরা আবর্জনা দূর করা যাবে না, মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে দলে ভারী করা যেতে পারে মাত্র। সতী পুজো বা রাম-শিলার পুজো যেমন বিশ্বাস-নির্ভর, একইভাবে সমস্ত দেবতা ও অবতারের পুজোই একান্ত বিশ্বাস-নির্ভর। যতদিন মানুষের মনে "আত্মা অবিনশ্বর" এই যুক্তিহীন বিশ্বাস থাকবে ততদিন সতী মন্দির সহ নানা মৃত বাবাজি-মাতাজিদের মন্দির থাকবে, ওইসব মৃত বাবাজি-মাতাজিদের কৃপা লাভের আশায়। যতদিন ঈশ্বর নামক কল্পনা মানুষের চেতনায় বিশ্বাস হয়ে বিরাজ করবে, ততদিন রাম-রহিমসহ অন্যান্য ঈশ্বরের পুজোও চলতেই থাকবে। সতী ও রামের পুজো বন্ধ করলে তার পরিবর্তে স্বভাবতই সৃষ্টি করা হবে 'কৃষ্ণ-চক্র', 'বজরঙ-ধ্বজা' ইত্যাদি নিয়ে ধর্ম উন্মাদনা। কোটি কোটি দেবতা আর লক্ষ লক্ষ অবতার থাকতে উন্মাদনা সৃষ্টিতে অসুবিধে কোথায়? রাম গেলে, রামকৃষ্ণ আসবে—এমনটাই তো অবধারিত।

প্রায় সব রাজনৈতিক দলই মৌলবাদের বিরুদ্ধে মৌখিকভাবে সোচ্চার। কিন্তু তারা কেউই সমস্যার মূলে যেতে নারাজ। তবে কি এরা প্রত্যেকেই জনসাধারণের চেতনাকে বেশি দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে ভীত? ভাত, কাপড় ও বাস-সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের চিন্তার ভ্রান্তি, দীনতা দূর করতে সচেষ্ট না হলে, উন্নততর চিন্তার খোরাক দিতে না পারলে তার পরিণাম কী, পৃথিবী জুড়ে প্রগতির কাঁটাকে উলটো দিকে ঘোরাবার চেষ্টাতেই প্রকট।

'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' ('যুক্তিবাদী সমিতি' নামেই বেশি পরিচিত) সমাজ সচেতন যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ায় ব্রতী একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। আমাদের কাছে বিজ্ঞান আন্দোলনের অর্থ এই নয়—"বিজ্ঞানের সবচেয়ে

বেশি সুযোগ-সুবিধে সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।" সে দায়িত্ব সরকারের, প্রশাসনের। আমাদের কাছে বিজ্ঞান আন্দোলনের অর্থ—"বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার আন্দোলন, যুক্তিবাদী মানুষ গড়ার আন্দোলন, কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলন।"

আমাদের যুদ্ধ অলৌকিকের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের দুর্বলতাকে, অজ্ঞানতাকে কুসংস্কারকে ভাঙিয়ে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করে চলেছে, তাদের বিরুদ্ধে। যারা কুসংস্কারের আবর্জনা সাফ করার নাম করলে "মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত নয়" বলে সোচ্চার হয়, তাদের বিরুদ্ধে। যারা জনসাধারণের চেতনাকে বেশি দুর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে ভয় পায়, তাদের বিরুদ্ধে। যারা "জাতের নামে বজ্জাতি" করে চলেছে, তাদের বিরুদ্ধে। যারা ধর্মের নামে মানুষের মানবিকতার চূড়ান্ত বিকাশ-গতিকে রুদ্ধ রাখতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে। আমরা সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি, প্রতিটি বিজ্ঞান-মনস্ক, যুক্তিবাদী মানুষই খাঁটি ধার্মিক। একটা তলোয়ারের ধর্ম যেমন তীক্ষ্ণতা, আগুনের ধর্ম যেমন দহন, তেমনই মানুষের ধর্ম মনুষত্বের চরমতম বিকাশ। সেই বিচারে আমরাই ধার্মিক কারণ আমরা শোষিত মানুষদের মনুষ্যত্ববোধকে বিকশিত করতে চাইছি। মানুষের চিন্তায়, মানুষের চেতনায় বপন করতে চাইছি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বীজ।

যারা কুসংস্কার দূরীকরণের কথা উঠলেই বলে, "আগে চাই শিক্ষারবিস্তার, শিক্ষাই কুসংস্কার দূর করবে" তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, শিক্ষা বিস্তারের অর্থ শুধু বইয়ের পড়া মুখস্থ্ করা নয়, কুসংস্কার দূর করাও শিক্ষা প্রসারের অঙ্গ। অশিক্ষা বিতাড়নের চেয়ে বড় শিক্ষা আর কী হতে পারে?

জনশিক্ষা ও যথার্থ বিজ্ঞানচেতনা আজও এ দেশে দুর্লভ। আমরা সেই দুর্লভ কাজই সম্পূর্ণ করতে চাই। আমরা ঘটাতে চাই চিন্তার বিপ্লব, সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

আমরা জানি, যে দিন বাস্তবিকই কুসংস্কার বিরোধী বৃহত্তর আন্দোলন দুর্বার গতি পাবে, সে-দিন দুটি জিনিস ঘটবে। এক : **এই আন্দোলন যে শ্রেণিস্বার্থকে আঘাত হানবে সেই শ্রেণি তাদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে, অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে তীব্র প্রত্যাঘাত হানবে।** এই প্রত্যাঘাতের মুখে কেউ সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, কেউ পিছু হটবে। দুই : যুক্তিবাদী চিন্তা জনসাধারণের চেতনার জগতে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাবে তারই পরিণতিতে গড়ে উঠবে নতুন-নেতৃত্ব, যে নেতৃত্ব থাকবে সমাজ পরিবর্তনের, হুজুর-মজুর সম্পর্ক অবসানের সার্বিক বিপ্লবের অঙ্গীকার।

আমরা সুনিশ্চিত লক্ষ্যে পৌঁছতে চাই, সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে চাই, তাদেরকে আমাদের চিন্তার শরিক করতে চাই। আমরা যুক্তির বলে প্রতিটি অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে, প্রতিটি অলৌকিকবাবা ও জ্যোতিষীদের মুখোশ খুলে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই প্রতিটি অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের রহস্য উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্ঞানের সন্ধান সর্বসাধারণকে জানাতে নানা উদ্যোগ ও পরিকল্পনা নিয়েছি। মানুষের আহ্বানে হাজির হতে চাই জ্যোতিষ, অলৌকিক, ধর্মসহ কুসংস্কার-বিরোধী আলোচনাচক্রে, শিক্ষণ-শিবির পরিচালনায়, পদযাত্রায়। মানুষের দরবারে হাজির হতে চাই আমাদের নাটক, প্রতিবেদন ও বই-পত্তর নিয়ে। রেখেছি একটি ঘোষণা—কোনও অবতার বা জ্যোতিষী তার ক্ষমতার প্রমাণ দিতে পারলে দেব পঞ্চাশ হাজার টাকা। ভেঙে দেব 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'। চাই, এই ঘোষণার মধ্যে দিয়ে মানুষ বুঝতে শিখুক, অলৌকিক ও জ্যোতিষশাস্ত্রের অস্তিত্ব শুধু কল্পনায় ও বইয়ের পাতায়। চ্যালেঞ্জ গ্রহণের বা চ্যালেঞ্জ জানাবার ধৃষ্টতা যারা দেখিয়েছে, প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের নতজানু হতে হয়েছে।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি সহযোগী সংস্থার সমন্বয়কারী হিসেবে এবং নিজের শাখা সংগঠনগুলোকে নিয়ে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের মূল স্রোতে কাজ করছে। এই আন্দোলনেরই এক উল্লেখযোগ্য পর্যায় হল—'চ্যালেঞ্জ'। প্রচার ও বিজ্ঞাপনের দৌলতে যে গরুগুলো গাছে চড়ে বসেছে, তাদের মাটিতে নামিয়ে এনে আবার ঘাস খাওয়ানোর জন্যেই এই 'চ্যালেঞ্জ'। দোদুল্যমান, সুবিধাভোগী ও ইর্ষাকাতরদের কাছে 'চ্যালেঞ্জ' 'অশোভন' মনে হতেই পারে, কেন না চ্যালেঞ্জ বাস্তব সত্যকে বড় বেশি রকম স্পষ্ট করে তোলে। কিন্তু, সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় প্রশ্ন এটাই—যেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেই দাবি প্রমাণ করা যায়, বাস্তব সত্যকে জানা যায়, সেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণে দ্বিধা থাকবে কেন?

আমরা চাই আমাদের বিস্তার। আমাদের শাখা বিস্তার করতে চাই সেখানেই, যেখানে রয়েছে মানুষ। বিভিন্ন সংস্থাকে, মানুষকে পেতে চাই সংগ্রামের সহযোগী হিসেবে।

এবার আমি সেইসব মানুষদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই, যাঁদের প্রতিটি চিঠি, প্রতিটি যোগাযোগ, প্রতিটি আর্থিক সাহায্য, প্রতিটি উপদেশ, প্রতিটি সহযোগিতা আমাকে এবং আমাদের সমিতিকে প্রেরণা দিয়েছে, উৎসাহ দিয়েছে গভীর বিশ্বাস সৃষ্টি করেছে—আমি পারছি, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে পারছি। আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। এত দ্রুত আমরা যে সংখ্যায় এত বিশালভাবে বৃদ্ধি পাব, তা আমার সুখ কল্পনাতেও ছিল না। অবাক বিস্ময়ে দেখেছি, যখনই আক্রান্ত হয়েছি, দুর্বার জন-রোষ আক্রমণকারীদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। যুক্তিবাদী আন্দোলনের একমাত্র শক্তি মানুষের ঘুম ভাঙার গানে দিশা

হারিয়ে আক্রমণকারীরা কখনও হয়েছে ফেরার কখনও সচেষ্ট হয়েছে আত্মহননে।

'অলৌকিক নয়, লৌকিক'-এর প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছোলাম—মানুষ যুক্তি ভালবাসেন। সু-যুক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেলে কু-যুক্তিকে বর্জন ও সু-যুক্তিকে গ্রহণ করেন। বইটির পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে যে বিপুল সাড়া পেয়েছি তাতে আমি প্লাবিত, প্রাণিত, আপ্লুত। প্রতিনিয়ত আছড়ে পড়া বিশাল চিঠির ঢেউ আমার প্রাণশক্তি, আমার প্রেরণা, এ-কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করছি। যাঁদের চিঠির উত্তর দিতে পারিনি, যে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন ছিল, যা চিঠির স্বল্প পরিসরে সম্ভব ছিল না। বইটির এই খণ্ডে এবং পরবর্তী খণ্ডগুলোতে তাঁদের সকলের জিজ্ঞাসা নিয়েই আলোচনা করেছি এবং করব।

আমার প্রেরণার উৎস আমার সংগ্রামের সাথী প্রত্যেককে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন।

৭২/৮ দেবীনিবাস রোড
কলকাতা ৭০০ ০৭৪

প্রবীর ঘোষ
৬ অক্টোবর, ১৯৮৯

নতুন 'কিছু কথা'

'অলৌকিক নয়, লৌকিক' ১ম খণ্ডের প্রথম প্রকাশ ২১ বছরে পা দিল। প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে টানা ২১ বছর আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'বেস্ট সেলার' তালিকায় স্থান পেয়েই আসছে। মনেই হতে পারে 'অসম্ভব ব্যাপার', কিন্তু 'সত্যি'।

আরও একটা ব্যাপার—'যুক্তিবাদী সমিতি'-ও (ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি) ২১ বছরে পা দিল। 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' আর 'যুক্তিবাদী সমিতি' এই দুটি 'ব্র্যান্ড নেম' আজ সমার্থক শব্দ হয়ে গেছে।

বুজরুকি ফাঁস নিয়ে লেখার শুরু ১৯৮২ সালে। 'পরিবর্তন' সেই সময় জনপ্রিয়তম বাংলা সাপ্তাহিক। সম্পাদক ছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। 'লৌকিক অলৌকিক' শিরোনামে লিখতাম বিভিন্ন তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার নেপথ্যের লৌকিক কারণ। পাঠকরা যে ভাবে লেখাগুলো গ্রহণ করলেন, তাতে সত্যি-ই আপ্লুত হলাম।

আমার এই ধরনের লেখায় হাত দেওয়ার পিছনে কয়েকটা কারণ ছিল। সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম, এ-দেশের অসাম্যের জগদ্দল ব্যবস্থাকে বাস্তবিকই পাল্টাতে হলে সমাজের কিছু মানুষের আন্তরিক সমর্থনের প্রয়োজন। আইন করে আজও জ্যোতিষচর্চা, ধর্মের নামে পশু বলি, দেহব্যবসা, পণপ্রথা ইত্যাদি বন্ধ করা যায়নি জন-সচেতনতার অভাবে। আবার **আগে সমস্ত মানুষের বিবেকের পরিবর্তন ঘটাব, তারপর সমাজ বিপ্লব ঘটাবার কাজে হাত দেব—এটাও অত্যন্ত ভুল ধারণা।** হাতের সামনেই উদাহরণ রয়েছে। গত শতকের শেষভাগে রাশিয়ায় যখন প্রতিবিপ্লব ঘটল, মার্কসের মূর্তিকে উপড়ে ফেলল, তখন গোটা 'অপারেশন'-এ কত মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল? অতি মুষ্টিমেয়। কোনও প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, গৃহযুদ্ধ ছাড়াই তারা হঠাৎ করে কমিউনিস্ট জমানা পাল্টে দিল। রাশিয়ার সামান্য কিছু মানুষ পুরো 'অ্যাকশন'-এ নেতৃত্ব দিয়েছিল। নেতারা বুঝে নিয়েছিল, তাদের এই পাল্টে দেবার রাজনীতিকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা কেউ-ই প্রায় করবে না। কমিউনিস্টদের জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ধারণা, মন্দির-মসজিদ গির্জায় জোর করে প্রার্থনা বন্ধ করে দেওয়া, উঁচু মহলে দুর্নীতি—এসবই সাধারণ মানুষের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। জনগণের মধ্যে এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ছিল। বার-ড্যান্স, ক্যাবারে, ব্লু-ফিলম, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি নানা ভোগসর্বস্বতা রুশ সমাজে ঢুকে

গিয়েছিল। অলৌকিতার পক্ষে নানা গাল-গপ্পোকে 'সত্যি' বলে চালাতে চাইছিল রুশ সরকারি পত্র-পত্রিকা। কমিউনিস্টদের এই 'ঘোমটার তলায় খেমটা নাচ' দেশবাসীরা কী চোখে দেখছে, তা বোঝার সামান্যও চেষ্টা করেনি রাশিয়ার গদীতে বসা কমিউনিস্টরা। বুঝেছিল কমিউনিস্টদের ছুঁড়ে ফেলতে এগিয়ে আসা কিছু নেতা।

যেখানে শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ আছে, কিন্তু প্রকাশ নেই, সেখানে মুষ্টিমেয় নেতাও সরকার উল্টে দিতে পারে, সমাজ পাল্টে দিতে পারে—রাশিয়ার ইতিহাস তেমন-ই শিক্ষা দিয়েছে।

সমাজকে পাল্টে দেওয়ার পথ একটা নয়। বহু। প্রয়োজনে মানুষকে সচেতন করতে হয়। সমাবেশিত করে চালিত করতে হয়। কখনও বা গণ-হিস্টিরিয়া তৈরি করে কার্যোদ্ধার করা হয়। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে হিস্টিরিক করে তুলে 'ধর্মগুরু' বা 'ধর্মযোদ্ধা'রা আত্মঘাতী বাহিনী তৈরি করে ফেলে। যেমনটা দেখেছি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের সময়। আবার আদর্শের জন্য উচ্চমেধার মানুষদের আত্মবলি দিতে দেখেছি গত শতকের ছয়-সাতের দশকে নকশাল আন্দোলনে।

সমাজকে পাল্টাবার স্বপ্ন দেখা মানুষরা তাদের সংগৃহীত জ্ঞান থেকে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার ও প্রয়োগ করতে পারে। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল কি বর্তমান সময়ে আদৌ সম্ভব? সংঘর্ষ বিনা কি সাম্যের সমাজ গড়া সম্ভব? সাম্যের শত্রুরা কি বিনা বাধায় কাজ করতে দেবে? সবগুলো প্রশ্নের উত্তর 'না'। সাম্যের সমাজ গড়তে গেলে আক্রমণের মোকাবিলায় প্রতি আক্রমণ করতেই হবে। সংঘর্ষে যেতেই হবে। অসাম্য ভাঙতে সংঘর্ষ ও সাম্য আনতে নির্মাণ জরুরি।

বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে নিয়ে এক একটি পৃথক উন্নততর সাম্যের সমাজ গড়ার পরিকল্পনা নিলে তা হবে বাস্তব-সম্মত। যেমন ওড়িয়াভাষী অঞ্চল বাংলাভাষী অঞ্চল (যার মধ্যে থাকবে পশ্চিমবাংলা, বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চল,অসম ও ত্রিপুরার বাংলাভাষী অঞ্চল এবং বাংলাদেশ), ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী সংস্কৃতি প্রভাবিত অঞ্চল, বিহার, অন্ধ্র, ছত্তিশগড়, পূর্ব ভারতের সাতটি প্রদেশ—প্রত্যেকেই পৃথক দেশ হলে অসুবিধা কোথায়? কোথাও নেই। ইউরোপের ছোট ছোট দেশগুলো যদি স্বাধীন দেশ হয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে, তবে বাংলা, বিহার, ওড়িশা, অসম, ত্রিপুরা কেন পারবে না? নিশ্চয়-ই পারবে। তাত্ত্বিক ভাবে পারবে। বাস্তবেও পারবে।

যাঁরা সাম্যের সমাজ গড়ায় নেতৃত্ব দেবেন, তাঁদের নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। শোষিত জনগণের মধ্যে যদি কাজ করতে চান, তবে তাদের পাশে বন্ধুর মতো দাঁড়াতে হবে। পরিবারের একজন হতে হবে। তাদের ভালোবাসা,

তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। হতে হবে তাদের ভরসাস্থল। তবে না মানুষগুলো নেতার কথায় জীবন দিতে পারবে অবহেলে। এই নেতারা তো শূন্য থেকে হঠাৎ করে জন্মায় না। এরা একটু একটু করে হয়ে ওঠে। বরং বলা ভালো—একজন ভালো খেলোয়াড়কে গড়ে তোলার মতোই নেতা গড়ে তুলতে হয়। তারপর নানা ঘাত-প্রতিঘাত-লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে নেতা পরিশীলিত ও মার্জিত হয়।

যুক্তিবাদী সমিতির অনেক রকম কুসংস্কার বিরোধী কাজের পাশাপাশি সাম্যের সমাজ গড়ার চিন্তাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার বিষয়ে সমস্ত রকমের সহযোগিতা করাও কাজ।

এই আলোচনার মধ্য দিয়ে এটাই উঠে এল যে, যুক্তিবাদী সমিতি শুরুতে দুটি লক্ষ স্থির করেছিল। (এক), জনগণের একটা অংশকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা। এবং সেইসঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান করা, সেই অনুষ্ঠানে তথাকথিত নানা অলৌকিক ঘটনার পিছনের লৌকিক কৌশলকে বেআব্রু করা, কুসংস্কার বিরোধী 'ওয়ার্কশপ' (যারা কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছুক, তাদের তৈরি করা), তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের এবং জ্যোতিষীদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাদের ভণ্ডামি ফাঁস করা, কুসংস্কার-বিরোধী নাটক, পথসভা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস জাগিয়ে তোলা—ঐশ্বরিক শক্তি, ঈশ্বর, কর্মফল, ভাগ্য ইত্যাদির কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই।

(দুই), শোষিত মানুষদের মধ্য থেকে এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো মানুষ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হওয়া। সেই মানুষ যুক্তিবাদী সমিতির সভ্য হতে পারেন, আবার না-ও হতে পারেন। কিন্তু তাঁকে হতেই হবে সৎ, নির্লোভ, সাহসী, সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কিছু মানুষই শোষিত মানুষদের অধিকার বিষয়ে সচেতন করে বঞ্চনার ক্ষোভ জাগিয়ে তুলতে ও তাদের সমাবেশিত করতে পারেন। সেইসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে **সব্বাইকে সব কিছু বুঝিয়ে তারপর বিপ্লবের কাজে হাত দিতে গেলে আর বিপ্লব হবে না। কারণ সকলে কোনও দিন-ই একমত হবে না।**

(তিন), সাম্যের সমাজ গড়তে গেলে এতদিনকার চিন্তা-ভাবনা-মূল্যবোধের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ দেখা দেবে। সেই সংঘর্ষে লাঠি-বন্দুক না থাকলেও থাকবে পুরোনো চিন্তার সঙ্গে নতুনের ঠোকাঠুকি। আপনার উন্নততর ধ্যান-ধারণা নিয়ে যখনই প্রচারে নামবেন, দলিতদের অধিকার সচেতন করতে নামবেন, তখনই হুজুরের দল ও তাদের সহযোগীরা আপনার বিরুদ্ধে সংঘর্ষে নামবে। তার মধ্যে থাকবে রাজনৈতিক দল, তাদের 'বাহুবলী'রা, পুলিশ-প্রশাসন, প্রচার মাধ্যম ইত্যাদিদের কেউ কেউ। অথবা সবাই একজোট হয়ে আপনার ও আপনার দলের

বিরুদ্ধে নামতে পারে। কতটা লড়াইতে যাবেন, কতটা লড়াই এড়াবেন, কাদের সহযোগী হিসেবে পাবেন—সেটা ভিন্নতর প্রশ্ন। দলিতদের ঘুম ভাঙাতে গেলে সংঘর্ষ অনিবার্য। সবাই যদি খাদ্য-বস্ত্র বাসস্থান-পানীয়-স্বাস্থ্য-শিক্ষা'র মতো সাংবিধানিক অধিকারগুলো দাবি করে বসে, তবে তো রাজনীতিকদের লুটে-পুটে খাওয়ার ঐতিহ্যকেই লাটে তুলতে হয়।

(চার), সংঘর্ষের পর দ্বিতীয় ধাপে নির্মাণকালে শিক্ষা-সংস্কৃতি-আর্থিক উন্নতির মধ্য দিয়ে নতুন পরিবেশ তৈরি করতে হবে। সংখ্যাগুরু জনগণকে নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে। সেগুলোকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে।

(পাঁচ), এই পর্যায়ের কাজ ঠিক মতো চালাতে পারলে পরের পর্যায়ে উন্নততর সাম্য গড়ার কাজে হাত দিতে হবে। এই **নির্মাণ পর্যায়ে গড়ে তোলা হবে স্বনির্ভর গ্রাম, কমিউন, সমবায় ইত্যাদি**। নিজেকে জিজ্ঞেস করে নিজের কাছে পরিষ্কার হতে হবে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র এই পদ্ধতির প্রয়োগের সাহায্যে উন্নততর সাম্য আনা সম্ভব কি না? রাষ্ট্রশক্তি দখল করা সম্ভব কি না?

(ছয়), যারা দলিতদের সাম্য আনার কাজে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেবে বলে মনে হয়, যুক্তিবাদী সমিতির তরফ থেকে তাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় বারবার বসা দরকার। তাদের বোঝাতে হবে, আমাদের সমিতির প্রয়োগ কৌশল। এর জন্য প্রয়োজন ছিল শুরু থেকে আরম্ভ করার। কাঁচা মাটি নিয়ে গড়ার।

সব খেলারই নিজস্ব কিছু নিয়ম বা কৌশল থাকে। কেউ-ই শুরুতেই আস্তিনের সেরা তাসগুলো ফেলে না। সেরা দল বা খেলুড়ে সে-ই, যে প্রয়োজন বুঝে তাস বের করে।

শুরুতে-ই সব তাস ফেলিনি। শুরু করেছিলাম কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। 'পরিবর্তন' সাপ্তাহিকে আমার লেখা বছর তিনেক এমন একটা জনপ্রিয়তা পেল যে শহর, মফঃস্বল, গ্রাম থেকে আমন্ত্রণ আসতে লাগল। 'থ্রি মেনস আর্মি' নিয়ে শুরু হলো কুসংকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা। আমি, আমার বউ সীমা ও শিশুপুত্র পিনাকী। প্রথমে সীমা গান ধরতেন। তারপর আমি আর পিনাকী নানা বাবাজি-মাতাজিদের 'অলৌকিক-ক্ষমতার রহস্য ফাঁস করতাম। সেটা ১৯৮৫-৮৬ সাল। তারপর সংগ্রামের সাথী হলেন অরুণ মান্না, গুপি ও সঞ্জয়।

কিছু কিছু সমমনোভাবাপন্ন মানুষের সঙ্গে মত বিনিময় শুরু করেছিলাম ১৯৮২-৮৩ সাল থেকেই। আড্ডা, আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক সব-ই হতো। একটা যুক্তিবাদী সংগঠন গড়ার প্রয়োজনীতার কথা বারবার আলোচনায় উঠে আসত।

১৯৮৫-র ১ মার্চ। বিকেলে আমার দেবীনিবাসের ছোট্ট ফ্ল্যাটে সমমনোভাবাপন্ন

কিছু মানুষ এলেন। উদ্দেশ্য যুক্তিবাদী একটা সংগঠন গড়ার কাজকে রূপ দেওয়া। অসিত চক্রবর্তী, ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল, ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য, তরুণ মান্না, গৌতম, অমরেন্দ্র আদিত্য, জ্যোতি মুখার্জি এবং আরও কয়েকজন।

সেদিনই গড়ে উঠলো সংগঠন। নাম দেওয়া হলো 'ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতি'। আমাদের সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ লিখে ফেলা হলো। তাতে লেখা হলো ; "আমরা সমাজ-সচেতনতার মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি ভারতের শোষিত জনগণের মুক্তির জন্য এতাবৎকাল যে সকল সংগ্রাম হয়েছে তার ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ—সংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করা। এ দেশের রাষ্ট্রশক্তি অর্থাৎ শোষক ও তাদের সহায়ক শ্রেণিরা শোষিত মানুষকে সংগঠিত হবার সুযোগ দিতে নারাজ। তাই পরিকল্পিতভাবে ধর্ম, জাত-পাত, প্রাদেশিকতাকে ভেদাভেদের ভিত্তি হিসেবে কাজে লাগিয়েছে। বঞ্চিত মানুষদের মাথায় ঢোকাতে চাইছে—তাদের প্রতিটি বঞ্চনার কারণ অদৃষ্ট, পূর্বজন্মের কর্মফল, ঈশ্বরের কৃপা না পাওয়া।"

...."আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি, আমাদের দেশে বাস্তবিকই আজ পর্যন্ত জনজীবনে কোনও ব্যাপকতর গুণগত সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটেনি। ফলে একইভাবে শোষিতদের চিন্তার ভ্রান্তির জালে আবদ্ধ রেখে শোষকরা শোষণ চালিয়েই যাচ্ছে। এতাবৎকাল আমাদের দেশে কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনের নামে অথবা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নামে যা যা ঘটেছে তার কোনওটাই বাস্তবিক অর্থে আদৌ সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল না। ভারতে সংগঠিত তথাকথিত রেনেসাঁস যুগের আন্দোলন ছিল সমাজের উপরতলার কিছু ইংরেজি শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ কিছু সংস্কার প্রয়াস মাত্র। তৎপরবর্তী তথাকথিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলি ছিল শুধুমাত্র কলাক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।"

"আমাদের যুদ্ধ শোষণের শক্তিশালীতম হাতিয়ার প্রতিটি কুসংস্কার ও ভ্রান্ত-বিশ্বাসগুলোর বিরুদ্ধে।"

"ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতি'র একটা 'লোগো' বা প্রতীক তৈরির ভার পড়লো আমার উপর। 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' আজও সেই প্রতীক-ই ব্যবহার করছে।

১৯৮৬-র জানুয়ারিতে কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হলো 'অলৌকিক নয়, লৌকিক'। প্রথম প্রকাশক : এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা-৭০০ ০৭৩। এতো বিপুল সাড়া পাব, কল্পনাতেও ছিল না। বইমেলাতে বই যোগাতে হিমশিম খেয়েছে প্রকাশক সংস্থা। আন্দোলনের পালে হাওয়া লাগলো। অনেক মানুষের অনেক জিজ্ঞাসা, অনেক কৌতূহল। 'যুক্তিবাদী

সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত হতে চান অনেকেই। 'বেনো জল' ঢোকার সম্ভাবনা প্রবল। হুজুগে অনেকেই আসবেন। কিন্তু লক্ষ্য ও তার জন্য ঝুঁকি নেবার প্রশ্ন এলে অনেকেই খসে পড়বে—জানি। 'যুক্তিবাদী সমিতি' মানে একটা 'প্রগতিশীল' ব্যাপার। এ জন্যেও অনেকে ভিড়তে চাইতে-ই পারেন। আবার জনপ্রিয় একটা দলে ভিড়ে সুবিধে আদায় করতে আগ্রহী লোকের অভাব নেই এদেশে।

কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠান করে বেড়াচ্ছি পশ্চিমবাংলার গ্রামে-শহরে-আধা শহরে। তিনজনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুই তরুণ— গুপী ও সঞ্জয়। তারপর একে একে তন্ময়, কণিষ্ক, কাজল, কমল, রঘু, আশিস। এবার পুরোদস্তুর স্টাডি ক্লাসের প্রয়োজন অনুভব করলাম। 'স্টাডি ক্লাস' না হলে যুক্তিবাদী সমিতি আর পাঁচটা ক্লাবের মতো একটা 'ক্লাব' হয়ে যাবে। এগিয়ে এলেন 'কিশোর ভারতী' স্কুলের হেডমাস্টার মিহির সেনগুপ্ত। তিনি প্রতি রবিবার ক্লাস করার জন্য ছেড়ে দিলেন স্কুল। তর্কে-বিতর্কে-আলোচনায় জমে গেল। পুরোনোদের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য নতুন সংযোজন মানিক মৈত্র, ডাঃ সমিত ঘোষ, মিহির সেনগুপ্ত, ড. অপরাজিত বসু, ডাঃ বিষ্ণু মুখার্জি, অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

জন্মলগ্ন থেকেই যুক্তিবাদী সমিতি ঝড় তুলে এগিয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও আকাশবাণী আমাদের কাজ-কর্মকে, বাবাজি-মাতাজিদের বুজরুকি ধরাকে বার-বার তুলে ধরেছে। বহু সাংবাদিক আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ আমাদের সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছেন। লক্ষ্মীন্দ্রকুমার সরকার, পথিক গুহ, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, অনন্যা চ্যাটার্জির নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি। 'আজকাল' পত্রিকার সম্পাদক অশোক দাশগুপ্ত সেসময় ছিলেন আমাদের আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ।

১৯৮৮ সালের ১১ ডিসেম্বরে কলকাতা ময়দানে আমাদের হাতে বয় স্কাউট টেন্টের চাবি তুলে দেন ডাঃ অরুণ শীল। সেদিন এক বিশাল সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল ডাইনি সম্রাজ্ঞী ঈপ্সিতা রায় চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজনের অলৌকিক ক্ষমতার পরীক্ষা নিতে। সেই দিনই প্রকাশিত হল 'কিশোর

যুক্তিবাদী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। নাম অলংকরণ করেছিলেন আমাদের সমিতির সেই সময়কার সহ-সম্পাদক চন্দন ভট্টাচার্য। অসাধারণ অলংকরণ। পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক পিনাকী ঘোষ।

১৯৮৯ সালে একটি রাজনৈতিক দল 'যুক্তিবাদী সমিতি' দখলের এক ব্যর্থ

চেষ্টা চালালো। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ক্ষমতা দখলের বদ-অভ্যেস থেকে আমাদের সংগঠনেও অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলো।

১৯৮৯-এর ৮ ডিসেম্বর ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতি, 'সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট' অনুসারে নাম রেজিস্ট্রেশন করালো। নতুন নাম হলো 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'। ইংরেজিতে বলতে পারি 'Rationalists' Association of India'। সংক্ষেপে 'যুক্তিবাদী সমিতি' ও SRAI নামে পরিচিত।

১৯৯০-তে সমিতির স্টাডি ক্লাস উঠে এলো মধ্য-কলকাতার বউবাজারে। ঠিকানা: ৩৪-এ শশীভূষণ দে স্ট্রিট। কলকাতা-৭০০ ০১২। এটা ডাঃ বিরল মল্লিকের চেম্বার। স্টাডি ক্লাস হতো সোম-বুধ-শুক্র বিকেল ৫টা থেকে ৮টা। জমজমাট স্টাডি ক্লাস। ১৯৯১-তে এলেন সুমিত্রা পদ্মনাভন।

কেন্দ্রে আঘাত হানলে, শাখাগুলো যাতে স্বনির্ভরতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে পারে সেই পরিকল্পনা মাথায় রেখে শাখাগুলিকে স্বয়ম্ভর করতে শাখা থেকে মুখপত্র প্রকাশে উৎসাহিত করলাম। আজ বহু শাখা, জেলা কমিটি ও জোনাল কমিটি মুখপত্র প্রকাশ করে। কেন্দ্রীয় ভাবে 'যুক্তিবাদী' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৯৯২ সালে। সম্পাদনার দায়িত্ব বর্তে ছিল আমার উপর। ১৯৯৬ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করে চলেছেন সুমিত্রা পদ্মনাভন। প্রতি মাসে প্রকাশিত হচ্ছে 'বুলেটিন' যুক্তিবাদী সমিতি ও 'হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন'-এর মাসিক মুখপত্র 'আমরা যুক্তিবাদী'। বিষয়-ভিত্তিক প্রতিটি সংখ্যা। তথ্যবহুল ও তাত্ত্বিক জ্ঞান সমৃদ্ধ লেখা প্রতিটি সংখ্যাতেই থাকে।

'হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন'-এর কথা উঠে এলো হঠাৎ করে। কেন যুক্তিবাদী সমিতি ওদের সঙ্গে মিলে মাসিক মুখপত্র বের করে? প্রশ্ন উঠতেই পারে। এর পিছনে রয়েছে একটা ছোট্ট ইতিহাস।

'যুক্তিবাদী সমিতি' ঝড় তুলে-ই এগোচ্ছিল। বেশ চলছিল। গোল বাধলো ১৯৯৩-এর জানুয়ারিতে কলকাতা বইলেমায় 'সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ' বইটি প্রকাশিত হতেই। বইটিকে বলতে পারেন যুক্তিবাদী সমিতি'র 'ম্যানিফেস্টো' অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের 'ঘোষণাপত্র'। 'বিজ্ঞান আন্দোলন'-এর এতদিনকার ধ্যান ধারণাকে দুমড়ে-মুচড়ে নতুন ধারণা প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠা করল। বইটিতে উঠে এলো ভারতের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস ও বিশ্লেষণ, 'সংস্কৃতি' শব্দের সংজ্ঞা, উঠে এল 'প্রেম', 'দেশপ্রেম', 'গণতন্ত্র', 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' ইত্যাদি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বহু প্রাসঙ্গিক বিষয় এবং তাদের নতুন করে দেখা ও চেনা।

আমরা 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠানে (এই নামেই আমরা কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান করে থাকি) 'দেশপ্রেম' থেকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' সব প্রসঙ্গই টেনে

আনতে লাগলাম। এই প্রথম আমরা প্রকাশ্যে দলিত মানুষদের অধিকার সচেতন করার কাজে হাত দিলাম। শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে নতুন সাংস্কৃতিক চেতনা গড়ার কাজে নামলাম। পৃথিবীর বিপ্লবের ইতিহাস থেকে বার বার একটা শিক্ষা আমরা পেয়েছি—মধ্যবিত্তরা সাধারণভাবে সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে। কারণ তারা ভিতু, স্বার্থপর। আবার এই মধ্যবিত্তদের মধ্যে থেকেই বার বার উঠে এসেছে বিপ্লবের নেতারা। আদর্শবাদী, জীবনপণ করা সাহসী মধ্যবিত্তদের সংখ্যা অবশ্য এতই কম যে, তাদের খুঁজে বের করা খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার মতই অতি কষ্টসাধ্য। সাংস্কৃতিক চেতনার আলো নিয়ে আমরা সূচ খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।

ফলে কিছু গদিলোভী রাজনীতিক আমাদের সম্বন্ধে বলতে লাগল—আমরা রাজনীতি করছি। একনম্বর দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জ্ঞান দেওয়া হলো—আমাদের কী উচিত, তাই নিয়ে।

এমনই একটা সংকটময় সময়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, জনগণকে পাশে পেতে জনগণের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব। বিনা খরচে বস্তি ও গ্রামের ব্রাত্য শিশুদের এবং বয়স্কদের শিক্ষা, আইনি সাহায্য, কর্মশিক্ষা, চিকিৎসকদের নিয়ে গ্রামে

গ্রামে ক্যাম্প, পারিবারিক সমস্যা নিয়ে 'কাউন্সেলিং', মরণোত্তর দেহদান ও চক্ষুদান, রক্তদান শিবির, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার মানুষের পাশে দাঁড়ানো, বেশ্যাবৃত্তির মতো নিষ্ঠুর ব্যবস্থা বন্ধ করে তাদের বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করার জন্য সরকারকে চাপ দেওয়া, মানবতা বিকাশের স্বার্থে মানুষকে ধর্ম, জাত-পাত প্রাদেশিকতা ও লিঙ্গবৈষম্যের মত কুসংস্কার ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করা। এইসব কাজের প্রয়োজন মেটাতে গড়ে তোলা হলো 'হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন'। দিনটা ছিল ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ সাল। প্রথম জেনারেল সেক্রেটারি : সুমিত্রা পদ্মনাভন। অ্যাসোসিয়েশনের প্রতীক তৈরি করেছিলাম আমি। বহু অসম্ভব জয় ছিনিয়ে এনেছে হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন।

এই সময় আমরা 'হিউম্যানিজম' বা 'মানবতা' কে উপসনা ধর্মের বিকল্প হিসেবে তুলে ধরার পরিকল্পনা নিয়েছিলাম। যুক্তিবাদ যেহেতু উপসনাধর্মের মূলে আঘাত করার কথা ভাবছিল, তাই 'যুক্তিবাদী' মানেই 'নাস্তিক'—এরকম একটা নেতিবাচক ধারণা ছড়াচ্ছিল। কিন্তু যুক্তিবাদী'রা কখন-ই শুধুমাত্র 'নাস্তিক' নয়। শুধু নাস্তিকতা সমাজোন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনও ইতিবাচক ভূমিকা নিতে পারে না। আমাদের লাগাতার প্রচারে বহু মানুষ এগিয়ে আসে নিজেদের 'হিন্দু', 'মুসলিম' ইত্যাদি ধর্ম পরিচয় ছেড়ে 'হিউম্যানিস্ট' বা 'মানবতাবাদী' হিসেবে তুলে ধরতে। ধর্মান্ধতা, সম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ রুখতে এই নতুন 'হিমম্যানিস্ট' আন্দোলন সেই সময়ে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। আবেদনপত্রে 'ধর্ম' কলামে 'মানবতা' লেখার আইনি

অধিকার প্রতিষ্ঠা করে 'হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন'। দিনটা ছিল ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৩ সাল, ভারতের বহু ভাষাভাষি পত্রিকায় খবরটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা

Indian Express

NEW DELHI FRIDAY, NOVEMBER 5, 1993

Nation

When humanism will be the only religion

by Abhijit Dasgupta

CALCUTTA – While the country is going up in flames over religion, the City of Joy has taken the lead in trying to provide a healing touch with the setting up of a new organisation, the Humanist Association of India (HAI) which, among other things, will campaign to remove the compulsory registration of religion as one of the criteria in job and other admission forms.

The Association, set up on September 11 when the controversial Parliament of Religions was inaugurated by the Pesident here, has already got the green signal from the UN that the registration of the religion cannot be binding on any individual during the filling up of job and other admission forms.

Birol Mullick, a top official in the UN public health department here and a physician by vocation, has taken the lead in forming the association. Mullick told the *Indian Express* that he had written to the UN Information Centre director on August 13 asking whether the registration was mandatory. The UN sent a reply on September 7 alongwith some booklets which "clearly demonstrated that the registration was not compulsory." In fact, Mullick added, most of the European nations had already done away with the need to fill up the religion slot regarding jobs and other admissions.

Incidentally, the Calcutta University has already done away with the religion criteria since the last academic session, a pioneering effort the lead for which was taken by the Senate member and famous physician, Abirlal Mukherjee. Speaking to *Indian Express,* Mukherjee said, "A question remains about caste in which we have to have reservations for the listed tribes. In the university, we have found a way out by giving a five-mark per cent advantage for such candidates. But the religion slot has been totally abolished.

Mullick said that his organisations would now build up public and international pressure on the Government to abolish this "inhuman and degrading system of registration." The HAI has already written to five Novel laureates and Carl Sagan fer their views. It has also applied for membership to the umbrella organisation based in New York, Alliance of Secular Humanist Society. "We expect the membership soon and this will make our fight even

more forceful." Mullick added. After a strong public movement and opinion are organised, the Government will be approached officially.

The Association would mainly work in the field of humanrights concentrated in specific area of custodial deaths, police atrocities and injustice against women. S. Padmanabhan, general secretary of the Association, said, "We will not rest till humanism is recognised as a religion and we are allowed to mention that in our forms. Yes, this could be a first effort in helping the new generation realise the follies of religion based society. Ayodhya is a prime example."

Padmanabhan said that the response to the Association had been overwhelming and that they were expecting a huge turnout at a public meeting slated later in December.

হয়েছিল। সে সময় অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সুমিত্রা পদ্মনাভন। এবং সভাপতি ছিলাম আমি।

সাম্যকামী কিছু রাজনৈতিক দল স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে একজোট হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো। যুক্তিবাদী সমিতির উপর দায়িত্ব পড়লো 'কমন' কর্মসূচির ভিত্তিতে ওদের কাছাকাছি আনার। রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচি বিশ্লেষণ করার। তারপর একটা 'দলিল' বা পথনির্দেশ হাজির করে দেখতে হবে—কোন বিশেষ কর্মসূচি এই সময়ের এবং এই দেশের উপযোগী। এটা ১৯৯০-৯১ এর কথা।

আমরা জানালাম, প্রত্যেকটা সাম্যে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের সাংস্কৃতিক শাখা থাকা অত্যন্ত জরুরি। তারাই হবে পার্টির সঙ্গে জনসাধারণের যোগসূত্র। সুখ-দুঃখের সাথী বিভিন্ন সমমনোভাবাপন্ন পার্টিগুলোর মধ্যেও যোগসূত্র তৈরি করতে পারে কালচারাল ফ্রন্টের বা সাংস্কৃতিক শাখার 'কমন' কর্মসূচি। তারপরের পর্যায়ে আসবে 'কমন' কর্মসূচির ভিত্তিতে রাজনৈতিক পার্টিগুলোর মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা; কোনও কোনও ক্ষেত্রে কয়েকটা পার্টি মিলে একটাই পার্টি হয়ে যাওয়া। এ'সবই আমরা জানালাম আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী পার্টিগুলোকে।

১৯৯৩ সালে বিবিসির প্রোডিউসর ইনচার্জ রবার্ট ঈগল স্বয়ং তাঁর টিভি টিম নিয়ে এলেন এবং প্রায় এক ঘণ্টার ডকুমেন্টারি তুললেন ভারতের যুক্তিবাদী আন্দোলন নিয়ে। তাতে ভারতের রাজনীতি বিশেষজ্ঞ আমেরিকাবাসী সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্ত জানালেন, "ভারতের বাম রাজনীতিতে একটা সরাসরি বিভাজন আছে—প্রবীর ঘোষের পক্ষে ও বিপক্ষে।"

এই তথ্যচিত্রের নাম ছিল 'গুরু বাস্টারস'। প্রায় ৫০টির মতো দেশে তথ্যচিত্রটি দেখানো হয়, বিভিন্ন টিভি চ্যানেল মারফত। রবার্ট ঈগল আমাকে একটা চিঠি দিয়ে জানান—গত দশ বছরে তাঁদের তৈরি কোনও তথ্যচিত্র এতো জনপ্রিয়তা পায়নি। ১৯৯৪-এ 'নন্দন'-এ আমন্ত্রিতদের জন্য দুটি প্রদর্শনী হয়েছিল।

এই ইতিহাস হয়ে ওঠা তথ্যচিত্র সাম্য-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী ও বুর্জোয়া শক্তির টনক নড়িয়ে দিল। যুক্তিবাদী সমিতির উত্থানে যারা নিজেদের সর্বনাশ দেখতে পেয়েছিল, তারা প্রত্যাঘাত হানার জন্য তৈরি হতে লাগলো।

সেই সত্যি হলো

কুড়ি বছর আগে এই গ্রন্থটির 'কিছু কথায়' লিখেছিলাম, **"যে দিন বাস্তবিকই কুসংস্কার বিরোধী বৃহত্তর আন্দোলন দুর্বার গতি পাবে, সে-দিন দুটি জিনিস ঘটবে। এক : এই আন্দোলন যে শ্রেণিস্বার্থকে আঘাত হানবে সেই শ্রেণিস্বার্থ তাদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে, অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে তীব্র প্রত্যাঘাত হানবে। সেই প্রত্যাঘাতের মুখে কেউ সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, কেউ পিছু হটবে। দুই: যুক্তিবাদী চিন্তা জনসাধারণের চেতনার জগতে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাবে, তারই পরিণতিতে গড়ে উঠবে নতুন নেতৃত্ব, যে নেতৃত্বে থাকবে সমাজ পরিবর্তনের, সার্বিক বিপ্লবের অঙ্গীকার।"**

সে-ই সত্যি হলো। যুক্তিবাদী আন্দোলন যখন দুর্বার গতি পেল, সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে সমমনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে মূল স্রোত তৈরিতে হাত দিল, তখনই আমাদের সমিতির উপর নেমে এলো তীব্র প্রত্যাঘাত। সময় ১৯৯৬-এর আগস্ট। প্রত্যাঘাত হানার জন্য বছর তিনেক ধরে একদিকে ঘটানো হয়েছিল অনুপ্রবেশ। আর একদিকে লোভ দেখিয়ে তুলে নেওয়া হয়েছিল আমারই কাছের কয়েকজনকে। সুদীপ, সৈকত, দেবাশিস, রাজেশ, চির, রামকমল, সুতপা—এদের মধ্যে কে লোভের কারণে অনুপ্রবেশকারী, কে পরে বিক্রি হয়েছিল—আলাদা করে চিহ্নিত করা মুশকিল। ব্যাপক আকারের এই ষড়যন্ত্রে শামিল ছিল রাষ্ট্রশক্তি ও বিদেশি শক্তি। তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে ষড়যন্ত্রে সক্রিয় ভাবে অংশ নিয়েছিলেন কিছু রাজনীতিক, সাংবাদিক, এন জি ও কর্তা জ্যোতিষী ও বাবাজি-মাতাজি।

ষড়যন্ত্রে আমাদের মৃত্যু ঘটলে ইতিমধ্যে একাধিকবার সমিতি উঠে যেত। কিন্তু তা হয়নি। হবেও না। কারণ এই অসম ও প্রায় অসম্ভব কঠিন লড়াইয়েও সঙ্গে পেয়েছি বহু চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, আইনজীবী এবং বিভিন্ন পেশার সৎ মানুষকেও।

১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৬ সাল। দশটা বছর আমাদের সমিতির পুনর্গঠন ও অগ্রগমনের বছর। মনে পড়িয়ে দেয় বিশ্বযুদ্ধ বিধ্বস্ত জার্মানি ও জাপানের পুনর্গঠন ও অগ্রগমনের ইতিহাসকে।

১৯৯৬-এ যেখানে নেমে গিয়েছিলাম, সেই প্রায় শূন্য থেকে আবার শুরু। তবে পদ্ধতি পাল্টে। ২০০০ সাল থেকে 'যুক্তিবাদী সমিতি' কুসংস্কার বিরোধী কাজকর্ম এবং মানবতাবাদী কাজকর্মের সঙ্গে সাম্যের সমাজ গড়ার একটা 'আইডিয়া' বা 'পরিকল্পিত চিন্তা'র প্রচার শুরু করলো। পরিকল্পনা সংক্ষেপে এই রকম—

১। বর্তমান অবস্থায় পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থা এতই উন্নত যে, পৃথিবী যেন একটা গ্রাম। এই অবস্থায় সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল অসম্ভব। কারণ, যখন-ই সাম্যকামীরা সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে যাবে, তখনই সাম্যবিরোধী সামরিক-শক্তিধর দেশগুলো তাদের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

২। এই অবস্থায় আমাদের কাজ হবে, সশস্ত্র সংগ্রাম এড়িয়ে নিঃশব্দে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের একটা পথ খুঁজে বের করা। রাশিয়ার মতো সাম্যকামী দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা যদি সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া বিনা রক্তপাতে দখল হয়ে যায়, তবে আমরা-ই বা কেন পারব না নিঃশব্দে দখল নিতে?

৩। সশস্ত্র সংগ্রাম নয়, স্বয়ম্ভর গ্রাম ও সমবায় গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে-ই 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব' সম্পূর্ণ হতে পারে। সামন্তপ্রভু বা রাষ্ট্রশক্তি সন্ত্রাস চালালে আত্মরক্ষার জন্য পাল্টা সন্ত্রাস চালাতেই হবে। তাই অস্ত্র রাখতে হবে। নীতি হবে আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত 'অস্ত্র সংবরণ' করা। ভুলেও 'অস্ত্র সমর্পণ' নয়। তাহলেই সাম্যের শত্রুরা নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে খাবে।

৪। হতদরিদ্র মানুষগুলোর আর্থিক উন্নতি, মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার অধিকার, চেতনার উন্নতি ও উন্নততর সাম্যের জন্য কৃষিনির্ভর অঞ্চলে গড়ে তুলতে হবে স্বয়ম্ভর গ্রাম বা কমিউন।

৫। স্বয়ম্ভর গ্রাম আসলে সমবায় গ্রাম। এমন সমবায় গড়ে তোলা সম্ভব সর্বত্র। কয়লা খাদান, তেলের খনি থেকে ব্যাঙ্কিং শিল্প; পরিবহন ব্যবসা থেকে গাড়ি উৎপাদন ব্যবসা ; হোটেল ব্যবসা থেকে মাছ চাষ ; চা বাগিচা থেকে খেলনা উৎপাদন; ক্ষুদ্র শিল্প থেকে বৃহৎ শিল্প—সমস্ত ক্ষেত্রেই সমবায় মালিকানা সম্ভব। এ'দেশে সরকারি ছত্রছায়ায় সমবায় সংস্থাগুলোয় ধান্দাবাজ রাজনীতিকদের রমরমা। দুর্নীতির আখড়া। জনগণের সক্রিয় সহযোগিতায় যে সমবায় গড়ে তোলার কথা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, সেগুলো এক নতুন সমবায় চিন্তা—যেখানে জনগণতন্ত্রের প্রয়োগ নিশ্চিত।

৬। স্বয়ম্ভর গ্রামগুলোর ও সমবায়গুলোর পরিচালন ক্ষমতা থাকবে গ্রামের প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিতদের হাতে। এমন গণতন্ত্র-ই হলো 'বিপ্লবী জনগণতন্ত্র' (Revolutionary People's Democracy)। শিল্পক্ষেত্রে কো-অপারেটিভগুলোর পরিচালনা ভার থাকবে সেইসব শিল্পের শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে। চা-বাগিচা থেকে ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা—সব সমবায়ের-ই শেয়ার হোল্ডার হবেন শুধুমাত্র শ্রমিকরাই। তবে-ই সমবায়গুলোতেও দেখা দেবে 'বিপ্লবী জনগণতন্ত্র'।

৭। 'বিপ্লবী জনগণতন্ত্র'-তে প্রতিটি মানুষই তার অর্জিত গণতন্ত্র রক্ষা করতে আন্তরিক হবেন। কারণ, এমন জনগণতন্ত্রে প্রতিটি হতদরিদ্র মানুষই 'মানুষ' হিসেবে সম্মান পায়। **খেতের ফসল, অরণ্য, খনিজ সম্পদ, জলসম্পদ, কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি নিয়ে গড়ে তোলা সমবায়ে, কর্মী শেয়ার-হোল্ডারের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে শ্রমিক ছাড়া শেয়ার হোল্ডার নেই। শেয়ার বাজার নিয়ে ফাটকা নেই।**

৮। এমন সার্থক গণতন্ত্রে স্বয়ম্ভর গ্রামে ও সমবায়ে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ইত্যাদির টিকে থাকা অসম্ভব। মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখা মানুষগুলোই দুর্নীতিপরায়ণদের চিহ্নিত করে নির্মূল করার দায়িত্ব নেবে।

৯। প্রতিটি সমবায় ও স্বয়ম্ভর গ্রামগুলোর উপর নজরদারি করবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকারীরা। সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষ ঘটাতে লোকসংগীত-লোকনৃত্য-মেলা-যাত্রা-থিয়েটার-'বারো মাসে তেরো পার্বণ'-এ মাতিয়ে রাখবে সমবায় সংস্থা ও গ্রামগুলোকে। ওঁরা সিডি'তে দেখবেন দেশের বর্তমান অবস্থা, রাষ্ট্রের প্রকৃত চরিত্র, উন্নততর স্বয়ম্ভর গ্রাম ও সমবায়ের ছবি।

১০। স্বয়ম্ভর গ্রাম ও সমবায়ের ঘনবদ্ধ সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলে সে-সব জায়গায় সমান্তরাল শাসন বা স্বশাসন অথবা স্বায়ত্তশাসন চালু করা হবে। এটা হবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের একটা বড় ধাপ।

১১। এই আন্দোলনকে পালন ও পুষ্ট করার পরবর্তী ধাপ হলো, জয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হলে নির্বাচনে অংশ নিয়ে 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র'-কে কবর দেওয়া। নির্বাচন সর্বস্ব 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র'-কে 'জনগণতন্ত্র' বা 'People's Democracy'-তে পাল্টে দেওয়া।

১২। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে স্বয়ম্ভর গ্রাম বা সমবায়গুলোতে শোষকদের দালাল রাজনৈতিক দল বা সরকার নাক গলাবার সুযোগ না পায়। আমরা প্রয়োজন মনে করলে সরকারের কাছে সাহায্য চাইব। এই 'আমরা' অবশ্যই স্বয়ম্ভর গ্রামবাসী বা সমবায়ের সদস্যরা।

বিভিন্ন পথে বিশ্বাসী সাম্যকামী রাজনীতিকদের সঙ্গে বার বার আমরা আলোচনায় বসেছি। হাজারো খুঁটিনাটি প্রশ্ন উঠে এসেছে। আলোচনা-তর্ক-বিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত আমরা একটা জায়গায় পৌঁছেছি।

২০০৩ থেকেই নতুন অধ্যায়। শুরু হয়েছে সমন্বয় গড়ে তোলার কাজ, একাধিক দল মিলে এক হয়ে 'মস্তিষ্ক যুদ্ধে' নামার কাজ। ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে একটা সমন্বয় গড়ে তুলে লক্ষ্য পূরণে নামা।

এই স্বয়ম্ভর বা সমবায় চিন্তা আজকে ভারতের বাইরে নেপাল-ভুটান-বাংলাদেশ-মায়ানমার, দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা—সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

নতুন সহস্রাব্দের শুরু থেকেই গৌতম বুদ্ধ, গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ, যিশু, মার্ক্স লেনিন, মাও'দের মতো চিন্তাবিদদের স্বয়ম্ভর গ্রাম, কমিউন বা সমবায় চিন্তার একটা নতুন রূপ, নতুন প্রয়োগকৌশলের 'আইডিয়া' ছড়িয়ে দেওয়ার যে পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছিলাম, তা ২০০২-২০০৩-এ ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেল।

আজ ভারতের এক তৃতীয়াংশ অঞ্চলে, নেপালের শতকরা ৮০ ভাগ অঞ্চলে ভেনেজুয়েলায় পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করেছে 'নতুন সাম্য চিন্তা'-কে। ভুটান, বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চিলি, পেরু, আর্জেন্টিনার জনগণও নয়া সাম্যচিন্তাকে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট।

২০০৫-এর ফেব্রুয়ারিতে বি বি সি রেডিও এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিল আমার ও যুক্তিবাদী সমিতির সভাপতি সুমিত্রা পদ্মনাভনের। সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন ইরেনা লুটো (Irena Luto)। সঙ্গী ছিলেন 'বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস'-এর প্রডিউসর নীল ট্রেভিক (Neil Treivik)। ইরেনা ও নীল দু'জনের-ই মনে হয়েছিল, গত শতকের ন'য়ের দশকে সমাজতন্ত্রের পতন সাম্যকামীদের হতাশ করেছিল। গত দু-এক বছরে একটা নতুন চিন্তা ছড়িয়ে পড়েছে। সশস্ত্র সংগ্রামকে 'বাইপাস' (এড়িয়ে) করে 'নব্য সমাজতন্ত্র' (Neo-Socilism) দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ভারত-নেপাল-ভুটান-বাংলাদেশ থেকে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে পর্যন্ত। স্বয়ম্ভর গ্রাম, কমিউন, সমবায় এ'সবেরই 'থিংকট্যাংক' বা 'চিন্তার উৎপত্তিস্থল' যুক্তিবাদী সমিতির নেতা।

পৃথিবীর জনপ্রিয়তম ওয়েবসাইট আমাদের

Yahoo, Google, Rediffmail, AOL হলো পৃথিবীর জনপ্রিয় সমস্ত 'সার্চ ইঞ্জিন'। এইসব 'সার্চ ইঞ্জিন' 'সার্চ' করে আপনি বিভিন্ন ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। 'rationalist' অথবা 'rationalism' শব্দ দিয়ে সার্চ করলে তালিকার প্রথমেই উঠে আসবে আমাদের সমিতির ওয়েবসাইট। অর্থাৎ আমাদের ওয়েবসাইটের 'র‍্যাঙ্কিং' ১ম। এই 'র‍্যাঙ্কিং' নির্ধারিত হয় 'পেজর‍্যাঙ্ক' পদ্ধতিতে, যা নির্ভর করে সাইটের জনপ্রিয়তার উপর। যত বেশি মানুষ সাইট দেখবেন, সাইট তত ভালো 'র‍্যাঙ্ক' পাবে। অনুরোধ—সুযোগ থাকলে আমাদের সাইট www.srai.org দেখুন।

কেন আমরা এক নম্বরে? জানতে গেলে দেখতে-ই হবে। এদেশের বহু মিডিয়া 'ব্ল্যাক-আউট' করার পরও আমরাই পৃথিবীর জনপ্রিয়তম ওয়েবসাইট। আমরাই ভারতকে প্রথম এমন দুর্লভ সম্মান এনে দিয়েছি।

জয় নিশ্চিত করতে শক্তিশালী 'নেপথ্যবাহিনী' জরুরি

মাদার টেরিজাকে 'সেন্টহুড' দেবার বিশাল তোড়জোড় ব্যর্থ হয়েছিল। লক্ষ কোটি ডলার-পাউন্ড-ইউরো উড়লো। প্রচার মাধ্যমগুলো বিপুল পরিমাণে নিউজপ্রিন্ট আর ক্যাসেট খরচ করলো। এক বছর ধরে রোমে 'মাদার'-এর স্মারক বিক্রি হল। শেষ পর্যন্ত এলো মাদার'কে সম্মান জানানোর দিন; ১৯ অক্টোবর, রবিবার, ২০০৩। কী আশ্চর্য! পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে দেখলো, মাদার-কে 'সেন্ট' ঘোষণা না করে 'ব্লেসেড' বলে ঘোষণা করলেন পোপ দ্বিতীয় জন পল।

এ এক অভাবনীয় 'ইন্দ্র পতন'। পোপের আন্তরিক ইচ্ছে, সর্বাঙ্গীণ চেষ্টা এমন ভাবে ব্যর্থ হলো!

হলো। তার কারণ—'বিবিসি' থেকে 'টাইম' হাজার হাজার মিডিয়া আমাদের সমিতির সত্যানুসন্ধান তুলে ধরে ভ্যাটিকান সিটির উপর দিনের পর দিন চাপ সৃষ্টি করে গেছে। শেষ পর্যন্ত পোপের পরামর্শদাতা 'কার্ডিনাল'দের বেশির ভাগই

পোপকে পরামর্শ দেন—র‍্যাশানালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার ('যুক্তিবাদী সমিতি'র নাম) সঙ্গে লড়াইতে না নামা-ই বুদ্ধিমানের কাজ। মৃত্যুর পর টেরিজার অলৌকিক ক্ষমতা মণিকার ক্যানসার রাতারাতি সারিয়ে তুলেছে, এমনটা দাবি করে টেরিজাকে 'সেন্ট' বলে ঘোষণা করলে ভবিষ্যৎ আমাদের ক্ষমা করবে না। ভবিষ্যতে আমরা 'মিথ্যাচারী' ও 'ভণ্ড' বলে চিহ্নিত হব।

এই যে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমের অকুণ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি—এটা সম্ভব হয়েছে প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত কিছু বন্ধুদের সহযোগিতায়। 'কার্ডিনাল' অর্থাৎ পোপের পরামর্শদাতাদের (কার্ডিনালদের মধ্যে থেকে-ই পোপ নির্বাচিত হয়ে থাকেন) বেশির ভাগকে আমাদের পাশে দাঁড় করানোর পিছনে ছিল আরও অনেক অঙ্ক, অনেক বন্ধুদের সাহায্য। এই বন্ধুরা নেপথ্যে থেকেই সাহায্য করে গেছেন। এঁরাই আমাদের লড়াইয়ে 'নেপথ্য বাহিনী'।

স্বয়ম্ভর গ্রাম-কমিউন-সমবায় গড়ে তুলতে যে সব শিক্ষিত সমাজবিজ্ঞানী, কৃষিবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সংগঠক ইত্যাদিদের সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে তাঁরাই আমাদের শ্রদ্ধেয় নেপথ্য বাহিনী ; যাঁদের ছাড়া আমাদের পরিকল্পনা অচল। যাঁরা আমাদের হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যোগাযোগ রাখছেন, তাঁরা নেপথ্য থেকেও আমাদের 'প্রাণ ভোমরা'। তাঁরা কারা? পরিচয় হয় তো কোনও দিন-ই জানা যাবে না। জানানো হবে না। তাঁরা প্রকাশ্যে নেই বলে-ই আমরা আজ পর্যন্ত বহু অসম্ভব লড়াই জিতছি। তাঁরা-ই দিকে দিকে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে গতিশীল করছেন ; চূড়ান্ত জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে অন্যতম প্রধান সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছেন।

আমাদের দুই সংগঠনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছেন খুশবন্ত সিং, ড. সরোজ ঘোষ, ড. সন্তোষ সরকার, ড. পবিত্র সরকার, ডাঃ সরোজ গুপ্ত, ডাঃ আবিরলাল মুখার্জি, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, দিলীপ গুপ্ত, গীতানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সনাতন মুখোপাধ্যায়, মল্লিকা সেনগুপ্ত, কৃষ্ণা বসু সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

যাঁরা সমিতির শ্বাস-প্রশ্বাস

যাঁরা যুক্তিবাদী সমিতির শ্বাস-প্রশ্বাস এক নিশ্বাসে সেই পাঁচজনের নাম বলে দেওয়া যায়। সুমিত্রা পদ্মনাভন, রানা হাজরা, সঞ্জয় কর্মকার, অনাবিল সেনগুপ্ত আর পঞ্চমজন আমি।

সংগঠন এ'ভাবেই তৈরি, যাতে পাঁচজনের কোনও এক বা দু'জনের মৃত্যুর পরও গতিশীল থাকে। আরও দুরন্ত গতিতেই চলবে। এই গ্যারান্টি দিলাম।

এই পাঁচজনের পর যে কয়েকটি নাম অনিবার্যভাবে এসে পড়ে তাঁরা হলেন অরুণ মুখার্জি, বিপাশা চ্যাটার্জি, মানসী মল্লিক, অনিন্দ্যসুন্দর, সুবীর মণ্ডল, দেবাশিস চ্যাটার্জি, সুদীপ চক্রবর্তী, পিনাকী লাহা, সন্তোষ শর্মা, নিতাই রুইদাস, অজয় বৈরাগী, দ্বিজপদ বাউরি, মধুসূদন মাহাতো, মধুসূদন বাউরি, মনোজ গিরি, গোপাল

ছেত্রী, শংকর ভড়, পলাশ ভট্টাচার্য, বিপ্লব চক্রবর্তী, অনিন্দিতা ও চৈতালী।

আরও অনেক নাম ভিড় করে আসছে। কিন্তু আজ এখানে-ই থামলাম। ভবিষ্যতে আরও নতুন নামকে তুলে ধরব জানি। সঙ্গে এও জানি, যাঁরা আজও আছেন তাঁরা কাল নাও থাকতে পারেন। সমিতি চলমান একটা ট্রেন। বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রীরা উঠছেন, নামছেন। সমিতি যখন চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছোবে তখন কে থাকবে, কে থাকবে না, সময়ই বলে দেবে। বিভিন্ন সময়ে শান্তিদা, জ্যোতিদাকে আমরা হারিয়েছি। মৃত্যু ওঁদের ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আবার অঞ্জন, সেন্টুদা, সমীর, অশোক এর মতো সৎ মানুষরা আমাদের পথ ভুল পথ মনে করে বসে গেছেন। বিপ্লব, সৌরভ, শৌভিক, কমল কর্মসূত্রে দূরে থেকেও যোগাযোগ রাখেন। সংসারের চাপে বা কাজের চাপে সরে গিয়েও মানসিক ভাবে আছেন সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্ত, সংগঠক অতনু, ম্যাজিসিয়ান রবি, গানের গ্রুপের তপন কাহালী, গোপাল দত্ত, গোবিন্দ দত্ত, প্রমিলা রায়, সত্যানুসন্ধানী বলু এমনি আরও কিছু মানুষ।

যুক্তিবাদী সমিতি একুশে পা দিল। বাংলার বহু মিডিয়ার কাছে আমরা যখন ব্রাত্য, তখন জাতীয় স্তরের টিভি নিউজ মিডিয়ায় আমরা বারবার ঘুরে ফিরে আসছি। আমাদের উপর বিশাল প্রচারের আলো ফেলছে 'নিউইয়র্ক টাইমস' থেকে 'টাইম' ম্যাগাজিন, 'বিবিসি' থেকে 'ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক' চ্যানেলের মত পৃথিবী বিখ্যাত প্রচার মাধ্যমগুলো। "এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত এনসাইক্লোপিডিয়া আর 'ব্রিটেনিকা' নয়। তা বরং 'উইকিপিডিয়া'— এক অনলাইন বিশ্বকোষ"— একথা বলেছে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' (১৬ জুলাই, ২০০৬)। সেই 'উইকিপিডিয়া'-য় (www.wikipedia.org) সংযোজিত হয়েছে 'প্রবীর ঘোষ' নামটি এবং তা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে। পৃথিবী জুড়ে কয়েক হাজার অনলাইন মিডিয়ায় প্রচারের আলোতে থাকার পর কোন বাংলা মিডিয়ায় কতটা প্রচার পেলাম, কোন কোন মিডিয়া 'ব্ল্যাক আউট' করার দুর্নীতি গ্রহণ করেছে—এ'সব আর স্পর্শ করে না। যুক্তিবাদী সমিতি ও হিউম্যানিস্টিস্ অ্যাসোসিয়শন ১ ডিসেম্বর ২০০৬ অসাধারণ একটি কাজ করে ফেলেছে। এই দিন থেকে জয়যাত্রা শুরু হল online magazine : www.thefreethinker.tk (অনলাইন ম্যাগাজিন 'দ্য ফ্রিথিঙ্কার')। দুর্বার স্রোতের সামনে সব বাধাই ভেসে যাচ্ছে, ভেসে যাবে। অথবা নতুন পথ করে আমরা এগোবো। 'আমরা' অর্থাৎ যুক্তিবাদীরা মানবতাবাদীরা, সাম্যবাদীরা।

আমার সংগ্রামের সাথী প্রত্যেককে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন।

প্রবীর ঘোষ
১ জানুয়ারি ২০০৭

৭২/৮ দেবীনিবাস রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৭৪

e-mail : Prabir_rationalist@hotmail.com
www.srai.org • prabirghosh.tk
rationalistprabir.bravehost.com
www. the freethinker. tk

অধ্যায় : এক

প্রস্তাবনা

আকস্মিকতার চেয়ে ধারাবাহিকতাই বেশি

মে, ২০০৬ জিনতত্ত্বের সবচেয়ে বড় আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক জেনেটিক কোড জানা সম্পূর্ণ করলেন বিজ্ঞানীরা। ক্রোমোজম ১-এর সিকুয়েন্সিং বাকি ছিল। এবার সেটির কাজ শেষ হলো। এর ফলে ক্যানসার, অলজাইমারস্ ও পারকিনসন্সের মতো অন্তত ৩৫০টি রোগের গোপন রহস্য জানা সম্ভব হবে। এইসব রোগের আরোগ্য এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। বিশ্বখ্যাত জিনতত্ত্বের বিজ্ঞানীরা মানব সভ্যতাকে এক লাফে এগিয়ে দিলেন অনেকটা।

একই বছরে বিভিন্ন ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবর।

বিহার বিধানসভার অধ্যক্ষের পত্নীর মৃত্যু, আবার ফাঁসলেন রামদেব

হিন্দি ভাষার জনপ্রিয় ম্যাগাজিন 'সরস সলিল'-এর জুন ২০০৬ সংখ্যায় একটি খবর প্রচণ্ড হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, রামদেব মার্চ ২০০৬-এ তাঁর পাটনায় শিবির বসান। শিবিরে বিহার বিধানসভার অধ্যক্ষ উদয় নারায়ণ চৌধুরীর ক্যানসার রোগে আক্রান্ত পত্নীর চিকিৎসা শুরু করেন। কিছু 'জড়িবুটি'-র সঙ্গে প্রাণায়াম এবং মন্ত্র ছিল রামদেবের 'অব্যর্থ' চিকিৎসার অঙ্গ।

২৫ মার্চ ২০০৬ পাটনা-শিবির শেষ হয়। তার দশ দিন পর (অর্থাৎ ৪ এপ্রিল ২০০৬) অধ্যক্ষ-পত্নী ভরোনিকা চৌধুরীর মৃত্যু হয়।

এই ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল গ্যারান্টি দিয়ে ১০ হাজার ক্যানসার রোগী সারিয়ে তোলার রামদেবের দাবি কী বিশাল ভণ্ডামী।

৭ জানুয়ারি ২০০৬ বাবা রামদেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ('NDTV' ইন্ডিয়া'র মুকাবিলা অনুষ্ঠানে), আপনি 'যোগ সাধনা' বইতে লিখেছেন 'প্রাণ মুদ্রা'য় যে কোনও চোখের রোগ সারে। আপনার বাঁ চোখ পিট্‌পিট্ করা রোগটা সারাচ্ছেন না কেন? আমার প্রশ্নের উত্তরে গালাগাল দিয়েছেন। রামদেব জানালেন, 'খেচরী মুদ্রা' জানেন। যোগের আকর-গ্রন্থ 'হঠযোগ প্রদীপিকা' তুলে ধরে বললাম, এতে

লেখা আছে, 'খেচরী মুদ্রা' জানলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মৃত্যু নেই। আপনি কি অমর থাকবেন? উত্তরে জানালেন, অবশ্যই অমর থাকবেন। আপনি সত্যি বলছেন, না কি মিথ্যে? খেচরী মুদ্রা জানার পর আপনাকে খাদ্য-পানীয় কেন গ্রহণ করতে হয়? উত্তর দিলেন না বাবা রামদেব। প্রশ্ন করেছিলাম, হাতের নখে নখ ঘষলে টেকো মাথায় চুল গজায় বলে আপনি দাবি করেছেন। এ দাবি কি সত্যি? রামদেবের কথা—হাজার হাজার টাকে এ'ভাবে চুল গজিয়েছে। চ্যালেঞ্জ করতেই রামদেব তোতলাতে তোতলাতে পিছু হটলেন।

विधानसभा अध्यक्ष की पत्नी की मौत:

फिर फंसे रामदेव

अपने पठना शिविर के दौरान बाबा रामदेव ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी की कैंसर से पीड़ित पत्नी वरोनिका चौधरी को कुछ जड़ीबूटियों के साथ प्राणायाम का 'अचूक' मंत्र दिया, फिर भी 25 मार्च को शिविर खत्म होने के 10 दिनों के अंदर ही उन की मौत हो गई।

वरोनिका चौधरी की मौत 4 अप्रैल, 2006

'আবার ফাঁসলেন' কথার অর্থ—তার আগেও ফেঁসেছিলেন, NDTV ইন্ডিয়া'র 'মুকাবিলা' অনুষ্ঠানে আমারই কাছে। তারিখটা ছিল ৭ জানুয়ারি, সাল ২০০৬। রাত ১০টা থেকে ১১-৩০ পর্যন্ত পাক্কা দেড় ঘণ্টার অনুষ্ঠানে রামদেবের ভণ্ডামী, অজ্ঞতা, মিথ্যাচারিতা সবই কিমা-কিমা করেছি। (গোটা বিষয়টা বিস্তৃত জানতে পড়তে পারেন, 'মনের নিয়ন্ত্রণ-যোগ-মেডিটেশন' গ্রন্থটি)।

একবিংশ শতাব্দিতে, সেলফোন, মাইক্রোচিপ্‌স, স্যাটেলাইট, ইন্টারনেটের যুগে আগস্ট ২০০৬ দেবমূর্তির 'দুধপান' নিয়ে হুজুগে মাতলো 'শিক্ষিত' ভারতবাসী। এগার বছর আগে একই ঘটনা ঘটেছিল। তখন শুধু গনেশমূর্তি দুধ খেয়েছিল। সেবার সারাদিন ঘুরে ঘুরে গনেশের দুধ পান দেখে বিকেলে 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার দপ্তরে বসে লেখটা শেষ করেই দৌড়েছিলাম 'বিড়লা মিউজিয়ম'-এ। সেখানে দূরদর্শনের Live অনুষ্ঠানে গনেশের দুধ খাওয়ার পিছনে হাতে-কলমে বোঝাতে আমি ছাড়াও ছিলেন একাধিক বিজ্ঞানী। ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫-এ 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় আমার তাতে 'দুধ পান রহস্য' উন্মোচন করা লেখাটি বিশাল গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তার এগারো বছর পর আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি! একে কী বলবো—আকস্মিকতা? নাকি ধারবাহিকতা?

বর্তমান ভারতে একই সঙ্গে ধর্মের রমরমা ও যুক্তিবাদের দ্রুত অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এদেশে বিশ্বায়ন এসে পড়েছে। তারই সঙ্গে তাল রেখে যখন এ'দেশেরই একটা অংশ তাল মেলাচ্ছে, তখন আর একটা অংশ আকণ্ঠ ডুবে রয়েছে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে।

২০ আগস্ট ২০০৬ সন্ধে থেকে ও ২১ আগস্ট সন্ধে পর্যন্ত দেবমূর্তিরা 'দুধপান' করেছেন। ১১ বছর আগে 'দুধ পান' গুজবের উৎস ছিল দিল্লি। এবার গাজিয়াবাদ।

গাজিয়াবাদ থেকে দ্রুত গুজব ছড়িয়ে পড়ে দিল্লি, চণ্ডীগড়, লুধিয়ানা, জয়পুর, এলাহাবাদ, কাশী, পাটনা, কলকাতা সহ আরও বিভিন্ন শহরে। হাজারে হাজারে মানুষ মন্দিরে হাজির হন দুধ-চামচে নিয়ে। এদের মধ্যে প্রথাগত ভাবে শিক্ষিতের সংখ্যা বিপুল।

২০ আগস্ট রাত ১০টা নাগাদ প্রথম ফোন করে আমার প্রতিক্রিয়া জানতে চান 'স্টার নিউজ'-এর প্রতিনিধি। ১০টা ১৫-তে আমাকে ফোনে ধরলেন 'স্টার-আনন্দ'-এর প্রতিনিধি। তাঁর সঙ্গে আমার ফোনের কথোপকথন প্রচারিত হলো। বললাম, ১১ বছর আগের অভিজ্ঞতার কথা। জানালাম, গনেশ বা অন্য দেবমূর্তির দুধপানের মধ্যে অলৌকিক কিছু নেই। আপনাদের তোলা যে ছবি দেখাচ্ছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে সমস্ত দুধই শ্বেতপাথরের দেবমূর্তির গা বেয়ে নেমে যাচ্ছে। মূর্তির তলা বেয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত ভেসে যাচ্ছে দুধে। ভক্তরা দুধভরা চামচ ধরছেন মূর্তির ভেজা শুঁড়ে বা ঠোঁটে। শুঁড়ের বা ঠোঁটের একটি জলবিন্দু চামচের দুধকে আকর্ষণ করছে। এটা তরল পদার্থের ধর্ম। তারপর মাধ্যাকর্ষণের পৃষ্ঠটানে আকর্ষিত হয়ে দুধের কিছুটা ভেঁজা শরীর বেয়ে নেমে যাচ্ছে তলায়। ওমনি ভক্তরা চামচকে বেশি করে হেলিয়ে ধরছেন। চামচের দুধ যতই কমতে থাকে, ততই চামচ আরও বেশি করে হেলিয়ে ধরেন ভক্তরা। ভক্তি থেকে অবচেতন মন চামচে হেলাতে শুরু করতেই পারে। এটা খুবই স্বাভাবিক মানসিক প্রতিক্রিয়া। আবার কেউ নিজেকে জাহির করতে ইচ্ছে করেও হেলাতে পারে।

সে'দিন রাতেই আনন্দবাজারের প্রতিনিধি এ বিষয়ে আমার সাক্ষাৎকার নিলেন। পরদিন ভোরে আমাকে ঘুম থেকে তুললেন 'স্টার আনন্দ'। ফোনে সাক্ষাৎকার। বললাম, যে পদার্থ যত বেশি, তরল অর্থাৎ সান্দ্রতা বেশি, সে-পদার্থকে তত বেশি তাড়াতাড়ি আকর্ষণ করবে দেবমূর্তির শরীরে লেগে থাকা তরলবিন্দু। কেরসিন থেকে হুইস্কি, ফলিডল থেকে সাবানজল দেবতারা সব পান করবে। শুধু খেতে পারবে না লাড্ডু, পেঁড়া, আপেল এইসব না-তরল পদার্থ।

২১ আগস্ট দুপুরে 'স্টার আনন্দ'-এর ঋতব্রত এলেন। সঙ্গে ফটোগ্রাফার। ওদের কাজ শেষ করেই 'তারা'-র ওবি ভ্যানের সঙ্গে মন্দির পরিক্রমা শুরু করলাম। 'তারা'র প্রতিনিধি অয়নদেবের এক প্রশ্নের উত্তর জানালাম, যেসব পদার্থ বিজ্ঞানী বলেছেন, কাঁচ, চিনেমাটি, ধাতুর তৈরি মূর্তি দুধপান করবে না; তাঁরা যদি হাতে কলমে পরীক্ষা করতেন তো দেখতেন ওইসব ধাতুমূর্তিও দুধ খায়। ওঁদের বক্তব্য ছিল, যে-সব মূর্তির গায়ে খালি চোখে দেখা যায় না, এমন ছোট ছোট ছিদ্র থাকে, তারাই শুধু 'দুধপান' করে। এটা দুধপানের অন্যতম শর্ত। ছিদ্রগুলোতে দুধ ঢুকে যায়, তাইতেই চামচের দুধ কমে। ছিদ্রগুলো দুধে ভর্তি হয়ে গেলে মূর্তি খাওয়া বন্ধ করে।

অয়নদেবকে আমি দেখালাম চিনেমাটির মূর্তি থেকে ধাতুর মূর্তিও দুধপান করছে হৈ-হৈ করে।

রাতে 'এখন বাংলা' এবং তারপর 'তারা'র স্টুডিওতে হাজির হলাম। সেখানে সঞ্চালক ও দর্শকদের প্রশ্নের উত্তরের ফাঁকে ফাঁকে দেখাতে হলো, ঘোড়া থেকে সাপ সব্বাই দুধ, ঠাণ্ডা পানীয়, কেরসিন—সব পান করছে। খাচ্ছে না শুধু আপেল-আঙুর।

দেবমূর্তিরা যখন 'দুধপান'-এ ব্যস্ত, তখনই আরব সাগরের জল মিষ্টি হয়ে গেছে—গুজবে সারা মুম্বাই নাচলো। সুফি সন্ত মকদুম শাহের কৃপায় নাকি এমনটা ঘটেছে। সর্বরোগহর এই 'মিষ্টি' জল বোতলবন্দি করতে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। লবণাক্ত সমুদ্রের জলে লবণের পরিমাণ কমে সাদা জল (plain water) হয়ে যায় জলে ফ্লোরাইড ও ক্লোরাইডের যৌগ বৃদ্ধি হলে। এই প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে অপ্রাকৃতিক ঘটনাকে আবিষ্কার করার মতো অপ্রকৃতিস্থ শিক্ষিত মানুষের আজও অভাব ঘটেনি ভারতে।

মোবাইল ভূত থেকে লাইট ভূতের আঁচড়ে দেওয়ার মত ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ তোলপাড় হয়। ভূতের ভয়ে বর্ধমানের 'বেনাগ্রাম'-এর সব মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালায়।

এতসব তোলপাড় করা ঘটনা দেখে মনে হয় ভারতের শিক্ষিতরা কি মধ্যযুগের দিকে ফিরছেন? এতসব 'অলৌকিক' কাণ্ডকারখানাগুলো সবই কি আকস্মিক? নাকি এটাই 'মূর্খ'-ভারতের ধারাবাহিকতা?

মানুষ ও দেবতা

এককালে অসহায় মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে ভয় ও শ্রদ্ধা করেছে। জল, ঝড়, বৃষ্টি, নদী, সমুদ্র, বন্যা, আগুন, পাহাড়-পর্বত, মাটি সমস্ত কিছুরই প্রাণ আছে বলে বিশ্বাস করেছে, বসিয়েছে দেবত্বের আসনে। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি জড় নক্ষত্র ও গ্রহগুলোর পুজো করেছে জীবন্ত দেবতা হিসেবে। মানুষের জীবনে সম্পদ হিসেবে প্রবেশ করেছে বৃক্ষ, অরণ্য, গরু, ছাগল, শুয়োর আরও নানা ধরনের গৃহপালিত জন্তু। এরাও দেবতা হিসেবে পুজো পেয়েছে। শিক্ষা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক মানুষের কাছেই এইসব দেবতারা দেবত্ব হারালেও সবার কাছে হারায়নি।

প্রাচীন মানুষ জীবাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত না থাকার দরুন অসুখকে কখনও বলেছে পাপের ভোগ, কখনও বা বলেছে অশুভ শক্তির ফল। তন্ত্র-মন্ত্র, মাদুলি, যাগ-যজ্ঞ, জলপড়া, তেলপড়া, ঝাড়ফুঁক, স্বপ্নাদিষ্ট ওষুধ রোগের চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আজও এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি অনুন্নত দেশে এবং কিছু কিছু

পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। রোগ না সারলে কারণ হিসেবে কাউকে ডাইনি ঘোষণা করে হত্যা করার ইতিহাস ক্ষীণতর হলেও স্তব্ধ হয়নি।

মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছে। গোষ্ঠীর শক্তিমান ও বুদ্ধিমানকে বরণ করেছে নেতার পদে। শক্তিমান হয়েছে শাসক, বুদ্ধিমান হয়েছে ধর্মীয় নেতা। ধর্মীয় নেতারা বুদ্ধির জোরে শাসকদের ওপরও প্রভুত্ব করতে চেয়েছে। নিজেদের ঘোষণা করেছে ঈশ্বরের প্রেরিত দূত হিসেবে, ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে, নবরূপে ঈশ্বর হিসেবে। বিভিন্ন কৌশল সৃষ্টি করে সেইসব কৌশলকে সাধারণের সামনে হাজির করেছে অলৌকিক ক্ষমতা হিসেবে। নিজেদের এইসব অলৌকিক কীর্তিকথা প্রচারের জন্য কখনও সাহায্য নিয়েছে কিছু সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের, কখনও বা কিছু অন্ধ বিশ্বাসীদের। পরবর্তীকালে সেইসব অলৌকিক কীর্তিকথার কিছু কিছু পল্লবিত হয়ে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে।

এই সব ধর্মগুরুরা নিজস্ব ধারণাগুলোকে ঈশ্বরের মত বলে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে, যদিও পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এইসব অভ্রান্ত ঈশ্বরের মতগুলো একে একে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ধর্মীয় শাসকেরা যে-সব ধর্মগ্রন্থ রচনা করে গেছে, সেগুলো বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা অভ্রান্ত সত্য হিসেবেই গ্রহণ করেছে। যুক্তি দিয়ে বিচার না করেই সংখ্যাগুরু মানুষ যুগ যুগ ধরে মেনে চলেছে ধর্মীয় ধারণাগুলোকে। শাসক সম্প্রদায় ও পুরোহিত সম্প্রদায় পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক হয়ে শোষণ করেছে অন্ধ-বিশ্বাসী সাধারণ মানুষদের।

বিশ্বের বহু দেশেই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুমনেই রোপিত হচ্ছে অবাস্তব অলৌকিক ধ্যান-ধারণার বীজ। দেব-দেবী ও সাধক-সাধিকাদের মনগড়া অলৌকিক কাহিনি পড়ে ও শুনে যে বিশ্বাস শিশু মনে অঙ্কুরিত হচ্ছে, তাই পরিণত বয়সে বিস্তার লাভ করছে বৃক্ষরূপে।

যুক্তিবাদী, মুক্তচিন্তার সেইসব মানুষ

খ্রিস্টজন্মের ৫০০ বছর আগে পিথাগোরাস, এনাকু, সিমেণ্ডের মতো গ্রীক অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতেরা জানিয়েছিলেন, পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ, সূর্যকে ঘিরে পৃথিবী ও অন্য গ্রহগুলো ঘুরছে। বিনিময়ে ধর্ম-বিরোধী, ঈশ্বর-বিরোধী, নাস্তিক মতবাদ প্রকাশের অপরাধে এঁদের বরণ করতে হয়েছিল অচিন্তনীয় নির্যাতন, সত্যের ওপর অসত্যের নির্যাতন, ধর্মের নির্যাতন।

এই মতকে ২০০০ বছর পরে পুস্তকাকারে তুলে ধরলেন পোল্যাণ্ডের নিকোলাস কোপারনিকাস। তাঁরই উত্তরসুরি হিসেবে এলেন ইতালীর জিয়োর্দানো ব্রুনো, গ্যালিলিও গ্যালিলেই। প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন বৈজ্ঞানিক সত্যকে—সূর্যকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে পৃথিবীসহ গ্রহগুলো।

সে-যুগের শিক্ষাক্ষেত্রেও ছিল প্রচণ্ড ধর্মীয় প্রভাব। ধর্মীয় বিশ্বাসকেই অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। সাধারণের মধ্যেও ধর্মান্ধতা ছিল গভীর ও ব্যাপ্ত। বাইবেল-বিরোধী মত প্রকাশের জন্য মহামান্য পোপ ক্ষিপ্ত হলেন, ক্ষিপ্ত হলো ধর্মযাজক ও ধর্মান্ধ মানুষগুলো। ব্রুনো বন্দি হলেন। ধর্ম-বিরোধী মত পোষণের অপরাধে ব্রুনোকে আটকে রাখা হয়েছিল এমন এক ঘরে, যার ছাদ ছিল সীসেতে মোড়া। গ্রীষ্মে ঘর হতো চুল্লি, শীতে বরফ। এমনি করে দীর্ঘ আট বছর ধরে তাঁর উপর চলেছে ধর্মীয় নির্যাতন।

ব্রুনো

১৬০০ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র ঈশ্বর-প্রেমীরা তথাকথিত সত্যের পূজারিরা ব্রুনোকে শেষবারের মতো তাঁর মতবাদকে ভ্রান্ত বলে স্বীকার করতে বলল। অসীম সাহসী ব্রুনো সেই প্রস্তাব প্রচণ্ড ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন। বাইবেল বিরোধী অসত্য ভাষণের জন্য ব্রুনোকে প্রকাশ্য স্থানে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হলো। অনুমান করে নিতে অসুবিধে হয় না, সেদিনের দর্শক হিসেবে উপস্থিত মুর্খ জনতা লেলিহান আগুনে এক সত্যের পূজারিকে ধ্বংস হতে দেখে যথেষ্ট উল্লসিত হয়েছিল।

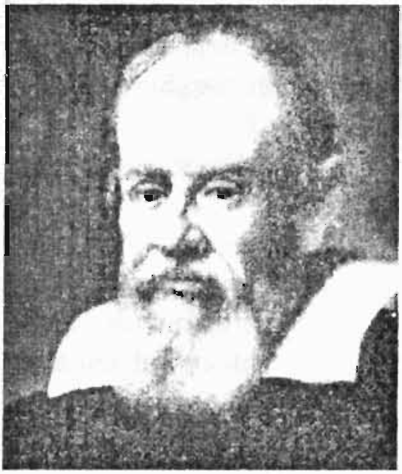

গ্যালিলিও গ্যালিলেই

গ্যালিলিও গ্যালিলেইকেও ধর্মান্ধদের বিচারে অধার্মিক ও অসত্য মতবাদ প্রচারের অপরাধে জীবনের শেষ আট বছর বন্দি জীবন কাটাতে হয়েছে।

কিন্তু এত করেও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ও ঈশ্বরের পুত্রেরা সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর ঘোরা বন্ধ করতে পারেনি।

খ্রিস্টজন্মের প্রায় ৪৫০ বছর আগে আনাক্সাগোরাস বলেছিলেন, চন্দ্রের নিজস্ব কোনও আলো নেই। সেইসঙ্গে আরও বলেছিলেন, চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ। চন্দ্রগ্রহণের কারণও তিনি ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

আনাক্সাগোরাসের আবিষ্কারের প্রতিটি সত্যই ছিল সেদিনের ধর্ম-বিশ্বাসীদের চেখে জঘন্য রকমের অসত্য। ঈশ্বর বিরোধিতা, ধর্ম বিরোধিতা ও অসত্য প্রচারের অপরাধে দীর্ঘ ও নিষ্ঠুর নির্যাতনের পর তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়।

এত করেও কিন্তু সেদিনের ঈশ্বরের পুত্রেরা সত্যকে নির্বাসনে পাঠাতে পারেনি। তাদের ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাণীই আজ শিক্ষিত সমাজে নির্বাসিত।

ষোড়শ শতকে সুইজারল্যান্ডের বেসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্র ও ভেষজবিদ্যার অধ্যাপক ডাক্তার ফিলিপ্রাস অ্যাউরেওলাস প্যারাসেলসাস ঘোষণা করলেন—মানুষের অসুস্থতার কারণ কোনও পাপের ফল বা অশুভ শক্তি নয়, রোগের কারণ জীবাণু। পরজীবী এই জীবাণুদের শেষ করতে পারলেই নিরাময় লাভ করা যাবে।

প্যারাসেলসাস-এর এমন উদ্ভট ও নতুন তত্ত্ব শুনে তাবৎ ধর্মের ধারক-বাহকেরা 'রে-রে' করে উঠলেন। এ কী কথা! রোগের কারণ হিসেবে ধর্ম আমাদের যুগ যুগ ধরে যা বলে এসেছে, তা সবই ওই একজন উন্মাদ অধ্যাপকের কথায় মিথ্যে হয়ে যাবে? শতাব্দীর পর শতাব্দী পবিত্র ধর্মনায়কেরা যা বলে গেছেন, ধর্মগ্রন্থগুলোতে যা লেখা রয়েছে লক্ষ-কোটি মানুষ যা বিশ্বাস করে আসছে, সবই মিথ্যে? সত্যি শুধু প্যারাসেলসাস-এর কথা?

সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক ধর্ম-বিরোধী মতবাদ প্রচারের জন্য প্যারাসেলসাসকে হাজির করা হলো 'বিচার' নামের এক প্রহসনের মুখোমুখি। ধর্মান্ধ বিচারকরা প্যারাসেলসাসকে ঈশ্বর প্রণীত অভ্রান্ত সত্যকে অসত্য বলার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দিল। প্যারাসেলসাস সেদিন নিজের জীবন বাঁচাতে প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সেদিনের ধর্মীয় সত্য আজ বিজ্ঞানের সত্যের কাছে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। মিথ্যে হয়ে গেছে ধর্মের ধারণা, ঈশ্বরের বাণী।

হিন্দু ধর্মের ধারণায় ব্রহ্মা তাঁর শরীরের এক একটি অঙ্গ থেকে এক এক শ্রেণির জীব সৃষ্টি করেছেন। এমনি করেই একদিন সৃষ্টি হয়েছিল মানব, মানবীর। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তাবত জীব ব্রহ্মারই সৃষ্টি বলে হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাসীরা মনে করেন।

খ্রিস্টীয় মতে কিন্তু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ জীবের স্রষ্টা পরমপিতা জিহোবা। পরমপিতা এক জোড়া করে বিভিন্ন প্রাণী সৃষ্টি করে ছেড়ে দিয়েছিলেন পৃথিবীর বুকে। এমনি করেই একদিন জিহোবা সৃষ্টি করেছিলেন এক জোড়া মানুষ—আদম ও ঈভ।

বিভিন্ন প্রাণী বা মানুষের উৎপত্তির কোনও ধর্মীয় ধারণাই আজ আর বিজ্ঞান শিক্ষিত মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, আজ আমরা জানতে পেরেছি, কোনও

প্রাণীই ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে হঠাৎ করে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়নি। হাজির হয়েছে কোটি কোটি বছরের দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

আধুনিক জীবাশ্ম বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীতে জীবনের প্রথম বিকাশ ঘটে আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ' কোটি বছর আগে। অর্থাৎ, পৃথিবীর জন্মের একশ' কোটি বছর পরে। জীব-বিজ্ঞানের ভাষায় তাদের বলা হয় 'প্রোকারিয়টস' (prokaryotes)— জীবাণুবিশেষ প্রাণী। তাদের ধরনধারণটা ছিল কতকটা আধুনিক ব্যাকটিরিয়ার মতো। এক একটি জীবকোষ এক একটি প্রাণী। এই জীবকোষে নিউক্লিয়াসের মতো সুস্পষ্ট কোনও অঙ্গ ছিল না। এই এককোষী প্রাণীই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠল বহুকোষী প্রাণীতে। দীর্ঘ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বর্তমানের প্রতিটি শ্রেণীর প্রাণী এবং মানুষও তার বাইরে নয়।

প্রাণের উৎস চারটে জিনিস। **এক** : এক ধরনের কিছু প্রোটিন, যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় 'নিউক্লিয়োটাইড' (Nucleotide)। **দুই** : কিছু অ্যাসিড, বিজ্ঞান যার নাম দিয়েছে 'নিউক্লিক অ্যাসিড' (Nucleic acid)। **তিন** : বিশেষ তাপমাত্রা, **চার** : বিশেষ পরিবেশগত চাপ। এই চারটি জিনিসের মিলনে সৃষ্টি হয়েছিল প্রাণ।

পৃথিবীর জন্ম থেকেই নিউক্লিয়োটাইড ও নিউক্লিক অ্যাসিডের অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল। বিভিন্ন সময় এরা মিলিতও হয়েছে, কিন্তু পরিবেশগত চাপ ও তাপের অভাবে প্রাণ সৃষ্টি হয়নি। পৃথিবী সৃষ্টির প্রায় একশো' কোটি বছর পরে পৃথিবী একটা চরম অবস্থার মধ্যে ছিল। প্রতিনিয়ত প্রচণ্ড ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত, আগ্নেয়গিরিব অগ্নুৎপাত, ভুমিকম্পের ফলে অশান্ত পৃথিবীতে যে পরিবেশগত তাপ ও চাপ সৃষ্টি হয়েছিল, তারই মধ্যে হঠাৎ একসময় নিউক্লিয়োটাইড ও নিউক্লিক অ্যাসিড মিলিত হয়ে সৃষ্টি করেছিল প্রাণ।

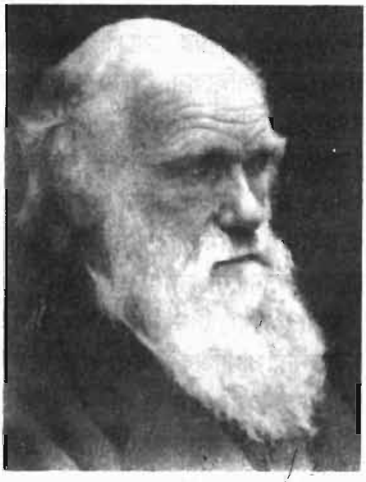

ডারউইন

প্রাণীদের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস প্রথম তুলে ধরেছিলেন চার্লস ডারউইন। দীর্ঘ বছরগুলোর অক্লান্ত পরিশ্রমে ডারউইন সৃষ্টি করলেন তাঁর সনাতন ধর্ম-বিরোধী সৃষ্টি ও বিবর্তন তত্ত্ব।

বিভিন্ন জীবাশ্মের আবিষ্কার ও তাদের প্রাচীনত্ব নির্ণয় করে বিজ্ঞান ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের হারানো সূত্র বা 'মিসিং লিংক'কে জোড়া লাগিয়ে সম্পূর্ণ রূপ দিল।

যদিও ডারউইন ছিলেন গত শতকের মানুষ, তবু তাঁকে ধর্মান্ধদের হাতে অত্যাচারিত হতে হয়েছে প্রায় মধ্যযুগীয় প্রথায়।

প্রাচীন অতীতে মানুষ দরিয়ায় নৌযান ভাসাতে শিখল। দিক নির্ণয়ের জন্য অনুভব করলো নক্ষত্র চেনার প্রয়োজনীয়তা। কেবলমাত্র অনুন্নত গণিত শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে সীমিত জ্ঞান নিয়ে মানুষ গ্রহ, নক্ষত্রের বিষয়ে যা জেনেছিল তাতে অনেক ক্ষেত্রেই ছিল অসম্পূর্ণতা ও ভ্রান্ত ধারণা আর্যভট্ট, ভাস্কর, হিপার্কস-এর জ্যোতিষচর্চায় গণিত থাকলেও টেলিস্কোপের অভাবে পুরোপুরি বিজ্ঞান ছিল না। অর্থাৎ সেই সময়কার জ্যোতির্বিদ্যা বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নত হতে পারেনি। বরাহমিহির থেকে টলেমির মত আকাশ পর্যবেক্ষকদের জন্যে তখন জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy) ও ফলিত জ্যোতিষ-এর (Astrology) মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য ছিল না।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কৃত হলো দূরবীক্ষণ, উন্নত হলো গণিত শাস্ত্র। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো বর্তমান জ্যোতির্বিদ্যা। পরিত্যক্ত হলো ফলিত জ্যোতিষ বা জ্যোতিষশাস্ত্ররূপে অ-বিজ্ঞান।

উন্নত দেশগুলোর সংখ্যাগুরু মানুষ আজ বুঝতে শিখেছেন, মানুষের সুখ-দুঃখের হেতু আকাশের গ্রহগুলোর মধ্যে নিহিত নেই, রয়েছে আমাদের সৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে।

বিশ্বের খ্যাতিমান ১৮৬ জন যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী (এঁদের মধ্যে ১৮ জন নোবেল বিজয়ী) ১৯৭৫-এর সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্কের 'দি হিউম্যানিস্ট' পত্রিকায় এক ইস্তাহারে বলেছিলেন, "আমরা অত্যন্ত বিচলিত, কারণ বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম, নামী সংবাদপত্র, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশক পর্যন্ত ঠিকুজী-কোষ্ঠী, রাশিবিচার, ভবিষ্যদ্বাণীর পক্ষে ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। যেখানে যুক্তি-বিচারের কোনও স্থান নেই। এতে মানুষের মধ্যে অযৌক্তিক ধ্যান-ধারণা অন্ধ-বিশ্বাস বেড়েই যায়। আমরা বিশ্বাস করি, জ্যোতিষীদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সরাসরি দৃঢ়ভাবে চ্যালেঞ্জ জানানো সময় এসেছে।"

মজার কথা, বিজ্ঞানীরা যখন চ্যালেঞ্জ জানানোকে স্বাগত জানাচ্ছেন, একান্ত প্রয়োজনীয় সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করছেন এবং তাঁদের আহ্বানের সঙ্গে সহমত হয়ে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রথম সারির নামী-দামী বহু সংখ্যক জ্যোতিষীদের পরাজিত, পর্যুদস্ত করেই চলেছে তখন পরাজিত পর্যুদস্ত জ্যোতিষীসহ অনেক জ্যোতিষীই বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে ভাগ্য গণনার বিজ্ঞাপন দিয়ে চলেছে। ফলিত জ্যোতিষের মতো অ-বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে জেনে বুঝে লোক ঠকিয়ে চলেছে।

আমরা কোথায় আছি

আমাদের মতো সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া সংস্কারবদ্ধ দেশে পদে পদে যেখানে অনিশ্চয়তা সেখানে বেশির ভাগ সাধারণ মানুষ দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রতিকারের একমাত্র ধ্বজাধারী জ্যোতিষী বা অবতারদের দ্বারস্থ হবেন, এটাই স্বাভাবিক।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় ভ্রান্ত ধারণাগুলো একে একে পচা-গলা অঙ্গের মতোই খসে খসে পড়ছে। শিক্ষা ও বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান-মনস্ক মানসিকতাও একটু একটু করে গড়ে উঠছে। তবুও এ-কথা অস্বীকার করার উপায়ে নেই যে, অনুন্নত দেশের তুলনায় অনেক কম হলেও উন্নততর দেশেও অবৈজ্ঞানিক, যুক্তিহীন, ভ্রান্ত ধর্মীয় ধারণাগুলো এখনও বর্তমান।

মেঘনাদ সাহা

শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি তাঁর সংগৃহীত তথ্য অনুসারে সে সময়ে আমাদের দেশের শতকরা ৯৯ ভাগ পুরুষ ও শতকরা ১০০ ভাগ মহিলা ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসী। ইউরোপে ফলিত জ্যোতিষে পূর্ণ আস্থাবান পুরুষের সংখ্যা শতকরা ৫ এবং মহিলার সংখ্যা শতকরা ৩৩ জন।

এই পরিসংখ্যান থেকে অনুমান করতে অসুবিধে হয় না, যুক্তিহীন কুসংস্কার ভারতীয় সমাজে কেমনভাবে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে রয়েছে। অতি দুঃখের কথা এই যে, প্রতিটি দেশ যখন বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতিকে দ্রুততর করতে চাইছে, তখন আমরা অতীত সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে সনাতন সংস্কারের আবর্তে থাকতে চাইছি।

এ-যুগের অনেকেই বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করলেও বা বিজ্ঞানের কোনও বিভাগকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেও মনে-প্রাণে বিজ্ঞানী হতে পারেননি, পারেননি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করতে।

এঁরা প্রায়শই একদিকে যুক্তিহীন ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাগুলোকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন, আর এক দিকে লেখাপড়ায় সুপুত্র হয়ে ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ছাত্র-জীবনে ছেদ টেনেছেন, অথবা বিজ্ঞানের অন্য কোনও বিভাগে

সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে কর্মজীবনে আর্থিক সফলতা পেয়েছেন।

আমার এক পরিচিত এক ডাক্তারকে দেখেছি, একটা স্ট্রোক হওয়ার পর তাঁর হাতে ও গলায় একাধিক মাদুলী শোভা পাচ্ছে।

আমার এক পরিচিত বিজ্ঞান পেশার প্রতিবেশীকে জানি, যাঁর পালিয়ে যাওয়া কিশোরী কন্যাটিকে ফেরত পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে মানত করেছিলেন।

এক কেমিস্ট্রির অধ্যাপককে জানি, যিনি বিশ্বাস করেন, তাঁর গুরুদেব মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে উপেক্ষা করে ধ্যানে শূন্যে ভেসে থাকতে পারেন।

বর্তমানের নামী-দামি অবতারদের জীবনী পড়লে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকেরই নাম পাবেন, যাঁরা এই সব অবতারদের অলীক অলৌকিক ক্ষমতার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা এই সব মত প্রকাশ করেছেন কখনও অন্ধ-বিশ্বাসে, কখনও বা অলৌকিক (?) ঘটনাটির পিছনে লুকোনো বাস্তব কারণ বুঝতে না পারার দরুন। অহংবোধের ফলে এইসব শিক্ষিত মানুষ একবারও ভাবতে পারেন না, তাঁদের বোধশক্তির বাইরেও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ থাকতে পারে। বিশ শতকের শেষ মাথায় এসেও ভারতবর্ষের শিক্ষিত, বিজ্ঞান-শিক্ষিত, মার্কসবাদে-দীক্ষিত অনেকেই যুক্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বহন করে চলেছেন।

সমাজে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত অথচ যুক্তিহীন মানুষের তালিকা দিতে গেলে একটা ছোট-খাটো বই হয়ে যাবে।

কিছু কিছু বিজ্ঞান-পেশার ব্যক্তি আছেন, যাঁরা তাঁদের আজন্ম লালিত ধর্মীয় ধারণাগুলোকে বিজ্ঞানের কাছে নতজানু হতে দেখে ধর্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং অতীন্দ্রিয়তার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য মিথ্যা ও শঠতার আশ্রয় নিতে পিছ-পা নন। ধর্মতত্ত্ব ও অতীন্দ্রিয়তাকে বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রচার করার অক্লান্ত চেষ্টা করে চলেছেন পরামনোবিজ্ঞানী (Para-psychologist) নামের অ-মনোবিজ্ঞানীরা। আজ পর্যন্ত তাঁদের এই চেষ্টা শুধুমাত্র প্রচারের স্তরেই রয়ে গেছে, পরামনোবিদ্যা প্রকৃতিবিজ্ঞানের মর্যাদা পায়নি। পরামনোবিজ্ঞানীরা প্রকৃতিবিজ্ঞানের (মেথডলজি) অনুসরণ করে বিজ্ঞানের দরবারে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা, প্ল্যানচেট, জাতিস্মর মানুষের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য নানাধরনের কূট কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। যদিও সেইসব কৌশলের একটিও বিজ্ঞানের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গ্রহণযোগ্য হয়নি কোনও যুক্তিবাদী মানুষের কাছে। কারণ, পরামনোবিজ্ঞানীদের দেওয়া প্রতিটি পরীক্ষার ক্ষেত্রেই ছিল কৌশল গ্রহণের সুযোগ।

ভারতীয় সমাজকে কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে বিজ্ঞানের আলোতে আনার জন্য যখন বুদ্ধিজীবী ও যুক্তিবাদীদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, তখন এক শ্রেণির কুসংস্কারাচ্ছন্ন 'বুদ্ধিজীবী' মানুষই অতীন্দ্রিয়তাকে, অবতারবাদকে, জন্মান্তরকে, জ্যোতিষশাস্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করে প্রগতির চাকাকে উলটো দিকে ঘোরাতে চাইছেন।

শিক্ষার ডিগ্রিধারী সংস্কারবদ্ধ মানুষ, অবতারদের কৌশলকে ব্যাখ্যা করতে না পারা সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া আত্মগর্বী মানুষ, কৌশলে অতীন্দ্রিয়তাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া বিজ্ঞান শাখার মিথ্যাচারী মানুষগুলোই আজকের সমাজে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান-মনস্ক মানুষগড়ার কাজে সবচেয়ে বড় বাধা।

আমাদের দেশে স্বল্প-শিক্ষিত, ডিগ্রিহীন, সংস্কারমুক্ত, যুক্তিবাদী, স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক মানসিকতার মানুষ আমি দেখেছি। আবার একই সঙ্গে দেখেছি 'যুক্তিবাদী', 'বিজ্ঞানমনস্ক' এবং সংগ্রামী বলে স্ব-বিজ্ঞাপিত কিছু সমাজশীর্ষ মানুষের ঈর্ষার নানা রূপ। ঈর্ষা তাঁদের কখনও নিয়োজিত করছে যুক্তিবাদী মানুষের সংস্কারমুক্তির সংগ্রামের বিরুদ্ধে, কখনও বাধ্য করছে যুক্তিহীনতাকে আশ্রয় করতে।

জানি, প্রতিটি ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত অনিবার্যরূপে যুক্তিবাদী মানসিকতা যুক্তিহীনতার বিরুদ্ধে জয়ী হবেই। বিরোধীরা এই জয়কে বিলম্বিত করতে পারে মাত্র, আজ পর্যন্ত স্তব্ধ করতে পারেনি এবং পারবেও না। ইতিহাস অন্তত এই শিক্ষাই দিয়েছে।

অধ্যায় : দুই

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান

জাদুকর জাদুর খেলা দেখান মনোরঞ্জনের জন্য। সেই খেলা দেখে বিস্মিত হলেও আমরা বুঝতে পারি এর পেছনে অলৌকিক কিছু নেই। আছে কিছু কৌশল, যা সাধারণ মানুষ চেষ্টা করলে আয়ত্ত করতে পারে। কিন্তু সরল বিশ্বাস ও কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণির চতুর লোক যখন স্রেফ কিছু কৌশলের খেলা দেখিয়ে, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে নিজেদের প্রায় ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে রাখে, তখন তা নির্দোষ মনোরঞ্জনের পর্যায়ে থাকে না।

আসুন, আমরা প্রত্যেকেই খোলামেলা যুক্তিবাদী মন নিয়ে অলৌকিক বলে কথিত ঘটনাগুলোকে পর্যালোচনা করে দেখি, এগুলো কতখানি লৌকিক ও কতখানি অলৌকিক। সেইসঙ্গে প্রতিটি পাঠক-পাঠিকাকে অনুরোধ করব যুক্তিবাদী মনের অধিকারী হতে এই মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করুন—

কোন অন্ধ-বিশ্বাসে বশ হওয়া নয়। বহুজনে বা বিখ্যাতজনে মেনে নিয়েছেন বলে কোন ধারণাকে মেনে নেওয়া নয়। যুক্তি দিয়ে বিচার করব, যাচাই করব শুধু। তারপরই গ্রহণ করব বা বাতিল করব।

এই অলৌকিক ক্ষমতাবানদের প্রসঙ্গে একটা অসাধারণ ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। একজন জাদুকর বুজরুক মোল্লাদের তথাকথিত ক্ষমতার মায়াজাল থেকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন আলজিরিয়ার অধিবাসীদের মুক্ত করেছিলেন।

আলজিরিয়া তখন ফ্রান্সের অধীন। আলজিরীয়রা আরব মুসলমান সম্প্রদায়ের বংশধর। স্বভাবে দুঃসাহসী হলেও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। মোল্লা-সম্প্রদায় ওই সব সরল ও কুসংস্কারগ্রস্ত লোকগুলোকে নানারকম জাদুর খেলা দেখিয়ে এমন মুগ্ধ করে রেখেছিল। দেশের লোকেরা মনে করত মোল্লারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ও আল্লার মতোই পূজনীয়। মোল্লারা জনসাধারণের ওপর ফরাসি সরকারের কর্তৃত্বে সন্তুষ্ট ছিল না। কারণ, এতে তাদের দীর্ঘদিনের একচেটিয়া কর্তৃত্বে বাধা পড়ছিল। মোল্লারা একসময় জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে শুরু করল যে, তারা আল্লার কাছ থেকে জানতে পেরেছে ফরাসি সরকারের আলজিরিয়া

শাসনের দিন ফুরিয়েছে। মোল্লারা ফরাসি সরকারের বিরুদ্ধে জনতাকে নানাভাবে উসকানি দিতে লাগল।

মোল্লাদের কথা আলজিরীয়দের কাছে স্বয়ং আল্লার কথা। অতএব, তারা আর ফরাসি সরকারকে পাত্তা দিতে রাজি হল না। আলজিরিয়ার ফরাসি সরকার প্রমাদ গুনলেন। মোল্লাদের এইসব কথার পিছনে যে কোনও যুক্তি নেই, তা অধিবাসীদের বোঝাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে তাঁরা শঙ্কিত হলেন। এই বিপদের কথা জানিয়ে ফ্রান্সে খবর পাঠালেন। ফ্রান্সের ফরাসি সরকার দীর্ঘ আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোলেন যে, সেনা পাঠিয়ে সাময়িকভাবে দমননীতি চালানো গেলেও এটা কোনো স্থায়ী সমাধান নয়। স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রয়োজন, চতুর মোল্লাদের প্রভাব নষ্ট করা। জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিতে হবে মোল্লাদের কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নেই। ওরা এতদিন শুধু মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে লোক ঠকিয়ে এসেছে।

ফরাসি সরকার এই কাজের ভার দিলেন ফ্রান্সের সেরা জাদুকর রবেয়ার উদ্যাঁকে। এতদিন শুধু চিত্ত বিনোদনের জন্যই উদ্যাঁ তাঁর জাদুর খেলা দেখিয়েছেন। এবার দেশের জন্য অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন আলজিরীয় মোল্লাদের মুখোমুখি হলেন। দলবল নিয়ে আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্স শহরে হাজির হলেন। সেখানকার সেরা থিয়েটার হলে তাঁর জাদু প্রদর্শনের ব্যবস্থা হল। বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হলেন শহরের বহু গণ্যমান্য আরব মুসলমান ও মোল্লারা। ফরাসি জাদু দেখার ব্যাপারে অবশ্য জনসাধারণের খুব একটা উৎসাহ ছিল না। ওরা বিশ্বাস করত মোল্লাদের নানা ধরনের অলৌকিক কাণ্ডকারখানার কাছে ফরাসি জাদুকরের জাদু নেহাতই ছেলেখেলা।

কিছু খেলা দেখানোর পর উদ্যাঁ light and heavy chest (হালকা ও ভারি বাক্স) খেলাটি দেখালেন। একটি ফরাসি সুন্দরী একটা ছোট্ট হালকা লোহার বাক্স লোহার পাটাতন পাতা মঞ্চে এনে রাখল। উদ্যাঁ এবার মঞ্চে আহ্বান জানালেন উপস্থিত সেরা শক্তিমান দর্শককে। শহরের সেরা পালোয়ান বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অতএব তিনি উঠলেন মঞ্চে।

উদ্যাঁ বললেন, "দেখো তো বাক্সটা তুলতে পারো কি না?"

পালোয়ান অতি তাচ্ছিল্যে তাঁর বাঁ হাত দিয়ে তুলে আবার নামিয়ে রাখলেন।

উদ্যাঁ এবার পালোয়ানটিকে বললেন, 'আমি আমার জাদুর বলে তোমার সব শক্তি কেড়ে নিচ্ছি।"

উদ্যাঁ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সম্মোহন করার বিশেষ ভঙ্গিতে দু'হাত নাড়তে লাগলেন। তারপর একসময় বললেন, "এবার তোমার কোনও শক্তি নেই। তুমি বাক্সটা আর তুলতে পারবে না।"

পালোয়ান তাচ্ছিল্যভরে হাত দিলেন বাক্সের হাতলে, কিন্তু এ কী! উঠছে না তো! তাচ্ছিল্যের হাসি মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। সমস্ত শক্তি দিয়ে হেঁচকা দিলেন,

কিন্তু বাক্সটা এক ইঞ্চিও উঠল না।

দর্শকদের চোখে বিস্ময় ও আতঙ্ক। এমন দৈত্যের মত লোককে শিশুর চেয়েও দুর্বল করে দিয়েছেন জাদুকর।

উদ্যাঁ এবার অলৌকিক শক্তি অধিকারী মোল্লা দর্শকদের আহ্বান জানালেন পালোয়ানটিকে শক্তি ফিরিয়ে দিতে।

দর্শকদের একান্ত অনুরোধে স্টেজে উঠে এলেন শহরের দুই সেরা মোল্লা পীর। অনেক ঝাড়ফুঁক করলেন, কিন্তু তবুও পালোয়ানটি ঐ ছোট্ট লোহার বাক্সটা তোলার শক্তি ফিরে পেলেন না।

শেষ পর্যন্ত উদ্যাঁই তাকে শক্তি ফিরিয়ে দিলেন। দর্শকরা অবাক বিস্ময়ে দেখল, এবার পালোয়ান অবহেলায় বাঁ হাতেই বাক্সটা তুলে ফেললেন। কৃতজ্ঞতায় উদ্যাঁর পায়ে মাথা ঠেকালেন পালোয়ান।

এর পর একের পর এক শহর ঘুরে উদ্যাঁ তাঁর আশ্চর্য খেলা দেখিয়ে মোল্লাদের প্রভাবের ভিত কাঁপিয়ে দিলেন। তারপর শুরু করলেন আর এক নতুন খেলা। আলজিরীয়দের বোঝালেন, এতদিন ধরে তাঁর খেলাগুলো সকলে অলৌকিক বলে মনে করছেন, তার কোনওটাই অলৌকিক নয়। সবই লৌকিক কৌশলের সাহায্যে দেখান হয়েছে। উদ্যাঁ এবার মোল্লাদের দেখানো নানা ভোজবাজির খেলা দেখিয়ে সেগুলো যে নেহাতই লৌকিক কৌশলে দেখানো হয় তা বুঝিয়ে দিলেন।

পালোয়ানের শক্তিহরণের খেলায় উদ্যাঁ বৈদ্যুতিক চুম্বকের সাহায্য নিয়েছিলেন। মঞ্চের আড়ালে উদ্যাঁর সহকারী ইশারা পেলেই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ চালু করে দিতেন। বাক্সের তলার লোহা, মঞ্চের উপরের লোহার পাটাতনের সঙ্গে বৈদ্যুতিক চুম্বকের আকর্ষণে আটকে থাকত। সেই লোহার মঞ্চের উপরই দাঁড়িয়ে বাক্সকে তোলা পৃথিবীর কোনও মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ, তখন বাক্স তুলতে হলে তাকে চুম্বকের আকর্ষণের চেয়েও বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

মোল্লাতন্ত্রের ও কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আলজিরীয়রা উদ্যাঁকে যে কতখানি ভালোবেসেছিলেন তা উদ্যাঁকে তাঁদের অভিনন্দনপত্রের প্রতিটি লাইনে ছড়িয়ে রয়েছে।

আলজিরিয়ায় উদ্যাঁর প্রয়োজন শেষ হলেও পৃথিবীর বহু দেশেই এমনকী আমাদের ভারতেও উদ্যাঁর প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়নি। কারণ–

আমরা অনেকেই প্রয়োজনমতো যুক্তিকে এড়িয়ে চলতে ভালোবাসি। ভালোবাসি কিছু কিছু কুসংস্কারের কাছে মাথা নোয়াতে। চমক লাগানো গল্প বলতে ভালবাসি। পরের মুখে শোনা ঘটনাকে নিজের চোখে দেখা সত্য-ঘটনা বলে জাহির করার তীব্র লোভের শিকার হই। এই তীব্র লোভ থেকেই

জন্ম নেয় বহু অতিরঞ্জিত কাহিনি। যা অনেক সময় বহু কথিত হওয়ার ফলে আমরা বিশ্বাসও করে ফেলি।

এই সুযোগে ম্যাজিকের ওপর একটা গুল-গল্প শোনাই আপনাদের।

এক বিখ্যাত ম্যাজিসিয়ানের ম্যাজিক দেখতে এসে দর্শকরা একটু একটু করে অধৈর্য হয়ে উঠছেন, শো'র সময় কখন পার হয়ে গেছে, অথচ তখনও ম্যাজিসিয়ানের দেখা নেই।

অধৈর্য জনতা যখন ক্ষুব্ধ, সেই সময় মঞ্চের পরদা উঠল। জাদুকর হাসিমুখে এসে দাঁড়ালেন। কয়েকজন ক্ষুব্ধ দর্শক জাদুকরের কাছে দেরি করার কৈফিয়ত দাবি করতেই জাদুকর অবাক চোখে নিজের ঘড়ি দেখে বললেন, "এক মিনিটও তো দেরি করিনি।"

যাঁদের হাতে ঘড়ি ছিল তাঁরা সকলেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলেন। প্রত্যেকের ঘড়িই একটু আগে দেখা সময় থেকে দেড় ঘণ্টা পিছিয়ে গেছে। এমন এক অসাধারণ খেলা দিয়ে ম্যাজিক শুরু হতে দেখে দর্শকরা প্রচণ্ড হাততালি দিয়ে অভিনন্দন করলেন জাদুকরকে।

ম্যাজিক নিয়ে এই গণসম্মোহনের গল্পটা বহু প্রচলিত, মূল গল্পের কাঠামো প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক। যে জাদুকরদের নিয়ে এই ধরনের কিংবদন্তি বা আষাঢ়ে গল্প বিভিন্ন সময়ে দারুণভাবে চালু হয়েছিল, তাদের মধ্যে রয়েছে ভারতীয় জাদুকর গণপতি, রাজা বোস, রয়-দি মিসটিক এবং জাদু সম্রাট পি সি সরকার। বিশ্বে যাঁকে নিয়ে এই আষাঢ়ে গল্প শুরু হয়েছিল তিনি এক মার্কিন জাদুকর হাউয়ার্ড থার্স্টন।

এই গণসম্মোহনের জাদু এঁরা কোনদিনই দেখাননি। কারণ, দেখানো সম্ভব নয়। অথচ, ভাবতে অবাক লাগে, আজও অনেকেই বিশ্বাস করেন এই বিস্ময়কর জাদুর খেলা বিভিন্ন জায়গায় দেখানো হয়েছে এবং অনেক প্রত্যক্ষদর্শী এখনও আছেন। দোষ এইসব বিশ্বাসকারীদের নয়। দোষ সেইসব আষাঢ়ে গল্পবাজদের, যাঁরা শোনা গল্পকে নিজের চোখে দেখা বলে চালিয়েছেন।

শাসক শ্রেণির স্বার্থে কুসংস্কার পুষ্ট হচ্ছে

হ্যাঁ, সেই কথাতেই আবার ফিরে আসি। আমাদের দেশে উদ্যাঁর মতো কোন একজনের বড় বেশি প্রয়োজন, যিনি অলৌকিকবাদের লৌকিক-কৌশলগুলো সাধারণ মানুষদের বুঝিয়ে দিয়ে কুসংস্কার ও অলৌকিকত্বের মায়াজাল থেকে জনগণকে মুক্ত করবেন। কারণ—অলৌকিক বাবাজি-মাতাজিদের ভিড় এবং জ্যোতিষীদের রমরমা আমাদের দেশে বড় বেশি। বারো মাসে তেরো পার্বণের

মতো লেগেই রয়েছে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক হানাহানি। ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠনগুলো শক্তিবৃদ্ধি করে চলেছে। ডাক দিচ্ছে প্রকাশ্যে আন্দোলন। জয়েন্দ্র সরস্বতীর দাবির মধ্যে রয়েছে ভারতের নাম করতে হবে 'হিন্দুস্থান', গরুকে করতে হবে 'জাতীয় পশু'। আমরা দেখলাম জয়েন্দ্র সরস্বতী আন্দোলনের সূত্রে দিল্লিতে এলেন। প্রধানমন্ত্রী পদে থেকেও রাজীব গান্ধী সপরিবারে তাঁর আশীর্বাদ নিতে হাজির হলেন। সে সময়ে রাজীবের হাতে তখন বিজ্ঞান দপ্তরও।

আমরা দেখলাম পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নুরুল হাসানের নাম উপরাষ্ট্রপতি পদে কংগ্রেস দলের মনোনয়নের প্রশ্নে বাতিল হল। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি তথা আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বিরোধী নেতাদের জানালেন, নুরুল হাসানের নাম বাতিল করা হল, কারণ নুরুল হাসান নাস্তিক।

১৯৮৭-র ৪ সেপ্টেম্বর। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের রাজধানী নয়াদিল্লি থেকে মাত্র চার ঘণ্টার দূরত্বে,

রাজস্থানের দেওরালায় ধর্মীয়-উন্মাদ কিছু মানুষ মধ্যযুগীয় বর্বরতায় অষ্টাদশী রূপ কানওয়ারকে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে সতী করল। আমরা দেখলাম ধর্মীয়-উন্মাদনার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় নেতারা পিছু হটলেন। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক এন. সি. চতুর্বেদী প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, সতীদাহ ব্যক্তিগত ধর্মীয় ব্যাপার।

আমরা দেখলাম সতীর সমর্থনে জয়পুরের জনসভায়, রাজস্থানের রাজ্য জনতা দলের সভাপতি, রাজ্য লোকদল (বহুগুণা গোষ্ঠী) সভাপতির সরব উপস্থিতি।

আমরা দেখেছি হরিয়ানার নির্বাচনের কংগ্রেস বিরোধী প্রচারে এন. টি. রামারাও নারায়ণ সেজে চৈতন্য রথম চেপে হিন্দু ভোটারদের সুড়সুড়ি দেওয়ার চেষ্টা করতে। আমরা দেখেছি 'শরিয়ত' নামের আদিম বর্বর আইনের সমর্থনে দীর্ঘ মিছিল। 'অকাল তখত' থেকে পুরোহিতদের জারি হওয়া ফতোয়া। আমরা দেখেছি রামশিলা ও বাবরি মসজিদ নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আমরা দেখলাম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় পুলিশের ভূমিকা হয় নীরব দর্শকের, নতুবা দাঙ্গাবাজদের উৎসাহদাতার। দেখেছি গুজরাটে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুদের দ্বারা ইসলাম ধর্মের মানুষদের লুঠ, ধর্ষণ ও হত্যা হতে। তাই সংখ্যালঘুরা আর পুলিশকে নাগরিকদের রক্ষাকারী হিসেবে ভাবতে পারছেন না। অস্বীকার করার উপায় নেই, শাসকশ্রেণির স্বার্থে পুলিশের ওপর ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রভাব বেড়েই চলেছে।

পুলিশ লাইনে মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বার বানাতে দেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। আর আজ স্বাধীনতার প্রায় ষাট বছর পরে

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের পুলিশ লাইনে হনুমান মন্দির, কালীমন্দির অতি স্বাভাবিক ঘটনা। পুলিশ ধর্মনিরপেক্ষতার পাছায় লাথি কষাচ্ছে হিজড়ে প্রশাসন ও সরকার নীরব দর্শক।

একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর কয়েকটি তদন্ত কমিশন পুলিশ লাইনে সমস্ত মন্দির ভেঙে ফেলার সুপারিশ করলেও, কোনও রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার তা কার্যকর করতে ইচ্ছে প্রকাশ করেনি। অর্থাৎ পুলিশদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা গড়ে তুলতে, ধর্মান্ধতা গড়ে তুলতে সরকার ইন্ধনই যুগিয়েছে। সংবিধানগতভাবে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। কোনও রাষ্ট্রনায়ক, সাংসদ, বিধায়ক বা সরকারি আমলা প্রকাশ্যে ধর্ম আচরণ করলে তা হবে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান অবমাননা। কোনও সরকারি বা আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান হবে উপাসনা ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত। আজ ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে যে সব রাজনৈতিক দল জোট বা ঘোট পাকাচ্ছে, তারা কেউ কি আদৌ ধর্মনিরপেক্ষ? **বাম জামানায় পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি থানায় গজিয়ে উঠেছে মন্দির কোর্ট চত্বরে মন্দির, মসজিদ, সরকারি স্কুলে হিন্দু দেব-দেবীর পুজো। এর পরও বামফ্রন্ট কী করে নিজেদের 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলে দাবি করে? আমাদের মতো আকণ্ঠ দুর্নীতি ডোবা দেশেই এ'সব সম্ভব?**

আমাদের দেশের মন্ত্রীরা নির্বাচনের আগে জয়ের আশায় মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায়, গুরুদ্বারে পুজো দেন। অবতারদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন। রাজনীতিবিদ থেকে বড়-মেজ-সেজ আমলারা পর্যন্ত প্রত্যেকেই প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের আগে দ্বারস্থ হন গুরুদেব বা জ্যোতিষীদের। যে কোনও রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয় ঈশ্বরের পুজো করে।

ধর্মকে রাজনীতির স্বার্থে, শুধুমাত্র ভোট-কুড়োবার স্বার্থে কাজে লাগাবার দেউলিয়াপনায় প্রগতিশীল বামপন্থীদেরও শরিক হতে দেখেছি আমরা। কেরলের বিধানসভা নির্বাচনের সময় খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের স্বাক্ষরিত বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রচার করে খ্রিস্টান ভোট প্রার্থনা, বিবেকানন্দের বাণীকে নির্বাচনের প্রচারে লাগানো, এ-সবই আমরা দেখেছি।

অন্ধ সংস্কারের ধারক-বাহক হিসেবে পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকারের মার্কসবাদী অনেক মন্ত্রীই পিছিয়ে নেই। এখন মন্ত্রীরা বড় বড় সব পুজোর 'পেট্রন'।

যুক্তিহীন আচার পালনকেই আমরা বলি কুসংস্কার, যা এসেছে সাধারণভাবে যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস থেকে। এ-কথা ভুললে চলবে না, যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস শাসকশ্রেণির স্বার্থেই বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে এবং পুষ্ট করা হচ্ছে। দেশে পরিবর্তনের রাজনীতি শুরু করতে হবে মানুষের চিন্তায়, চেতনায় যুক্তিবাদের বীজ ছড়িয়ে।

অধ্যায় : তিন

সাধুসন্তদের অলৌকিক ক্ষমতা

ব্রহ্মচারী বাবা

ছেলেবেলা থেকেই কোনও সাধুসন্তর খবর পেলেই তাঁর কাছে দৌড়োই, সত্যি তাঁর কোনও অলৌকিক ক্ষমতা আছে কী না জানার ইচ্ছেয়। সালটা বোধহয় ১৯৬৪। আমার কলেজের বন্ধু বরাহনগরের শশিভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেনের গোরাচাঁদ দত্ত একদিন বলল, ওদের পারিবারিক গুরুদেব এক ব্রহ্মচারী বাবার অলৌকিক ক্ষমতার কথা। ওদের গুরুদেবের নাম আমি আগেই শুনেছি। এও শুনেছি, ওঁর লক্ষ লক্ষ শিষ্য-শিষ্যা। বাংলা তথা ভারতে এই ব্রহ্মচারী বাবার নাম 'বালক ব্রহ্মচারী' বলে খুবই পরিচিত।

গোরা আমাকে একদিন বলল, "তুই তো অলৌকিক ক্ষমতার মানুষ খুঁজছিস, আমি কিন্তু নিজের চোখে আমার গুরুদেবকে একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে দেখেছি। বরানগরের স্কুলে একবার গুরুদেবের জন্মদিন পালনের ব্যবস্থা হয়েছে। অনুষ্ঠান সন্ধেতে। কিন্তু, বিকেল থেকেই হাজার হাজার লোকের ভিড়। বরানগরেও ওঁর প্রচুর শিষ্য-শিষ্যা। আমরা স্থানীয় কিছু তরুণ শিষ্য ভলান্টিয়ার হয়ে অনুষ্ঠান যাতে সুন্দরভাবে হয় তার দেখাশোনা করছি। বিকেলবেলাতেই এক ভদ্রলোক দশ-বারো বছরের ছেলের হাত ধরে এসে হাজির হলেন। উনি আমাকেই জিজ্ঞেস করলেন, বাবা কখন আসবেন?

বললাম, সন্ধে নাগাদ।

ভদ্রলোক বললেন, তিনি এসেছেন বহুদূর থেকে। শুনেছেন বাবার অপার অলৌকিক ক্ষমতা। এও শুনেছেন, বাবার কাছে কেউ দীক্ষা নিতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে দীক্ষার জপ-মন্ত্র দিয়ে দেন। অনেক আশা করে তাঁর দুই বোবা-কালা ছেলেকে নিয়ে এসেছেন। বাবাকে বলবেন, এদের দুটিকে দীক্ষা দিতে। দেখতে চান, কেমন করে বোবা-কালারা জপ-মন্ত্র শোনে।

"ভদ্রলোক ও তাঁর ছেলে দুটিকে এক জায়গায় বসিয়ে রেখে ওদের আগমনের উদ্দেশ্য ভলান্টিয়ার, চেনা, মুখ-চেনা, অনেকের কাছেই বলেছিল গোরা। খবরটা দাবানলের মতোই ছড়িয়ে পড়েছিল। সব ভক্ত প্রচণ্ড ঔৎসুক্য ও উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে শুরু করলেন—কী হয়? কী হয়? সত্যিই কি বাবার দেওয়া জপ-মন্ত্র

ওরা শুনতে পাবে?

সন্ধের আগেই হাজার-হাজার শিষ্য-শিষ্যা ও ভক্তেরা বারবার ভদ্রলোক ও তাঁর দুই ছেলেকে কৌতূহলের চোখে দেখে গেল।

শেষ পর্যন্ত সেই শুভ মুহূর্তটি এল। গুরুদেবের চরণে প্রণাম জানিয়ে ভদ্রলোক তাঁর দুই ছেলেকে দীক্ষা দিতে অনুরোধ করলেন। গুরুদেব ছেলেদুটিকে একে একে কাছে টেনে নিয়ে জপ-মন্ত্র দিয়ে বললেন, শুনতে পেয়েছিস তো?

হাজার হাজার ভক্ত উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন এরপর কী হয় দেখার জন্য। ছেলে দুটি পরিষ্কার গলায় বলে উঠল, শুনতে পেয়েছি।

ঘটনার আকস্মিকতায় ভক্তেরা হৃদয়াবেগ সংযত করতে পারলেন না। অনেকেরই দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো জলের ধারা। স্কুলের হল-ঘর গুরুদেবের জয়ধ্বনিতে ভরে গেল। ভদ্রলোক লুটিয়ে পড়লেন গুরুদেবের পায়ে।"

গোরার কাছে এই ঘটনা শোনার পর একদিন ওর সঙ্গে গেলাম গুরুদেব-বালক ব্রহ্মচারীর দর্শনে। কলকাতার এক অভিজাত এলাকায় তখন তিনি থাকতেন। একতলার একটা হলের মতো বিরাট ঘরে প্রচুর ভক্ত অপেক্ষা করছিলেন। আমি আর গোরাও ওই ঘরেই বসলাম। শুনলাম, গুরুদেব দোতলায় দর্শন দেন। সময় হলে আমাদের সকলকেই ডাকা হবে। ওখানে অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকের সঙ্গে আলাপ করে ফেললাম। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ভারত-বিখ্যাত শিক্ষাবেত্তা। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি ওঁর কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নিজে দেখেছেন?"

উত্তরে উনি যা বললেন, তা খুবই বিস্ময়কর। উনি একবার গুরুদেবের কাছে খিদে পেয়েছে বলাতে গুরুদেব বললেন, "দাঁড়া, তোর খাবার আনার ব্যবস্থা করছি।" গুরুদেব ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলেন, একটা আলো হয়ে গেলেন। তারপর আলোর ভেতর থেকে ভেসে এলো সোনার থালায় সাজানো নানা রকমের মিষ্টি। কী তার স্বাদ! কী তার গন্ধ! অপূর্ব! জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এ ঘটনার সময় আপনার সঙ্গে আর কেউ উপস্থিত ছিলেন?"

"না, শুধু আমিই ছিলাম।"

একসময়ে আমাদের ডাক পড়ল। সকলের সঙ্গে ওপরে গেলাম। তলার ঘরটার মতোই একটা বড় ঘরে সিল্কের গেরুয়া পরে একটা বাঘছালের উপর বসে আছেন গুরুদেব। চারিদিকে পেলমেট থেকে দীর্ঘ ভারী পরদা ঝুলছে। ঘরে মৃদু আলো। দেখলাম ভক্তেরা এক এক করে তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করে নিচে চলে যাচ্ছেন। কেউ দিচ্ছেন ফুলের শ্রদ্ধাঞ্জলি। কেউ এগিয়ে দিচ্ছেন মিষ্টির প্যাকেট। কেউ কেউ শিশি বা বোতলে জল নিয়ে এসেছেন। ওই জলে গুরুদেবের পায়ের বুড়ো আঙুল ডুবিয়ে পবিত্র পাদোদক করে নিচ্ছেন।

ব্রহ্মচারীবাবার এক সেবক যিনি সমস্ত ব্যাপারটা তদারক করছিলেন। তিনি একসময় আমাকে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতে বললেন। আমি এগিয়ে গিয়ে প্রণাম না জানিয়ে ব্রহ্মচারীবাবাকে বললাম, "শ্রদ্ধার থেকেই প্রণাম আসে। আমার একটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেলে আপনার অলৌকিক ক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গেই প্রণাম করব।" ব্রহ্মচারীবাবা ইশারায় ঘরের কোনায় দাঁড়াতে বললেন। দাঁড়ালাম। শিষ্যদের প্রণাম শেষ হতে ব্রহ্মচারী আমার দিকে তাকালেন। আমার পাশে ছিল গোরা ও সেবক ভদ্রলোক। বালক ব্রহ্মচারী আমাকে কাছে ডেকে বললেন, "তোর প্রশ্নটা কী?" মুখে একটা রহস্যের হাসি।

বললাম, "আমি গতকাল সন্ধে সাতটার সময় কোথায় ছিলাম?"

ব্রহ্মচারী এবার গোরাকে বললেন, "ও বুঝি তোর বন্ধু? তা, তুই নিচে গিয়ে বোস। আমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলব।"

গোরা বেরিয়ে যেতেই সেবকটিকে বললেন, "তুই দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যা। কেউ যেন আমার কাছে এখন না আসে।"

সেবকটি চলে যেতে ব্রহ্মচারীবাবা আমার সঙ্গে নানা রকম গল্পসল্প করলেন। আমার বাড়ির খবরাখবর নিলেন। এরই মধ্যে এক সময় সেবকটি দরজা খুলে জানাল, "দুই ভদ্রলোক এক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে এসেছেন। মহিলাটির গল-ব্লাডারে স্টোন হয়েছে। আজই নার্সিংহোমে অপারেশন করার কথা। আপনার আশীর্বাদ নিতে এসেছেন।"

ব্রহ্মচারী বললেন, "অপেক্ষা করতে বল, দেরি হবে।"

আমরা আবার আমাদের গল্পে ফিরে গেলাম। সময় কাটতে লাগল, এক সময় আবার সেবকটি ঘরে ঢুকে বলল, "গুরুদেব পেশেন্ট যন্ত্রণায় ছটফট করছে। যদি অনুমতি করেন তো—"

বিরক্ত গুরুদেব বললেন, "যা নিয়ে আয়।"

একটু পরেই দুই ভদ্রলোকের সাহায্যে সেবকটি এক মহিলাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। মহিলাটির মুখের চেহারায় তীব্র যন্ত্রণার চাপ। মহিলাটিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণামের ভঙ্গিতে গুরুদেবের পায়ের কাছে শুইয়ে দেওয়া হলো। গুরুদেব সঙ্গে লোকদুটিকে বললেন, "তোরা নীচে গিয়ে বোস।" সেবকটিকে বললেন, "যা কুশিতে করে একটু জল নিয়ে আয়।"

সেবক কুশিতে জল নিয়ে এলেন। তারপর তিনিও গুরুদেবের আদেশে বেরিয়ে গেলেন।

ব্রহ্মচারী কুশিটি মহিলাটির পিঠের উপর বসিয়ে তিরিশ সেকেন্ডের মতো বিড়বিড় করে কী যেন মন্ত্র পড়লেন ও কুশির জলে বারকয়েক ফুল ছিঁড়ে পাপড়ি ছুঁড়লেন। তারপর আমাকে বললেন, "দেখ তো, জলটা গরম হয়েছে কি না?"

কুশির জলে হাত দিলাম, গরম। বললাম, "গরম হয়েছে।"

ব্রহ্মচারীবাবা বললেন, "এবার কুশিটা পিঠ থেকে নামিয়ে ওকে তুলে দাঁড় করা।" করলাম। গুরুদেব আদেশ দিলেন, "এবার ওকে জোর করে দৌড় করা।"

.বালক ব্রহ্মচারী

তাই করলাম, মহিলাটি, "পারব না, পারব না," করে ভেঙে পড়তে পড়তেও আমার জন্য দৌড়তে বাধ্য হলেন। এবং তারপর দৌড়ে গুরুদেবের পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে বললেন, "বাবা, আমি ভাল হয়ে গেছি।"

গুরুদেব হাসলেন। বললেন, "যা নার্সিংহোমে যেতে হবে না, বাড়ি ফিরে যা।"

মহিলাটি নিজেই হেঁটে চলে গেলেন। ব্রহ্মচারী এবার আমাকে বললেন, "তুই মাঝে মাঝে এখানে এলে এমনি আরও অনেক কিছুই দেখতে পাবি। এবার আমাতে বিশ্বাস জন্মেছে তো তোর?"

বললাম, "আমি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি। তা পেলেই আমার বিশ্বাস জন্মাবে।"

জাদুকররা যেমন দর্শকদের মধ্যে নিজেদের লোক রেখে সাজানো ঘটনা দেখিয়ে দর্শকদের অবাক করে দেন, অনেক গুরুদেবই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলে এই ধরনের নানা রকমের সাজানো ঘটনার অবতারণা করেন।

গুরুদেব যা দেখালেন সেটা সাজানো ব্যাপার হতে পারে।

কুশির জল মন্ত্র পড়ে গরম করার ঘটনাটির পিছনেও ধাপ্পাবাজি থাকা সম্ভব। ব্রহ্মচারীবাবা বললেন, "দেখ তো কুশির জলটা গরম হয়েছে কিনা?" আমি দেখেছিলাম গরম। এমনও তো হতে পারে, গরম জল এনেই রোগিণীর পিঠে রাখা হয়েছিল।

ব্রহ্মচারীবাবা আমাকে বললেন, "যা, দরজাটা ভেজিয়ে দে। তোর সঙ্গে আর কিছু কথা আছে।"

আদেশ পালন করলাম। ব্রহ্মচারীবাবা নিজেই উঠে গিয়ে দেওয়াল-আলমারি খুলে একটা রাইটিং প্যাড ও পেনসিল নিয়ে এলেন। প্যাড আর পেনসিলটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "আমাকে না দেখিয়ে এতে লেখ, কাল সন্ধের সময় কোথায় ছিলি।"

লিখলাম, মধ্যমগ্রামে; বিপুলদের বাড়িতে।

ব্রহ্মচারীবাবা বললেন, "প্যাডের কাগজটা ছিঁড়ে তোর হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রাখ।"

ধরে রাখলাম, তবে শক্ত করে নয়, আলতো করে। ব্রহ্মচারীবাবা আমার হাত থেকে প্যাডটা নিলেন। তারপর তাঁর মুখোমুখি আমাকে বসালেন। আমাকে চোখ বুজে এক মনে সমুদ্রে সূর্যোদয়ের দৃশ্য ভাবতে বললেন। আমি ভাবতে লাগলাম।

আমার কপালটা কিছুক্ষণ ছুঁয়ে থেকে গুরুদেব বললেন, "দেখতে পাচ্ছি তুই গিয়েছিলি একটা গ্রাম-গ্রাম জায়গায়। জায়গাটা মধ্যমগ্রাম। বাড়িটাও দেখতে পাচ্ছি। ঠাণ্ডা, শান্ত, বড় সুন্দর পরিবেশ।"

বললাম, "সত্যিই সুন্দর। মুলিবাঁশের দেওয়াল, মাটির মেঝে, টালির চাল, অদ্ভুত এক ঠাণ্ডা আর শান্ত পরিবেশ।"

গুরুদেব বললেন, "হ্যাঁ, তাই দেখতে পাচ্ছি। একটা লাউ না কুমড়ো গাছ যেন ওদের বাঁশের দেওয়াল বেয়ে উঠেছে।"

আরও অনেক কিছুই বলে গেলেন উনি। কিন্তু ততক্ষণে গোরার গুরুর দৌড় আমার জানা হয়ে গেছে। কারণ, গতকাল সন্ধে ছ'টা থেকে আটটা পর্যন্ত ছিলাম কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে। জাদুকররা অনেক সময় কার্বন পেস্টেড কাগজের প্যাডে দর্শকদের দিয়ে কোন কিছু লিখিয়ে তলার কাগজে কার্বনের ছাপে কী উঠেছে দেখে বলে দেন কী লেখা হয়েছিল। অনেক সময় সাধারণ প্যাডে হার্ড পেন্সিল দিয়ে কিছু লিখিয়ে তলার পাতাটায় পেন্সিলের সীসের গুঁড়ো ঘষেও বলে দেওয়া হয়, কী লেখা হয়েছিল। আমি কফি হাউসে থেকেও ইচ্ছে করে লিখেছিলাম মধ্যমগ্রামে; বিপুলদের বাড়িতে। অলৌকিক ক্ষমতার বদলে কৌশলের আশ্রয় নিতে গেলে গুরুদেব ভুল করতে বাধ্য। আর ভুল করতে বাধ্য হলেনও। আমি সামান্য একটু চালাকির আশ্রয় নিয়ে বিপুলদের বাড়ির যে ধরনের বর্ণনা দিলাম গুরুদেবও সেই বর্ণনাতেই সায় দিয়ে গেলেন। অথচ বিপুলদের বাড়ি দস্তুরমতো পেল্লাই পাকা বাড়ি।

বিখ্যাত মহারাজের শূন্যে ভাসা

আমি তখন দমদম পার্ক-এ থাকি। ভারতবিখ্যাত এক সাধক মহারাজের শিষ্য ছিলেন আমার এক প্রতিবেশী। তাঁর কাছে অনেকদিনই তাঁর গুরুদেবের অনেক অলৌকিক কাহিনি শুনেছি। দেশে-বিদেশে সাধক-মহারাজের প্রচুর নাম, প্রচুর

ভক্ত। তাই, বিভিন্ন ভক্তদের সন্তুষ্ট করতে কোন জায়গাতেই একনাগাড়ে বেশিদিন থাকতে পারেন না। আমার প্রতিবেশী ভদ্রলোককে ধরলাম, এইবার মহারাজ কলকাতায় এলে তাঁকে দর্শনের ব্যবস্থা করে দেবেন। সেইসঙ্গে দয়া করে এমন ব্যবস্থা করে দেবেন যাতে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়।

প্রতিবেশী জানতেন, আমি সাধু-সন্তদের কাছে যাই। তাই, ভক্তজন অনুমান করে আমাকে ভরসা দিলেন মহারাজ কলকাতায় এলেই একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।

একদিন বহু প্রতীক্ষিত সেই সুযোগ পেলাম। প্রতিবেশী ভদ্রলোকের সঙ্গে গেলাম সেই বিখ্যাত মহারাজ দর্শনে। গুরুদেব তাঁর কিছু নিকটতম শিষ্যদের নিয়ে উঠেছিলেন দক্ষিণ কলকাতারই এক প্রাসাদে। একদিন প্রতিবেশী বললেন, আজ আমাকে গুরুদেবের অলৌকিক ধ্যান দর্শন করাবেন। এই দৃশ্য সব শিষ্যরাও দেখার সুযোগ পান না। সেইদিক থেকে আমি মহাভাগ্যবান। ধ্যানের সময় মহারাজের শরীর মেঝে থেকে হাতখানেক উঁচুতে শূন্যে ভেসে থাকে।

নির্দিষ্ট সময়ে ধ্যান-কক্ষের বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। কক্ষের দরজা তখনও বন্ধ। ভিতর থেকে ধূপের সুন্দর গন্ধ ভেসে আসছে।

একসময় প্রতীক্ষার অবসান হলো; একজন শিষ্য কক্ষের ভারী দরজাটা একটু একটু করে খুলে দিলেন। আমাদের বারান্দার আলো নিভে গেল। ভিতরটা জ্যোৎস্নার মতো নরম আলোয় ভেসে যাচ্ছে। শান্তদর্শন গুরুদেব নিমীলিত চোখে পদ্মাসনে স্থির। তিনি বসে আছেন শূন্যে, মাটি থেকে প্রায় দেড় ফুট উঁচুতে। তাঁর পিছনে গাঢ় রঙের ভারী ভেলভেটের পরদা।

বেরিয়ে এলাম চুপচাপ। অলৌকিক কিছুই দেখতে পেলাম না। ভারত বিখ্যাত মহারাজ যা দেখালেন, ম্যাজিকের পরিভাষায় তাকে বলে 'ব্ল্যাক আর্ট'। গুরুদেবের পিছনের এই গাঢ় রঙের পরদাটাই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল—

সাধক মহারাজের এই ধ্যানে শূন্যে ভেসে থাকার পিছনে কোন অলৌকিকত্ব নেই। এটা স্রেফ ব্ল্যাক-আর্টের খেলা। এই ব্ল্যাক-আর্ট-এর সাহায্যে জাদুকরেরা কোনও রমণীকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখেন, হাতিকে করেন অদৃশ্য, আবার শূন্য থেকে আমদানী করেন জিপগাড়ি।

ব্ল্যাক আর্টের আবিষ্কারক ম্যাক্স আউজিঙ্গার (Max Auzinger)। জার্মানির নাগরিক এই ভদ্রলোক পেশায় নাট্য পরিচালক। তাঁর ব্ল্যাক-আর্ট পদ্ধতি আবিষ্কারের কাহিনি দারুণ মজার।

তাঁর পরিচালিত একটা নাটকের প্রথম অভিনয় রজনী। বিশেষ এক উত্তেজক

দৃশ্য তখন অভিনীত হচ্ছে। পিতা অবাধ্য কন্যাকে একটা প্রায় অন্ধকার ঘরে বন্দি করে রেখেছেন। অন্ধকার ঘরটার ভয়াবহতা ফুটিয়ে তুলতে পরিচালক ম্যাক্স মঞ্চের

চ্যাং লিং সু ছদ্মনামের আড়ালে উইলিয়াম এলস্‌ওয়ার্থ রবিনসন

তিন দিকের দেওয়াল কালো মখমলের পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। মেয়েটিকে উদ্ধার করতে ওপরের গবাক্ষ দিয়ে নেমে এলো এক টেলিফোন-কালো নিগ্রো ক্রীতদাস। নায়িকার এমন নাটকীয় মুক্তিক্ষণে দর্শকদের উত্তেজনায় ও হাততালিতে ফেটে পড়ার কথা। কিন্তু কই? দর্শকদের মধ্যে ঘটনায় কোনও প্রতিফলন তো নেই? ব্যাপারটা বুঝতে ম্যাক্স দ্রুত মঞ্চ থেকে নেমে এলেন দর্শকদের কাছে। এবার মঞ্চের দিকে তাকাতেই কারণটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। স্বল্পালোকিত মঞ্চে কালো নিগ্রো ক্রীতদাস কালো মখমলের পরদার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, ওকে দেখাই যাচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক্স-এর মাথায় এলো ব্ল্যাক-আর্টের মূল তত্ত্ব। গাঢ় রঙের পর্দা টাঙিয়ে সেই ধরনের গাঢ় রঙের যে কোন কিছু সামনে রাখলে তা দেখা যায় না। এই একই নিয়মে গাঢ় রঙের পর্দার সামনে গাঢ় রঙের একটা দেড়ফুট উঁচু আসনে বসে থাকা গুরুদেবকেও ভক্তরা শূন্যে ভাসমান দেখেন।

প্রায় একই সঙ্গে ব্ল্যাক-আর্টের খেলা দর্শকদের সামনে হাজির করেন মার্কিন জাদুকর উইলিয়াম এলস্‌ওয়ার্থ রবিনসন (William ellsworth Robinson), যিনি চিনা ছদ্মবেশে চ্যাং লিং সু নামেই জাদুর জগতে পরিচিত এবং বরেণ্য হয়েছিলেন।

ব্ল্যাক আর্ট ছাড়া সাধিকার শূন্যে ভাসা

শারদীয় পরিবর্তন ১৩৯১-তে (১৯৮৫ সাল) একটি প্রবন্ধে ব্ল্যাক-আর্টের সাহায্যে শূন্যে ভেসে থাকা সেই মহারাজের কাহিনিটি লিখেছিলাম। কলকাতারই জনৈকা ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু উষ্মার সঙ্গে পরিবর্তনে একটি চিঠি দেন। চিঠিতে

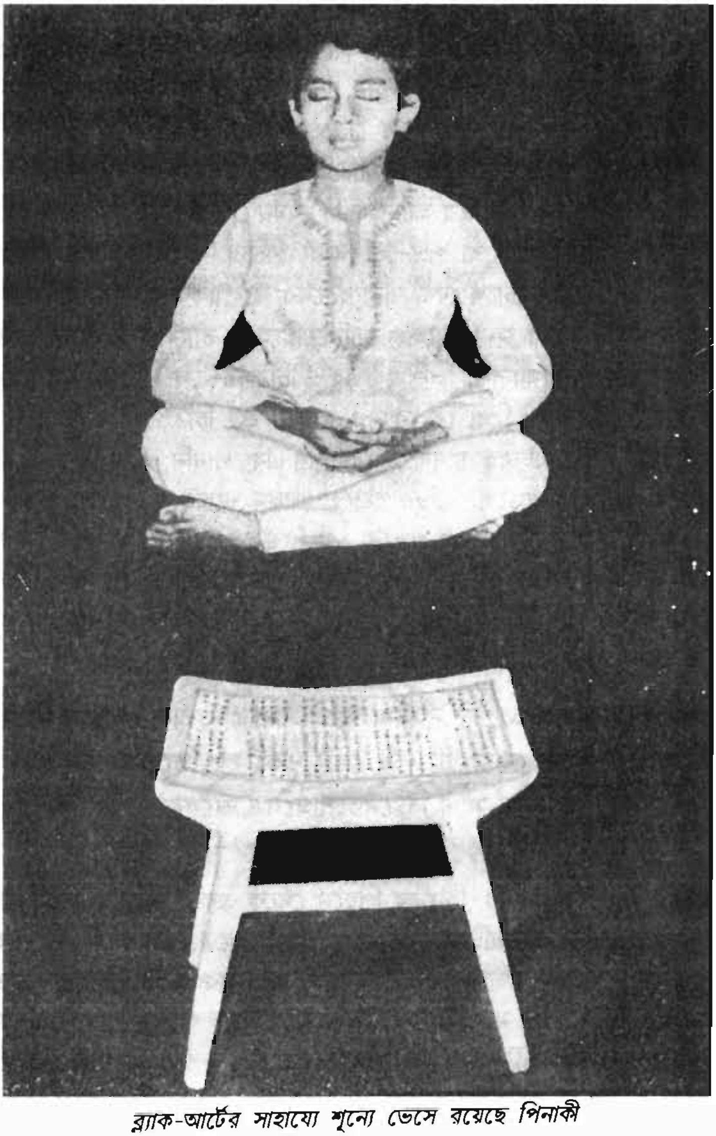

ব্ল্যাক-আর্টের সাহায্যে শূন্যে ভেসে রয়েছে পিনাকী

তিনি উল্লেখ করেন যে, ভারত-বিখ্যাত এক সাধিকাকে তিনি নিজের চোখে ব্ল্যাক-আর্টের সাহায্য ছাড়াই শূন্যে ভেসে থাকতে দেখেছেন। সাধিকা ধ্যানে যখন শূন্যে ভেসে ছিলেন, তখন তাঁর পেছনে ছিলো-নেহাতই সাদামাটা চুনকাম করা দেওয়াল। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন করেছিলেন—এইক্ষেত্রে অলৌকিক তত্ত্বের বিরোধী প্রবীর ঘোষ কী উত্তর দেবেন?

উত্তর আমি দিয়েছিলাম। এবং নিয়মমাফিক পত্র-লেখিকার চিঠি সমেত আমার উত্তর পরিবর্তন পত্রিকার অফিসে জমা দিয়েছিলাম। পত্র-লেখিকার চিঠি এবং আমার উত্তর, কোনওটাই প্রকাশিত হয়নি, তাই শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠিকানা ও তাঁর লেখা চিঠিটি পুরোপুরি তুলে দিতে পারলাম না।

প্রসঙ্গত জানাই, পরিবর্তনের ওই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। অভিনন্দন জানিয়ে অনেক চিঠি যেমন পেয়েছি, তেমনি অনেক চিঠি পেয়েছি যাতে পত্র-লেখক বা পত্র-লেখিকারা বিভিন্ন বইতে বা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অথবা নিজের চোখে দেখা নানা ধরনের অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করে আমাকে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। চ্যালেঞ্জ জানানো প্রতিটি অলৌকিক ঘটনারই ব্যাখ্যা করে লিখিত উত্তর ও চিঠিপত্রগুলো পরিবর্তনের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দিয়েছিলাম। কিন্তু যে কোনও কারণে ওই চিঠিগুলো ও তার উত্তর প্রকাশিত হয়নি। যাঁরা ঘটনার ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন এবং পাননি, তাঁরা নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছিলেন আমি ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করতে অক্ষম বলেই চিঠিগুলো প্রকাশিত হয়নি। ১৯৮৬-র জানুয়ারিতে এই গ্রন্থটির ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে শূন্যে ভেসে থাকার বিভিন্ন কৌশল হাজির করেছিলাম। প্রতিটি প্রশ্নের ব্যাখ্যা ছিল।

আমরা আবার ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় ফিরে যাই। তিনি দেখেছিলেন এক শূন্যে ভাসমান সাধিকার পেছনে ছিল সাদামাটা চুনকাম করা দেওয়াল।

যে পদ্ধতিতে ব্ল্যাক-আর্টের সাহায্য ছাড়া সাদা দেওয়াল পেছনে নিয়ে সাধিকা শূন্যে ভেসে ছিলেন, সেই একই পদ্ধতিতে অনেক জাদুকর সাদা স্ক্রিনের সামনেও অনেক কিছু ভাসিয়ে রাখেন।

পদ্ধতিটা আর কিছুই নয়, স্ক্রিনের পিছনে থেকে একটা ডাণ্ডা বেরিয়ে এসে শূন্যে ভাসাতে চাওয়া জিনিসটিকে স্টেজের প্ল্যাটফর্ম থেকে তুলে রাখে। ওই একই পদ্ধতিতে সাদা দেওয়াল থেকে বেরিয়ে আসা শক্ত ও সরু একটা লোহার পাতের মাথায় ছোট্ট একটা বসার মতো জায়গা তৈরি করে নিয়ে অনেক সাধক-সাধিকাই ধ্যানে শূন্যে ভাসার 'অলৌকিক লীলা' দেখান। ধ্যানে বসা শরীরের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় লোহার পাত। ফলে দর্শকরা মনে করেন সাধক-সাধিকা শূন্যে ভেসে রয়েছেন। ছোটদের জনপ্রিয় পত্রিকা আনন্দমেলার ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৪ সংখ্যায়

'নিরালম্ববাবা ও আনন্দবাবু' নামে এই ধরনের ব্ল্যাক-আর্ট ছাড়া শূন্যে ভেসে থাকার ঘটনাকে নির্ভর করে একটি গল্প লিখি।

সাদা দেওয়ালে ভেসে থাকার ব্যাপারটা ছবি এঁকে বোঝাবার চেষ্টা করছি।

লাঠিতে হাতকে বিশ্রাম দিয়ে শূন্যে ভাসা

চন্দননগর বা এর ধারে-কাছের কোন জায়গা থেকে কৌশিক মুখোপাধ্যায় নামে একজন পরিবর্তনের লেখাটির পরিপ্রেক্ষিতে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ছে, তিনি লিখেছিলেন, বেশ কিছু বছর আগে (সালটা আমার ঠিক মনে নেই) বারাণসীতে এক সন্ন্যাসীকে সামান্য একটা লাঠির ওপর হাতকে বিশ্রাম দিয়ে তাঁর শরীরকে শূন্যে তুলে রাখতে দেখেছিলেন। কৌশিকবাবু কিছুটা ঝাঁজ মিশিয়ে লিখেছিলেন, প্রবীরবাবুর আন্তরিক সত্যনিষ্ঠা থাকলে যেন কিছুটা কষ্ট করে ওই স্থানে গিয়ে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করেন, তা হলেই আমার কথার সত্যতা যাচাই করতে পারবেন।

কৌশিকবাবু সত্যিই যে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখেছেন সেই বিষয়ে আমার

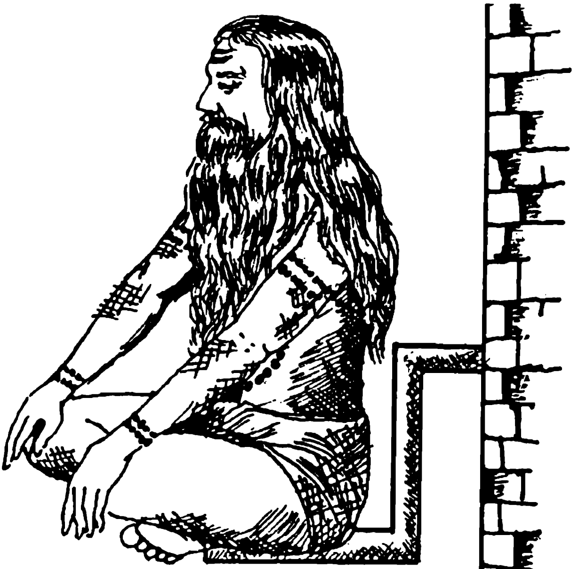

কোনও সন্দেহ নেই। তাই অনুসন্ধানেরও প্রয়োজন নেই।

কাঠের লাঠিতে হাতকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য এলিয়ে রেখে সাধুবাবার শূন্যে ভেসে থাকা কৌশিকবাবু ঠিকই দেখেছেন। কিন্তু ঘটনাটার পেছনে যে লৌকিক

বা বিজ্ঞানসম্মত কারণ রয়েছে, সেই কারণটি জানা না থাকায় তিনি অলৌকিক বলেই ঘটনাটাকে মেনে নিয়েছেন।

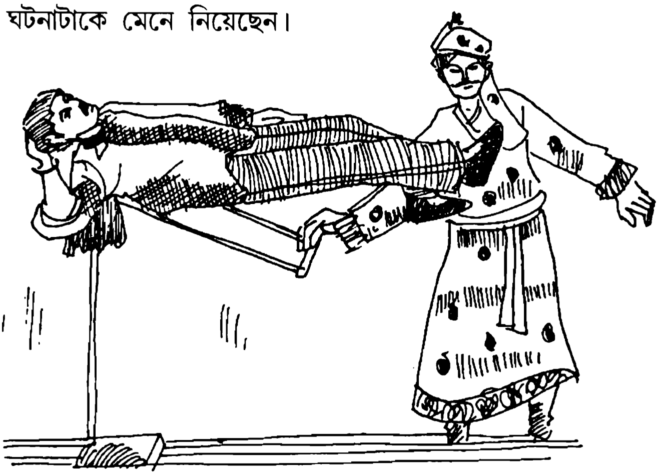

বগলে ডান্ডা গুঁজে শূন্যে ভাসার কৌশল

পাঠক-পাঠিকাদের প্রায় সকলেই বোধহয় ম্যাজিক দেখেছেন। আর অনেকেই দেখেছেন সেই জাদুর খেলা, যেখানে জাদুকর একটি মেয়েকে সম্মোহিত করে (আসল ব্যাপারটা অবশ্য পুরোপুরি অভিনয়) তিনটে সরু লোহার বর্শার ওপর শুইয়ে দেন; তারপর বর্শা দুটো সরিয়ে নেওয়ার পর মেয়েটি একটি মাত্র বর্শার

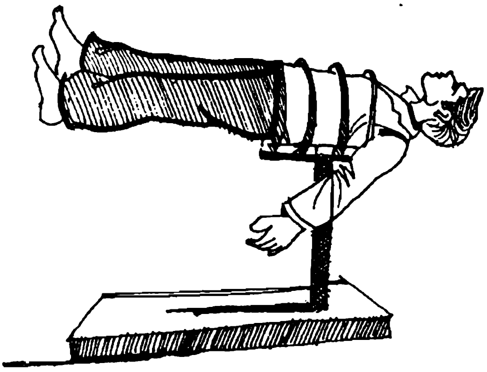

লাঠিতে ভর দিয়ে শূন্যের ভাসার কৌশল

ওপর ঘাড় পেতে বাকি দেহ শূন্যে ভাসিয়ে শুয়ে থাকে। অথবা দেখেছেন, জুনিয়র পি. সি. সরকারের ম্যাজিক, যাতে তিনি একটি খোঁড়া মেয়ের বগলে একটা কাঠের ডাণ্ডা গুঁজে দিয়ে তাকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখেন।

সাধুবাবাজিরাও সেই একই নিয়মে একটি কাঠের দণ্ডের সাহায্য নিয়ে নিজের শরীরকে শূন্যে তুলে রাখেন।

জাদুকর যে মেয়েটিকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখতে চান, তার পোশাকের তলায় থাকে একটা ৫ থেকে ৭ ইঞ্চি চওড়া ফুট দেড়েকের মতো লম্বা শক্ত ধাতুর পাত। পাতটি প্রয়োজন অনুসারে 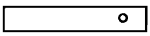 লম্বা বা 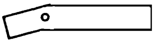 এই ধরনের একটু বাঁকানো হতে পারে। চামড়ার বা ক্যানভাসের তিন-চারটে বেল্ট দিয়ে ধাতুর পাতটি শরীরের সঙ্গে বাঁধা থাকে। পাতটিতে প্রয়োজনমতো এক বা একাধিক ফুটো থাকে। যে ডাণ্ডার ওপর নির্ভর করে মেয়েটি শূন্যে ঝুলে থাকে, সেই ডাণ্ডার মাথাটা হয় একটু বিশেষ মাপের। দেখতে হবে ডাণ্ডার মাথাটা যেন মেয়েটির পোশাক সমেত ওই ধাতুর পাতের ফুটোয় শক্ত ও আঁটোসাঁটোভাবে ঢোকে। মেয়েটির যা করণীয়, তা হলো সম্মোহিত হওয়ার অভিনয় ও সরু পাতের ওপর ব্যালান্স রেখে শোয়া।

ডাণ্ডার ওপর হাত রেখে সাধুরা যেসব পদ্ধতিতে নিজেদের দেহকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখেন, তার কয়েকটা ছবি এখানে দিলাম। শূন্যে ভেসে থাকা বিষয়ে আগেই বিস্তৃত আলোচনা করে নেওয়ায় ছবিগুলো দেখলে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন সাধুদের ভেসে থাকার কৌশলগুলো।

আলেকজান্ডার হাইমবুর্গার (Alexander Heimburghar) নামে এক বিখ্যাত জাদুকর আমেরিকায় ১৮৪৫-৪৬ সাল নাগাদ একটা অদ্ভুত খেলা দেখিয়ে আলোড়নের ঝড় তুলেছিলেন। খেলাটা ছিল জাদুকরের এক সঙ্গী, একটা খাড়া ডাণ্ডার মাথায় শুধুমাত্র একটা হাতের কনুই ঠেকিয়ে শূন্যে ভেসে থাকত।

আলেকজান্ডারের লেখা থেকেই জানা যায়, তিনি এই খেলা দেখানো শুরু করেন ভারত থেকে প্রকাশিত একটি বার্ষিকী পত্রিকায় এক ফকিরের অলৌকিক খেলার বর্ণনা পড়বার পর। ফকিরটি একটি বাঁশের লাঠি মাটিতে খাড়া রেখে লাঠির ওপর হাত ঠেকিয়ে তার এক সঙ্গীকে হাওয়ায় ভাসিয়ে রাখত।

অসাধারণ জাদুকর হ্যারি হুডিনি এক জাদু আলোচনায় বলেন, তিনি এই লাঠিতে ভর দিয়ে শূন্যে ভেসে থাকার খেলাটির কথা প্রথম জানতে পারেন টমাস ফ্রস্ট (Thomas Frost) নামের এক ইংরেজ লেখকের লেখা বই পড়ে। লেখক ১৮৩২ সালে মাদ্রাজের এক ব্রাহ্মণকে শূন্যে বসে থাকতে দেখেন। ঘটনাটা ঘটেছিল এইভাবে, একটা তক্তাজাতীয় কাঠের টুকরোতে চারটে পায়া লাগানো ছিল। তক্তায় ছিল একটা ফুটো। ফুটোটা ছিল এই মাপের, যাতে একটা লাঠি ঢোকালে লাঠিটা শক্ত হয়ে তক্তার সঙ্গে আটকে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে। খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা লাঠির সঙ্গে লাগানো থাকত আর একটা ছোট ডাণ্ডা। এটা থাকত মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে। ছোট ডাণ্ডাটায় বাহু রেখে শূন্যে ভেসে থাকতেন ব্রাহ্মণ।

১৮৪৮ সাল নাগাদ আধুনিক জাদুর জনক রবেয়ার উদ্যাঁও তাঁর দু'বছরের ছেলে ইউজেনকে এই পদ্ধতিতে শূন্যে ভাসিয়ে

রেখে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে প্রচণ্ড বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন। একটা খাড়া লাঠিতে কনুইটুকুর ভর দিয়ে শূন্যে ভেসে থাকত ইউজেন।

প্রায় একই সময়ে লন্ডনে এইভাবে শূন্যে ভাসিয়ে রাখার খেলাটি দেখিয়েছিলেন আর দু'জন জাদুকর। এঁরা হলেন কমপার্স হারম্যান ও হেনরি অন্ডারসন।

শূন্যে ভাসিয়ে রাখার খেলাকে আর এক ধাপ উন্নত করলেন জাদুকর জন নেভিল ম্যাসকেলিন (John Nevil Maskelyne)। ১৮৬৭ সালে তিনি লন্ডনের এক জাদু-প্রদর্শনীতে তাঁর স্ত্রীকে সম্মোহিত করে (অভিনয়) একটা টেবিলের ওপর শুইয়ে দেন। তারপর, দর্শকরা সবিস্ময়ে দেখলেন, শ্রীমতী ম্যাসকেলিনের দেহটা ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে গেল। এই খেলাকে জাদুর ভাষায় বলা হয় 'আগা' (A. G. A.)। A. G. A.'র পুরো কথাটা হল Anti Gravity Animation।

এই খেলাটিকেই আরও নাটকীয় আরও সুন্দর করে দেখালেন হ্যারি কেলার (Harry Keller)। স্থান আমেরিকা। খেলাটির নাম দিলেন 'Levitation of Princess Kamac'।

শূন্যে ভেসে থাকার খেলাকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন বেলজিয়ামের প্রখ্যাত জাদুকর সার্ভেস লে-রয় (Servais Le Roy)। আমি যতদূর জানি, এটাই

সাধুসন্তদের শূন্যে ভাসা

শূন্যে ভাসিয়ে রাখার সর্বশেষ উন্নততম পদ্ধতি। লে-রয় তাঁর দলের একটি মেয়েকে সম্মোহন করে (পুরোটাই অভিনয়) একটি উঁচু বেদিতে শুইয়ে দিতেন।

মেয়েটিকে ঢেকে দেওয়া হতো একটি রেশমি কাপড় দিয়ে। এক সময় মেয়েটির কাপড়ে ঢাকা শরীরটা ধীরে ধীরে শূন্যে উঠতে থাকত। তারপর, হঠাৎ দেখা যেত জাদুকরের হাতের টানে চাদরটা জাদুকরের হাতে চলে এসেছে। কিন্তু মেয়েটি কোথায়? বেমালুম অদৃশ্য। বর্তমানে অনেক জাদুকর-ই এই খেলাটি খুব আকর্ষণীয়ভাবে দেখিয়ে থাকেন।

লে-রয়ের এই খেলা যদি অসৎ কোন ব্যক্তি লোক-ঠকানোর জন্য দেখায়, তবে অনেকেই তাঁকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করতে পারেন।

লে রয় আসলে যা করতেন : জাদুকর তাঁর সহকারী মেয়েটিকে সম্মোহন করার অভিনয় করতো। মেয়েটিও সম্মোহিত হওয়ার অভিনয় করতো। সম্মোহিত মেয়েটিকে সহকারীদের সাহায্যে একটা টেবিল বা বেঞ্চের ওপর শুইয়ে দেওয়া হয়। দু'জন সহকারী রেশমের কাপড় দিয়ে যখন মেয়েটির শরীর ঢেকে দেয়, তখন সামান্য সময়ের জন্য কাপড়টা এমনভাবে মেলে ধরে যাতে শুয়ে থাকা মেয়েটির দেহ কিছুক্ষণের জন্য দর্শকদের দৃষ্টির আড়ালে থাকে। এই অবসরে মেয়েটি পিছনের পর্দার আড়ালে সরে যায়। পাতলা রবারে হাওয়া ঢোকান একটি নকল মেয়েকে টেবিল বা বেঞ্চের ওপর তুলে দেওয়া হয়। সহকারী দু'জন ওই বেলুনের তৈরি মেয়েটিকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। বেলুন-মেয়েটির গলায় ও পায়ে বাঁধা থাকে খুব সরু স্টীলের তার বা সিন্থেটিক সুতো। তারের বা সুতোর মাথা দুটি ঢেকে দেওয়া কাপড় ভেদ করে তার দুটি উপরে উঠে থাকে। ঢেকে দেওয়ার পর জাদুকর সরু তার ধরে বিভিন্ন কায়দায় মেয়েটিকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখেন। কখনও জাদুকরের ইশারায় মেয়েটি উঁচুতে উঠে যায়, কখনও নীচে নেমে আসে। মঞ্চে গাঢ় নীল বা বেগুনী আলো ফেলা হয়। ফলে, তিন-চার ফুট দূরের দর্শকদের পক্ষেও তারের অস্তিত্ব বোঝা সম্ভব হয় না।

এরপর আসা যাক দেহটা অদৃশ্য করা প্রসঙ্গ। অদৃশ্য করার সময় জাদুকর বেলুনে পিন ফুটিয়ে দেন। বেলুন যায় ফেটে। সঙ্গে-সঙ্গে বেলুন মেয়েও হয়ে যায় অদৃশ্য। আর বেলুন ফাটার আওয়াজ ঢাকতে জাদুকরের বাজনাদারেরাই যথেষ্ট।

বেদে-বেদেনীদের শূন্যে ভাসা

অনেকেই বোধহয় দেখেছেন রাস্তার পাশে, বাজার-হাটে, মাঠে-ময়দানে, খোলা জায়গায় একধরনের বেদে-সম্প্রদায়ের লোকেরা শূন্যে ভাসবার খেলা দেখায়। তবে ওরা দাবি করে—এটা ম্যাজিক নয়, অলৌকিক ঘটনা। সত্য সাঁই-এর ছোট একটা বাঁধানো ছবি, দু-একটা হাড়, মড়ার খুলি ও ছোট্ট একটা টিনের বাক্সে

কিছু তাবিজ সাজিয়ে সত্য সাঁই-এর অপার কৃপায় নানা ধরনের 'অলৌকিক' খেলা দেখায়।

এই বেদে-সম্প্রদায় অবশ্য সবসময়ই লোক ঠকানোর জন্য ওদের বিভিন্ন খেলাকেই অলৌকিক আখ্যা দিয়ে থাকে। যুক্তি দিয়ে খেলাগুলোর ব্যাখ্যা না পেলে দর্শকরা অনেক সময় ওদের কথায় বিশ্বাস করে ফেলেন এবং চটপট নগদ দামে অলৌকিক মাদুলিও কিনে ফেলেন। অনেকে না কিনলেও এইটুকু অন্তত বিশ্বাস করে ফেলেন, ওরা তন্ত্র-মন্ত্র ও তুক-তাকে সিদ্ধ মানুষ। অবশ্য এই বইটি লেখার পর লক্ষ কোটি মানুষ এখন কৌশলটি জেনেছেন।

আমাকে অনেকেই অনেক সময় প্রশ্ন করেছেন, ব্ল্যাক-আর্ট, ঘরের দেওয়ালের সাহায্য বা কোন ডাণ্ডার সাহায্য ছাড়াই অনেক বেদে-সম্প্রদায়ের লোকেরা খোলা জায়গায় মানুষকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখে। এটা কী করে সম্ভব?

আমি বলি, এটাও একটা লৌকিক খেলা। আরও অনেক অত্যাশ্চর্য 'অলৌকিক' ঘটনার মতোই এর পেছনেও রয়েছে অতি সাধারণ কৌশল। অথচ, আজ থেকে কুড়ি বছর আগেও খেলাটি দেখে সাধারণ দর্শক কেন, অনেক বিশেষজ্ঞ জাদুকরকেও আশ্চর্য হতে দেখেছি। ঠিক কী ভাবে খেলাটা দর্শকদের কাছে হাজির কি হয় তার একটু বর্ণনা দিলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

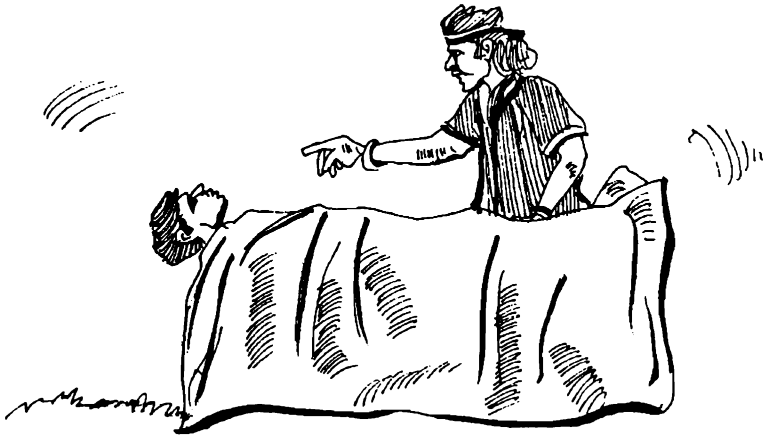

খোলামাঠে শূন্যে ভাসানো হচ্ছে

সত্য-সাঁই বা অন্য কোনও ঈশ্বরের কৃপায় অলৌকিক ক্ষমতাধর বেদে তার এক সহকারীকে মাটির ওপর শুইয়ে বিশাল এক চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে দেয়। চাদরে থাকে একটা ফুটো, যা দিয়ে মাথাটা শুধু বেরিয়ে থাকে। তারপর ডমরু

ও বাঁশি বাজিয়ে বেদেটি সহকারীটির চারপাশে ঘুরতে থাকে। একসময় মড়ার হাড় বা খুলি নিয়ে নানা মন্ত্রপাঠ করতে থাকে। বেদেটির আহ্বানে ওর আরও দু'জন সহকারী বা দু'জন দর্শক (এরাও বেদেটিরই লোক) এগিয়ে এসে শুয়ে থাকা দেহটির মাথা ও পায়ের দিকে চাদরটা ধরে একটু নেড়ে দেয়। কী আশ্চর্য! সহকারীর চাদরে ঢাকা দেহ একটু একটু করে শূন্যে উঠতে থাকে এবং একসময় দেহটা শূন্যে দেড়-ফুটের মতো উঁচুতে ভাসতে থাকে।

ছবিটিতে দেখিয়েছি বেদেটির সহকারীর শরীর শূন্যে ভেসে রয়েছে, এবং ওর শরীর ঢেকে দেওয়া চাদরটা মাটি পর্যন্ত লুটিয়ে রয়েছে।

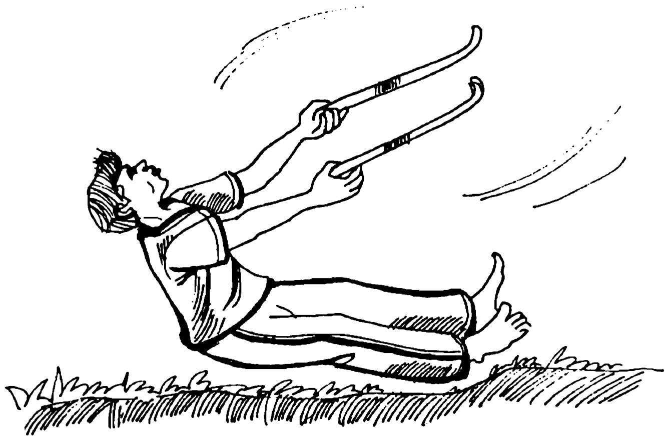

শূন্যে ভেসে থাকার নেপথ্যে

মাটি পর্যন্ত লুটিয়ে থাকা চাদরের তলায় রয়েছে ভেসে আসল রহস্য। চাদরের তলায় সহকারী হকিস্টিক ও ওই ধরনের কোন লাঠির সাহায্য নিয়ে যা করে তা পরের ছবিটি দেখলেই বুঝতে পারবেন।

এই ধরনের খেলা বসে এবং দাঁড়িয়ে দুভাবেই দেখানো সম্ভব। দাঁড়িয়ে দেখালে উচ্চতা বাড়বে।

এই প্রসঙ্গে একটি মজার অভিজ্ঞতার কথা না বলে পারছি না। একটি স্ব-ঘোষিত যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান-মনস্ক, সমাজ সচেতন মাসিক পত্রিকার (বর্তমানে উঠে গেছে) জনৈক সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আমাকে অনুরোধ করলেন, তাঁদের পত্রিকার জন্য 'শূন্যে ভাসার কৌশল' নিয়ে একটা লেখা তৈরি করে দিতে। সম্পাদককে লেখাটি দিলাম। আমার এই বইতে এতক্ষণ শূন্যে ভাসার যে-সব কৌশলগুলোর সঙ্গে আপনারা পরিচিত হলেন, সেগুলোই লিখেছিলাম ওই লেখাটিতে। লেখাটি খুব শিগগিরই ফেরত পেলাম ওই পত্রিকারই সম্পাদকমণ্ডলীর আর এক সদস্যের হাত থেকে। তিনি জানালেন, "লেখাটা মনোনীত হয়নি। কেন মনোনীত হয়নি, তা

ওপরের পাতাতেই লিখে দিয়েছি।"

কারও লেখাই সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমার লেখা অমনোনীত হওয়ার মধ্যে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না। কিন্তু আমার জন্য এক রাশ শঙ্কা ও বিস্ময় নিয়ে অপেক্ষা করছিল অমনোনীত লেখার প্রথম পৃষ্ঠাটি। তাতে লেখাটি প্রসঙ্গে সম্পাদকমণ্ডলীর তিনজনের স্বাক্ষরিত মন্তব্য রয়েছে।

একজন লিখেছেন, "কৌশলগুলো কতখানি নির্ভরযোগ্য সে সন্দেহ থাকে।"

দ্বিতীয় জনের মন্তব্য, "শূন্যে ভাসার technique গুলি convincing নয়। কাপড় ঢাকার কায়দাটাও ফাঁকিবাজিতে সারা হয়েছে।"

তৃতীয় সম্পাদকের সিদ্ধান্তে ঘোষিত হয়েছে, "চাদর ঢাকার ব্যাপারটা ভুল describe করেছেন। sorry।"

যুক্তিবাদী বলে স্ব-ঘোষিত মানুষগুলোর এমন যুক্তিহীন মনগড়া মন্তব্যে যতটা বিস্মিত হই, শঙ্কিত হই তার চেয়েও বেশি।

তিন সম্পাদক শূন্যে ভাসার কৌশলগুলো অসার, মিথ্যে বলে মন্তব্যে করার আগে তাঁরা দু'টি পথের যে কোনও একটিকে বেছে নিতে পারতেন।

এক : 'হাতে-কলমে' আমার বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে দেখতে পারতেন, এগুলো সত্যিই শূন্যে ভাসার কৌশল কি না?

দুই : বিশেষজ্ঞ হিসেবে কোনও প্রতিষ্ঠিত জাদুকরের কাছ থেকে মতামত নিতে পারতেন।

১১ ডিসেম্বর ১৯৮৮ সাংবাদিক সম্মেলনে শূন্যে ভাসা

দু'টির কোনও পথকেই গ্রহণ না করে এই ধরনের অন্ধ-বিশ্বাস মিশ্রিত সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো আর যাকেই শোভা পাক, কোনও যুক্তিবাদী বলে স্ব-বিজ্ঞাপিত মানুষদের শোভা পায় না।

১৯৮৬-র কলিকাতা পুস্তক মেলায় বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সমিতি, বহু সহযোগী সংস্থা, বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাব ও যুক্তিবাদী সংগঠন অন্তত কয়েক হাজার অলৌকিক বিরোধী প্রদর্শনীতে আমার বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে চাদরে ঢেকে শূন্যে ভাসার ঘটনাটি দেখিয়ে স্ব-ঘোষিত তিন যুক্তিবাদী সম্পাদকের মন্তব্যের অসারতা এবং যুক্তিহীনতাকে প্রমাণ করে দিয়েছে।

স্ব-ঘোষিত জ্যোতিষ সম্রাটদের মতো করে 'যুক্তিবাদী' 'বিজ্ঞানমনস্ক' ইত্যাদি কথাগুলো নিজের নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে প্রচারের মাধ্যমে কিছু মানুষকে ভুল বুঝিয়ে তাদের কাছে যুক্তিবাদী সাজা যেতে পারে, কিন্তু সত্যিকারের যুক্তিবাদী হওয়া যায় না। কারণ—

যুক্তিবাদী সাজা যায় না। শুধুমাত্র জীবনচর্যার মধ্য দিয়েই যুক্তিবাদী হতে হয়। যুক্তিবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হলে নিজেকে যুক্তিবাদী হতে হবে। এর কোনও ব্যতিক্রম সম্ভব নয়।

যুক্তিকে বাদ দেওয়া যুক্তিবাদী মানুষগুলো যখন যুক্তিবাদী আন্দোলনের নেতা সাজে, তখন শঙ্কিত হই। শঙ্কার কারণ, এঁদের যুক্তিহীন চিন্তাধারা, চিন্তার অস্বচ্ছতা, ঈর্ষাকাতরতা, মানুষদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে প্রবলতর ভূমিকা নেবে।

মন্ত্রে যজ্ঞের আগুন জ্বলে

এবার যে ঘটনাটা বলছি, সেটা ঘটেছিল আমার স্কুল জীবনে। সালটা সম্ভবত ১৯৫৭। বাবা রেলওয়েতে চাকরি করতেন, সেই সুবাদে আমরা তখন খড়্গপুরের বাসিন্দা। পড়ি কৃষ্ণলাল শিক্ষানিকেতনে। একদিন হঠাৎ খবর পেলাম, পাঁচবেড়িয়া অঞ্চলের এক বাড়িতে খুব ভূতের উপদ্রব হচ্ছে। তার দিনকয়েক পরেই খবর পেলাম, বাড়ির মালিক ভূত তাড়াতে কোথা থেকে যেন এক বিখ্যাত তান্ত্রিককে নিয়ে এসেছেন। তারপরেই যে খবরটা পেলাম, সেটা ভূতের চেয়েও অদ্ভুত। তান্ত্রিক প্রতিদিনই যজ্ঞ করছেন এবং যজ্ঞের আগুন জ্বালছেন মন্ত্র দিয়ে, দেশলাই দিয়ে নয়।

এমন এক অসাধারণ ঘটনা নিজের চোখে দেখতে পরদিনই স্কুল ছুটির পর দৌড়লাম। গিয়ে দেখি শয়ে শয়ে লোকের প্রচণ্ড ভিড়। ভিড় ঠেলে যখন ভিতরে ঢোকার সুযোগ পেলাম, তখন দেখি যজ্ঞ চলছে। যজ্ঞের তান্ত্রিককে সেদিন অবাক চোখে দেখেছিলাম। তাকে কেমন দেখতে ছিল তা মনে নেই। তবে, এইটুকু মনে আছে, সেদিন তান্ত্রিক ছিল আমার চোখে 'হিরো'।

পরের দিন পেটের ব্যথা বা ওই জাতীয় একটা কোনো অজুহাতে স্কুলে গেলাম না। দুপুরে মা'কে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেলাম। সেদিন যজ্ঞ

শুরু আগেই পৌঁছেছিলাম। ইট দিয়ে একটা বড়-সড় যজ্ঞের জায়গা করা হয়েছিল, তাতে সাজানো ছিল অনেক কাঠ। পাশে স্তূপ করা ছিল প্রচুর কাঠ, পাটকাঠি, একধামা বেলপাতা ও একটা ঘিয়ের টিন। একসময় তান্ত্রিক এসে বসলেন। তাঁর সামনে ছিল একটা কানা উঁচু তামার বাটি। বাটিতে কয়েকটা পাটকাঠি রয়েছে। তান্ত্রিক আসনে বসে 'মা, মা' বলে বার কয়েক হুঙ্কার ছাড়লেন। তারপর বাটিটার ওপর ডান হাতের আঙুলগুলো নিয়ে আরতি করার ভঙ্গিমায় নাড়তে লাগলেন।

একসময় অবাক হয়ে দেখলাম, শূন্য তামার বাটিতে রাখা পাটকাঠি দপ করে জ্বলে উঠল। বিস্মিত ভক্তেরা তান্ত্রিকের জয়ধ্বনি করে উঠল। জয়ধ্বনির মধ্যেই তান্ত্রিকবাবাজি ওই জ্বলন্ত পাটকাঠি থেকে যজ্ঞের আগুন জ্বালালেন।

১১ ডিসেম্বর ১৯৮৮ যজ্ঞে আগুন জ্বালাচ্ছেন জ্যোতি মুখার্জি

সেই দিনের সেই বিস্ময় আজ আর আমার মধ্যে নেই। সেদিনের হিরো আজ আমার চোখে নেহাতই এক প্রবঞ্চক মাত্র। জানি ওই তান্ত্রিকও সেদিন বিজ্ঞানেরই সাহায্য নিয়ে আগুন সৃষ্টি করেছিল। সেদিন তান্ত্রিকের বাটিতে ছিল কিছুটা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট। আর, তান্ত্রিকের ডান হাতের আংটির খাঁজে লুকোনো ছিল গ্লিসারিন ভর্তি ড্রপার। হাত নাড়তে নাড়তে আমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিন বাটিতে ফেলে দিয়েছিল। পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট গ্লিসারিনের সংস্পর্শে এতে তাকে অক্সিডাইজড করে ফেলেছিল। এই অক্সিডেশনের ফিজিক্যাল পরিবর্তন হিসেবে ওই রাসায়নিক উত্তাপ বেড়ে গিয়ে দপ করে আগুন জ্বলে উঠেছিল।

ছোটবেলা থেকেই ঠাকুর-দেবতা ও সাধু-সন্ন্যাসীদের নানা অলৌকিক ঘটনার কথা অনবরত পড়ে ও শুনে আমাদের মনের মধ্যে একটা যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাসের সৃষ্টি হচ্ছে। এই মানসিকতার সুযোগ নিয়ে একদল প্রতারক অলৌকিক ক্ষমতার নামে লৌকিক জাদু দেখিয়ে ধর্মের নামে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

খবরের কাগজগুলোতে অলৌকিক ক্ষমতার গপ্পো-কথা পড়েছি, ভূতের গপ্পো পড়েছি, টিভি-তে দেখেছি। বিভিন্ন মিডিয়ার হয়ে সে'সবের অনুসন্ধানে দেখেছি—প্রত্যেকটি মিথ্যে। ভাববাদীরা অবশ্য বলবেন, আমি যাদের নিয়ে লিখছি, তাদের বাইরেও আরও অনেক সাধু-সন্ন্যাসী এসেছিলেন বিশেষত ভারতবর্ষে। যাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। অতীতের ওই সব সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়ে গড়ে ওঠা কাহিনি বা কল্পকাহিনির ব্যাখ্যা তথ্যের অভাবেই বর্তমানে অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়। 'সত্যি' বলে প্রমাণ করাও সম্ভব নয়।

বিজ্ঞান অলৌকিক বা অপ্রাকৃত কোনও ঘটনা বা রটনাতে বিশ্বাস করে না। অলৌকিক কোনও কিছু ঘটেছিল এটা প্রমাণ করার দায়িত্ব সাধু-সন্ন্যাসীদের বা তার ভক্তদের। কোনও ক্ষেত্রেই তারা এই ধরনের কোনও প্রমাণ দিতে সক্ষম হননি।

সত্য সাঁইবাবা

সত্য সাঁইবাবা ভারতের সবচেয়ে প্রচারিত অলৌকিক ক্ষমতাবান (?) ব্যক্তি। আর সব অবতারদের মতো সাঁইবাবাও ভক্তদের মধ্যে রয়েছে সমাদের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই অবতারদের পক্ষে অতি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষ ভাবে এত বড়-বড় নামি-দামী লোকেরা যখন অমুকের শিষ্য, তখন অমুক সাধকের নিশ্চয়ই অনেক ক্ষমতা।

সাঁইবাবার অলৌকিক ঘড়ি-রহস্য

সাঁইবাবার এমনি এক বিশিষ্ট ভক্ত ডঃ এস. ভগবন্থম। ইনি ভারত সরকারের প্রাক্তন বিজ্ঞান উপদেষ্টা। ভগবন্থম জানালেন, তিনি অলৌকিককে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু সাঁইবাবার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তাঁর আগেকার ধারণাই পালটে গেছে। নিজের চোখে সাঁইবাবার যে-সব অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখেছেন,

তাতে অলৌকিকে বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না। ভারতে এসে তিনি নিছক কৌতূহল মেটাতে সাঁইবাবার আশ্রমে তাঁকে দর্শন করতে আসেন। ভক্তদের মধ্যে ওই জাপানি ভদ্রলোকটিকে দেখতে পেয়ে সত্য সাঁইবাবা শূন্য থেকে একটি ছোট পার্সেল তৈরি করে তাঁকে দেন। পার্সেলটি খুলে ভদ্রলোক হতবাক হয়ে যান। ভেতরে ছিল জাপানে রেখে আসা ঘড়ির মডেলটি। ঘড়ির সঙ্গে বাঁধা রেশমের ফিতে, সঙ্গে মডেলটির নতুন নাম লেখা লেবেলটিও রয়েছে। জাপানি ভদ্রলোকের সাঁইবাবার ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ গেল মিলিয়ে। এই ঘটনার পর থেকে তিনি সাঁইবাবার একজন একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে ওঠেন। জাপানে ফিরে তিনি আলমারি খুলে দেখেন ঘড়িটি নেই। তাঁর ব্যক্তিগত সচিব যা বললেন তা আরও বিস্ময়কর। সচিব বললেন, ঝাঁকড়া চুলের দেবকান্তি একটি লোক একদিন হেঁটে অফিসে ঢুকলেন, তারপর আলমারি খুলে ঘড়িটি নিয়ে চলে গেলেন।

অলৌকিকে অবিশ্বাসী ডঃ কোভুর ঘটনাটির সত্যতা যাচাই করার জন্য ডঃ ভগবন্থমকে চিঠি লিখে জাপানি ভক্তটির নাম ও ঠিকানা জানতে চান। একাধিকবার চিঠি লিখেও ডঃ কোভুর কোন উত্তর পাননি। শেষ পর্যন্ত ডঃ কোভুর শ্রীলঙ্কার জাপানি দূতাবাস থেকে সিকো ঘড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থার ঠিকানা সংগ্রহ করে ওই কোম্পানির প্রেসিডেন্টকে এই বিষয়ে আলোকপাত করতে অনুরোধ করে ৩০ অক্টোবর ১৯৭৩-এ একটি চিঠি লেখেন। সিকো ঘড়ির প্রস্তুতকারক সংস্থার ঠিকানা সংগ্রহ করে ওই কোম্পানির প্রেসিডেন্ট শোজি হাট্টোরি এর উত্তরে যা জানান তা তুলে দিলাম।

তাঁর কথায়—একবার জাপানের 'সিকো' ঘড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থার এক কর্তা ব্যক্তি ভারতে আসেন। আসার সময় তিনি অফিসের আলমারিতে রেখে এসেছিলেন একটি বিশেষ সিকো ঘড়ি।

ডঃ এ. টি. কোভুর
পামানকাডা লেন
কলম্বো—৬, শ্রীলঙ্কা

সিকো
কে হাট্টোরি অ্যাণ্ড কোং লিঃ
৫, কোয়াবাসি ২ কোমে,
চুওকু, টোকিও—১০৪
৮ নভেম্বর, ১৯৭৩

প্রিয় ডঃ কোভুর,

আপনার ৩০ অক্টোবরের চিঠিটার জন্য ধন্যবাদ। অলৌকিক ক্ষমতার দাবি বিষয়ে আপনার গবেষণার আগ্রহের আমি প্রশংসা করি। আপনি চিঠিতে মিস্টার সাঁইবাবার বিষয়ে জানতে চেয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে আমি বেশি কিছু জানাতে পারছি না। আমার বা আমাদের কোনও পদস্থ কর্মীর সঙ্গে ওই ভদ্রলোকের পরিচয় ঘটেনি। আমি নিশ্চিত, যে ঘটনার কথা আপনি বলেছেন, তার কোনও ভিত্তি নেই। তাই

ওই ঘটনাকে ভিত্তি করে আপনি যেসব প্রশ্ন রেখেছেন, তার উত্তরে 'না' বলা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই।

আপনার একান্ত
কে, হাট্রোরি অ্যান্ড কোং লিঃ
স্বাক্ষর শোজি হাট্রোরি
প্রেসিডেন্ট

চিঠির উত্তর পড়ে বুঝতে অসুবিধে হয় না, সিকোর বড়-মেজ কোনও কর্তার সঙ্গে সাঁইবাবার এই ধরনের কোনও মুলাকাত হয়নি।

উত্তরটি পাওয়ার পর ডঃ কোভুর আবার ডঃ ভগবন্থমকে চিঠি লিখে শোজি হাট্রোরির কাছ থেকে পাওয়া উত্তরটির কথা জানান। ডঃ কোভুর আরও জানতে চান ডঃ ভগবন্তম যে জাপানি ভক্তের কথা বলেছেন, তিনি কি অন্য কোনও ব্যক্তি? তাঁর নাম, ঠিকানা ও সিকো'তে কী পদে কাজ করেন জানান। এবারও ডঃ ভগবন্থম আশ্চর্যজনকভাবে নীরব থাকেন। ডঃ ভগবন্থমের নীরবতা এবং ডঃ কোভুরের সত্যকে জানার প্রচেষ্টা এটাই প্রমাণ করে যে, সিকো ঘড়ির অলৌকিক ঘটনা নেহাতই মিথ্যে প্রচার।

কেন এমন হয়

অবতার বা অলৌকিক ক্ষমতা (?) অধিকারীদের পক্ষে জনপ্রিয় বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকাগুলো যেভাবে প্রচার চালায়, অবতারদের বিপক্ষে কেউ যুক্তির অবতারণা করলেও সেভাবে প্রচার চালানো হয় না। তার কারণগুলো হলো, (১) এখনও পাঠক-পাঠিকাদের বড় অংশই আবেগপ্রবণ, অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন। এই ধরনের পাঠক-পাঠিকাদের মনোরঞ্জনের পক্ষে এবং আবেগকে সুড়সুড়ি দেওয়ার পক্ষে অবতারদের কাহিনি যথেষ্ট কার্যকর। (২) জনপ্রিয় অবতারদের কাহিনি ছাপা হলে সেই অবতারদের শিষ্য-শিষ্যা ও ভক্তদের বড় অংশ পত্রিকাটির 'রেগুলার' পাঠক-পাঠিকা না হলেও সংখ্যাটি কিনবেন বা পড়বেন। (৩) অবতারদের কাছ থেকে পত্র-পত্রিকাগুলো বিজ্ঞাপন বাবদ অথবা অন্যভাবে কিছু সুযোগ-সুবিধে পেয়ে থাকে। এক যোগীবাবা তো শুনি—টিভি পোগ্রাম পিছু দু-লাখ টাকা দেন। (৪) পত্রিকা কর্তৃপক্ষ অনেক সময় নিজেরাই যুক্তিহীনতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এবং অবতারবাদে বিশ্বাসী ও অবতারবাদের পৃষ্ঠপোষক।

সাঁইবাবার ছবিতে জ্যোতি

অবতারবাদে বিশ্বাসী ও অবতারবাদের এমনই এক পৃষ্ঠপোষক 'ব্লিৎস' পত্রিকার সম্পাদক মিস্টার করঞ্জিয়া। ২২.৩.৮১-র 'সানডে' পত্রিকার সংখ্যায় শ্রীকরঞ্জিয়া এক সাক্ষাৎকারে জানালেন, "সম্প্রতি যোগের মাধ্যমে আমি এর ভেতরে প্রবেশ করেছি। যোগ শুরু করার পর অনেক রহস্যময় অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। এই যে

আমরা দু'জনে এখানে বসে রয়েছি, আর আমাদের চারপাশে রয়েছে অনন্ত মহাজাগতিক শক্তি, অথচ আমরা জানি না কীভাবে একে কাজে লাগাব। এই সবই আমাকে ভারতীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। সাঁইবাবার ভিতর এই মহাজাগতিক শক্তির কিছু বহিঃপ্রকাশ দেখতে পেয়েছি।"

শ্রীকরঞ্জিয়া সাঁইবাবার একটি ছবি দেখান। ক্যামেরায় তোলা ফোটোটিতে সাঁইবাবার চারপাশে একটা উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা দেখা যায়। শ্রীকরঞ্জিয়া দাবি করেন, এই উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা দেখা যায়। শ্রীকরঞ্জিয়া দাবি করেন, এই উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা হলো সাঁইবাবার শরীর থেকে নির্গত জ্যোতি। ফটোগ্রাফির কৌশলে

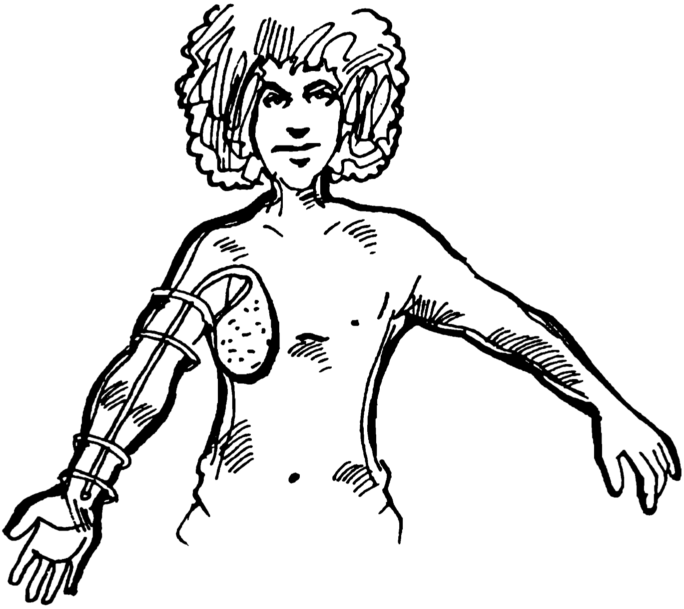

বিভূতি আনার কৌশল

যে কোনও প্রাণী বা উদ্ভিদের ছবি থেকেই জ্যোতি বেরোতে দেখা যেতে পারে।

সাঁইবাবার বিভূতি

সাঁইবাবার নামের সঙ্গে 'বিভূতি'র ব্যাপারটা এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, সাঁইবাবা বললেই তাঁর অলৌকিক বিভূতির কথাই আগে মনে পড়ে। সাঁইবাবা অলৌকিক প্রভাবে তাঁর শূন্য হাতে সুগন্ধি পবিত্র ছাই বা বিভূতির সৃষ্টি করে ভক্তদের বিতরণ করেন। বছরের পর বছর মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভক্তেরা দেখে

আসছেন সাঁইবাবার বিভূতি সৃষ্টির অলৌকিকের লীলা।

১৯৮৪'র ১ মার্চ, ২ এপ্রিল, ২ মে ও ১ জুন সাঁইবাবাকে চারটে চিঠি দিই। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি চিঠিরও উত্তর পাইনি। আমার ইংরেজিতে লেখা প্রথম চিঠিটির বাংলা অনুবাদ এখানে দিলাম।

ভগবান শ্রী সত্যসাঁইবাবা
প্রশান্তিনিলায়ম
পুট্টাপার্টি
জেলা—অনন্তপুর
অন্ধ্রপ্রদেশ

২৮৭ দমদম পার্ক
কলকাতা—৫৫
পিন—৭০০ ০৫৫
১.৩.১৯৮৪

প্রিয় সত্যসাঁইবাবা,

ভক্ত ও শিষ্য সংখ্যার বিচারে আপনিই সম্ভবত ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও জনপ্রিয়তম ধর্মগুরু। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আপনার অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার সম্বন্ধে অনেক কিছু পড়েছি এবং আপনার কিছু ভক্তের কাছে আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছি। আপনার অলৌকিক খ্যাতি প্রধানত 'বিভূতি' সৃষ্টির জন্য। পড়েছি এবং শুনেছি যে, আপনি অলৌকিক ক্ষমতাবলে শূন্যে হাত নেড়ে 'পবিত্র ছাই' বা 'বিভূতি' সৃষ্টি করেন এবং কৃপা করে কিছু কিছু ভাগ্যবান ভক্তদের তা দেন।

আমি অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে জানতে অত্যন্ত আগ্রহী। অলৌকিক কোনও ঘটনা বা অলৌকিক ক্ষমতাবান কোনও ব্যক্তির বিষয় শুনলে আমি আমার যথাসাধ্য অনুসন্ধান করে প্রকৃত সত্যকে জানার চেষ্টা করি। দীর্ঘদিন ধরে বহু অনুসন্ধান চালিয়েও আজ পর্যন্ত একটিও অলৌকিক ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা ঘটনার সন্ধান পাইনি। আমার এই ধরনের সত্য জানার প্রয়াসকে প্রতিটি সৎ মানুষের মতোই আশা করি আপনিও স্বাগত জানাবেন; সেইসঙ্গে এ-ও আশা করি যে, আপনার অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে অনুসন্ধানে আপনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। আপনার পোশাক ও শরীর পরীক্ষা করার পর আপনি আমাকে শূন্যে হাত নেড়ে, 'পবিত্র ছাই' বা 'বিভূতি' সৃষ্টি করে দেখালে আমি অবশ্যই মেনে নেব যে, আপনার অলৌকিক ক্ষমতা আছে এবং অলৌকিক বলে বাস্তবিকই কোনও কিছুর অস্তিত্ব আছে।

আপনি যদি আমার চিঠির উত্তর না দেন, অথবা যদি আপনার বিষয়ে অনুসন্ধানের কাজে আমার সঙ্গে সহযোগিতা না করেন, তবে অবশ্যই ধরে নেব যে, আপনার সম্বন্ধে প্রচলিত প্রতিটি অলৌকিক কাহিনিই মিথ্যে এবং আপনি 'পবিত্র ছাই' বা 'বিভূতি' সৃষ্টি করেন কৌশলের দ্বারা, অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা নয়।

শুভেচ্ছান্তে,
প্রবীর ঘোষ

সাঁইবাবাকে লেখা পরের চিঠিগুলোর বয়ান একই ছিল। কোনও চিঠিরই উত্তর পাইনি।

শূন্যে হাত নেড়ে ছাই বের করাটা ঠিকমতো পরিবেশে তেমনভাবে দেখাতে পারলে অলৌকিক বলে মনে হতে পারে।

১৬.৪.৭৮ তারিখের 'সানডে' সাপ্তাহিকে জাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়র জানান তিনি সাঁইবাবার সামনে শূন্যে হাত ঘুরিয়ে একটা রসগোল্লা নিয়ে আসেন। সাঁইবাবা এই ধরনের ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠেন।

এর কতটা সত্যি, বা একটুও সত্যি আছে কী না—সন্দেহ আছে। কারণ, সাঁইবাবার আশ্রমের যা পরিকাঠামো দেখেছি, তাতে এভাবে সাঁইবাবাকে তাঁরই আশ্রমে বে-আব্রু করা একেবারেই অসম্ভব।

শূন্যে হাত ঘুরিয়ে রসগোল্লা নিয়ে আসা, এটা জাদুর ভাষায় 'পামিং'। পামিং হল কিছু কৌশল, যেগুলোর সাহায্যে ছোটখাটো কোনও জিনিসকে হাতের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়। আমার ধারণা সাঁইবাবা তাঁর 'পবিত্র ছাই' পাম করে লুকিয়ে রাখেন না, কারণ প্রচুর ছাই 'পাম' করে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সাঁইবাবা যে পদ্ধতিতে ভক্তদের 'পবিত্র ছাই' বিতরণ করেন বলে আমার ধারণা আমি সেই একই পদ্ধতিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নজনের সামনে ছাই সৃষ্টি করেছি। প্রতিটি অত্যাশ্চর্য জাদুর মতোই এই খেলাটির কৌশল অতি সাধারণ।

যে অবতার শূন্যে ডান হাত নেড়ে পবিত্র ছাই বের করতে চান তাঁর ডান বগলে বাঁধা থাকে রবারের বা নরম প্লাসস্টিক জাতীয় জিনিসের ছোটখাটো ব্লাডার। ব্লাডার ভর্তি করা থাকে সুগন্ধি ছাই। ব্লাডারের মুখ থেকে একটা সরু-নল হাত বেয়ে সোজা নেমে আসে হাতের কব্জির কাছ বরাবর। পোশাকের তলায় ঢাকা পড়ে যায় ব্লাডার ও নল। এবার ছাই সৃষ্টি করার সময় ডান হাত দিয়ে বগলের তলায় বাঁধা ব্লাডারটায় প্রয়োজনীয় চাপ দিলেই নল বেয়ে হাতের মুঠোয় চলে আসবে পবিত্র ছাই। বাঁ হাত দিয়েও ছাই বের করতে চান? বাঁ বগলেও একটা ছাই-ভর্তি ব্লাডার ঝুলিয়ে নিন। দেখলেন তো, অবতার হওয়া কত সোজা!

বোঝবার সুবিধের জন্য ছবি দেখুন।

এই পদ্ধতি ছাড়াও বিভূতি সৃষ্টি সম্ভব। ছাইয়ের পাউডারে ভাতের পড় মিশিয়ে লাড্ডু বানিয়ে আলখাল্লার ভিতরের দিকে 'জাদু চিমটে'র সাহায্যে ঝুলিয়ে রাখা যেতে পারে। জাদুর পরিভাষায় একে বলে 'লেড' নেওয়া। তারপর আলখাল্লার তলায় হাত ঢুকিয়ে হাতে লাড্ডু এনে গুঁড়ো করে বিলি করলেই হলো। লাড্ডুতে সেন্ট মেশালে 'সোনায় সোহাগা'।

শূন্য থেকে হার আনলেন ও হার মানলেন সাঁই

১৯৯৪-র ডিসেম্বরে বিবিসি'র প্রোডিউসর ইনচার্য রবার্ট ঈগল এলেন যুক্তিবাদী আন্দোলন নিয়ে তথ্যচিত্র তুলতে। সেই সময় সাঁইবাবার অলৌকিক ক্ষমতা ছবি-বন্দি করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আমরা সাঁইবাবার আস্তানায় গিয়ে তাঁর বুজরুকি ফাঁস করতে রাজি কি না? বললাম রাজি। সে সাহস আমাদের আছে, আছে পরিকাঠামো। তুমি যেদিন সাঁইয়ের আশ্রমে যাবে, তার সাত দিন আগে থেকেই আমাদের সমিতির কিছু ফুল-কণ্টাক্ট ক্যারাটেতে এক্সপার্ট ছেলে-মেয়েকে ভক্ত সাজিয়ে পাঠাতে হবে। ওদের যাতায়াত থাকা খাওয়ার খরচ তোমার।

রবার্ট জানিয়ে ছিলেন, কেন এই লড়াইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে? তোমাদের কোলকাতারই ম্যাজিসিয়ান পি. সি. সরকার জুনিয়র তো একাই গিয়ে ভক্তদের সামনে ওর বুজরুকি ফাঁস করেছে?

বললাম,

সাঁইয়ের আস্তানায় পা রাখলেই তুমি বুঝতে পারবে, পি. সি. সরকারের যে গল্পটা শুনেছ, সেটা কত অবাস্তব! ওখানে তিনজন ভক্ত পিছু একজন করে ক্যারাটে এক্সপার্ট রাখা হয়। বেয়ারা ভক্তদের হাড়-গোড় ভাঙতেই এদের রাখা হয়। তারপরও আছে ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা। ওখানে গেলাম, চ্যালেঞ্জ করলাম, সাঁই ভয়ে পালালেন—এমনটা অসম্ভব।

ওখানে অমনটা করলে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললেও হদিশ মিলবে না। চ্যালেঞ্জ করলে ধুন্ধুমার কাণ্ড একটা ঘটবেই। আমরা তৈরি। তুমি?

সবশুনে পরিকল্পনা পাল্টালেন রবার্ট ঈগল। ঠিক হলো, শুধু বুজরুকিটুকু ক্যামেরাবন্দি করে চুপচাপ চলে আসবেন। তবু আমাদের সমিতির সাহায্য নিলেন। গাইডের ভূমিকা নিল সমিতি।

সাঁই তো মহা আনন্দে রবার্টকে ছবি তুলতে দিলেন। বিবিসির প্রোডিউসর ইনচার্জ বলে কথা। পৃথিবী জোড়া প্রচারের প্রলোভন তো চারটিখানি কথা নয়।

সাঁইবাবাবা শূন্য থেকে একটা হার এনে দিলেন। সাঁইবাবার সত্যিকার অলৌকিক ক্ষমতা থাকলে তো জানতেই পারতেন— গোপন ক্যামেরা বন্দি হয়ে গেছে তাঁর হাতসাফাই।

রবার্ট ঈগলের ফিল্ম 'গুরু বাস্টর্স' অসাধারণ জনপ্রিয়তা পায় পৃথিবী জুড়ে।

এক ঘণ্টার এই তথ্যচিত্রে দেখানো হয়েছে সাঁইবাবা কীভাবে একজনের হাত থেকে হারটা নিলেন হাতের মুঠোয়। এবং হারটা প্রকাশ্যে হাজির করে দাবি করলেন—শূন্য থেকে সৃষ্টি করলেন। চারবার 'স্লো মোশনে' সাঁইয়ের এই হাতসাফাই দেখানো হয়েছে ফিল্মটিতে। হাতসাফাইকে অলৌকিক ক্ষমতা বলা যায় না। তবে হাতসাফাইকে অলৌকিক ক্ষমতা বলে কেউ দাবি করলে তাকে প্রতারক বলা যায়।

সাঁইবাবার চ্যালেঞ্জ : পেটে হবে মোহর!

এক অদ্ভুত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার বিচিত্র আমার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। রেজেস্ট্রি ডাকে চিঠিটি পাঠিয়েছেন শ্রীসত্যসাঁইবাবার চরণাশ্রিত 'শিক্ষা আশ্রম ইন্টারন্যাশনাল'-এর ভাইসচান্সেলারের সেক্রেটারি অম্বিকা বসাক। প্যাডের কোনায় লেখা Ref. No. 710/88. 10th April 1988. চিঠিটি এখানে তুলে দিলাম :

মহাশয়,

৩০শে মার্চ ৫ই এপ্রিল ১৯৮৮-এর সংখ্যায় 'পরিবর্তন'-এ আপনার (অ) লৌকিক অভিজ্ঞতার কথা পড়ে আমাদেরও অভিজ্ঞতা হল।

আমাদের আশ্রমের উপাচার্য শ্রী বিভাস বসাকের নির্দেশক্রমে এক (অ) সত্য ঘটনা আপনাকে জানানো যাইতেছে, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা করা আপনার ইচ্ছাধীন।

উনার কাছে শ্রীসত্যসাঁইবাবার সৃষ্টি করা কিছু বিভূতি (ছাই) আছে, যে কেউ রবিবার সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত আসতে পারে পরীক্ষা করার জন্য। সম্পূর্ণ খালি পেটে আসতে হবে—সঙ্গে একজন মাত্র দর্শক বা সাক্ষি থাকতে পারে।

বিভূতি জলে গুলে খাইয়ে দেওয়া হবে। সন্দেহ নিবারণের জন্য গোলা বিভূতির খানিকটা অংশ উনি নিজেই খেয়ে নেবেন। খাবার তিনদিন পরে কম করে ৬টি, বেশি ১১টি স্বর্ণমুদ্রা পাকস্থলী বা অন্ননালীর কোনও অংশে নিজেই সৃষ্টি হবে। চতুর্থ দিনে কোনও সুযোগ্য Surgen-কে দিয়ে operation করে বের করা যাবে, বা প্রত্যেকদিন পায়খানা পরীক্ষা করতে হবে ৩০ দিন পর্যন্ত। ঐ সময়ের মধ্যেই ২৫ নঃ পঃ আকৃতিতে স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যাবে।

দক্ষিণা—৫০০্। পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে স্বেচ্ছাদান করে রসিদ সঙ্গে আনতে হবে। বিভূতি খাওয়ানো উপাচার্যের ইচ্ছাধীন। পত্রে আলাপ করে পরীক্ষার দিন ধার্য করতে পারেন। আপনি নিজে পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলেই প্রচার করবেন, নতুবা নয়।'

চিঠিটা আমাদের সমিতির অনেকেই পড়ে সাঁইবাবার নামের সঙ্গে জড়িত এমন একটা প্রতিষ্ঠানকে কোণঠাসা করার সুযোগ পেয়ে উত্তেজিত হলেন। তাঁরা চাইলেন, আমি বিভূতি খেয়ে ওঁদের বুজরুকির ভাণ্ডাফোড় করি। কিন্তু আমার মনে হল—আপাদদৃষ্টিতে উপাচার্যের চ্যালেঞ্জটা যতটা বোকাবোকা ও নিরীহ মনে

হচ্ছে, বাস্তব চিত্র ঠিক তার বিপরীত। এই নিরীহ চ্যালেঞ্জের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর রকমের বিপদজনক হয়ে ওঠার সমস্তরকম সম্ভাবনা।

'শিক্ষা আশ্রম ইন্টারন্যাশনাল'-এর উপাচার্যকে আগস্টের শেষ সপ্তাহে চিঠি পাঠিয়ে জানালাম—

আপনি যে অলৌকিক একটি বিষয় নিয়ে আমাকে সত্যানুসন্ধানের সুযোগ দিচ্ছেন তা জন্য ধন্যবাদ। এই অলৌকিক ঘটনা প্রমাণিত হলে সাঁইবাবার অলৌকিক ক্ষমতাও প্রমাণিত হবে। কিন্তু পাশাপাশি এও সত্যি— আপনি ব্যর্থ হলে ব্যর্থতার দায় বর্তাবে কেবলমাত্র আপনার উপর। আপনি কৃতকার্য হলে সাফল্যের ক্রিমটুকু খাবেন সাঁইবাবা। এই ব্যাপারটা আমাদের পছন্দ নয়। আপনার ব্যর্থতার দায় সাঁইবাবা নেবেন কী না, জানতে উৎসুক হয়ে রইলাম। সাঁইবাবার নির্দেশমত বা জ্ঞাতসারেই এই চ্যালেঞ্জ আপনি করেছেন—এটা ধরে নিতেই পারি। কারণ তাঁকে না জানিয়ে তাঁর সম্মান নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানানোর দুঃসাহস নিশ্চয়ই আপনার হত না। এমন অবস্থায় পরবর্তী পর্বে লিখিতভাবে জানিয়ে দেবেন, এই চ্যালেঞ্জ সাঁইবাবার নির্দেশ অনুসারে/জ্ঞাতসারে হচ্ছে কিনা?

বিভূতিতে বিষ নেই—নিশ্চিত করতে খানিকটা বিভূতি খাবেন জানিয়েছেন। সন্দেহ নিরসনের জন্য আপনারা এই সৎ চেষ্টাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। কিন্তু তারপরও যুক্তির খাতিরে বলতেই হচ্ছে—এতে সন্দেহ নিরসন হয় না। কারণ প্রায় সমস্ত বিষেরই প্রতিষেধক বিজ্ঞানের জানা। যুক্তির খাতিরে আমরা যদি ধরে নিই, আপনি বিভূতিতে বিষ মেশাবেন, তবে বিষটির প্রতিষেধক আপনার ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন। আমি অজানা বিষ খেয়ে ফেললে মৃত্যুই অনিবার্য হয়ে উঠবে। তিন দিনের মধ্যে আমি মারা গেলে পেটে সোনার টাকা তৈরি হওয়ার প্রশ্নই থাকবে না।

এই মৃত্যুর জন্য আপনাকে দায়ী বলে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কারণ আমি যে বিভূতি খেয়েই মারা গেছি—তার প্রমাণ কী? আমি যে মৃত্যুর আগে অন্য কিছু খাওয়ার সময় বিষ গ্রহণ করিনি, তার প্রমাণ কী? খাবারে বিষ মিশে যেতে পারে, কেউ শত্রুতা করে বিষ খাওয়াতে পারে, এমনকী নিজেই কোনও কারণে বিষ খেতে পারি।

এই অবস্থায় আপনার আন্তরিক প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখছি—

১) যে কোনও প্রাণীকে বিভূতি খাইয়েই যদি তিনদিন পরে পেটে সোনার টাকা তৈরি করে অলৌকিকত্ব প্রমাণ করা যায়, তবে আমাকে নিয়ে আর টানাটানি কেন? পরীক্ষার জন্য ছাগল-টাগল কিছুকে বেছে নেওয়া যেতে পারে।

২) ছাগলটিকে আগের রাতেই আপনার আশ্রমে নিয়ে আসবো আমরা। উদ্দেশ্য বিভূতি খাওয়ার আগে পর্যন্ত ছাগলটি যে সম্পূর্ণ খালি পেটে আছে, সে

বিষয়ে নিশ্চিন্ত করা।

৩) সঙ্গে নিয়ে আসবো পশ্চিমবঙ্গের মুখমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে জমা দেওয়া ৫০০ টাকার রসিদ।

৪) ছাগলটিকে বিভূতি খাওয়াবার পর ছাগলটি আমাদের, আপনাদের ও ইচ্ছুক সাংবাদিকদের পাহারায় থাকবে। উদ্দেশ্য—আপনারা যাতে কোনওভাবে ছাগলটিকে স্বর্ণমুদ্রা খাওয়াতে না পারেন।

৫) ছাগলটিকে বটপাতা, কাঁঠালপাতা জাতীয় খাবার খাওয়ানো হবে। খাবারের জোগান দেবেন আপনারা। উদ্দেশ্য যাতে খাদ্যে বিষক্রিয়ায় মারা গেলে আপনাদেরকে দায়ী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

৬) তিনদিন পর ছাগলটির পেটে এক্স-রে দেখা হবে সোনার টাকা তৈরি হয়েছে কি না। (তখন 'চ্যালেঞ্জ মানি' ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা।)

৭) টাকা তৈরি হলে সাঁইবিভূতির অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণিত হবে। আমি পরাজয় মেনে নিয়ে আপনার হাতে প্রণামী হিসেবে তুলে দেব পঞ্চাশ হাজার টাকা।

৮) ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এই অলৌকিকত্ব দেখার পর সঙ্গত কারণেই আর অলৌকিত্বের বিরোধিতা না করে সত্য-প্রচার করবে এবং আমাদের সমিতির সদস্যরা প্রত্যেকে সাঁইবাবার কাছে দীক্ষা নেবে।

আপনার তরফ থেকে পেটে টাকা তৈরির বিষয়ে অন্য কোনও গভীর পরিকল্পনা না থাকলে, এবং বাস্তবিকই বিভূতির অলৌকিক ক্ষমতায় আপনি প্রত্যয়ী হলে আমার এই প্রস্তাবগুলো নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর আমরা ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি 'প্রেস কনফারেন্স' করে বিষয়টা সাংবাদিকদের জানাব। তারপর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আমরা পরীক্ষার দিন ধার্য করে সাংবাদিকদেরও এই সত্যানুসন্ধানে অংশ নিতে আহ্বান জানাব।

এই পরীক্ষায় আপনি কৃতকার্য হলে তা আমার পরাজয় হবে না; হবে সত্যকে খুঁজে পাওয়া।

আপনার ইতিবাচক চিঠির প্রত্যাশায় রইলাম।

উত্তর পেলাম সেপ্টেম্বরে। অগ্নিকা উপাচার্যের পক্ষে আমাকে জানালেন—

আপনার অমানবিক চিঠিটি পেয়েছি। আপনি শুধু অমানবিকই নন, ভীতু। আপনি নিজে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে মৃত্যুর ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিতে চাইছেন অবলা, নিরীহ একটি প্রাণীকে। একটি ছাগল বা মুরগির প্রাণ কি প্রাণ নয়? তাদের প্রাণ কি মানুষের প্রাণের চেয়ে কম মূল্যবান? আপনার ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা আমাদের ব্যথিত করেছে।

অলৌকিকতার প্রমাণ চাইতে হলে এর আপনাকেই বিভূতি খেতে হবে। আপনার কোনও পরিবর্তন চলবে না। আপনি এতে রাজি থাকলে প্রেস কনফারেন্স হাজির থাকতে আমরা রাজি।

১১ ডিসেম্বর ১৯৮৮ রবিবার প্রেস কনফারেন্স করব ঠিক হল। প্রেস কনফারেন্স প্রেস ক্লাবে না করে ময়দান টেন্টে করব ঠিক করলাম। ময়দান টেন্টটা ডাঃ অরুণকুমার শীলের।

৯ ডিসেম্বর 'আজকাল'-এ এবং ১০ ডিসেম্বর 'গণশক্তি'-তে প্রকাশিত হল ১১ ডিসেম্বর ময়দানে হতে যাওয়া লড়াইয়ের খবর।

এসে গেল ১১ ডিসেম্বর। The Telegraph পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় তলায় চার কলম জুড়ে (পত্রিকার পরিভাষায় একে বলে anchor story, যা অতি গুরুত্বপূর্ণ) আমার ছবি ও প্রেস কনফারেন্সের খবরটি ছাপা হলো। খবরটি শিরোনাম ছিল 'Calcuttan to take on Satya Sai Baba'

১২ ডিসেম্বর The Telegraph পত্রিকায় আবার ৪ কলাম জুড়ে খবর। চ্যালেঞ্জে কেউ এল না। সব পত্রিকায় সেদিন খবরটি বেরিয়ে ছিল ছবি সমেত।

১১ ডিসেম্বর এসে গেল। সকাল হওয়ার আগেই তাঁবুতে জায়গা নিয়েছি। দুপুর থেকে তাঁবুর লনে পড়েছে কয়েকশ চেয়ার। বিকেলে প্রেস কনফারেন্স শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই হাজির কয়েকশো উৎসাহী জনতা। প্রেস কনফারেন্স শুরু হওয়ার আগেই প্রতিটি পত্র-পত্রিকা ও প্রচার-মাধ্যমের প্রতিনিধিরা টেন্ট ভরিয়েছেন। খবর শুনে এসেছেন দিল্লি, বম্বে, মাদ্রাজের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাংবাদিক। চারটেতে প্রেস কনফারেন্স শুরু করার কথা। তাই শুরু হল। তবে তখনও উপাচার্য, তাঁর সচিব বা কোনও প্রতিনিধির দেখা নেই। মাইকে বারকয়েক আহ্বান জানানো হল, তাঁরা থাকলে যেন এগিয়ে আসেন। এগিয়ে এলেন না। সাঁইবাবার বিভূতি লীলার মতই এও এক লীলা। নিজের বিভূতির গপ্পো প্রচার, চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া এবং চ্যালেঞ্জ গৃহীত হওয়ার পর আপন খেয়ালে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া। পুরাণের কূর্ম অবতার চরিত্রটি সাঁইবাবার সম্ভবত সবচেয়ে পছন্দসই। তাই সাঁই অবতারের মধ্যেও বিপদে খোলোসে মুখ লুকোবার প্রবণতা আমরা দেখতে পাচ্ছি।

বিস্তৃত জানতে পড়তে পারেন 'যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা' ১ম খণ্ড।

ছবি থেকে ছাই

সত্য সাঁইবাবা সম্বন্ধে এও শুনেছি যে, অনেকের বাড়িতে রাখা সাঁইবাবার ছবি থেকে নাকি পবিত্র ছাই বা বিভূতি ঝরে পড়ে। গত শতকের আটের দশকে কোলকাতায় জোর গুজব ছড়িয়ে ছিল যে অনেকের বাড়ির সাঁইবাবার ছবি থেকেই নাকি বিভূতি ঝরে পড়ছে। প্রতিটি মিথ্যে গুজবের মতোই এই ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষদর্শীর অভাব হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে আমি যাঁদের মুখেই এইসব গুজব শুনেছি তাঁদেরই চেপে ধরেছি। আমার জেরার উত্তরে প্রায় সকলেই জানিয়েছেন যে তাঁরা নিজের চোখে বিভূতি ঝরে পড়তে দেখেনি। যাঁরা সত্যিই বাস্তবে ছবি থেকে

বিভূতি পড়তে দেখেছেন, তাঁরা শতকরা হিসেবে সংখ্যায় খুবই কম। তাঁরা দেখেছেন ভক্তদের বাড়ির ছবি থেকে বিভূতি পড়তে বা ছবির তলায় বিভূতি জমা হয়ে থাকতে। এই বিভূতি বা ছাই সৃষ্টি হয়েছে দু'রকম ভাবে। (১) কোনও সাঁইবাবার ভক্ত অন্য সাঁই ভক্তদের চোখে নিজেকে বড় করে তোলার মানসিকতায় সাঁইবাবার ছবির নীচে নিজেই সুগন্ধি ছাই ছড়িয়ে রাখে। (২)

সাঁইবাবার ছবির কাচে যদি ল্যাকটিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল মাখিয়ে ঘষে দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে ল্যাকটিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল বাতাসের সংস্পর্শে এলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছাইয়ের মতো ঝরে পড়তে থাকবে।

ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে সাঁইবাবার ওপর অনুসন্ধানের জন্য ১২ জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়। নাম দেওয়া হয় Saibaba Exposure

The Telegraph

MONDAY 12 DECEMBER 1988 VOL VII NO. 151

Round one to

By Pathik Guha

Calcutta, Dec. 11 : City rationalist Prabir Ghosh has won the first round. Devotees of Sri Satya Sai Baba who had challenged him to a public contest failed to turn up at the venue–Boys Scouts' Tent at the Maidan.

Prabir Ghosh, a bank employee, is an amateur magician heading the Science and Rationalists' Association of India. He had openly challenged Sri Satya Sai Baba, even terming him a hoax. Members of Siksha Asram International, all devout Sai Baba fans, took up cudgels challenging Ghosh to publicly drink the vibhuti. Within five days, six to eleven gold coins would appear in his stomach, they said. Ghosh accepted the challenge And today was the day.

A beaming Ghosh distributed copies of thc letter sent to him by the honorary secretary of the ashram to all those who thronged the venue expecting an exciting evening. Mr. Ghosh had suggested that the Sai Baba's vivhuti be tested on birds or animals before,lest it should contain poison.

The letter from the ashram secretary reads : "The test will be carried out on you only and not on hens or ducks. Your long letter to us proves that a) you are afraid of death but not against killing a creature ; (b) you could not resist the temptation of earning some gold coins in exchange for some amount of ash....With this, I end all communications from my end."

Committee। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সময়কার উপাচার্য ডঃ নরসিমাইয়া ছিলেন এই কমিটির উদ্যোক্তা। সাঁইবাবার সহযোগিতার অভাবে কমিটি শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধান চালাতে ব্যর্থ হন।

শূন্য থেকে হিরের আংটি

মেয়েদের একটি বাংলা সাময়িক পত্রিকায় ১৯৮১ সালের জুলাই মাসের সংখ্যায় লেখা হয়েছিল সাঁইবাবা শূন্য থেকে একটা হিরের আংটি সৃষ্টি করে নাকি পণ্ডিত রবিশঙ্করকে দিয়েছিলেন। শূন্য থেকে হিরে সৃষ্টির ঘটনা একজন যুক্তিবাদী হিসেবে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। পণ্ডিত রবিশঙ্করকে যে কোন জাদুকরই শূন্য থেকে হিরের আংটি এনে দিতে পারেন। আর এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে দেখালেই কি ওই জাদুকরকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে ধরে নেওয়া হবে?

শূন্য থেকে সৃষ্টির ক্ষমতা যদি থাকে তবে খোলামেলা পরিবেশে একা স্কুটার কী একটা মোটর বা বিমান সৃষ্টি করে উনি দেখান না।

city rationalist

Declaring that the ashram was backing out "just out of fear of being exposed of its hoax," Mr. Ghosh told newsmen, "My challenge is still on. My suggestion to get the vibhuti tested before I took it was entirely logical. The fact that the ashram is closing the episode in a hurry shows that it has something to hide."

Newsmen as well as the hundreds of youths who had assembled at the test waited with bated breath as Mr. Ghosh called out for Ms Ipsita Roy Chakraborty, the witch whose paranormal prowess has hit newspaper headlines recently, to come forward before the gathering. Mr. Ghosh had offered Rs. 50,000 if she could stand his scrutiny.

"We have been trying to contact her even from our tent here, "Mr. Ghosh told newsmen, "but the phone at her residence seems to be constantly engaged. I do not know if the receiver is always kept aside or not. Wouldn't you have considered me a cheat if I had not turned up here today? Not only did she hide herself from us, she did not even send a representative. Any way, our Association is ready to face her at a venue of her choice."

In the absence of any drama, the proceedings turned out to be a tame affair. Dr. Arun Seal, in-charge of the Boys Scouts' Tent, handed over an emblem of the key to the tent to Dr. Bishnu Mukherjee, president of the Association. In his speech, Dr. Seal said he was looking forward to the body for making the youth of Bengal rational, a goal that was there for the scouts too."

■ **Picture on Page 2**

· ব্ল্যাক-আর্টের দ্বারা জাদুকরেরা শূন্য থেকে হাতি বা জিপ-কার সৃষ্টি করেন। জাদুকরদের এই সৃষ্টির মধ্যে থাকে কৌশল। সাধু-বাবাজিদের সৃষ্টির মধ্যে এই ধরনের কোনও কৌশল থাকলে চলবে না। কোনও বাবাজি যদি শূন্য থেকে এই ধরনের বড়-সড় মানের কোন কিছু সত্যিই সৃষ্টি করতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হবে অলৌকিক বলে কিছু আছে, এবং তাবৎ বিশ্বের যুক্তিবাদীরাও আর এইসব নিয়ে কচ্‌কচানির মধ্যে না গিয়ে অলৌকিক বলে কিছুর বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলে স্বীকার করে নেবে।

কৃষ্ণ অবতার কিট্টি

সত্তরের দশকের গোড়ায় কর্নাটকের পাণ্ডবপুরে কৃষ্ণের অবতার হিসেবে উপস্থিত হয় বালক কিট্টি। বালকটির মা-বাবা ছাড়া সাঁইবাবাও ঘোষণা করেন, ও ভগবান সাঁই ও ভগবান কৃষ্ণের অবতার সাঁইকৃষ্ণ। ভক্তের ভিড়েরও অভাব হল না। শোনা গেল সাঁই-ভজনের সময় সাঁইকৃষ্ণ শূন্য থেকে পবিত্র সুগন্ধি ছাই তৈরি করে বিলি ভক্তদের মধ্যে। শূন্য থেকে কখনও কখনও সাঁইবাবার ছোট্ট ছবিও তৈরি করে ভক্তদের মধ্যে বিলি করে। ভক্তদের মধ্যে ডাক্তার বা ডক্টরেটেরও অভাব হল না। ব্যাঙ্গালোরের ডঃ জি. ভেঙ্কটরাও আবির্ভূত হলেন এই ধরনের এক ভক্ত প্রচারকারী হিসেবে।

সাঁইকৃষ্ণের ঈশ্বর-ব্যবসা যখন জমজমাট, সেই সময় ১৯৭৬ সালে ১৫ জুলাই ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ এইচ নরসিমাইয়ার নেতৃত্বে এক অনুসন্ধানকারী দল হঠাৎই হাজির হন সাঁইকৃষ্ণের বাড়িতে। এই দলে ছিলেন বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, মনোরোগ বিশেষযজ্ঞ, জাদুকর, আইনব্যবসায়ী প্রমুখ। দিনটি ছিল সাঁইকৃষ্ণের ভজনার বিশেষ দিন। এই দিনটিতে ভক্তদের সাঁইকৃষ্ণ পবিত্র বিভূতি বিলি করেন। যুক্তিবাদী এই দল ভক্তদের সামনেই সাঁইকৃষ্ণের পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে রাখা সুগন্ধি ছাই বের করে দেন। সাঁইকৃষ্ণের এই বুজরুকি ধরা পড়ে যাওয়ার ওর জমজমাট ঈশ্বর ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়।

যে সাধকরা একই সময়ে একাধিক স্থানে হাজির ছিলেন

ভারতের অতীত ও বর্তমানে গাদা-গাদা অবতারদের সম্বন্ধে শোনা যায় যে, তাঁরা নাকি একই সঙ্গে একাধিক স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শুধু রামঠাকুর বা শ্যামাপদ লাহিড়ীই নন এ যুগের অনেকের সম্বন্ধেই এই ধরনের কথা শুনেছি। আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা অন্নদাঠাকুরের শ্যালক পরেশ চক্রবর্তীর তান্ত্রিক হিসেবে যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। তিনি নিজেই আমাকে বলেছেন, একবার তাঁর এক ভক্তের জীবনের অন্তিম লগ্নে উপস্থিত থাকার জন্য ট্যাক্সিতে যাচ্ছিলেন। ট্যাক্সিতে সঙ্গী ছিলেন অসুস্থ ভক্তেরই আত্মীয়। কলকাতার বিখ্যাত যানজটে তাঁর ট্যাক্সি যায় আটকে। পরেশ

চক্রবর্তী এই সময় আর একটি দেহ ধারণ করে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে তাঁর কাছে হাজির হয়ে দেখা দেন। পরে ট্যাক্সি যখন ভক্তের বাড়িতে পৌঁছয়, তখন সব শেষ। পরেশ চক্রবর্তীকে সেই মুহূর্তে আবার ঘরে ঢুকতে দেখে ভক্তের বাড়ির সকলেই অবাক হয়ে যান। আর বিস্মিত হন, যখন জানতে পারেন যে, যেই সময় তাঁরা রোগীর শিয়রে পরেশ চক্রবর্তীকে দেখেছেন সেই সময় বাস্তবিকপক্ষে তিনি ছিলেন ট্যাক্সিতে। জমাটি গল্প, সন্দেহ নেই!

আমার ভায়রা পুলিন রায়চৌধুরী ছিলেন পেশায় শিক্ষক। তাঁর বড়দা তান্ত্রিক বলে পরিচিত। তাঁর কাছে শুনেছি, তিনি একবার বিশেষ কাজে ট্রেনে যেতে যেতে মনে পড়ে আজ তাঁর বাড়িতে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাইরে থেকে আসবেন। তিনি বাস্তবে ট্রেনে ভ্রমণ করতে থাকেন এবং আরও একটি দেহ ধারণ করে বন্ধুকে সঙ্গ দেন।

আমি বলেছিলাম, "আপনি আমার সামনেই দু-জন হয়ে দেখান তো।" তান্ত্রিক বাবাজি তারপর থেকে আমাকে এড়িয়ে চলেন।

একই লোকের দু'জায়গায় হাজির হওয়া নিয়ে বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন জাদুকর আলেকজান্ডার হারম্যান-এর একটি সত্যি-গল্প শোনাই। হারম্যান দিন-গ্রেট ছিলেন খেয়ালি প্রকৃতির লোক। তিনি যখন যে শহরে জাদুর খেলা দেখিয়েছেন তখন সেই শহরের লোকেরা দেখেছেন তাঁর দুটো অস্তিত্ব। কখনও শহরের থিয়েটার হলে যে সময় জাদুর খেলা দেখিয়ে কয়েকশো লোককে অবাক করে দিয়েছেন, সেই একই সময়ে শহরের বাজারে কয়েকশো লোক তাঁকে বাজার করতে দেখেছেন। আবার কখনও একই সঙ্গে তাঁকে দেখা যাচ্ছে হলে জাদুর খেলা দেখাতে এবং ঘোড়দৌড়ের মাঠে ঘোড়ার দৌড় দেখতো। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষদর্শী কয়েক শো বা কয়েক হাজার লোক। এসব ক্ষেত্রে শেখানো-পড়ানো মিছে কথা সুযোগ নেই। অতএব সে কালের বহু লোকই বিশ্বাস করতেন, হারম্যানের অলৌকিক ক্ষমতা আছে।

হ্যারম্যানের কিন্তু অলৌকিক ক্ষমতা ছিল না। ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও উপযুক্ত সহকারী উইলিয়াম রবিনসন। পরবর্তীকালে এই রবিনসনই চ্যাং লিং সু ছদ্মনামে জাদুর জগতে এসে বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাদুকর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অসাধারণ প্রতিভাধর দুই হারম্যান ও রবিনসনের শরীরের কাঠামোর সাদৃশ্যের সুযোগ নিয়ে তাঁরা স্টেজের বাইরেও আর এক খেলায় মেতে ছিলেন। রবিনসন নিখুঁত ছদ্মবেশে হারম্যান সেজে যখন খেলা দেখাতেন তখন হারম্যান হাটে-মাঠে ঘুরে বেড়াতেন। ফলে, অলৌকিক জাদুকর হিসেবে প্রচার ও পয়সা লুটেছিলেন হারম্যান ও তাঁর দল।

একই মানুষের দু'জায়গায় উপস্থিতি সম্বন্ধে যেমন স্বেচ্ছাকৃতভাবে ভুল বোঝানো সম্ভব, তেমনি আবার অনেক সময় প্রত্যক্ষদর্শীর দেখার ভুলেও এই ধরনের গুজবের সৃষ্টি হয়। কেউ সেই গুজবকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে পরিচিত হতে অসুবিধে কোথায়?

আপনি কোনও লোককে আপনার পরিচিত লোক বলে কখনও ভুল করেছেন কি? আমার চেহারার সঙ্গে যথেষ্ট মিল আছে এমন ব্যক্তি বৃহত্তর কলকাতাতেই থাকেন। আমরা কলেজ জীবন থেকেই শুনে আসছি, আমাকে নাকি অমুক দিন দমদম স্টেশনে দেখা গেছে। যদিও সেদিন আমি সেখানে যাইনি। এই ধরনের ভুলের শিকার হয়েছি গত পঁচিশ বছরে বোধহয় বার তিরিশেক। দিলীপ সেন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক, থাকেন দমদমের চেতনা সিনেমা হলের পাশে। কর্মস্থল কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় হলেও এককালে আনন্দবাজারে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দিলীপবাবুর ভাইয়ের বউ ও দিলীপবাবুর স্ত্রী একদিন আমার স্ত্রীকে বললেন, "প্রবীরবাবুকে কাল বিকেলে আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে রিকশা করে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে দেখলাম। সিনেমায় যাচ্ছিলেন নাকি?"

সেদিন সেইসময় আমি ও আমার স্ত্রী বাড়িতেই ছিলাম।

আমার এক ভায়রা সুশোভন রায়চৌধুরী একদিন আমাদের বাড়ির কাছেই আমার স্ত্রীকে বলল, "প্রবীর অত হন্তদন্ত হয়ে কোথায় দৌড়ল?"

আমার স্ত্রী সীমা বলল, "ও তো বাড়িতেই রয়েছে।"

সুশোভন যথেষ্ট জোরের সঙ্গে বলল, "আমি এক্ষুনি দেখেছি ওকে ট্যাক্সি ধরতে।"

সীমাও বলল, "আমিও এক্ষুনি বাড়ি থেকে আসছি।"

দু'জনেই এসে হাজির হলো আমি আছি কিনা দেখতে। আমি অবশ্য বাড়িতেই ছিলাম।

এই ধরনের আরও অনেক ঘটনাই আমার জীবনে ঘটেছে। শুধু আমার জীবনেই বা বলি কেন? আমাদের এক সহকর্মী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য একদিন অফিসে এসে আমাকে বললেন, "তোমার বউকে দেখলাম মিনিবাসে। এক মিনিবাসেই এলাম।"

আমি জানালাম, "সীমা এখন জামশেদপুরে। অন্য কাউকে দেখেছেন।'

বিশ্বনাথদা বেশ কয়েকবার সীমাকে দেখেছেন, অতএব ভুল হওয়া উচিত নয়। বিশ্বনাথদা বললেন, "বিশ্বাস করো, যাকে দেখেছি সে অবিকল সীমার মতো দেখতে।"

এই ধরনের ভুল আরও অনেকের জীবনেই হয়েছে। হয়তো আপনার জীবনেও। যেসব সাধুদের একাধিক জায়গায় একই সময়ে দেখা গেছে, সেগুলো যে এই ধরনের ভুল অথবা মিথ্যে প্রচার বা কৌশলমাত্র, তাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। আমার সামনে কোনও অলৌকিক ক্ষমতাধর যদি নিজেকে দু'জন হিসেবে উপস্থিত করতে পারে তবে আমার যুক্তিবাদী সব ধারণাই একান্ত মিথ্যে বলে স্বীকার করে নেব।

এটা সত্যিই দুঃখের যে, লেখাপড়া জানা লোকেদের বেশির ভাগই অনেক অলৌকিক গাল-গল্পকেই যাচাই না করে অথবা যুক্তি দিয়ে বিচার না করেই বিশ্বাস করে ফেলেন।

অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার তান্ত্রিক ও সন্ন্যাসীরা

আচার্য শ্রীমদ গৌরাঙ্গ ভারতী এবং পাগলাবাবা (বারাণসী) দু'জনেই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে পরিচিত। দু'জনেরই ভক্ত-সংখ্যা যথেষ্ট। দু'জনেরই নাম একসঙ্গে উল্লেখ করার কারণ দু'জনের অলৌকিক ক্ষমতা একই ধরনের। আমি শুনেছিলাম এঁরা যে-কোন প্রশ্নের উত্তর লিখিতভাবেই দিয়ে থাকেন, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে উত্তরগুলো নাকি ঠিক হয়।

আমি ১৯৮৫'র মার্চে গৌরাঙ্গ ভারতীর কাছে গিয়েছিলাম। কিঞ্চিৎ লিখিটিখি শুনে তিনি আমাকে কথা বলার জন্য যথেষ্ট সময় দিয়েছিলেন এবং যথেষ্ট খাইয়েছিলেন। কথায় কথায় গৌরাঙ্গ ভারতী বলেন, তিনি বর্তমানে বেশ কয়েক বছর ধরে অদ্ভুত এক ধরনের অসুখে ভুগছেন। অসুখটা হল হেঁচকি। একনাগাড়ে হেঁচকি উঠতেই থাকে। এ-ও জানালেন কলকাতার তাবড় ডাক্তারদের সাহায্য নিয়েও আরোগ্যলাভ করতে পারেননি।

আমি কিন্তু গৌরাঙ্গ ভক্তদের কাছে শুনেছি, তিনি বিভিন্ন ভক্তদের দুরারোগ্য রোগ ভাল করে দিয়েছেন। স্বভাবতই গৌরাঙ্গ ভারতীকে প্রশ্ন করেছিলাম, "আপনার ওপর লেখা একটা বইতে পড়লাম আপনি শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরীমাতার বরপুত্র, বাক্-সিদ্ধ, অতীন্দ্রিয় ঐশী-শক্তির অধিকারী। আপনি নিজে যে কোন দুরারোগ্য রোগ যখন মায়ের কৃপায় সারাতে সক্ষম, তখন নিজের রোগ কেন সারাচ্ছেন না?"

"পরমপুরুষ রামকৃষ্ণদেব কি নিজের ক্যানসার সারাতে পারতেন না? কিন্তু, তিনি মায়ের দেওয়া রোগ-ভোগকেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন," গৌরাঙ্গ ভারতী উত্তর দিয়েছিলেন।

আমি প্রশ্ন রেখেছিলাম, "মায়ের দেওয়া রোগকে যদি মেনেই নিতে চান, তবে কেন রোগ সারাবার জন্য আধুনিক চিকিৎশাস্ত্রের সাহায্য নিচ্ছেন?"

না; সঠিক উত্তর ওঁর কাছ থেকে আমি পাইনি। আমতা আমতা করেছিলেন। তবে যা পেয়েছিলাম তাতে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি দিয়েছিলেন আমার প্রশ্নের সঠিক লিখিত উত্তর। আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল, "আমি কি বিবাহিত?"

একটা চোট রাইটিং-প্যাডে উত্তরটা লিখে গৌরাঙ্গ ভারতী তাঁর হাতের কলমটা নামিয়ে রেখে আমাকে বললেন, "আপনি কি বিয়ে করেছেন?" বললাম, "হ্যাঁ, করেছি।"

প্যাডটা আমার চোখের সামনে মেলে ধরলেন গৌরাঙ্গ ভারতী। লেখাটা জ্বল-জ্বল করছে 'বিবাহিত'।

আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন রাখলাম, "আমার প্রথম সন্তান ছেলে না মেয়ে?"

এবারও উত্তর লিখে কলম নামিয়ে রেখে উনি আমাকে পালটা প্রশ্ন করলেন, "আপনার প্রথম সন্তান কি?"

বললাম, "ছেলে"।

"দেখুন তো কি লিখেছি?" প্যাডটা আবার মেলে ধরলেন আমার সামনে। স্পষ্ট লেখা রয়েছে 'ছেলে'।"

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও ছিল ঠিক। আমার অবাক হওয়া চোখমুখ দেখে গৌরাঙ্গ ভারতী আমাকে দুম্ করে 'আপনি' থেকে 'তুই' সম্বোধন করলেন। বললেন, "কি, অবাক হচ্ছিস? এমনি অবাক আরও অনেকেই হয়েছে। বিজ্ঞানচার্য সতেন্দ্রনাথ বসু, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, সাংবাদিক তুষারকান্তি ঘোষ, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, ভারত বিখ্যাত ডাক্তার আই এস রায়, ডাঃ সুনীল সেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন, বিশ্বজয়ী সেতার শিল্পী পণ্ডিত রবিশঙ্কর, কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অমরেন্দ্রনাথ সেন, পশ্চিমবাংলা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিজয়কুমার ব্যানার্জি, সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার, শৈলজানন্দ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র কতজনের আর নাম বলব। একটা বই আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, তুই বইটা পড়লে আরও অনেকের নাম দেখতে পাবি।"

বললাম, "আগেই পড়েছি। হ্যাঁ, বইয়ে অবশ্য এঁদের নাম দেখলাম।"

"আর কিছু প্রশ্ন করবি?"

বললাম, "বলুন তো, আমার বাবা-মা দু'জনেই বেঁচে?"

"তোর ভবিষ্যৎ জানতে না চেয়ে তুই শুধুই দেখছি আমাকে পরীক্ষা করছিস। ভাল, এমনি বাজিয়ে নেওয়াই ভাল। রামকৃষ্ণের অনেক ভক্ত থাকা সত্ত্বেও বিবেকানন্দ কিন্তু ভক্তদের বিশ্বাসে আস্থা না রেখে নিজে রামকৃষ্ণের খাঁটিত্ব পরীক্ষা করে নিয়েছিলেন। আর তাইতেই তো শেষ পর্যন্ত বিবেকানন্দই হয়ে উঠেছিলেন রামকৃষ্ণের এক নম্বর ভক্ত। কোন কোন বিখ্যাত লোকেরা আমার ভক্ত তা দেখে-শুনেই যে তোর মাথা গুলিয়ে যায়নি এটা খুব ভালো লক্ষণ। তুই যে খুব বড় হবি এটা তারই পূর্বাভাস। গৌরাঙ্গ ভারতী প্যাডে আমার প্রশ্নের উত্তর লিখে কলম সরিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তোর বাবা-মা দু'জনেই বেঁচে?"

বললাম, "দু'জনেই মারা গেছেন!"

গৌরাঙ্গ ভারতী প্যাডটা ধরলেন আমার সামনে। আমি যা বলেছি তাই লেখা রয়েছে।

এবার আবার আমার অবাক হওয়ার পালা। কারণ উত্তরটা আমি এবার মিথ্যে

করেই দিয়েছিলাম। বাস্তবে তখন আমার মা-বাবা দু'জনেই জীবিত। বুঝলাম আমি যা উত্তর দেব তাই প্যাডে লেখা দেখতে পাব। সেই রাত বাড়ি ফিরেই আমি আমার ছেলে পিনাকী ও স্ত্রী সীমাকে বললাম, "তোমরা আমাকে এমন কিছু প্রশ্ন করো যার উত্তর তোমরা জানো। আমি লিখিতভাবে সঠিক উত্তর বলে দেব" শেষ পর্যন্ত সঠিক উত্তর লিখে দিলাম প্রতিটি ক্ষেত্রে। পরের দিন আমাদের বাড়ির কাজের বউটিকে, অফিসের কয়েকজন সহকর্মীকে, আকাশবাণীর ডঃ অমিত চক্রবর্তীকে এই একই ধরনের প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখে দিয়ে চমকে দিলাম। তারপর অবশ্য মনোরোগ চিকিৎসক ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার হেডকোয়ার্টার সুবিমল দাশগুপ্তকে এক সামান্য

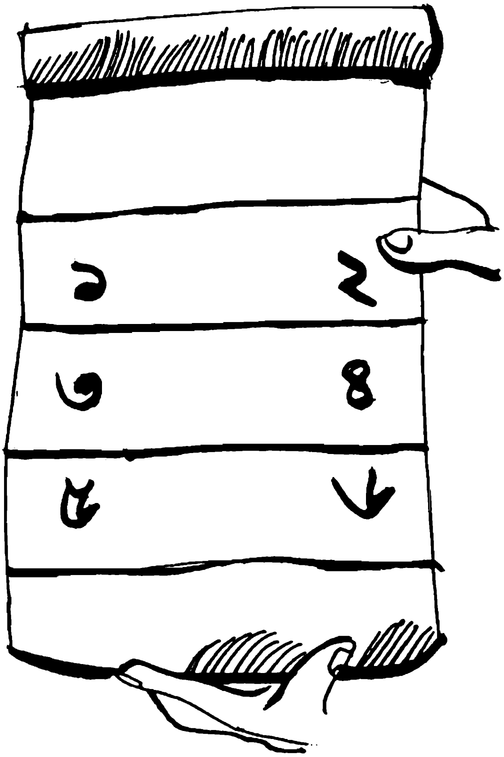

থট্-রিডিং-এর আসল রহস্য

কৌশলেই অবাক করে দিয়েছিলাম। মনে আছে, সুবিমলবাবু ও ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের চেম্বারে বসেই বলেছিলেন, বলুন তো আমরা ক'ভাইবোন? আপনি যদি বলতে পারেন তো বুঝব আপনার অলৌকিক ক্ষমতা আছে।

ধীরেনদারই একটা প্যাডে সঠিক উত্তর লিখেছিলাম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন এককালের কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের সর্বময়কর্তা সুবিমলবাবু।

আমার লেখা শেষ হতেই কলমটা সরিয়ে রেখে বলেছিলাম, "উত্তর লেখা হয়ে গেছে। এবার আপনি বলুন তো, আপনারা ক' ভাইবোন?"

"আমি কেন বলব। আপনিই বলুন, "সুবিমলবাবু বলেছেন।

"উত্তর তো লেখা হয়েই গেছে। আর পরিবর্তন করার কোনও সুযোগ নেই। এবার শুধু দেখার পালা, সঠিক উত্তর দিতে পেরেছি কী না।"

সুবিমলবাবু আমার যুক্তি মেনে নিয়ে উত্তর দিলেন, "ছয়।"

প্যাডটা মেলে ধরলাম, তাতেও লেখা হয়েছে—ছয়।

সুবিমল দাশগুপ্ত অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে অবাক কণ্ঠে বললেন, "আশ্চর্য তো। আমার ক'জন ভাইবোন তা আপনার পক্ষে জানা অসম্ভব। সত্যি, আজ অদ্ভুত এক অলৌকিক-ক্ষমতা দেখলাম!"

সুবিমলবাবুকে বললাম, "আপনি যেটাকে অলৌকিক বলে ভাবলেন, সেটা আদৌ কিন্তু কোন অলৌকিক ঘটনা নয়। এর পেছনে রয়েছে নেহাতই কৌশল।"

"অসম্ভব। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি প্রমাণ করতে পারবেন, এটা কৌশল?" সুবিমলবাবু চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন আমাকে।

কৌশলটা আরও অনেকের মতোই সুবিমলবাবুকেও শিখিয়ে দিলাম। প্যাডে সম্ভাব্য প্রতিটি উত্তরই লিখে রাখি। তারপর প্রশ্নকর্তার কাছ থেকেই উত্তর শুনে নিয়ে কাগজটা কায়দা মতো ভাঁজ করে, এবং ডান বা বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের সাহায্যে উত্তর ছাড়া বাকি লেখাগুলো ঢেকে দিই। ফলে সকলে শুধু উত্তরটাই দেখেন। গৌরাঙ্গ ভারতীর মতোই পাগলাবাবা বারাণসীর ভক্তদের মধ্যেও রয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও বিখ্যাত বহু ব্যক্তি।

আরও অনেক অলৌকিক ক্ষমতাধরও (?) নিশ্চয়ই আছেন, যাঁরা লিখে উত্তর দিয়েই কাত করে দিচ্ছেন বহু জ্ঞানী-গুনীজনকে। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই সুবিমল দাশগুপ্তের মতোই ঘটনার পেছনে নিজস্ব কোনও যুক্তি খাড়া করতে না পেরে ধরে নেন ঘটনাটা অলৌকিক।

সাধারণত আমরা যখন কোন অলৌকিক ঘটনা দেখি তখন সেই ঘটনার পেছনে কোনও যুক্তি নিজেরা খাড়া করতে না পারলেই ধরে নিই ঘটনাটা নিশ্চয়ই অলৌকিক। কখনই ভাবি না যে, এই ঘটনার পেছনে অবশ্যই আমার অজানা কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। এর কারণ অহং বোধ। আমি কী আর ভুল দেখেছি!

কামদেবপুরের ফকিরবাবা

প্রথম যৌবনে উত্তর ২৪ পরগনার কামদেবপুরের 'ফকির বাবা'র অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে একসময় যথেষ্ট আকৃষ্ট হয়েছিলাম। শুনলাম ফকিরবাবা নাকি যে কোনও রোগীর রোগ সারিয়ে দিতে পারেন। চিত্রাভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের নাকি লিউকোমিয়া হয়েছিল। এ-দেশ ও বিদেশের প্রচুর চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সুচিত্রাকে রোগমুক্ত করতে পারেনি। ফকিরবাবার কথা শুনে শেষ ভরসা হিসেবে সুচিত্রা ছুটে এসেছিলেন কামদেবপুরে। ফকিরবাবা নাকি প্রমাণ করেছিলেন বিজ্ঞানের বাইরেও কিছু আছে। বাবার কৃপায় সুচিত্রা নাকি রোগমুক্ত হয়েছিলেন।

শনি, মঙ্গলবার ফকিরবাবা তাঁর গুরুদেব গোরাচাঁদ পীরের সমাধির ওপর তৈরি একটা ঘরে বসেন। পীরের সমাধির ওপর বসে থাকলে ফকিরবাবার উপর গোরাচাঁদ পীরের ভর হয়। ঘরের দরজা থাকে বন্ধ। এক এক করে দর্শনার্থীদের নাম ডাকা হয়। দর্শনার্থী বন্ধ ঘরের বাইরে বসেন। ফকিরবাবা অ-দেখা মানুষটির অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং সমস্যা সমাধানের উপায় সবই বলে দেন ভরের ঝোঁকে। সমস্যার সমাধান বা রোগমুক্তির ওষুধ নিতে প্রার্থীদের আবার আসতে হয় শুক্র ও রবিবার।

ঠিক করলাম, ফকিরবাবার কাছে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে যাব। ১৯৬৬-র এপ্রিলের এক শনিবার সকালে আমরা পাঁচ বন্ধুতে বেরিয়ে পড়লাম। আমার সঙ্গী ছিল তপন, গোরা, দিলীপ ও সমীর। তপন ও গোরা তখন সরকারি চাকুরে। দিলীপ কস্টিং ও চাটার্ড পড়ছে। সমীর বাবার কনস্ট্রাকশন বিজনেস দেখছে। আমি স্নাতক হতে তৈরি হচ্ছি ও ছাত্র পড়াচ্ছি।

বারাসাত থেকে ৮ কিলোমিটারের মতো উত্তরে কামদেবপুরের ফকিরবাবার আস্তানা। পৌঁছে অবাক। সাতসকালে প্রায় মেলা বসে গেছে। বহু সহযাত্রীদের সঙ্গেই ইতিমধ্যে বাসেই আলাপ হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বা রোগমুক্তির আশায় চলেছেন। অনেকে আমাদের পরিচয় ও আসার উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন, বললাম।

টাকা-পয়সা দিয়ে নাম লিখিয়ে এবার আমাদের দীর্ঘ অপেক্ষার পালা। ঘুরে-ঘুরে বিভিন্ন মানুষদের সঙ্গে আলাপ করে, দোকানে দোকানে চা, কচুরি, জিলিপি খেয়ে আর ফকির বাবার কয়েকজন ভক্ত শিষ্যের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটালাম। ফকিরবাবার সম্বন্ধে অনেক খবরই পেলাম। ফকিরবাবা নাকি এই অলৌকিক ক্ষমতা পেয়েছেন তাঁর স্বপ্নে পাওয়া গুরুদেব গোরাচাঁদ পীরের কাছ থেকে। গোরাচাঁদ পীর দেহ রেখেছেন ৭০০ বছর আগে। আসল নাম ছিল পীর হজরত সৈয়দ আব্বাস আলী। গৌরবর্ণের সৌম্য দর্শন পীরটিকে সংখ্যাগুরু হিন্দুরা নাকি ভালবেসে নাম দিয়েছিলেন গোরাচাঁদ।

স্বপ্নাদেশ পেয়ে ফকির হবার আগে ফকিরবাবা সূর্য নামে পরিচিত ছিলেন। পুরো নাম, সূর্যকুমার মাইতি। ব্যবসা ছিল দুধ বিক্রি করা ও কবিরাজি। সূর্য মাইতির বাবা প্রিয়নাথ ছিলেন কবিরাজ। ছেলে সূর্য ওষুধ তৈরিতে সাহায্য করতেন। বর্তমানে সূর্য মাইতি ওরফে ফকিরবাবার চার মেয়ে দুই ছেলে। ছেলেরা বাবাকে সাহায্য করছেন। কামদেবপুরের দোকানি-পশারিরাও ফকিরবাবার পরম ভক্ত। ফকিরবাবার অনেক অলৌকিক ঘটনার কথাই শুনলাম। ভরে ফকির বাবা ত্রিকালদর্শী হয়ে ওঠেন। তখন বন্ধ দরজার ওপাশে মানুষটি বসলেই বাবা তাঁর সব-কিছুই জানতে পারেন। এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না, সপ্তাহের চারটে দিন বাবার কল্যাণে কামদেবপুরের আশপাশের বহু মানুষ দোকান-পশার করে দু-পয়সা ঘরে তুলছে।

কোনও কিছু চুরি গেলে বা হারিয়ে গেলে অবশ্য ফকিরবাবার কাছে এসে লাভ নেই। একটা সাইনবোর্ডে লেখাই আছে, চুরি বা হারানোর জন্য আসবেন না।

দেখলাম, ভক্তদের কৃপায় বাবার অর্থের অভাব নেই। গাড়ি, বাড়ি সবই আছে।

একসময় আমাদের ডাক পড়তে শুরু করল। আমার ডাক পড়তে ফকিরবাবার কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম, "আমি কি শিগ্‌গির কোনও চাকরি-বাকরি পাব বাবা?"

বাবা উত্তর দিয়েছিলেন, "না, চাকরি তোর হবে না। কাঁচা আনাজের যে ব্যবসা এখন করছিস, তাই আরও বেশ কিছু বছর করতে হবে।"

১৯৬৬-র মে মাসেই, অর্থাৎ ঠিক তার পরের মাসেই আমি স্টেট ব্যাঙ্কে যোগ দিই।

কাঁচা-আনাজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক চিরকালই ক্রেতা হিসেবে। ফকিরবাবার এই ধরনের ভুল করার কারণ, আমাদের পাঁচ বন্ধুর পোশাক, কথাবার্তা, আলোচনা সবই ছিল মুদির দোকানি ও কাঁচা-আনাজের ব্যবসায়ীর মতো। ফকিরবাবার খবর সংগ্রহকারীরা তাই আমাদের সঙ্গে আলাপ করে আমাদের নামের সঙ্গে যে পরিচয় ফকিরবাবাকে দিয়েছিল, ফকিরবাবা সেই পরিচয়কেই সত্যি বলে ধরে নিয়েছিলেন। তাই আমাদের পাঁচ বন্ধুর সমস্যা ও জীবিকা সম্পর্কেই পুরোপুরি ভুল করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আগরতলার ফুলবাবা

১৯৮৬-র ২৮ ফেব্রুয়ারি। আগরতলা প্রেস ক্লাবের হলে একটা প্রেস কনফারেন্স ছিল 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিরোনামের অলৌকিক বিরোধী এই প্রেস কনফারেন্সে যোগ দিতে আমি তিনদিন আগেই আগরতলা পৌঁছোই। সেখানে এক সাংবাদিক বন্ধু আমাকে প্রথম ফুলবাবার কথা বলেন। তাঁর কথামতো ত্রিপুরার সবচেয়ে ক্ষমতাবান অবতার এই ফুলবাবা। ইতিমধ্যে স্থানীয় তিনটি দৈনিক

পত্রিকার সম্পাদক ও কিছু সংগঠন এবং সেই সময়কার ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিমল সিনহা ফুলবাবার বিপুল জনপ্রিয়তার কথা বলেছিলেন।

শনি, মঙ্গলবার সকাল থেকেই ফুলবাবার আশ্রম ঘিরে বিশাল ভিড় জমে ওঠে। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষজন আসেন রোগ মুক্তি আশায় ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের আশায়। কামদেবপুরের পীরের মতোই এখানেও দর্শনার্থীরা সকালে নাম লিখিয়ে

কামদেবপুরের ফকিরবাবা

অপেক্ষা করতে থাকেন। দুপুর থেকে দর্শনার্থীদের ডাক পড়তে থাকে। ফুলবাবাও ফকিরবাবার মতোই ভক্তদের নাম শুনেই বলে দিতে থাকেন কী সমস্যা নিয়ে তাঁরা এখানে এসেছেন। কাউকে হয়তো বলেন, "কীরে, মায়ের অসুখ?" আবার কাউকে বলেন, "অফিসের কাজে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে, না রে?"

অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় ফুলবাবা কৃপাপ্রার্থীদের মনের কথাই বলে দিয়েছেন। যাঁদেরটা মেলে তাঁরা ফুলবাবার এমন অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ হয়ে বাবার মহিমা প্রচারে নেমে পড়েন। স্বভাবতই বাবার জীবন্ত কিংবদন্তি হতে অসুবিধে হয় না।

বাবাকে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখার ইচ্ছেয় ২৭ ফেব্রুয়ারি এক স্থানীয় সাংবাদিক পারিজাতকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলাম ফুলবাবার ডেরায়। যদিও সেদিন বৃহস্পতিবার, তবু ভিড়ের খামতি ছিল না। ফুলবাবা মন্দিরের সামনের চাতালেই বসেছিলেন। সাংবাদিক বন্ধুটি ফুলবাবাকে প্রণাম করে নিজের পরিচয় দিয়ে আমার সঙ্গে পরিচয় করালেন। আমার পরিচয় দিলেন সাহিত্যিক-সাংবাদিক হিসেবে। বাবাকে প্রণাম করলাম। বাবা আমার সারা শরীরে চোখ বোলালেন। আমার গলায় ও আঙুলে ছিল ঘণ্টা কয়েক আগে ধার করে পরা রুদ্রাক্ষের মালা ও প্রবালের আংটি। বাবা ও-দুটি

দেখে নিশ্চিন্ত হলেন আমি নাস্তিক নই। বাবা আশীর্বাদ করে বসতে বললেন।

ফুলবাবার সঙ্গে কথা বলে তাঁর সম্পর্কে কিছুকিছু শুনলাম। বর্তমান বয়স ৫৬। আদি নিবাস বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। আগরতলায় চলে আসেন ২২/২৩ বছর আগে। সাধকজীবনের আগে নাম ছিল শান্তিকুমার দে। মহারাজ অদ্বৈতানন্দ পুরীর কাছে দীক্ষা। ফুলবাবার আশ্রমে রয়েছে ভুবনেশ্বরী দেবীর মূর্তি। মা ভুবনেশ্বরীই ফুলবাবার একমাত্র আরাধ্যা দেবী। মা ভুবনেশ্বরীর অপার কৃপার ফুলবাবা যে কোনও মানুষের ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দেখতে পান। মায়ের কৃপাতেই মানুষের সমস্যার সমাধান করেন।

শাক্ত হলেও ফুলবাবার কথায় ছিল বৈষ্ণবের পেলবতা। বাবার আদেশমতো একজন ইতিমধ্যে রেকাবিতে প্রসাদি সন্দেশ নিয়ে এলেন। সন্দেশ আর জলপানের পর আমার সমস্যার কথা বললাম।—রোজগারপাতি মন্দ করছি না। একটা ফ্ল্যাটও কিনেছি। ঘর হলেও ভাগ্যে এখন ঘরণী জোটেনি। একটি মেয়েকে ভালবাসতাম। বছর তিনেক আগে ওর সঙ্গে আমার বিয়ের তারিখ ঠিক হলো। তার কয়েক দিনের মধ্যেই ওর ক্যানসার ধরা পড়ল। মাস তিন-চারেকের মধ্যে বেচারা মারা পড়ল। এরপর আরও দু'জায়গায় বিয়ের কথা কিছুটা এগোলেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচিওর করেনি। যথেষ্ট বয়েসও হয়েছে।

ফুলবাবা অভয় দিলেন। দুর্ভোগ দিন শেষ হয়েছে। এবার ভোগের দিন শুরু। আর তাই তো মা ভুবনেশ্বরী আপনাকে আজকে টেনে এনেছেন। যাঁর সঙ্গে আপনার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, তিনি সমস্ত দিক থেকেই ছিলেন আপনার উপযুক্ত। আপনারা দু'জনেই দু'জনকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। যিনি দেওয়ার তিনিই তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনিই আবার দেবেন। আগামী ১৯৮৭-র আগস্টের মধ্যে আপনার বিয়ে হবে। ভাল বিয়ে।

ফেরবার পথে সাংবাদিক বন্ধুটিকে দেখলাম ফুলবাবার ক্ষমতার দৌড় দেখে অবাক। আমার অবশ্য অবাক হওয়ার মতো কিছু ছিল না। জানতাম, আমার বলা কথাগুলো যে পুরোটাই গপ্পো, সেটুকু ধরার মতো অলৌকিক ক্ষমতা আর সব অবতারদের মতোই ফুলবাবারও নেই। আমি বিবাহিত, একটি পুত্রের পিতা। ফ্ল্যাট কিনিনি। এবং প্রসঙ্গত জানাই '৮৯-এর এই ডিসেম্বরেও আমার নতুন করে কোনও বিয়ে হয়নি। প্রেমিকার ক্যানসারে মৃত্যু? সেটাও নিছকই গপ্পো কথা।

২৮ ফেব্রুয়ারির প্রেস কনফারেন্সে বিভিন্ন আলোচনার মাঝে ফুলবাবার প্রসঙ্গ টেনে বলেছিলাম, "আপনাদের অনেকের কাছেই ফুলবাবা জীবন্ত অলৌকিকতার প্রতীক। তাঁর কাছে আপনাদের কেউকেউ হয়ত ফুলবাবার কাছে ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে হাজির হয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখেছেন, আপনার আসার উদ্দেশ্য ফুলবাবার অজানা নয়। আপনাদের কারও কারও একান্ত ব্যক্তিগত কিছু অতীত ঘটনাও ফুলবাবা বলে দিয়েছেন, এই অভিজ্ঞতাও বোধহয় এখানে উপস্থিত কারও কারও আছে।

আপনারা নিশ্চয়ই ভেবেছেন—আমাকে তো ফুলবাবা আগে থেকে চিনতেন না। তবে কি করে তিনি আমার আসার উদ্দেশ্য, অতীতের ঘটনা সবই ঠিক-ঠাক বলে দিলেন? শেষ পর্যন্ত আপনাদের যুক্তিতে এর কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে না পেয়ে ধরে নিয়েছেন ফুলবাবা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।

ত্রিপুরায় আমি নির্ভেজাল আগন্তুক। সদ্য দিন দু'য়েক হলো এসেছি। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে হাতে গোনা দু'চারজন ছাড়া সকলেই আমার অপরিচিত। অপরিচিত দর্শকদের কাছে অনুরোধ, আপনারা যাঁরা নিজেদের অতীত আমার মুখে শুনতে আগ্রহী, হাত তুলুন। পরিচিতদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা অনুগ্রহ করে হাত তুলবেন না। অবশ্য এই পরিচিতদের সঙ্গেও পরিচয় ঘটেছে মাত্র দিন দু'য়েক। অতএব তাঁদের অতীতের খুঁটিনাটি জানার মতো সময়-সুযোগ এখনও ঘটেনি।

বিরাট সংখ্যক দর্শক হাত তুললেন। বললাম, আপনাদের সবার অতীত বলতে গেলে তো রাত কাবার হয়ে যাবে। তারচেয়ে বরং আপনারাই ঠিক করুন, কার অতীত বলব। আপনারা যাঁরা হাত তুলেছেন, ব্যবস্থাপকরা আপনাদের প্রত্যেকের হাতে এক টুকরো করে কাগজ তুলে দেবে। আপনারা তাতে নিজেদের নাম লিখে ফেলুন।"

একটা ফাঁকা বাক্স দেখিয়ে বললাম, "আমি এই বাক্সটা নিয়ে আপনাদের কাছে যাচ্ছি। আপনাদের নাম লেখা কাগজের টুকরোগুলো এই বাক্সতে ফেলুন।"

তাই হল। এবার দর্শকদের অনুরোধ করলাম, "আপনাদের মধ্যে থেকে একজন কেউ আসুন, এবং চোখ বুজে এই নামগুলো থেকে একটা নাম তুলে দিন।"

একজন এলেন। নাম তুললেন। বললাম, "এবার নামটা পড়ে শোনান।"

তিনি পড়লেন। বললাম, "যার নাম পড়া হলো তিনি এবার উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে মাইক্রোফোনের একটা মাউথ-পিস্ ধরিয়ে দিলাম।

বললাম, "আমি এবার আপনার অতীত সম্পর্কে বলতে শুরু করছি। মিললে হ্যাঁ বলবেন। না মিললে না।"

আমি শুরু করলাম, "আপনি কি ১৯৭৩ সালে চাকরি পেয়েছেন?"

—"হ্যাঁ।"

—"বিয়ে' ৮০তে।"

—"হ্যাঁ।"

—"৮২-তে পুত্রলাভ?"

—"হ্যাঁ।"

—"৮৪-তে প্রমোশন।"

—৮৩-তে বাবা মারা যান।"

—"হ্যাঁ।"

—"আপনার তো একটিই সন্তান।"

—হ্যাঁ।"

এমনি আরও অনেক কিছুই বলে গিয়েছিলাম, আর প্রতিটির ক্ষেত্রেই উত্তর পেয়েছিলাম, "হ্যাঁ"।

উপস্থিত দর্শকরা ঘটনার নাটকীয়তা দারুণ রকম উপভোগ করেছিলেন। টান-টান উত্তেজনায় তুমুল হাততালি দিয়ে অভিনন্দিত করেছিলেন। দর্শকদের এই বিমূঢ় বিস্ময়ের পেছনে আমারও সেই কৌশলই ছিল, যা ফুলবাবা এবং কামদেবপুরের ফকিরবাবা প্রয়োগ করে থাকেন।

প্রেস ক্লাবের হলে এসে আমি দু'তিনজনকে আমার লক্ষ্য হিসেবে ঠিক করে নিয়ে দ্রুত তাঁদের সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করেছিলাম ব্যবস্থাপকদের সহায়তায়। তারপর সামান্য জাদু কৌশলের সাহায্যে আমার ইচ্ছে মতো ব্যক্তিটির নাম তুলতে বাধ্য করেছিলাম। আর তারপরই ঘটিয়ে ফেললাম অসাধারণ অলৌকিক (?) ঘটনা।

অবতারদের নিজদেহে রোগ গ্রহণ

বহু বিখ্যাত ও অখ্যাত সাধু-সন্ন্যাসী বা জীবন্ত ভগবানের সম্বন্ধে শুনেছি, তাঁরা অনেক দুরারোগ্য রোগ সারাতে পারেন। এমনকী যে সব ধরনের ক্যানসারের চিকিৎসা আজও আবিষ্কৃত হয়নি, এইসব সাধুজনেরা তাও আরোগ্য করতে সক্ষম। এই সব অবতারেরা যখন কঠিন রোগে আক্রান্ত হন, তখন শোনা যায় ভক্তের কঠিন রোগ গ্রহণ করার জন্যেই নাকি অবতারের এই অবস্থা।

গৌরাঙ্গ ভারতী একটা অদ্ভুত রোগে দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ। হেঁচকি রোগ। যখন-তখন অনবরত হেঁচকি ওঠে। তিনি নিজেই আমাকে বলেছিলেন, অনেক বড়-বড় ডাক্তার দিয়ে নাকি চিকিৎসা করিয়েছেন। কিন্তু কোনও ফল পাননি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনি তো ভক্তদের যে কোন রোগই সারিয়ে দেন বলে শুনেছি, তবে কেন নিজে ভুগছেন?"

"রামকৃষ্ণ কী নিজের অসুখ সারাতে পারতেন না? তিনি কেন সারালেন না, কারণ একটাই। মা যখন রোগ-ভোগ দিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই ভোগ করব। অন্যের হয়ে মায়ের কাছে বলার জন্য ওকালতনামা নিয়েছি। নিজের কিছু চাওয়ার জন্য নয়," বলেছিলেন গৌরাঙ্গ ভারতী।

ওই ধরনের সুন্দর পাশকাটানো জবাব যেমন অনেকে দেন তেমনি সাঁইবাবা বা অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের মতো অনেকের সম্বন্ধেই ভক্তরা দাবি করেন—এঁদের অসুস্থতার কারণ ভক্তের রোগ গ্রহণ। সাঁইবাবার একবার অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন করা হয়। ভক্তরা অনেকেই বিশ্বাস করেন, এক ভক্তের রোগগ্রস্ত অ্যাপেণ্ডিক্সের সঙ্গে নিজের সুস্থ অ্যাপেণ্ডিক্সের অদল-বদল করে নিয়েছিলেন সাঁইবাবা। হায় অন্ধ বিশ্বাস!

তাঁরা ভেবে নিলেন অলৌকিক ক্ষমতায় বিনা অস্ত্রোপচারেই অ্যাপেণ্ডিক্স বদল হয়ে গেল। যিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এতো বড় একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারলেন, তিনি নিজের অ্যাপেণ্ডিক্সের সামান্য প্রদাহটুকু বন্ধ করতে পারলেন না, এটাই আমাকে আরও বেশি আশ্চর্য করেছে।

যিনি অন্যের রোগ সারাতে পারেন, তিনি কেন নিজের রোগ সারাতে পারেন না? ভক্তদের মনের এই প্রশ্ন ও সংশয়ের নিরসনের জন্যই বাবাজিদের এই সব রোগ গ্রহণের মতো গালগল্পের আশ্রয় নিতে হয়।

এর পরেও অবশ্য কেউ কেউ বলতে পারেন, অমুক সাধুর দেওয়া ওষুধে তাঁর অসুখ সেরেছে। আমি বলি, নিশ্চয়ই সারতে পারে। সাধু বলে কী তাঁর চিকিৎসা করার মত জ্ঞান থাকতে নেই? এর মধ্যে অলৌকিকত্ব কোথায়?

বিশ্বাসে অসুখ সারে

অনেক সময় ওষুধ ছাড়াই এই সব অবতারেরা অনেক রোগ নিরাময় করেন। অনেক সময় ওষুধ ছাড়াও রোগ কমে। সেইসব রোগ কমার কারণ অলৌকিকত্ব নয়। কারণ অনেক অসুখ আপনা-আপনি সারে। শরীরের রোগ প্রতিহত করার ক্ষমতায় সারে। এই অবসরে একটি ঘটনা বলি ১৯৮৭-র মে মাসের এক সন্ধ্যায় কলকাতার থেকে প্রকাশিত একটু সুপরিচিত পত্রিকার সম্পাদকের স্ত্রী এসেছিলেন আমার ফ্ল্যাটে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক এক সাহিত্যিক-সাংবাদিক এবং জনৈক ভদ্রলোক।

চিকিৎসক জানালেন বছর আড়াই আগে সম্পাদকের স্ত্রী ডান উরুতে একটা ফোড়া হয়েছিল। ছোট অস্ত্রোপচার, প্রয়োজনীয় ইঞ্জেকশন ও ওষুধে ফোঁড়ার ক্ষত সম্পূর্ণভাবে সেরে যায়। কিন্তু এরপর ওই শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতস্থান নিয়ে শুরু হয় এক নতুন সমস্যা। মাঝে-মাঝেই উরুর শুকিয়ে যাওয়া ক্ষত ও তার আশপাশে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। কখনও ব্যথার তীব্রতায় রোগিণী অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে যেসব চিকিৎসকদের দেখান হয়েছে ও পরামর্শ নেওয়া হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই কলকাতার শীর্ষস্থানীয়। ব্যথার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ এঁরা খুঁজে পাননি। চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্র, এক্স-রে ছবি ও রিপোর্ট সবই দেখালেন আমাকে।

আমি পেশায় মানসিক চিকিৎসক না হলে মাঝে-মধ্যে এই ধরনের কিছু সমস্যা নিয়ে কেউ কেউ আমার কাছে হাজির হন। কাউন্সিলিং করি বা পরামর্শ দেই। রোগিণীর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক নানা বিষয়ে কথা বলতে বলতে উরুর শুকনো ক্ষতটা পরীক্ষা করে বললাম, "একবার খড়্গাপুরে থাকতে দেখেছিলাম একটি লোকের হাতের বিষ-ফোড়া সেপটিক হয়ে, পরবর্তীকালে গ্যাংগ্রিন হয়ে গিয়েছিল।

বিশ্বাস করুন, সামান্য ফোড়া থেকেও এই ধরনের ঘটনাও ঘটে।"

রোগিণী বললেন, "আমি নিজেই এই ধরনের একটা ঘটনার সাক্ষী। মেয়েটির হাতে বিষফোড়া জাতীয় কিছু একটা হয়েছিল। ফোড়াটা শুকিয়ে যাওয়ার পরও শুকনো ক্ষতের আশেপাশে ব্যথা হতো। একসময় জানা গেল, ব্যাথার কারণ গ্যাংগ্রিন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত কাঁধ থেকে হাত বাদ দিতে হয়।"

যা জানতে গ্যাংগ্রিনের গল্পের অবতারণা করেছিলাম তা আমার জানা হয়ে গেছে। এটা এখন আমার কাছে দিনের মতোই স্পষ্ট যে, সম্পাদকের স্ত্রী ফোঁড়া হওয়ার পর থেকেই গ্যাংগ্রিন স্মৃতি তাঁর মনে গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এই ফোড়া থেকেই আবার গ্যাংগ্রিন হবে না তো? এই প্রতিনিয়ত আতঙ্ক থেকেই একসময় ভাবতে শুরু করেন, "ফোড়া তো শুকিয়ে গেল, কিন্তু মাঝে-মধ্যেই যেন শুকনো ক্ষতের আশেপাশে ব্যথা অনুভব করছি? আমারও আবার গ্যাংগ্রিন হল না তো? সেই লোকটার মতোই একটা অসহ্য কষ্টময় জীবন বহন করতে হবে না তো?"

এমনি করেই যত দুশ্চিন্তা বেড়েছে, ততই ব্যথাও বেড়েছে। বিশ্বাস থেকে যে ব্যথার শুরু, তাকে শেষ করতে হবে বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েই।

আমি আরও একবার উরুর শুকনো ক্ষত গভীরভাবে পরীক্ষা করে এবং শরীরের আর কোথায় কোথায় কেমনভাবে ব্যথাটা ছড়াচ্ছে, ব্যথার অনুভূতিটা কী ধরনের ইত্যাদি প্রশ্ন রেখে গম্ভীর মুখ একটা নিপাট মিথ্যে কথা বললাম, "একটা কঠিন সত্যকে না জানিয়ে পারছি না, আপনারও সম্ভবত গ্যাংগ্রিনের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে একটু একটু করে।"

আমার কথা শুনে রোগিণী মোটেই দুঃখিত হলেন না। বরং উজ্জ্বল মুখে বললেন, "আপনিই আমার অসুখের সঠিক কারণ ধরতে পেরেছেন।"

আমি আশ্বাস দিলাম, "আমি অবশ্য নিশ্চিত নই, তবে আধুনিক মেশিনের সাহায্যে পরীক্ষা করলেই জানা যাবে, আমার অনুমান ঠিক কি না। আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তবে আপনার কর্তাটিকে একটু কষ্ট করতে হবে। বিদেশ থেকে ওষুধ-পত্তর আনাবার ব্যবস্থা করতে হবে। দেখবেন, তারপর সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।"

রোগ সৃষ্টি ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাসবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের শরীরে বহুরোগের উৎপত্তি হয় ভয়, ভাবনা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা থেকে। আমাদের মানসিক ভারসাম্য নির্ভর করে সামাজিক পরিবেশের ওপর। সমাজ জীবনে অনিশ্চয়তা, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ধর্মোন্মাদনা, জাত-পাতের লড়াই ইত্যাদি যত বাড়ছে দেহ-মনজনিত অসুখ বা Psycho-somatic disorder তত বাড়ছে। সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে থাকে বলে এই সময় তাঁদের অনেকে দেহ-মনজনিত অসুখের শিকার হয়ে পড়েন।

মানসিক কারণে যে-সব অসুখ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে, শরীরের বিভিন্ন স্থানের ব্যথা, মাথার ব্যথা, হাড়ে ব্যথা, স্পন্ডালাইটিস আরথ্রাইট্রিস, বুক ধড়ফড়, পেটের গোলমাল, পেটের আলসার, গ্যাসট্রিকের অসুখ, ব্লাডপ্রেসার, কাশি, ব্রঙ্কাইল অ্যাজমা, ক্লান্তি অবসাদ ইত্যাদি। মানসিক কারণে শারীরিক অসুখের ক্ষেত্রে ঔষধি-মূল্যহীন ক্যাপসুল, ইনজেকশন বা ট্যাবলেট প্রয়োগ করে অনেক ক্ষেত্রেই ভাল ফল পাওয়া যায়। এই ধরনের বিশ্বাস-নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে 'প্ল্যাসিবো' (placebo) চিকিৎসা পদ্ধতি। Placebo কথার অর্থ "I will please." বাংলায় অনুবাদ করে বলতে পারি, "আমি খুশি করব।" ভাবানুবাদ করে বলতে পারি আমি "আরোগ্য করব।"

রোগিণীর পারিবারিক চিকিৎসকের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলে জানলাম, কোনও পরীক্ষাতে-ই রোগের কোনও কারণ ধরা পরেনি। ডাক্তারদের অনুমান ব্যথার কারণ সম্পূর্ণ মানসিক। রোগিণীর মনে সন্দেহের পথ ধরে একসময় বিশ্বাসের জন্ম নিয়েছে তাঁর উরুর ফোঁড়া সারেনি, বরং আপাত শুকনো ফোঁড়ার মধ্যে রয়েছে গ্যাংগ্রিনের বিষ। রোগিণীর বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়ে কেমনভাবে প্ল্যাসিবো চিকিৎসা চালাতে হবে সে বিষয়ে একটা পরিকল্পনার কথা খুলে বললাম।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে রোগিণীর পারিবারিক ডাক্তার সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়া উরুর ফোঁড়ার ওপর নানা রকম পরীক্ষা চালিয়ে একটা মেশিনের সাহায্যে রেখা-চিত্র তৈরি করে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়ে আবার রেখা-চিত্র তোলা হলো। দু-বারের রেখা-চিত্রেই রেখার প্রচণ্ড রকমের ওঠা-নামা লক্ষ্য করে স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, গ্যাংগ্রিনের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। নিউ ইয়র্কে খবর পাঠিয়ে দ্রুত আনানো হলো এমনই চোরা গ্যাংগ্রিনের অব্যর্থ ইন্‌জেকশন। সপ্তাহে দু'টি করে ইন্‌জেকশন ও দু'বার করে রেখা-চিত্র গ্রহণ চলল তিন সপ্তাহ। প্রতিবার রেখা-চিত্রেই দেখা যেতে লাগল রেখার ওঠা-নামা আগের বারের চেয়ে কম। ওষুধের দারুণ গুণে ডাক্তার যেমন অবাক হচ্ছিলেন, তেমন রোগিণীও। প্রতিবার ইন্‌জেকশনেই ব্যথা লক্ষণীয়ভাবে কমছে। তিন সপ্তাহ পরে দেখা গেল রেখা আর আঁকা-বাঁকা নেই, সরল। রোগিণীও এই প্রথম অনুভব করলেন, বাস্তবিকই একটুও ব্যথা নেই। অথচ মজাটা হলো এই যে, বিদেশী দামী ইন্‌জেক্‌শনের নামে তিন সপ্তাহ ধরে রোগীণীকে দেওয়া হয়েছিল স্রেফ ডিসটিলড্‌ ওয়াটার।

পঞ্চম সপ্তাহে 'আজকাল' পত্রিকার রবিবারের ক্রোড়পত্র একটা আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। শিরোনাম 'বিশ্বাসে অসুখ সারে'। মহিলার ঘটনাটির উল্লেখ করে লেখাটা শুরু করেছিলাম।

বছর পনেরো আগের ঘটনা। আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে দমদমের 'শান্তিসদন' নার্সিং হোমে ভর্তি হন। ওই সময় শান্তি সদনের অন্যতম কর্ণধার অতীন রায়ের

সঙ্গে কিছু ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়। তিনি সেই সময় অতি সম্প্রতি আসা এক রোগিণীর কেস হিস্ট্রি শোনালেন। মাঝে মাঝেই রোগিণীর পেটে ও তার আশেপাশে ব্যথা হত। আশ্চর্য ব্যাপার হল, প্রতিবারই ব্যথাটা পেটের বিভিন্ন জায়গায় স্থান পরিবর্তন করত। এই দিকে আর এক সমস্যা হল, নানা পরীক্ষা করেও ব্যথার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ডাক্তার রোগিণীকে একটা ক্যাপসুল দিয়ে বললেন, এটা খান, ব্যথা সেরে যাবে। ক্যাপসুল খাওয়ার পর রোগিণীকে একটা ক্যাপসুল দিয়ে বললেন, এটা খান, ব্যথা সেরে যাবে। ক্যাপসুল খাওয়ার পর রোগিণীর ব্যথার কিছুটা উপশম হল। অথচ ক্যাপসুলটা ছিল নেহাতই ভিটামিনের। ব্যথা কিন্তু বারো ঘণ্টা পরে আবার ফিরে এলো।

আবার ভিটামিন ক্যাপসুল দেওয়া হলো। এবারও উপশম হল সাময়িক। এভাবে

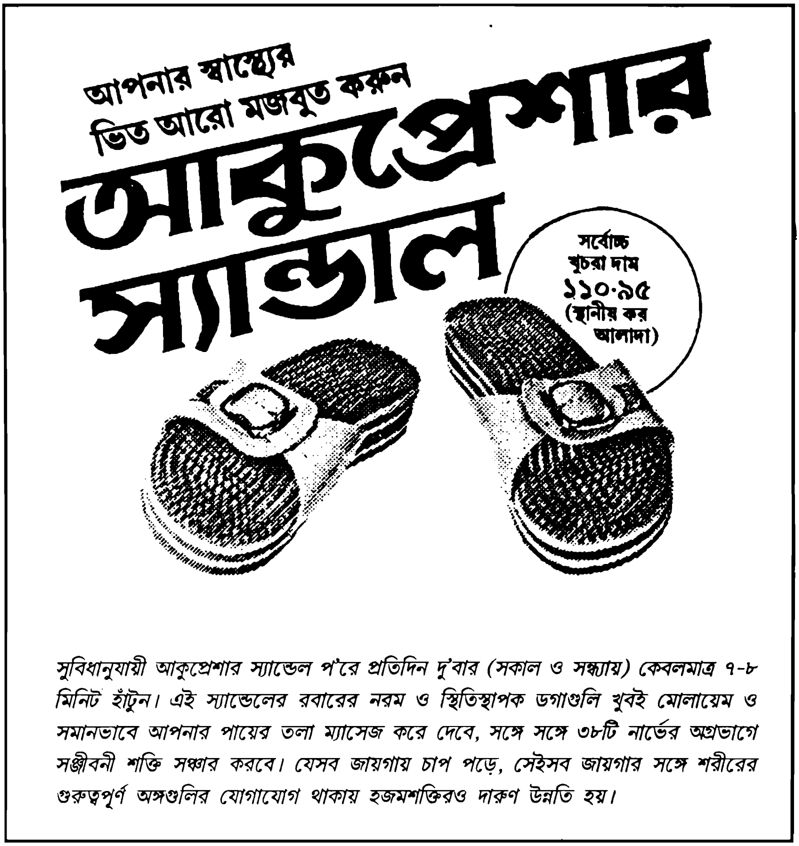

আর কতবার চালানো যায়। ডাক্তারবাবু শেষ পর্যন্ত রোগিণীকে জানালেন, যে বিশেষ ইন্‌জেকশনটা এই ব্যথায় সবেচেয়ে কার্যকর সেটি বহু কষ্টে তিনি জোগাড়

করেছেন। এবার ব্যথা চিরকালের মতো সেরে যাবেই।

ডাক্তারবাবু ইনজেকশনের নামে ডিসটিলড ওয়াটার পুশ করলেন। রোগিণীর ব্যথাও পুরোপুরি সেরে গেল।

কয়েক বছর কুড়ি আগেও কলকাতা জেনারেল পোস্টে অফিসের আশপাশে এক গৌরকান্তি, দীর্ঘদেহী বৃদ্ধ তান্ত্রিক ঘুরে বেড়াতেন। গলায় মালা (যতদূর মনে পড়ছে রুদ্রাক্ষের)। মালার লকেট হিসেবে ছিল একটি ছোট্ট রুপোর খাঁড়া। বৃদ্ধকে ঘিরে সব সময়ই অফিস-পাড়ার মানুষগুলোর ভিড় লেগেই থাকত। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল তান্ত্রিকবাবার অলৌকিক শক্তি সাহায্য নিয়ে নানা ধরনের অসুখ-বিসুখ থেকে নিজেকে মুক্ত করা। বেশ কয়েকদিন লক্ষ্য করে দেখেছি এঁদের অসুখগুলো সাধারণত অম্বলের ব্যথা, হাঁপানি, শরীরের বিভিন্ন স্থানের ব্যথা, বুক ধড়ফড় অর্শ, বাত ইত্যাদি।

সাধুবাবা রোগীর ব্যথার জায়গায় লকেটের খাঁড়া বুলিয়ে জোরে-জোরে বার কয়েক ফুঁ দিয়ে বলতেন, "ব্যথা কমেছে না?"

রোগী ধন্দে পড়ে যেতেন। সত্যিই ব্যথা কমেছে কী কমেনি, বেশ কিছুক্ষণ বোঝার চেষ্টা করে প্রায় সকলেই বলতেন, "কমেছে মনে হচ্ছে।"

এই আরোগ্য লাভের পিছনে তান্ত্রিকটির কোনও অলৌকিক ক্ষমতা কাজ করত না, কাজ করত তান্ত্রিকটির অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি রোগীদের অন্ধ বিশ্বাস।

এবারের ঘটনাটা আমার শোনা। বলেছিলেন প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিশ্বনাথ রায়। ডাঃ রায়ের সার্জারির অধ্যাপক ছিলেন ডাঃ অমর মুখার্জি। তাঁর কাছে চিকিৎসিত হতে আসেন এক মহিলা। মহিলাটির একান্ত বিশ্বাস, তাঁর গলস্টোন হয়েছে। এর আগে কয়েকজন চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই পরীক্ষা করে জানিয়েছিলেন পেটে ব্যথার কারণ গলস্টোন নয়। চিকিৎসকদের এই ব্যাখ্যায় মহিলা আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

ডাঃ মুখার্জি মহিলার গল-ব্লাডারের এক্স-রে করালেন। দেখা গেল কোনও স্টোন নেই। তবু ডাঃ মুখার্জি তাঁর ছাত্রদের শিখিয়ে দিলেন রোগিণীকে বলতে, তাঁর গলস্টোন হয়েছে। এক্স-রে-তে দুটো স্টোন দেখা গেছে। অপারেশন করে স্টোন দুটো বার করে দিলেই ব্যথার উপশম হবে।

রোগিণীকে জানানো হলো অমুক দিন অপারেশন হবে। নির্দিষ্ট দিনে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে অজ্ঞান করে পেটের চামড়া চর্বিস্তর পর্যন্ত কাটলেন এবং আবার সেলাই করে দিলেন। ও.টি. স্টাফের হাতে ছোট্ট দুটো রঙিন পাথর দিয়ে ডাঃ মুখার্জি বললেন, রোগিণী জ্ঞান ফেরার পর স্টোন দেখতে চাইলে পাথর দুটো দেখিয়ে বলবেন, এ-দুটো ও পিত্তথলি থেকেই বেরিয়েছে।

রোগিণী কয়েকদিন হাসপাতালেই ছিলেন। সেলাই কেটেছিলেন ডাঃ রায়। রোগিণী

হৃষ্টচিত্তে রঙিন পাথর দুটো নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। যে ক-দিন হাসপাতালে ছিলেন সে ক-দিন গলব্লাডারের কোনও ব্যথা অনুভব করেননি। অথচ আশ্চর্য, সাজানো অপারেশনের আগে প্রতিদিনই নাকি রোগিণী গলব্লাডার প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করতেন।

এবার যে ঘটনাটি বলছি, তা শুনেছিলাম চিকিৎসক এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির একসময়ের সভাপতি ডাঃ বিষ্ণু মুখার্জি কাছে। ঘটনাস্থল জামশেদপুর। ডাঃ মুখার্জি তখন জামশেদপুরের বাসিন্দা। নায়িকা তরুণী, সুন্দরী, বিধবা। ডাঃ মুখার্জির কাছে তরুণীটিকে নিয়ে আসেন তাঁরই এক আত্মীয়া। তরুণীটির বিশ্বাস তিনি মা হতে চলেছেন। মাসিক বন্ধ আছে মাস তিনেক। ডাঃ মুখার্জির আগেও অন্য চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি পরীক্ষা করে জানিয়েছেন, মাতৃত্বের কোনও চিহ্ন নেই। ডাক্তারের স্থির নিশ্চিত সিদ্ধান্তে মেয়েটির পরিবারের আর সকলে বিশ্বাস স্থাপন করলেও, মেয়েটি কিন্তু তাঁর পূর্ব বিশ্বাস থেকে নড়েননি। তাঁর এখনও দৃঢ় বিশ্বাস, মা হতে চলেছেন। এবং মা হলে তাঁর সামাজিক সম্মান নষ্ট হবে। ইতিমধ্যে সম্মান বাঁচাতে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন।

পূর্ব ইতিহাস জানার পর ডাঃ মুখার্জি পরীক্ষা করে মেয়েটিকে জানালেন, "আপনার ধারণাই সত্যি। আপনি মা হতে চলেছেন। যদি অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে অব্যাহতি চান নিশ্চয়ই তা পেতে পারেন। তবে সে ক্ষেত্রে অ্যাবরশন করতে হবে।

মেয়েটি এককথায় অপারেশনে রাজি হয়ে গেলেন। সাজানো অ্যাবরেশন শেষে জ্ঞান ফিরতে রোগিণীকে দেখানো হলো অন্য এক রোগিণীর দু'মাসের ফিটাস ট্রেতে রক্তসহ সাজিয়ে।

মেয়েটি সুখ ও স্বস্তি মেশানো নিশ্বাস ছাড়লেন। পরবর্তীকালে মেয়েটি তাঁর স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক জীবন ফিরে পেয়েছিলেন।

অনেক পুরনো বা chronic রোগ আছে যেসব রোগের প্রকোপ বিভিন্ন সময় কমে-বাড়ে। যেমন গেঁটে বাত, অর্শ, হাঁপানি, অম্বল। আবার হাঁপানি, অম্বলের মতো কিছু পুরনো রোগ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওষুধ ছাড়াই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে সেরে যায়। অলৌকিক বাবাদের কাছে কৃপা প্রার্থনার পরই এই ধরনের অসুখ বিশ্বাসে বা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে কিছুটা কমলে বা সেরে গেল অলৌকিক বাবার মাহাত্ম্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন চীফ সেক্রেটারি অমিয় সেন একবার আমাকে বলেছিলেন, "মার্কসবাদে বিশ্বাসী হলেও আমি কিন্তু অলৌকিক শক্তিকে অস্বীকার করতে পারি না। দীঘার কাছের এক মন্দিরে আমি একা অলৌকিক ক্ষমতাবান পুরোহিতের দেখা পেয়েছিলাম। আমার স্ত্রী গেঁটে-বাতে পায়ে ও কোমরে মাঝে-মাঝে খুব কষ্ট পান। একবার দীঘায় বেড়াতে গিয়ে ওই পুরোহিতের খবর পাই। শুনলাম উনি অনেকের অসুখ-টসুখ ভাল করে দিয়েছেন। এক সন্ধ্যায় আমার

স্বামী-স্ত্রীতে গেলাম মন্দিরে। পুজো দিলাম। সন্ধ্যারতির পর পুরোহিতকে প্রণাম করে নিজের পরিচয় দিয়ে আসার উদ্দেশ্য জানালাম। পুরোহিত বিড়-বিড় করে মন্ত্র পড়ে আমার স্ত্রীর কোমর ও পায়ে হত বুলিয়ে দিলেন। একসময় জিজ্ঞেস করলেন, "কি, এখন ব্যথা কমেছে না?" অবাক হয়ে গেলাম আমার স্ত্রী জবাব শুনে। ও নিজের শরীরটা নাড়া-চাড়া করে বলল, "হ্যাঁ, ব্যথা অনেক কমেছে।" এইসব অতি-মানুষের হয়তো কোনও দিনই আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দিতে হাজির হবেন না। কিন্তু এদের অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়ার পর তা অস্বীকার করব কী ভাবে?"

আমি বলেছিলাম, "যতদূর জানি আপনার স্ত্রীর বাতের ব্যথা এখনও আছে।"

আমার মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়ে প্রাক্তন চীফ সেক্রেটারী জবাব দিয়েছিলেন, "পুরোহিত অবশ্য আরও কয়েকবার ঝেড়ে দিতে হবে বলে জানিয়েছিলেন। কাজের তাগিদে আর যাওয়া হয়নি। ত্রুটিটা আমাদেরই।"

এই সাময়িক আরোগ্যের কারণ পুরোহিতের প্রতি রোগিণীর বিশ্বাস, পুরোহিতের অলৌকিক কোনও ক্ষমতা নয়। অথবা, পুরনো রোগের নিয়ম অনুসারেই স্বাভাবিকভাবেই সেইসময় গেঁটে-বাতের প্রকোপ কিছুটা কম ছিল।

অর্শ রোগীদের অনেকেরই হাতের আঙুলে শোভিত হয় আড়াই প্যাঁচের একটা রুপোর তারের আংটি। যাঁরা এই আংটি পরেন, তাঁদের কাছে কোনও অর্শ রোগী আংটি ধারণ করে নিরাময় চাইলে সাধারণভাবে আড়াই-প্যাঁচি আংটির ধারক তাঁর আংটির তারের ছোট্ট একটা টুকরো কেটে দেন। ওই টুকরো স্যাঁকরাকে দিয়ে আড়াই-প্যাঁচ আংটি তৈরি করে ধারণ করেন। ধারণ করার পর অর্শ রোগ সত্যিই কি সারে? আমি দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয়ে ২০০ জানের উপর একটা অনুসন্ধান চালিয়েছিলাম। সাধারণত যাদের হাতেই আড়াই-প্যাঁচ আংটি দেখেছি, তাদের সঙ্গে কথা বলে জানার চেষ্টা করেছি, আংটি পরে কতটা উপকৃত হয়েছেন। শতকরা ৩০ ভাগের মতো ধারণকারী জানিয়েছেন, আংটি পরে উপকৃত হয়েছেন। শতকরা ৪৫ ভাগের মতো জানিয়েছেন, আংটির গুণ আছে কি না, এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসার মতো কিছু বোঝেননি। বাকি ২৫ ভাগ জানিয়েছেন, কিছুই কাজ হয়নি। অর্শ অনেক সময় স্বাভাবিক নিয়মেই প্রাকৃতিক সারে। যাঁদের সেরেছে, তাঁরা প্রাকৃতিক নিয়মকেই আংটির অলৌকিক নিয়ম বলে ভুল করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ১৯৮৮-র ২৯ জুলাই সাংবাদিক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এক প্রতিবেদনে আনন্দবাজার পত্রিকায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে লেখা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিটা এখানে তুলে দিচ্ছি।

"প্রীতিভাজনেষু জ্যোতিবাবু,

আনন্দবাজার পত্রিকায় পড়লাম আপনি স্পন্ডিলাইটিসে কষ্ট পাচ্ছেন। আমি স্পন্ডিলাইটিসে অনেকদিন ধরে ভুগেছি। তখন তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ প্রতুল মুখার্জী আমাকে একটা বালা দেন যার মধ্যে হাই ইলেকট্রিসিটি ভোল্ট পাশ করানো হয়েছে। সেটা পরে কয়েকদিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হই। আমি আপনাকে কয়েকদিনের মধ্যেই একটি তামার বালা পাঠাব, আশা করি সেটা পরে আপনি উপকার পাবেন।

আপনার দ্রুত নিরাময় কামনা করি, আমি এখন আরামবাগে আছি।

পুনঃসম্ভবপর হলে সাইকেলে অন্তত দৈনিক আধঘন্টা চাপবেন। আপনি বোধহয় জানেন, আমি সাইকেলে চেপে ভাল ফল পেয়েছি।

স্বাঃ প্রফুল্লচন্দ্র সেন

২৮.৭.৮৮

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রফুল্লচন্দ্র সেন জানান, তামার বালা পরেছিলেন ১৯৭৯ সালে। শ্রীসেনের কথায়, "স্পন্ডালাইটিস হয়েছিল। ডঃ নীলকান্ত ঘোষাল দেখছিলেন। কিছুই হল না। কিন্তু যেই তামার বালা ব্যবহার করলাম, প্রথম ৭ দিনে ব্যথা কমে গেল। পরের ১৫ দিনে গলা থেকে কলার খুলে ফেললাম।"

এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পর নাকি তামার বালা বিক্রি খুব বেড়ে গিয়েছিল শহর কলকাতায়। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের বক্তব্য এবং জ্যোতি বসুকে লেখা চিঠি শুধুমাত্র সাধারণ মানুষদের মধ্যে নয়, বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। যার ফলশ্রুতি হিসেবে শরীরের ওপর ধাতুর প্রভাব কতখানি অথবা বাস্তবিকই পরভাব আছে কি না, বহু প্রশ্নের ও পত্রের মুখোমুখি হয়েছি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁদের জানিয়েছি, 'শরীরের উপর ধাতুর প্রভাব আছে', এটা সম্পূর্ণ অলীক ধারণা।

'আর্থ' না করে তামার বালা পরে জীবনধারণ করার চিন্তা বাস্তবসম্মত নয়। তামাকে 'আর্থ' হওয়া থেকে বাঁচাতে বালাধারণকারীকে তবে পৃথিবীর ছোঁয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে জীবন ধারণ করতে হয়। কারণ, বালাধারণকারী পৃথিবীর সংস্পর্শে এলেই বালার তামা 'আর্থ' হয়ে যাবে।

আরও একটি বৈজ্ঞানিক সত্য এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা প্রয়োজন, বিদ্যুৎ-প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর তামার মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি থাকে না।

মানবদেহে অল্প পরিমাণে বিভিন্ন মৌলিক দ্রব্যের অস্তিত্ব আছে এবং নানা ধরনের অসুখের চিকিৎসাতে মৌলিক দ্রব্যের ব্যবহার সুবিদিত। গর্ভবতীদের রক্তস্বল্পতার জন্য LIVOGEN CAPSULE বা ঐ জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে সংশোধিত অবস্থায় রয়েছে লৌহ। প্রস্রাব সংক্রান্ত অসুখের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে MERCUREAL DIURETIC (DIAMOX) দেওয়া হয়, যার মধ্যে সংশোধিত অবস্থায় পারদ রয়েছে। একধরনের বাতের চিকিৎসায় অনেক সময় MYOCRISIN দেওয়া হয়, যার মধ্যে সংশোধিত অবস্থায় সোনা রয়েছে।

যখন রোগিণীকে LIVOGEN CAPSULE বা ঐ জাতীয় ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন তখন পরিবর্তে রোগিণীকে এক কুইন্টাল লোহার ওপর শুইয়ে রাখলেও ফল পাওয়া যাবে না। কারণ, মৌল দ্রব্য বা ধাতু শরীরে ধারণ করলে তা কখনই শোষিত হয়ে দেহে প্রবেশ করে না।

উপরের দু'টি স্তবকে যা লিখেছি তা আমার ব্যক্তি-বিশ্বাসের কথা নয়, বিজ্ঞানের সত্য।

এরপর যে প্রশ্নটা সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেবে, তা হলে প্রফুল্লচন্দ্র কি তবে মিথ্যে কথা বলেছিলেন? যদিও আমরা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝতে শিখেছি সমাজশীর্ষ মানুষরাও মিথ্যাশ্রয়ী হন তবু তামার বালা পরে প্রফুল্লচন্দ্রের স্পন্ডালাইটিস আরোগ্যের মধ্যে কোনও অবাস্তবতা দেখতে পাচ্ছি না।

আমার এই কথার মধ্যে অনেকেই নিশ্চয়ই পরস্পর বিরোধিতা খুঁজে পাচ্ছেন। কিন্তু যাঁরা এতক্ষণে প্ল্যাসিবো চিকিৎসা পদ্ধতির বিষয়টি বুঝে নিয়েছেন, তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে প্রফুল্লচন্দ্রের রোগমুক্তির ক্ষেত্রে তামা বা বিদ্যুৎশক্তির কোনও বৈশিষ্ট্য বা গুণই কাজ করেনি, কাজ করেছিল তামা, বিদ্যুৎশক্তি এবং সম্ভবত ডঃ প্রতুল মুখার্জির প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের একান্ত বিশ্বাস।

অ্যাকুপ্রেসার স্যান্ডেলের কথা ব্যাপক বিজ্ঞাপনের দৌলতে অনেকেরই জানা। সর্বরোগহর এক অসাধারণ স্যান্ডেল। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় মাত্র দু'বার হাঁটলেই নাকি নার্ভে সঞ্জীবনীশক্তির সঞ্চার হয়, দূর হয় হরেক রকমের অসুখ, হজমশক্তির দারুণ রকমের উন্নতি হয়। রোগমুক্তির এমন সহজ-সরল উপায়ে অনেকেই আকর্ষিত হচ্ছেন। কিনেও ফেলছেন। ব্যবহারের পর অনেকের নাকি অনেক অসুখ-বিসুখ সেরেও যাচ্ছে। অথচ বাস্তব সত্য হলো এই যে, যাঁরা আরোগ্য লাভ করছেন, তাঁদের আরোগ্যের পিছনে স্যান্ডেলের কোনও গুণ বা বৈশিষ্ট্য সামান্যতম কাজ করেনি, কাজ করেছে স্যান্ডেলের প্রতি রোগীদের অন্ধ-বিশ্বাস।

ডাঃ বিরল মল্লিক বিখ্যাত স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁকেও দেখেছি রক্তচাপ

কন্ট্রোলে রাখতে ম্যাগনেটিক বেল্ট পরতে। এসব যে ফালতু ব্যাপার —তা বুঝিয়ে ছিলাম নানা যুক্তি ও তত্ত্ব দিয়ে। তারপর ডাঃ মল্লিক বেল্ট ছেড়েছিলেন।

এ-বারের ঘটনার নায়ক ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং। নায়িকা তাঁর প্রেমিকা এলিজাবেথ। এলিজাবেথ ছিলেন রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে। এলিজাবেথের পরিবারের সকলের না-পছন্দ মানুষ ছিলেন রবার্ট ব্রাউনিং। রবার্ট ব্রাউনিং পরিকল্পনা করেছিলেন এলিজাবেথ নিজের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলে দু'জনে বিয়ে করবেন। এলিজাবেথের বাড়ি ছেড়ে বেরোন ছিল একটা সমস্যা। কারণ শিরদাঁড়ার প্রচণ্ড ব্যথায় তিনি ছিলেন শয্যাশায়ী। ব্রাউনিং-এর উৎসাহ এলিজাবেথকে রোগ জয় করতে সক্ষম করেছিল। এলিজাবেথ শিরদাঁড়ার ব্যথা ভুলে বাড়ির উচু পাঁচিল টপকে বাইরে এসেছিলেন এবং রবার্ট ব্রাউনিংকে বিয়ে করেছিলেন।

সালটা সম্ভবত ১৯৮৪। সে সময়কার বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক 'বিশ্ববাণী'র মালিক ব্রজ মণ্ডলের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়েছি। হোটেলে পৌঁছতেই রাত দশটা পার হয়ে গেল। এগারোটায় খাবারের পাট চুকানোর পর প্রকাশক বন্ধুটির খেয়াল হলো সঙ্গে ঘুমের বড়ি নেই। অথচ প্রতি রাতেই ঘুম আনে ঘুমের বড়ি। বেচারা অস্থির ও অসহায় হয়ে পড়লেন। "কী হবে প্রবীর? এত রাতে কোনও ওষুধের দোকান খোলা পাওয়া অসম্ভব। তোমার কাছে কোনও ঘুমের ওষুধ আছে?" বললাম, "আমারও তোমার মতোই ঘুম নিয়ে সমস্যা। অতএব সমাধানের ব্যবস্থা সব সময়ই সঙ্গে রাখি। শোবার আগেই ওষুধ পেয়ে যাবে।"

শুতে যাওয়ার আগে প্রকাশকের হাতে একটা ভিটামিন ক্যাপসুল দিয়ে আমিও একটা খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। ক্যাপসুলটা নেড়ে-চেড়ে দেখে প্রকাশক বললেন, "এটা আবার কী ধরনের ওষুধ? ক্যাপসুলে ঘুমের ওষুধ? নাম কী?"

একটা কাল্পনিক নাম বলে বললাম, "ইউ. এস. এ'র ওষুধ।" কলকাতার এক সুপরিচিত চিকিৎসকের নাম বলে বললাম, "আমার হার্টের পক্ষে এই ঘুমের ওষুধই সবচেয়ে সুইটেবল বলে প্রতি তিন মাসে একশোটা ক্যাপসুলের একটা করে ফাইল এনে দেন। যে চিকিৎসকের নাম বলেছিলাম তিনি যে আমাকে খুবই স্নেহ করেন সেটা প্রকাশক বন্ধুটির জানা থাকায় আমার কথায় পুরোপুরি বিশ্বাস করে ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়লেন। পরের দিন সকালে জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন ঘুম হলো?"

"ফাইন। আমাকেও মাঝে-মধ্যে এক ফাইল করে দিও।"

প্রকাশকের বিশ্বাস হেতু এ ক্ষেত্রে ঘুমের ওষুধহীন ক্যাপসুলই ঘুম আনতে সক্ষম হয়েছিল।

গত শতকের নয়ের দশকের গোড়ার কথা। আমার কাছে এসেছিলেন এক চিকিৎসক বন্ধু এক বিচিত্র সমস্যা নিয়ে। বন্ধুটি একটি নার্সিংহোমের সঙ্গে যুক্ত।

সেখানে এক রোগিণী ভর্তি হয়েছেন। তাঁকে নিয়েই সমস্যা। তিনি মাঝে মাঝে অনুভব করেন গলায় কিছু আটকে রয়েছে। এইসময় তীব্র শ্বাসকষ্ট হয়। এক্স-রেও করা হয়েছে, কিছু মেলেনি। দেহ-মনজনিত অসুখ বলেই মনে হচ্ছে। এই অবস্থায় কী ধরনের পদক্ষেপ নিলে রোগিণী তাঁর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন বলে আমি মনে করি, সেটা জানতেই আসা।

পরের দিনই নার্সিংহোমে রোগিণীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দিলেন বন্ধুটি। নানা ধরনের কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে রোগিণী তাঁর উপসর্গের কারণ হিসেবে কী ভাবছেন, এইটুকু জানতে চাইছিলাম। জানতেও পারলাম। চিকিৎসক বন্ধুটিকে জানালাম, রোগিণীর ধারণা তাঁর পেটে একটা বিশাল ক্রিমি আছে। সেটাই মাঝে-মাঝে গলায় এসে হাজির হয়। অতএব রোগিণীকে আরোগ্য করতে চাইলে একটা বড় ফিতে ক্রিমি যোগাড় করে তারপর সেটাকে রোগিণীর শরীর থেকে বার করা হয়েছে এই বিশ্বাসটুকু রোগিণীর মনের মধ্যে গেঁথে দিতে পারলে আশা করি তাঁর এই সাইকো-সোমটিক ডিস্অর্ডার ঠিক হয়ে যাবে।

কয়েক দিন পরে বন্ধুটি আমাকে ফোনে খবর দিলেন রোগিণীর গলা থেকে পেট পর্যন্ত এক্স-রে করে তাঁকে জানানো হয়েছিল একটা বিশাল ফিতে ক্রিমির অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। অপারেশন করে ক্রিমিটাকে বের করা প্রয়োজন। তারপর পেটে অপারেশনের নামে হালকা ছুরি চালিয়ে রোগিণীর জ্ঞান ফেরার পর তাঁকে ক্রিমিটা দেখানো হয়েছে। এরপর চারদিন রোগিণী নার্সিংহোমে ছিলেন। গলার কোনও উপসর্গ নেই। রোগিণীও খুব খুশি। বারবার ধন্যবাদ জানিয়েছেন ডাক্তার বন্ধুটিকে।

বিশ্বাসবোধকে যে শুধুমাত্র চিকিৎসকেরাই কাজে লাগান, তা নয়। অনেক তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতাধরেরাও বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগ নিরাময় ঘটিয়ে অলৌকিক 'ইমেজ' বজায় রাখেন অথবা বর্ধিত করেন।

সত্তর ও আশির দশকে কলকাতার 'ফু বাবা' ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোবিন্দপুর অঞ্চলের 'ডাব বাবা' তো জীবন্ত কিংবদন্তী হয়ে গিয়েছিলেন। এঁরা দু'জনেই সর্বরোগহর হিসেবে প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন।

ফুঁ-বাবা

ফুঁ-বাবার আবির্ভাব গত শতকের সাতের দশকে। তিনি কলকাতা এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। ওঁর কাছে তেল নিয়ে যেতে হতো। বাবাজি তেলে ফুঁ দিয়ে দিতেন। সেই ফুঁ দেওয়া তেল রোগানুসারে মালিশ করলে বা খেলে ফুৎকারে নাকি রোগ উড়ে যেত। প্রচুর প্রত্যক্ষদর্শী এবং ফলভোগকারীও পাওয়া যেতে লাগল। ভিড়ও

বাড়তে লাগল দ্রুত। ভিড় এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছল, যা সামাল দেওয়া একা ফুঁ-বাবার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই বিকল্প ব্যবস্থা হল। গুরুদাস পার্কে কৃপাপ্রার্থীদের জন্য গণ্ডায় গণ্ডায় অ্যামপ্লিফায়ারের ব্যবস্থা হল। হাজার হাজার কৃপাপ্রার্থী তেলের পাত্রের মুখ খুলে দাঁড়িয়ে রইলেন, ফুঁ-বাবা অ্যামপ্লিফায়ারের মাধ্যমে ফুঁ দিতে লাগলেন।

ফুঁ-বাবার মঞ্চে একজন চলার শক্তিহীন মানুষকে তুললেন কয়েকজন। কয়েক মিনিটের মধ্যে ফুঁ-বাবার কৃপায় চলার শক্তি ফিরে পেলেন রোগী। এমন বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনা দেখে সাধারণ মানুষ যখন মুগ্ধ, বিহ্বল, উত্তেজিত, ফুঁ-বাবার জয়ধ্বনিতে মুখরিত এমনি সময় আর এক রোগীকে নিয়ে মঞ্চে উঠে এলেন কিছু তরুণ। এই রোগীটিও চলার শক্তি হারিয়েছেন। তরুণদের অনুরোধ ফুঁ-বাবা অবহেলায় উপেক্ষা করলেন। অনুরোধের সুরে কিছুক্ষণের মধ্যেই পাওয়া গেল ক্ষোভ। মঞ্চে আবির্ভূত হল বাবার অসুরবাহিনী। অসুরবাহিনীর আসুরিক শক্তিতে তরুণরা রক্তাক্ত হলেন বটে, কিন্তু ওই রক্তেই জন্ম নিল জনজাগরণ। গণপ্রহার থেকে বাঁচতে ফুঁ-বাবা ও তাঁর বাহিনী পালানোকেই এই ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে বেছে নিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। পুলিশ ফুঁ-বাবাকে গ্রেপ্তার করার পর আবিষ্কৃত হল আর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। ফুঁ-বাবা এক দাগী ফেরারী আসামী।

ডাব-বাবা

১৯৮৮-র শুরুতেই ডাব-বাবার মাহাত্ম্য লোকের মুখে মুখে হু-হু করে ছড়িয়ে

আদি ডাব বাবা

পড়তে থাকে। মে-জুনে ডাব-বাবা পত্র-পত্রিকার শিরোনামে এলেন। প্রতিদিন লাখো লাখো রোগী দুর-দুরান্ত থেকে এসে হাজির হতে থাকে ডাব-বাবার কৃপায় রোগমুক্তির আশায়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ছোট স্টেশন গোবিন্দপুর। সেখান থেকে তিন কিলোমিটারের মতো পথ বড়গাছিয়া। এখানে বিদ্যুতের খুঁটি চোখে পড়ে না। এমনই এক ছোট্ট গ্রামে গাছের ছায়ায় চাটাইবেড়া ঘিরে মাথায় টালির চাল নিয়ে গড়ে উঠেছিল বনবিবির মন্দির। জানুয়ারির শুরুতে সুরথ মণ্ডল নাকি বনবিবির কাছ থেকে স্বপ্নে ওষুধ পায়। সুরথ ধর্মে রোমান ক্যাথলিক। তবু বাংলার হাওয়ায় হিন্দু পরিবেশে থাকতে থাকতে সুরথদের পরিবারের মেয়েদের কপালে ও সিঁথিতে উঠেছে সিঁদুর। সুরথের কর্মস্থল কলকাতার বসুমতী পত্রিকা। পত্রিকার ছাপাখানায় কাজের পাশাপাশি গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারও। সুরথ ভক্তদের ডাবের জলে বনবিবির চরণামৃত মিশিয়ে দিতেন। সেই ডাবের জল খেয়েই নাকি রোগীরা সব রোগ-বালাই

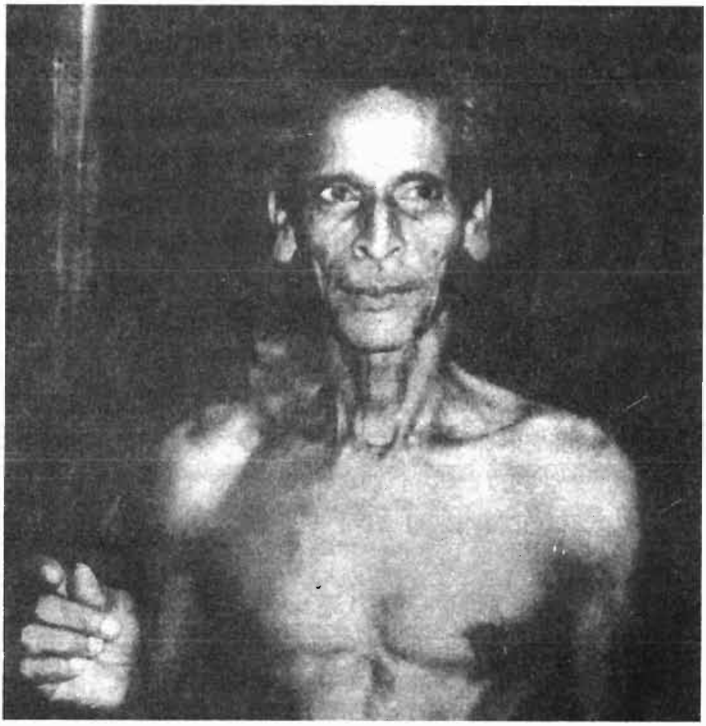

নতুন ডাব বাবা

থেকে মুক্তি পেয়েছেন। বনবিবির প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই পুজোও চলছিল। আর চরণামৃতও ভক্তরাও পান করেছিলেন। এতদিন কেন বনবিবির চরণামৃতে রোগ

সারছিল না? নিশ্চয়ই এটা হক কথার এক কথা। কিন্তু এরও উত্তর আছে—এতদিন ঠিকমত চরণামৃত শুদ্ধ মনে বিশেষ প্রণালীতে তৈরি হচ্ছিল না। অর্থাৎ চরণামৃত তৈরির আসল ফর্মুলাটা ছিল মানুষের অজানা। বনবিবি একদিন স্বপ্নে ফর্মুলাটা সুরথবাবুকে জানানোতে মুশকিল আসান হল। সুরথবাবু ফর্মুলা মাফিক চরণামৃত বানান, ভক্তদের দেন, আর টপাটপ অসুখ সারে।

আশ্চর্য ডাবের জলের কথা দ্রুত ছড়াতে লাগল। লোক মুখে মুখে সুরথ হয়ে গেলেন 'ডাব-বাবা'। যে ভিড় শুরু হয়েছিল ৩/৪ জন দিয়ে মার্চের শেষে সেই ভিড়ই দাঁড়াল ৩/৪ হাজারে। শনি-মঙ্গল বাদে হপ্তার অন্য দিনগুলো ডাব-বাবা কয়েকজন সঙ্গী-সাথী নিয়ে ভক্তদের ডাবের জলে স্বপ্নে দেখা নির্দেশমতো তৈরি বনবিবির চরণামৃত মিশিয়ে দিচ্ছিলেন। টাকাটা-সিকেটা প্রণামীও পড়ছিল। দিনের শেষে দু-তিন হাজার হয়ে যাচ্ছিল। রোগীরা নাকি আশ্চর্য ফল পাচ্ছিলেন। দু-মাসের মধ্যেই মন্দিরের দেওয়াল পাকা হয়েছে। গ্রামের জনা দশেক উদ্যোগী মানুষ নিয়ে একটা মন্দির কমিটি হয়েছে। কিন্তু কোথা দিয়ে কী হলো, মন্দির কমিটির সঙ্গে সুরথের প্রণামী নিয়ে একটা গোলমাল লেগে গেল। সুরথ উধাও হলেন।

ডাব-বাবা স্বয়ং নিরুদ্দেশ। স্বপ্ন দেখার মালিকটি নিখোঁজ। স্বপ্নাদ্য চরণামৃত তৈরির ফর্মুলা আর কারও জানা না থাকলেও মন্দির কমিটি স্বপ্নাদ্য ওষুধ দেওয়া বন্ধ করলেন না। ফির হপ্তায় রোগীর ভিড় বেড়েই চলল। মে-জুনে প্রতিদিন রোগীর সংখ্যা দৈনিক লাখ ছাড়াতে লাগল। লাখো লাখো রোগী জানতেও পারল না ওষুধ দাতা ডাব-বাবা স্বয়ং নিরুদ্দেশ। আগের দিন রাত থেকেই লাইন পড়তে লাগল। এলো লাইন ম্যানেজ করার ভলেন্টিয়ার, জেনারেটার, মাইক। গজিয়ে উঠল পান, বিড়ি, সিগারেট, চা ও খাবারের দোকান। রিকশার সংখ্যা বাড়ল কুড়ি গুণ। এলো ট্যাক্সি, এলো অটো। ডাবের দাম চড়ল। ডাব কাটার ফিস হলো দশ পয়সা। ধারাল দা চালিয়ে ধাঁ করে ডাবের মুণ্ডু কেটে ফিস নেবার অধিকার পেল শুধু সওয়া-শ' ভলেন্টিয়ার। ওদের চেহারা ও হাবভাব দেখে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, নিজেদের স্বার্থরক্ষায় দা-গুলো ডাব ছেড়ে মানুষের মুণ্ডুতে নামার জন্যেও তৈরি।

খবরটা কিছুদিন ধরেই কানে আসছিল। জুনের শুরুতেই হাজির হলাম 'বসুমতী' পত্রিকা দপ্তরে। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে দেখা পেলাম সুরথ মণ্ডলের। সুরথবাবুর কথায় বুঝতে অসুবিধা হয় না, বনবিবি মন্দিরের কমিটির ভয়ে পত্রিকা অফিসের বাইরে পা রাখতেও ভরসা পান না। ভয় খুন হওয়ার। বেশ কিছু পত্রিকা প্রতিনিধি সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিলেন। কারও সঙ্গেই দেখা করেননি। একটাই ভয়, বেফাঁস কিছু বললে এবং তা পত্রিকায় প্রকাশিত হলে নকল ডাব-বাবারা জানে মারতে পারে। আর তেমন পরিস্থিতি এলে রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে ওই সাংবাদিকরা

এগিয়ে আসবেন, এমন ভরসা করেন না সুরথ। আমার কাছে সুরথ প্রথমেই যে অভিযোগ করলেন, তা হলো, "যারা এখন ডাববাবা সেজে স্বপ্নাদ্য ওষুধ দিচ্ছে তারা সব ঠগ, ডাকাত। স্রেফ লোক ঠকাচ্ছে। স্বপ্ন দেখলাম আমি। আমি না জানানো সত্ত্বেও ওরা ওষুধ তৈরি করছে কি করে? থানায় খোঁজ নিলে জানতে পারবেন, ওদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ আছে। পয়সা রোজগারের ধান্দায় **ওরা প্রচার করছে বনবিবির চরণামৃত মেশানো ডাবের জল খেলে কান-কট্‌কট্‌ থেকে ক্যানসার সবই নাকি সারে। অথচ আমাকে মা স্বপ্নে দেখা দিয়ে জানিয়েছিলেন, চরণামৃতসহ ডাবজল পানে দুটি মাত্র অসুখ সারবে। হাঁপানি ও পেটের অসুখ।"**

বুঝলাম, বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে কী কী অসুখ সারানো যায়, সে বিষয়ে সুরথবাবু কিঞ্চিৎ ওয়াকিবহাল।

প্রচুর কথা বলিয়ে, এক সময় জানতে পারলাম চরণামৃত তৈরি করতেন গরম জল, ডাবের জল, দুধ, সন্দেশ, বাতাসা ও কর্পূর মিশিয়ে।

এর কয়েকদিন পর গিয়েছিলাম বনবিবির থানে। দেখে এটুকু বুঝেছিলাম, এখন আসল ডাব-বাবা স্বয়ং ফিরে এসে—'সব ঝুট হ্যায়', বলে চ্যাঁচালেও বিশ্বাসে আচ্ছন্ন মানুষগুলো তাতে কান দেবে না।

ডাবে চরণামৃত মিশিয়ে দিচ্ছিলেন বিজয় মণ্ডলের নেতৃত্বে কিছু তরুণ। কথা হলো বিজয় মণ্ডল, মন্দির কমিটির সম্পাদক হারাণ নস্কর ও কিছু খালি গা তেজী তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে।

জিজ্ঞেস করলাম, "বনবিবি স্বপ্নে ওষুধ বাতলে দিয়েছিলেন সুরথ মণ্ডলকে। তিনি তো আপনাদেরই ভয়েই নাকি উধাও। আপনারা তো স্বপ্ন দেখেননি। তা হলে ওষুধ দিচ্ছেন কি করে?"

হারাণ নস্কর জবাব দিলেন, "সুরথ মণ্ডল আমাদের ভয়ে গাঁ ছাড়া, এসব দুষ্ট লোকেদের মিথ্যে প্রচার। আসলে ঈর্ষা করা মানুষের সংখ্যাতো কম নয়, তারাই ওসব রটাচ্ছে। সুরথ একটু ভিতু আর নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। এত ভিড়, এত মানুষজন সামলে সকাল থেকে রাত মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার মতো মন কি সবার আছে? সুরথেরও ছিল না। সুরথ পালাল। তবে লোকটা ভাল ছিল। যাওয়ার আগে বিজয় মণ্ডলকে শিখিয়ে দিয়েছিল বনবিবির চরণামৃত তৈরির পদ্ধতি।

বললাম, "সুরথবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। উনি অবশ্য অন্য কথা বললেন। উনি নাকি কাউকেই স্বপ্নাদ্য ওষুধ তৈরির পদ্ধতি বলে জানি।"

বিজয় মণ্ডল একটু উত্তেজিত হলেন। চড়া গলায় বললেন, "ও সব বাজে কথা।"

হারাণ নস্কর পোড় খাওয়া মানুষ। এক গাল হেসে বললেন, "সুরথ না বললেই

বা কি হয়েছে? বনবিবি তো সুরথের একার সম্পত্তি নয়। বনবিবি এখন আমাদের অনেককেই স্বপ্ন দিচ্ছেন।”

ডাব-বাবার দাবি মতো রোগীরা সত্যিই রোগমুক্ত হচ্ছেন কী না, জানার জন্য ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটি যৌথ উদ্যোগে একটি তথ্য সংগ্রহ অভিযান চালান। আমরা ৫০ জন রোগীর ওপর অনুসন্ধান চালিয়ে ছিলাম। ৬ জন জানিয়েছিলেন ৩ বার জল খেয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। ১১ জন জানালেন—অনেকটা ভাল আছেন। ৩৩ জন জানালেন—ফল পাইনি।

যে ৬ জন পুরোপুরি ও ১১ জন আংশিকভাবে রোগমুক্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছিলেন, সেই ১৭(৬ + ১১) জনের মধ্যে ১৪ জন সেই সব অসুখে ভুগছিলেন, যেসব অসুখ বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে সারানো সম্ভব। একজন জানিয়েছিলেন তাঁর ক্যানসার হয়েছিল। বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ। আমাদের তরফ থেকে প্রশ্ন ছিল—আপনার যে ক্যানসারই হয়েছিল তা জানলেন কী করে? কত দিন আগে ক্যানসার ধরা পড়ে?

উত্তর ছিল—ডাক্তার বলেছিলেন, মাস ছয়েক আগে।

প্রশ্ন—কোন ডাক্তার, নাম কী? ঠিকানা কী?

উত্তর—কোন ডাক্তার অত মনে নেই।

প্রশ্ন—সে কী? এত বড় রোগ হল, ডাক্তার দেখিয়েছেন নিশ্চয়ই অনেক বার। আর ডাক্তারের নামটাই ভুলে গেলেন? ডাক্তারবাবু কি কোনও জায়গায় আপনাকে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন—এই যেমন চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতাল বা ঠাকুরপুকুর ক্যানসার রিসার্চ সেণ্টার?

উত্তর—ঠাকুরপুকুর পাঠিয়েছিলেন।

প্রশ্ন—সেখানকার কোনও প্রেসক্রিপশন আছে কি?

উত্তর—না সে সব কোথায় হারিয়ে-টারিয়ে গেছে।

প্রশ্ন—এই মাস-দুয়েকের মধ্যেই সব হারিয়ে ফেললেন? কী করে জানলেন আপনার ক্যানসার সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছে।

উত্তর—ডাক্তারবাবু দেখে বললেন।

প্রশ্ন—এই যে বললেন কোন ডাক্তার অত মনে নেই।

উত্তর—না, না। ডাক্তারবাবু মানে ঠাকুরপুকুরের ডাক্তারবাবু।

এই রোগীর ক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনা আছে। প্রথম ও জোরালো সম্ভাবনা হলো, রোগীটি একজন প্রতারক ও ডাব-বাবার প্রচারক। দ্বিতীয়টি হলো, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যেই ক্যানসার মুক্ত হয়েছে, ডাবের জলে নয়। ক্যানসার প্রথম পর্যায়ে ধরা পড়লে বহুক্ষেত্রেই আরোগ্য সম্ভব।

একজন জানিয়েছিলেন তাঁর গলব্লাডারে স্টোন হয়েছিল। ডাব-বাবার কৃপায়

এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তিনিও তাঁর অসুখের সমর্থনে কোনও চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র দেখাতে সক্ষম হননি। অতএব এর'ও ডাববাবার একজন বেতনভুক প্রচারক হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

একজন জানিয়েছিলেন তাঁর বোবা ভাই দুদিন ডাবের জল খেয়েই এখন কষ্ট করে হলেও কিছু কিছু কথা বলতে পারছে। ভাইয়ের জন্যেই আজ শেষবারের জন্য ডাবের জল নিতে এসেছেন। তিনি তাঁর ভাইয়ের জীবনের এই অলৌকিক ঘটনার কথা অনেককেই বলছিলেন। শ্রোতারা অবাক বিস্ময়ে কথাগুলো শুনছিলেন। আমরা ভদ্রলোকের ঠিকানা নিলাম। এবং পরবর্তীকালে ঠিকানাটার খোঁজ করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম—ও একটি আস্ত ছোটলোক। কারণ ঠিকানাটাই ছিল মিথ্যে।

ডাব-বাবার বিশাল প্রচার ও জন-আবেগকে প্রতিহত করতে দুটি কাজ করেছিলাম। (এক) ওই অঞ্চল ও তার আশে-পাশে আরও কয়েকজন ডাব-বাবা খাড়া করে দিয়েছিলাম। ফলে সব ডাব-বাবার প্রতিই বিশ্বাসে চিড় ধরেছিল ভক্তদের। (দুই) ডাব-বাবার বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার। একাধিক ডাব-বাবা বাজারে এসে পড়ায় প্রত্যেকেই প্রত্যেককে 'চোর-জোচ্চোর' বলে গাল পাড়ছিল এবং ওদের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গণসংগঠন এগিয়ে আসার ফলে ডাব-বাবার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হয়েছিল। ফলে ডাব-বাবা বা তাঁর অসুর চেলাদের পিছু হটতে হয়েছিল। কারবার গোটাতে হয়েছিল। অন্য ডাব-বাবারা ছিল আমাদেরই সৃষ্টি। কাজ ফুরোতেই তারও ভ্যানিশ।

ডাইনি সম্রাজ্ঞী ইপ্সিতা

এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা না বললে বোধহয় কিছুটা অবিচার হয়। তিনি হলেন ডাইনী সম্রাজ্ঞী ইপ্সিতা রায় চক্রবর্তী। ১৯৮৭-৮৮ ঈপ্সিতাকে নিয়ে ভারতের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী পত্র-পত্রিকা বিশাল বিশাল কভারেজ দিয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল—ঈপ্সিতা যে কোনও রোগীকেই রোগমুক্ত করতে পারেন। তবে কোন রোগীকে রোগ মুক্ত করবেন সেটা তিনিই ঠিক করেন।

ঈপ্সিতার সঙ্গে আমার একটা মোলাকাত হয়েছিল এবং সেই সাক্ষাৎকারটা ঈপ্সিতার পক্ষে মোটেই সুখের ছিল না। এই প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব 'অলৌকিক নয়, লৌকিক'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে। শুধু এটুকু এখানে বলে রাখি, ঈপ্সিতা সেইসব রোগীদের রোগমুক্ত করার দায়িত্বই শুধু নিতেন, যাঁদের রোগ বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে আরোগ্য করা সম্ভব।

ঈপ্সিতাকে প্রথম খোলামেলা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলাম ১২ আগস্ট ১৯৮৮ 'আজকাল' পত্রিকার পাতায়। জানিয়েছিলাম, "ঈপ্সিতা কি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ রাখতে আমার হাজির করা পাঁচজন রোগীকে সুস্থ করে তুলতে রাজি

আছেন? তিনি জিতলে আমি দেব পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রণামী, সেইসঙ্গে থাকব চিরকাল তাঁর গোলাম হয়ে।”

ডাইনি সম্রাজ্ঞী ইঙ্গিতা

১৯৮৮-র ১১ ডিসেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনেও আমাদের সমিতির তরফ থেকে ঈঙ্গিতাকে আহ্বান জানিয়েছিলাম তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দেওয়ার জন্যে হাজির হতে। রোগী দেব। রোগমুক্তি ঘটাবার জন্যে দেব ছয় মাস সময়। কিন্তু আমাদের সমিতির আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও ঈঙ্গিতা সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হওয়ার ধৃষ্টতা দেখাননি। দেখালে তাঁর বুজরুকি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে পড়ত।

বকনা গরুর অলৌকিক দুধ ও মেহেবুব আলি

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মহকুমা শহর বনগাঁর গা ছুঁয়ে ঘাটবাওড় গ্রাম। ‘হাজি-বাড়ি’ গ্রামের সম্ভ্রম জাগানো সচ্ছল পরিবার। এই পরিবারেই মানুষ মেহেবুব আলি। বয়স তিরিশের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। স্বল্প উচ্চতার মাঝারি চেহারার মানুষটির ঝকঝকে দুটি চোখ বুদ্ধির সাক্ষ্য বহন করছে।

১৯৮৯-এর মে মাস নাগাদ দাবানলের মতো একটা খবর দ্রুত আশপাশের অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল—মেহেবুব আলির বকনা (স্ত্রী বাছুর) দুধ দিচ্ছে। যে কোন একটি রোগ আরোগ্যের প্রার্থনা নিয়ে পরস্পর তিনদিন ওই

দুধ খেলে রোগটি আশ্চর্যজনকভাবে সেরে যাচ্ছে।

শুরু হল ভিড়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত স্রোতের মতো মানুষ আসতে লাগলেন দূর-দুরান্ত থেকে। এমন কী বাংলাদেশ থেকেও। লরি, টেম্পোর গাদা লেগে গেল। পরপর তিনদিন অলৌকিক দুধ খেয়ে রোগ মুক্তি তীব্র আকাঙ্ক্ষা

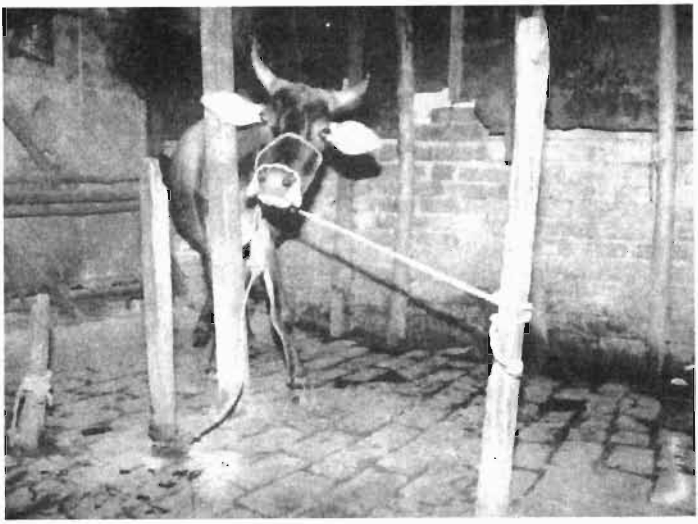

অলৌকিক বকনা

নিয়ে নারী-পুরুষ সকলেই রাত কাটাতে লাগলেন খোলা আকাশের নীচে। কারণ অনেকেই এতদূর থেকে আসেন, যেখান থেকে পরপর তিনদিন যাওয়া আসা অসম্ভব বা কষ্টসাধ্য। দুধ দেওয়া বন্ধ থাকে শুক্রবার ও বাংলা মাসের ১৪ তারিখ। দুধ খাওয়ার নিয়ম হলো, দুধ কোথাও নিয়ে যাওয়া চলবে না. ওখানেই খেতে হবে। অর্থাৎ রোগীকে স্বয়ং আসতে হবে।

এতগুলো মানুষ থাকছেন, প্রাকৃতিক কাজ সারছেন, পরিবেশ দূষণ রোধে এগিয়ে এলো স্থানীয় ক্লাব 'নজরুল ক্রীড়া চক্র'। বিনিময়ে মানুষগুলোর কাছ থেকে আদায় করতে লাগলো ২০ পয়সা করে। মেহেবুব আলির সঙ্গে ক্রীড়া চক্রের এই নিয়ে মন কষাকষি। ফলে পুলিশের হস্তক্ষেপ। ক্রীড়া চক্র ২০ পয়সা কমিয়ে ১০ পয়সা করল।

মেহেবুব আলি রোগীদের দুধ দেন নস্যির চামচের এক চামচ করে। বিনিময়ে কোনও পয়সা দাবি করেন না। ভালবেসে শ্রদ্ধার সঙ্গে যে যা দেন তাই নেন।

'বনগাঁ সায়েন্স ক্লাব' তখন ছিল 'যুক্তিবাদী সমিতি'র সহযোগী সংস্থা। ক্লাবের কিছু সদস্য এই বিষয়ে অনুসন্ধান চালান। অনুসন্ধান চালিয়ে বিভিন্ন সময়ে যেসব রিপোর্ট আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাতে জানতে পারি—প্রতিদিন পাঁচ-ছ'হাজার

মানুষ আসছেন রোগমুক্তির আশায়। দৈনিক প্রণামী পড়ছে চার-পাঁচ হাজার টাকা। এত মানুষের ভিড়ে ও রাত কাটাবার ফলে মল-মূত্র ত্যাগের জন্য পরিবেশ দূষণ

মেহেবুব আলী ও লেখক

হচ্ছে। রাতে মাথা গোঁজার ভাল ব্যবস্থার অভাব ও আগতদের রক্ষার কোনও ব্যবস্থা না থাকায় মহিলাদের শ্লীলতাহানি ঘটছে বলে বেশ কিছু অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং থানাকে এই বিষয় দুটি জানায় নজরুল ক্রীড়াচক্র। কোনও সহযোগিতাই নাকি এই দুই সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। গড়ে ওঠা খাবারের দোকানগুলো চড়া দাম নিচ্ছে। একইভাবে, যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার সুযোগ নিয়ে মানুষগুলোর কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করছে লরি, টেম্পো ও রিকশা। প্রতিটি লরি ও টেম্পোতেও নাকি থাকে মেহবুব আলির এজেন্ট। এরা লরি, টেম্পোর ভাড়া থেকে কমিশন আদায় করছে। আগে হাজার দুয়েক লোককে দুধ বিতরণ করতেই দুধ শেষ হয়ে যেত। এখন যত লোকই আসুক দুধ শেষ হয় না। সবার সামনেই দুধ দোয়া হয় বটে, তবে দোয়া দুধ ঘরের ভিতরে চলে যায়। দফায় দফায় ভেতর থেকে দুধ আসে।

বনগাঁ সায়েন্স ক্লাবের সদস্যারা একাধিকবার চেষ্টা করেছিলেন গরুর ছবি তুলতে। ব্যর্থ হয়েছেন। ছবি তোলা নিষিদ্ধ। মেহেবুব আলি ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নজর এড়িয়ে গোপনে ছবি তোলা অসম্ভব। পরীক্ষার জন্য দুধ সংগ্রহ করতে রোগী

সেজে একাধিকবার হাজির হয়েছেন সাইন্স ক্লাবের সভ্য-সভ্যারা। মেহেবুব ও তাঁর সাঙ্গাতদের দৃষ্টি এড়িয়ে হাতের তালুতে ঢালা দুধ কোনওভাবে নিয়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়নি।

জুন মাসের মাঝামাঝি মেহেবুব বিশেষ রোগীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা চালু করলেন। বিনিময়ে নিতে লাগলেন মাত্র দশ টাকা। সেইসঙ্গে প্রচার চলতে লাগল গরুটি 'কামধেনু'। এই মত নাকি মেহবুবের নয়। তারকেশ্বর থেকে গরুটিকে দেখতে আসা কিছু পণ্ডিত ব্রাহ্মণই বিদায়কালে নাকি এই মত প্রকাশ করে গেছেন মেহেবুবের কাছে।

যুক্তিবাদী সমিতির তরফ থেকে গিয়েছিলাম মেহেবুব আলির কাছে। অবশ্যই পরিচয় গোপন রেখে। চতুর মেহেবুবের আস্থা ভাজন করতে পুরেপুরি সক্ষম হয়েছিলাম। ফলে অনেক কিছুই জেনেছিলাম। পেয়েছিলাম অলৌকিক দুধে রোগমুক্ত হওয়া মানুষদের ঠিকানা। মেহেবুবের কথায়—১৯ এপ্রিল রাতে নামাজ পরে ইফতার করে শুয়েছি। রাতে স্বপ্ন দেখলাম, ফুরফুরার দাদা পীর সাহেব বলেছেন, কাল থেকে অ্যান্টনীর দুধ হবে। এই দুধ যে পরম বিশ্বাসে রোগ সারার প্রার্থনা নিয়ে পরপর তিনদিন খাবে, তারই অসুখ সেরে যাবে। তবে সব অসুখ নয়। একটা মাত্র অসুখ সারার প্রার্থনা নিয়ে খেতে হবে। দুধ নস্যির চামচের এক চামচ খেলেই হবে।

স্বপ্নের পর ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্নকে স্বপ্ন বলেই ভাবলাম। কী করে বিশ্বাস করি ২২ মাস বয়সের বকনা অ্যান্টনি গর্ভ না হতেই দুধ দেবে? অ্যান্টনি জার্সি বকনা। ভেবেছিলাম ওকে কুরবানি দেব। সকাল না হতেই কিছুটা অবিশ্বাস্য ও কিছুটা কৌতূহল নিয়ে অ্যান্টনির বাঁটে হাত দিলাম। অবাক কাণ্ড। অ্যান্টনি দেড় সেরের মতো দুধ দিল।

দিন দুয়েক পর থেকে সাহস করে দাদা পীর সাহেবের নির্দেশ মতো রোগীদের দুধ বিতরণ শুরু করলাম। অবাক হয়ে দেখলাম তিনদিন দুধ খেয়ে বোবা কথা বলতে লাগল। প্যারালাইসিস রোগী উঠে বসল। সাহস পেলাম। পীর সাহেবের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমার কাপড়ের দোকান বন্ধ করে মানুষের সেবায় নিজেকে লাগিয়ে দিলাম। মেহেবুব আমাকে দুধ খেতে দিয়েছিলেন। একটা শিশিতে পরম যত্নে কিছুটা দুধও দিয়ে দিয়েছিলেন। ছবি তোলায়ও কোনও আপত্তি করেননি।

বনগাঁ সায়েন্স ক্লাব ও নজরুল ক্রীড়া চক্রের সাহায্যে আমরা আগত ভক্তদের কাছে তথ্য হাজির করে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম,

কোনও গরুর হরমোনের ভারসাম্য হীনতার জন্য বাচ্চা না হলেও কোনও গরুর পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে দুধ দেওয়া সম্ভব। ল্যাকটোজেনিক হরমোন ইনজেক্ট করেও বকনার বাঁটে দুধ আনা সম্ভব। এমন যদি হয়, গরুটা

গর্ভবতী হয়েছিল এবং কোনও কারণে গর্ভ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সে ক্ষেত্রেও এমনি ঘটা সম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশু চিকিৎসা বিভাগের রোগ অনুসন্ধান আধিকারিক ডাঃ পরিতোষকুমার বিশ্বাস আমাদের এই বিষয়ে তথ্যগুলো জানিয়েছিলেন।

ব্যাপক প্রচারের পাশাপাশি বনগাঁ সায়েন্স ক্লাব ও কমল বিশ্বাসের নেতৃত্বে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির ঠাকুরনগর শাখা ৪৫ জন রোগীর উপর অনুসন্ধান চালান। ৬ জন জানান সম্পূর্ণ সেরে গেছেন। ৫ জন জানান মোটামুটি ভাল আছেন। ৩৪ জন জানান রোগ একটু কমেনি, বরং অনেকের বেড়েছে।

ডাব-বাবার তুলনায় মেহেবুব আলির রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণ ব্যাপক যুক্তিবাদী প্রচারের ফলে বেশিরভাগ রোগীর ক্ষেত্রে অলৌকিক দুধ (?) বিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি।

বাবা তারক ভোলার মন্দির ও শ্রীশ্রীবাসুদেব

আজ থেকে প্রায় ৪২ বছর আগে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী প্রয়াত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর দুই ছেলের জমিতে বাবা তারকনাথের আদেশক্রমে (?) মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগ্রহ পাথরের। সাধারণের কাছে প্রচলিত এটি 'ভুঁইফোঁড় শিব'। সেবাইত—বাসুদেব দাস। লন্ড্রিতে কাজ করতেন। বর্তমানে অবতার। ছোটবেলা থেকেই নাকি তারকনাথকে দেখছেন, তারকনাথের সঙ্গে খেলেছেন। রোগীদের পরপর চার সপ্তাহ প্রতি সোমবারে মন্দিরে গিয়ে নিজের রোগের কথা জানাতে হয়। ভোলাবাবার আদেশমতো বাসুদেব ওষুধ দেন। ওষুধ বলতে বাবার স্নানজল, ফুল-বেলপাতা ইত্যাদি রয়েছে।

মন্দিরে রোগমুক্ত রোগীদের নাম-ঠিকানা ঝোলান রয়েছে। যত বড় রোগই হোক না কেন সব রোগেই মুশকিল আসান হয়। জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা 'আলোকপাত'-এর পাতায় রঙিন ছবিসহ অলৌকিক তারক ভোলার কাহিনি প্রকাশিত হওয়ার পর বাবার রমরমা বেড়েছে।

ওঁ

নূতন তীর্থ তারক ভোলার মন্দির
আশ্চর্য পুরুষ শ্রীশ্রীবাসুদেব

যুগে যুগে—এ যুগেও নিজের জীবনকে তিলে তিলে শেষ করে শত শত মুমূর্ষু মানুষকে মুক্তি দিয়ে যাও তাই তোমাকে আমি চিরকাল মাথায় করে রাখি।

আর ভক্তের অন্তরে ধ্বনিত হয় যে কথা—

বহু যুগ থেকে তুমি আজও আছ সাথে সাথে আস যাও, কর খেলা সবই থাকে

হৃদয়ে গাঁথা। তবুও যখন তুমি করগো খেলা কারো সাধ্য কি তোমায় ধরা? জীবের তরে যাতনা সহে আপন জীবন বিলায়ে দিয়ে শান্তি আন বহু প্রাণে, তাই কত মানুষ ছুটে আসে ভালবেসে তোমার টানে, ধন্য তারা তোমার নামে।

আমাদের ঠাকুরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমস্ত মানুষকে জানাই নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। হে মুমূর্ষু-পীড়িত ব্যাধিগ্রস্থ মানুষ এই তীর্থ ও সেবাইত আপনাদের সেবায় সর্বদাই ব্যস্ত।

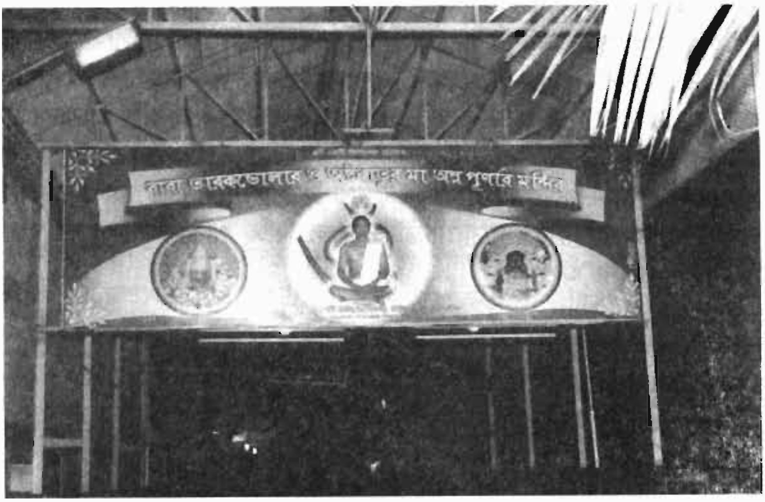

তারকভোলার মন্দির

মন্দিরে ঝোলানো নাম ঠিকানা ধরে আটজন রোগীর সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের সমিতি। দেখে রিঙ্কা মজুমদারের শ্বেতী সারেনি। মাধবী মজুমদারের জীবনে স্টোভ বার্স্ট করে দৃষ্টি হারাবার ঘটনাই ঘটেনি। শ্যামাপদ দত্তের মানসিক ভারসাম্যের অভাব এখনও আছে। চন্দন দাস ক্যানসারের আক্রমণ থেকে মুক্ত হয়নি। সনকা পালের যে ঠিকানা দেওয়া হয়েছে তার বাস্তব কোনও অস্তিত্ব নেই। সুদীপ দাস মৃগীরোগ থেকে মুক্ত হতে এখনও বাবার স্নানজল ও চিকিৎসকের নির্দেশমতো ওষুধ দুটোই গ্রহণ করে চলেছেন। ওষুধ বন্ধ করে পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। সেক্ষেত্রে অসুস্থতা বেড়েছে। রুমা ঘোষ নাকি জলের ভুলে হাত ও পায়ের অসাড়তার শিকার হন। বাবা পঞ্চানন ঘোষ বলতে পারেননি কত বছর হল অসুখ হয়েছিল। কোন চিকিৎসক চিকিৎসা করেছিলেন। দেখাতে পারেননি চিকিৎসকের কোনও নির্দেশ-পত্র। আর একটি তথ্য এখানে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ—সেবাইত বাসুদেব সম্পর্কে রুমার নাকি কাকা। সাবিত্রী পাল অর্শমুক্ত হয়েছেন। বাবা কিছু গাছ-গাছালি দিয়েছিলেন। অর্শ অনেক সময় নিজে থেকেই রক্তপাত বন্ধ রাখে। এ বিষয়ে আগেই আলোচনা করেছি। এছাড়া আরও একটি সম্ভাবনা

রয়ে গেছে—বাবা অলৌকিক কিছুর পরিবর্তে আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রয়োগ করেছিলেন।

গিয়েছিলাম নূতন তীর্থ—তারক ভোলার মন্দির ও আশ্চর্য পুরুষ শ্রীশ্রীবাসুদেবের দর্শন লাভের আশায়। দিনটা ৭ জানুয়ারি ১৯৯০। দর্শনার্থীদের গাড়ির ভিড় দেখে বুঝলাম বিজ্ঞাপনের খরচটা চূড়ান্তভাবেই সার্থক হয়েছে।

বাবার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করতে আশ্চর্য পুরুষের এক আশ্চর্য চামচা প্রথম বাধা দিলেন। পুলিশি জেরা চালিয়ে গেলেন। এতকিছুর পরও আশ্চর্য পুরুষের দর্শন মিলল না। পরিবর্তে চামচা যা বললেন, তার সারমর্ম—আমি যদি প্রবীর ঘোষ হই তো ...। এরপর যে সব নোংরা কথা বললেন সেগুলো ছাপার অযোগ্য।

রাগের কারণটা বোঝার চেষ্টা করলাম। তবে কি আমাদের পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের কর্মধারায় প্রভূত উন্নতি হয়েছে? ৫ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান চিঠিটা কি ইতিমধ্যেই শ্রীশ্রীবাসুদেবের কাছে পৌঁছে গেছে? আমার ছোট্ট চিঠিটায় বাসুদেবকে অপমান করার মতো একটি কথাও লিখেছি বলে তো বরং ছিল তাঁকে প্রণামী দেওয়ার অঙ্গীকার। পুরো চিঠিটাই তুলে দিচ্ছি পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ন্যায়-বিচার পাবার আশায়।

শ্রীশ্রী বাসুদেব সেবাইত, *৫.১.১৯৯০*
বাবা তারক ভোলার মন্দির
৩৮, প্রামাণিক ঘাট রোড
কলকাতা—৭০০ ০৩৬

বাবা তারক ভোলার কৃপায় ও আপনার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় কৃপাপ্রার্থী প্রতিটি রোগী রোগমুক্ত হয়েছেন বলে বহু প্রচার শুনেছি ও পড়েছি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও লোকমুখে আপনার প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁদের অথবা তাঁদের প্রিয়জনদের রোগ-মুক্তি কামনায় আপনার কাছে আসছেন। আমিও আপনার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার খবরে আকৃষ্ট।

অলৌকিক কোনও ঘটনা বা অলৌকিক ক্ষমতাধর কোনও ব্যক্তির কথা শুনলে আমি ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে প্রকৃত সত্য জানতে সত্যানুসন্ধান চালিয়ে থাকি। এই ধরনের সত্যকে জানার প্রচেষ্টাকে একজন সৎ মানুষ হিসেবে নিশ্চয়ই আপনি স্বাগত জানাবেন।

আপনার দাবির বিষয়ে একটি সত্যানুসন্ধান চালাতে আপনার কাছে পাঁচজন রোগীকে হাজির করতে চাই। আপনি ছ'মাসের মধ্যে রোগীদের রোগমুক্ত করতে পারলে আপনার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা এবং বাবা তারক ভোলার মাহাত্ম্য অবশ্যই স্বীকার করে নেবো ও প্রণামী হিসেবে আপনাকে দেবো ৫০ হাজার টাকা।

আগামী সাত দিনের মধ্যে আপনি চিঠির উত্তর না দিলে অথবা অনুসন্ধানের কাজে সহযোগিতা না করলে অবশ্যই ধরে নেবো আপনি মিথ্যাচারী ও বুজরুক।

শুভেচ্ছা সহ— *প্রবীর ঘোষ*

এমনি আরও বহু বহু অবতারের রোগমুক্তির ক্ষমতার উপর সমীক্ষা চালিয়েছি আমরা। প্রতিটি ঘটনা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করলেও একটা মোটা-সোটা বই হয়ে যাবে। এইসব সমীক্ষা চালিয়ে নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি—

যাঁরা বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতায় বা স্বপ্নে পাওয়া ওষুধের সাহায্যে যে কোনও রোগ সারাবার দাবিদার, তাঁরা প্রত্যেকেই হয় বুজরুক, নয় পাগল। অবতারদের সকলকেই ঠগ ও ধান্দাবাজ বলতে পারি না। এঁদের অনেকেই ঈশ্বর সম্বন্ধে জন্মগত ভাবে নানা ভ্রান্ত ধারণার শিকার।

এই যুগেই বেশ কিছু অবতারদের দেখতে পাচ্ছি, যারা নানা রকম সেবামূলক কর্মসূচির মুখোশ এঁটে চূড়ান্তভাবে মানুষ ঠকিয়ে অর্থ রোজগারের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ধর্ম-ব্যবসায়ে আজ তারা একদিকে যেমন বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠেছে, তেমনি ভক্ত রাজনৈতিক নেতাদের ও উঁচু সমাজের লোকদের কাজে লাগিয়ে হয়ে উঠেছে সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতার অধিকারী।

যোগে বৃষ্টি আনলেন শিববাল যোগী

১৯৮৫-র মে-জুনে আর এক ভারতীয় যোগী পত্র-পত্রিকায় যথেষ্ট আলোড়ন তুললেন। শিববাল যোগী। শিববাল যোগীর দাবি, তিনি যোগের দ্বারা প্রকৃতিকে (বৃষ্টিপাত, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি ঘটনা) নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। তারই সবচেয়ে বড় প্রমাণ তিনি রাখলেন ৩০ মে বাঙ্গালোরে। যোগের দ্বারা বৃষ্টি নামালেন। ঘটনাটার দিকে এবার একটু ফিরে তাকানো যাক।

বাঙ্গালোর শহরে জল সরবরাহ করা হয় শহরের কাছাকাছি থিপাগাগুানাহালি জলাশয় থেকে। বৃষ্টিপাতের অভাবে জলাশয়ের জল খুবই কমে গিয়েছিল। বাঙ্গালোর ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড সিউয়্যারজ বোর্ড (Bangalore Water Supply and Sewerage Board) কর্তৃপক্ষের মতে বৃষ্টি না হলে সঞ্চিত জলে আর মাত্র ১৫ দিনের মতো জল সরবরাহ সম্ভব। শেষ পর্যন্ত মুশকিল আসানের জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ শিববাল যোগীকে অলৌকিক ক্ষমতাবলে বৃষ্টি আনার জন্য লিখিতভাবে আমন্ত্রণ জানান।

২৮ মে বাঙ্গালোরের এক দৈনিক সংবাদপত্রে প্রথম খবরটি প্রকাশিত হয়। অতএব ৩০ মে জলাশয়ের কাছে অনুষ্ঠিত শিবলাল যোগীর বৃষ্টি আনার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উৎসুক দর্শকের অভাব হয়নি। অনুষ্ঠানে শিববাল যোগী এলেন শুভ্র

ধুতি পরে, বিদেশি গাড়িতে সওয়ার হয়ে। যোগী ধ্যানে বসলেন, সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হল ভক্ত-শিষ্যদের ভজন গান ও নাচ। কয়েকজন শিষ্য জ্বলন্ত কর্পূর জিভে রেখে

শিববাল যোগী

আরতি করেন। শিষ্যদের এই অলৌকিক কাজকর্ম দেখে দর্শকরা তুমুল জয়ধ্বনি দিলেন। ঘন্টা তিনেক ধ্যানের পর দুপুর ২টা ৪০ মিনিটে যোগীর ধ্যান ভাঙল। এরপর যোগী ভক্তদের প্রণাম নিলেন, বিনিময়ে দিলেন বিভূতি। যে-সব বিশিষ্ট ভক্তেরা পরম বিশ্বাসে ভক্তিভরে যোগীর পদধূলি নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অন্ধ্রের প্রাক্তন মন্ত্রী ও লোকসভার সদস্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীকানথাম্মা, আকাশবাণীর স্টেশন ডিরেক্টর প্রমুখ অনেকেই।

শিববাল যোগী ঘোষণা করেছিলেন, 'একমাসের মধ্যে জলাশয়টি ভর্তি হয়ে যাবে।' খবরে আরও প্রকাশ, সে-দিনই বৃষ্টি হয়েছিল। বৃষ্টির পরিমাণ ছিল ৫ মিলিমিটার।

পরবর্তীকালে অনেক পত্র-পত্রিকাতেই সংবাদটি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে।

এবার একজন যুক্তিবাদী হিসেবে আমি সেই সঙ্গে আরও কয়েকটা খবর আপনাদের পরিবেশন করছি।

২৮ মে বাঙ্গালোরের যে দৈনিক সংবাদপত্রটিতে শিববাল যোগী দু'দিন অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা বৃষ্টি নামাবেন বলে খবর সংবরাহ করেছিলেন, সেই পত্রিকাটির 'আবহাওয়া বার্তায়' বলা হয়েছিল, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু কয়েক দিনের মধ্যেই কর্নাটকে এসে পৌঁছবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আবহাওয়া বার্তাতেই আরও বলা হয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে কোচিনে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। দীর্ঘ তাপদাহের পর ২৭ তারিখে বাঙ্গালোরে কিছু বৃষ্টি হয়েছে, যদিও এই বৃষ্টি ঠিক বর্ষার আগমনবার্তা নয়। অর্থাৎ এই বৃষ্টি মৌসুমী বায়ুর ফলে হয়নি।

আগুন খাচ্ছেন অনিন্দিতা

বাঙ্গালোর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে যে সময়ে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রবল বৃষ্টিপাত অবশ্যম্ভাবী, সেই সময়টিতে বৃষ্টি নামাকে কী করে শিববাল যোগীর অলৌকিক কাজ নয়। আমি নিজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় জিভে জ্বলন্ত কর্পূর রেখে দেখিয়েছি। কর্পূরের আগুনের শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে বলে সাধারণ

মানুষের চোখে ঘটনাটা রহস্যময় ও অলৌকিক বলে মনে হয়। কর্পূর একটি Volatole বা উদ্বায়ী বস্তু। অতিমাত্রায় জ্বলনশীল। ফলে অতি দ্রুত জ্বলে শেষ হয়ে যায়। আগুনের তাপ জিভে ততটা অনুভূত হয় না। জিভ ভাল করে লালা দিয়ে ভিজিয়ে নিলে কয়েক মুহূর্তের জন্য জ্বলন্ত কর্পূরের তাপ আদৌ অসহ্য নয়। এই খেলা দেখাতে যে বিষয়ে খুবই সচেতন থাকা প্রয়োজন তা হলো, কর্পূরের আগুন যেন গলায় না প্রবেশ করে। প্রবেশ করলে মৃত্যুও ঘটতে পারে। খেলাটা কঠিন হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব বা অলৌকিক নয়। আমরা বিভিন্ন অলৌকিক বিরোধী অনুষ্ঠানে জিভে কর্পূর জ্বেলে দেখাই।

চন্দননগরে সাধুর মৃতকে প্রাণ-দান

১৯৮৩'র ২৫ মে 'যুগান্তর' দৈনিক পত্রিকায় এক সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতাবলে মৃতকে বাঁচানোর বিবরণ প্রকাশিত হলো। বিবরণে বলা হয়েছিল, চন্দনগরে রাস্তার ধারের একটা বেলগাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এক সন্ন্যাসী। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এক পুরুষের মৃতদেহ। সঙ্গে চলেছিলেন মৃতের স্ত্রী। বেলগাছের কাছে এসে রমণীটি ধনুক থেকে বেরিয়ে আসা তীরের মতোই আছড়ে পড়েন সন্ন্যাসীর পায়ে, সন্ন্যাসীকে রমণী অনুরোধ করেন, "আমার স্বামীকে বাঁচান। ওঁর জ্ঞাতি শত্রুরা ওঁকে বিষয় খাইয়ে মেরে ফেলেছে। ওঁকে না হলে আমি বাঁচব না।" কান্নায় ভেঙে পড়েন রমণী।

সন্ন্যাসী বলেন, "বাঁচানোর আমি কে? ঈশ্বরের কৃপা থাকলে আর তোমার সতীত্বের জোর থাকলে বাঁচবে। আমার দেওয়া এই বিভূতি শরীরে ও মুখে ছড়িয়ে দাও।"

পরম বিশ্বাসে সাধুর আদেশ পালন করাতে মৃত উঠে দাঁড়ায়।

বিবরণের মোটামুটি এই মোদ্দা কথা শুনে আমি স্বভাবতই সন্ন্যাসীর দর্শনলাভের তীব্র বাসনায় চন্দননগরের স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণির লোকের সঙ্গে কথা বলে এই সন্ন্যাসীর বিষয়ে জানতে চাই। যতদূর সম্ভব অনুসন্ধান চালিয়েও এই ধরনের কোনও সন্ন্যাসী বা প্রাণ ফিরে পাওয়া মৃত ও তার পরিবারের কারও সন্ধান পাইনি। এমন একটা চমকপ্রদ অলৌকিক ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র একজন সাংবাদিক ছাড়া স্থানীয় কেউই জানতে পারলেন না, এটাই আমার কাছে আরও বেশি চমকপ্রদ ঘটনা বলে মনে হয়েছে। পত্রিকায় এই সংবাদ পরিবেশনে আরও কয়েকটি অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করেছি। ঘটনাটি ঘটার তারিখের কোনও উল্লেখ ছিল না। ছিল না মৃতের নাম ঠিকানা। বিংশ শতাব্দীর এমন একটা বিস্ময়কর ঘটনাকে এমন ত্রুটিপূর্ণভাবে, হেলাফেলার সঙ্গে পরিবেশন করা হলো কেন? কেন খবরের সঙ্গে নবজীবন পাওয়া লোকটির, তাঁর স্ত্রীর ও সন্ন্যাসীর ছবি এবং ঘটনায় সংশ্লিষ্ট যত জনের সম্ভব ইন্টারভিউ ছাপা হল না? মৃতের জীবনদানের ঘটনা

কি এই শতাব্দীর অন্যতম সেরা খবর নয়? একমাত্র পত্রিকা হিসেবে এমন 'স্কুপ নিউজ' পেয়েও যুগান্তরের এমন গা-ছাড়া ভাবই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক করে। আমি এই বিষয়ে আরও বিশদভাবে আলোকপাতের জন্য যুগান্তর চিঠিপত্র বিভাগে একটি চিঠি দিই। এই চিঠি লেখার পেছনে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, ঘটনার সত্যতা যাচাই করার সুযোগ লাভ। আমার সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। এতে এটাই স্পষ্ট হয় যে, মিথ্যে খবর ছেপে ছিল শুধু এই উদ্দেশ্যে যে—পাবলিক খাবে ভালো।

ভগবান শ্রীসদানন্দ দেবঠাকুর

অশ্বিনী দত্ত রোড, কলকাতা-২৮-এ গড়ে উঠেছে 'আনন্দধাম', ভগবান শ্রীসদানন্দ দেবঠাকুরের আশ্রম। ভক্ত শিষ্য-শিষ্যারা বাবাকে অবতার জ্ঞানে নয়, দেব জ্ঞানেই পুজো করেন। সদানন্দের কথায়—"আমি ব্রহ্ম, আমি শক্তি। নাম কর, নাম কর, আমায় পাবি। তোরা যেখানেই যাঁকে পূজা করিস না কেন জানবি তা—আমাতেই অর্পণ হয়।"

ভক্তদের প্রতি সদানন্দের বরাভয়—"তুই আমার নাম নে,—তোর সকল পাপ ধ্বংস করব আমি... তোর বাঞ্ছা পূরণ করব আমি। আমাকে ডাকতে থাক। ডাকতে ডাকতে সুগন্ধ হয়ে তোর মনকে দেব মজিয়ে, জ্যোতিঃ রূপে হবে প্রকাশ, রূপ হয়ে দর্শন, ভাব হয়ে করব আলিঙ্গন, বিভোর হয়ে ঢলে পড়বি আমারই কোলে। তখন শুধু আনন্দ-আনন্দ-সদানন্দ।

পত্র-পত্রিকায় ছবিসহ শ্রীসদানন্দের বিজ্ঞাপন কিছুদিন ধরেই চোখে পড়ছিল। বিজ্ঞাপনগুলোতে 'অলৌকিক সিদ্ধপুরুষ', 'প্রিয়দর্শন দেবপুরুষ' ইত্যাদি বিশেষণ শ্রীসদানন্দের উপর বর্ষিত হয়েছে। বিজ্ঞাপনগুলোতে বলা হয়েছে—শ্রীসদানন্দ কৃপা করলে রোগমুক্তি, সৌভাগ্যলাভ ও অসাধ্যসাধন হয়।

দেবপুরুষটির দর্শনে হাজির হলাম 'আনন্দধামে'। সময় ১৯৮৭-র ২৮ জুলাইয়ের সন্ধ্যা। প্রতীক্ষাকক্ষে আরও অনেকের মতো আমাকে নাম পাঠিয়ে কিছুক্ষণ বসতে হল। দেওয়ালের নানা লেখা পড়ে ও 'পুরমপুরুষ শ্রীসদানন্দ লীলা মাহাত্ম্য : (প্রথম খণ্ড)'র পাতা উল্টে সময় কাটালাম। দেওয়ালে উন্মাদ রোগ, হিস্টিরিয়া-সহ বহু রোগ ভাল করে দেওয়ার গ্যারান্টির কথা বড় বড় রঙিন হরফে লিপিবদ্ধ। যে লেখাটা আমাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করল সেটা হল, বন্ধ্যারমণীকে মাতৃত্ব দানের গ্যারান্টি। লীলা মাহাত্ম্যও খুব আকর্ষণীয় বই। বইটিতে জনৈকা শ্রীমতী লক্ষ্মী ঘোষ জানিয়েছেন, এক হিস্টিরিয়া রোগীকে শুধু একটি তাগা বেঁধে বাবাঠাকুর দু-দিনে তাকে ভাল করেছিলেন।

লক্ষ্মীদেবীর এক আত্মীয় বহু বছর ধরে প্যারালিসিস রোগে ভুগছিলেন। সর্বাঙ্গ অসাড়। হাসপাতালে যখন মৃত্যুর দিন গুনছেন সেই সময় লক্ষ্মীদেবী রোগীর স্ত্রীকে

পরামর্শ দেন বাবাঠাকুরের শরণাপন্ন হতে। বাবাঠাকুর দিলেন আশীর্বাদী ফুল-বেলপাতা। বলে দিলেন, এই ফুল-বেলপাতা রোগীর শরীরে বুলিয়ে দিও। অবাক কাণ্ড, কয়েক দিনের মধ্যেই রোগী রোগমুক্ত হলেন।

জনৈক পঙ্কজ হাজরা জানিয়েছেন, একরাতে আসন্ন প্রসবা স্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছিলেন হাসপাতালে। সঙ্গী করেছিলেন শুধু 'তাঁর নাম'। পথ চলছেন আর ব্যাকুল হয়ে ডাকছেন, 'গুরু তুমি দৃষ্টি রাখো।' হঠাৎ পথের মাঝেই দর্শন পেলেন ইষ্টদেব সদানন্দের।

রেণুকা সমাজদার জানিয়েছেন, এক ফাল্গুনী গভীর রাতে হঠাৎ সমস্ত ঘর আলোকিত হয়ে গেল। রেণুকা দেখতে পেলেন সেই আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীসদানন্দ। প্রাণ-মন আনন্দে ভরে উঠল। বিস্ময়ের আরও কিছু বাকি ছিল। শ্রীসদানন্দ হঠাৎ রূপ পরিবর্তন করলেন। হয়ে গেলেন মা কালী। এরপরও বহুদিন সময়ে-অসময়ে অপার করুণা বর্ষণ করে দেখা দিয়েছেন কখনো কৃষ্ণ, কখনো গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে, কখনো বা কালী রূপে।

একই ভাবে লক্ষ্মী ঘোষ তীব্র আকুতি নিয়ে যখনই ঠাকুরের দর্শন চেয়েছেন, তখনই শ্রীসদানন্দ আবির্ভূত হয়েছেন। এই সদানন্দই কখনো দর্শন দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ হয়ে, কখনো বিষ্ণু রূপে, কখনও বা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর রূপ নিয়ে।

জনৈক পার্থ কুণ্ডু চৌধুরী একদিন ঘরে বসে তারকেশ্বরের বিগ্রহকে মনেমনে স্মরণ করে কল্পনায় রূপ গড়ে প্রণাম জানাচ্ছেন। পরম বিস্ময়ে দেখলেন, তারকেশ্বর বিগ্রহের ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন ঠাকুর শ্রীসদানন্দ স্বয়ং। এমনতর আরও অনেক অত্যাশ্চর্য অলৌকিক ঘটনা আরও অনেকের জবানিতেই প্রকাশিত হয়েছে।

এক সময়ে ভিতরে যাওয়ার ডাক পেলাম। শ্রীসদানন্দ একটা খাটে বসে। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চির মধ্যে। মেদহীন চেহারা। গায়ের রঙ সাধারণ বাঙালিদের তুলনায় কিছুটা ফর্সা। চুল প্রায় ঘাড়ে এসে পড়েছে।

বাবাঠাকুরকে পরিচয় দিলাম 'আজকাল' পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে। নাম বললাম পুলক ঘোষ। সদানন্দ আমার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক প্রশ্ন করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের পত্রিকায় তো প্রবীর ঘোষও লেখেন, ওঁকে চেনেন? উত্তর দিলাম, প্রবীরবাবুর লেখার সঙ্গে সামান্য পরিচয় আছে, কিন্তু প্রবীরবাবুর সঙ্গে নয়। বাবাঠাকুর বললেন, আপনার ছবি-টবি কোনও বই বা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে? আপনাকে খুব চেনা-চেনা লাগছে। বললাম, না, আমার ছবি প্রকাশিত হওয়ার মতো নামী-দামি মানুষ এখনও হয়ে উঠতে পারিনি। তবে বহু জায়গায় ঘুরতে হয়, কোথাও দেখে থাকতেই পারেন।

না, সাক্ষাৎকার নেবার চেষ্টা করিনি। নিজের সমস্যা নিয়ে এসেছি—

জানিয়েছিলাম। তবে জানিয়েছিলাম শ্রীসদানন্দের বিষয়ে পত্রিকার পাতায় সুন্দর একটা প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছে আছে। এই ইচ্ছের কথা বলা সত্ত্বেও সদানন্দ তেমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না। বরং জানতে চাইলেন, আপনি যে সমস্যা সমাধানের জন্য আমার কাছে এসেছেন, আপনার কি অলৌকিক বিষয়ে বিশ্বাস আছে?

বললাম, আছে বলেই তো আসা। তবে কথা হল, আসল মানুষটি খুঁজে পাওয়াই কঠিন।

আপনি গ্রহের ফল, গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাস করেন? শ্রীসদানন্দ জিজ্ঞেস করলেন।

সদানন্দের কথায় খেয়াল হলো আজ প্রচণ্ড তাড়াহুড়োয় হাতে বা আঙুলে তাবিজ বা গ্রহরত্নের আংটি পরে আসা হয়নি। অবস্থাটা ম্যানেজ করার চেষ্টা করলাম। বললাম, একসময় গ্রহরত্নের আংটি পড়তাম। বছরখানেক হলো আংটি ছেড়েছি। সেও এক দক্ষিণ ভারতীয় সাধুর আদেশে। তিনি বলেছিলেন জন্মকুণ্ডলীর কেন্দ্র-বিন্দুতে অবস্থান করেন শিব-শক্তি, ভাগ্যে যা ঠিক করা আছে তা পাল্টাতে পারেন একমাত্র শিব-শক্তি, পাথর-টাথর নয়। ওঁরই নির্দেশে পাথর বিদায় দিয়ে

মন্ত্রে নাকি গর্ভবতী করেন শ্রীসদানন্দ ঠাকুর

শিব-শক্তির উপাসক হয়েছি।

কী পাথরের আংটি ছিল আপনার? জিজ্ঞেস করলেন সদানন্দ।

একটা ছিল মুক্তো, একটা হিরে। বললাম আমি।

হিরে আর মুক্তো কত রতি করে ছিল? আবার প্রশ্ন করলেন সদানন্দ।

বলালাম হিরে আধ রতির মতো, মুক্তো সাড়ে ন'রতি।

সে-দিন আরও কিছু এটা-সেটা প্রশ্ন করে আমার ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। একটা ঠিকানাও বললাম। বাবাঠাকুর ঠিকানাটা ডায়রিতে টুকে নিয়ে সাতদিন পরে আসতে বললেন। জানালেন সে-দিনই আমার সমস্যার কথা শুনবেন এবং সমাধানের উপায় বাতলাবেন।

সাত দিন পরে আবার গেলাম। এ-বার আমার সঙ্গী চিত্র-সাংবাদিক গোপাল দেবনাথ। আজও বাবা সতর্কতার সঙ্গেই কথা শুরু করলেন। এটা-সেটা নিয়ে গল্প-গাছার পর হঠাৎই বললেন, আপনি তো এখন স্টোন-টোন-এ বিশ্বাস করেন না। স্টোনগুলো কী করলেন?

বললাম, কিছুই করিনি, লকারে আছে।

বাবাঠাকুর মৃদু হাসলেন। বললেন, এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। যে জিনিস প্রয়োজনে আসে না সে জিনিস ধরে রেখে লাভ কী? তারচেয়ে বিক্রি করে দিন। আপনারও পয়সা আসবে, অন্যেরও কাজে লাগবে। আংটিটা যেন কী স্টোনের ছিল?

বললাম, একটা নয় দুটো আংটি ছিল। একটা হিরের, একটা মুক্তোর।

কেমন ওজন ছিল ওগুলোর।

হিরেটা আধ রতির মতো, মুক্তোটা সাড়ে-ন' রতির।

আমার উত্তর শুনে বাবাঠাকুর স্বস্তি পেলেন। তাঁর টান-টান কথাবার্তা এবার সাবলীল হল।

প্রথম দিনের সাক্ষাতে সদানন্দ আমাকে কী কী প্রশ্ন করেছিলেন এবং তার কী কী উত্তর দিয়েছিলাম প্রতিটি স্মৃতিতে ধরে রাখতে সচেষ্ট ছিলাম। আমার মনে হয়েছিল বাবাঠাকুর আমাকে প্রবীর ঘোষ বলেই সন্দেহ করছেন। তাই এমন কিছু প্রশ্ন রেখেছিলেন এবং নিশ্চিত ছিলেন, উত্তরকর্তা প্রবীর ঘোষ হলে যেগুলোর মিথ্যে উত্তর দেব। হঠাৎ করে প্রশ্নের জবাব দিতে মিথ্যে বলতে বাধ্য হলে, স্বাভাবিক নিয়মে উত্তরদাতা দ্রুত ভুলে যান কী কী প্রশ্নের উত্তরে কী কী মিথ্যে বলেছিলেন।

সদানন্দর কাছে আমার সমস্যাগুলো মেলে ধরলাম। পাশাপাশি শুনছিলাম তাঁর কথা। স্নাতক। ম্যাজিক শিখেছেন। মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করেছেন। অভিনয় করেছেন। সদানন্দের কথায়, যাঁদের ভগবান বলি, তাঁরা আমাদেরই মত রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে এসেছিলেন। নিজের শক্তিকে জানতে পেরে তাঁরা ভগবান হয়ে গেছেন। সদানন্দও একইভাবে ভগবান। ভক্তদের লেখাগুলো প্রসঙ্গে জানালেন, কোনও অতিরঞ্জন নেই। দু-পাতা বিজ্ঞান পড়া মানুষদের বেশির ভাগই পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভুলতে বসেছে। অথচ তারা জানে না পাশ্চাত্য দেশগুলোই প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিদের পুঁথি-পত্র ঘেঁটে আবার নতুন করে উদ্ধার করছে পৃথিবী কাঁপানো অনেক বিজ্ঞানের

আবিষ্কারকে। ভারত অলৌকিক, অবতার ও ঋষিদের পুণ্য-ক্ষেত্র।

আলোচনার প্রসঙ্গকে টেনে আনলাম সদানন্দের একটি বিশেষ দাবির দিকে। বললাম, আপনি জানিয়েছেন মন্ত্রশক্তিতে ইচ্ছুক রমণীকে আপনি মাতৃত্ব দানে সক্ষম। এই মন্ত্র আপনি কোথা থেকে পেলেন?

আমার প্রশ্নের উত্তরে সদানন্দ আবার ঋষিদেরই টেনে আনলেন। জানালেন, আড়াই-তিন হাজার বছরের প্রাচীন এই মন্ত্রের স্রষ্টা ভারতের প্রাচীন ঋষি। তাঁদের কাছ থেকেই শিষ্য পরম্পরায় এই মন্ত্র এসেছে আমার কাছে।

পুলক ঘোষ পরিচয়ের আমি সদানন্দের কাছে আমার সমস্যার কথা বলতে গিয়ে ফুলবাবার কাছে যে গল্প ফেঁদেছিলাম, সেটাই ফাঁদলাম—আজ পর্যন্ত ঘরণী না জোটার গল্প। ভগবান সদানন্দ আমার কাহিনিকে সত্য বলে ধরে নিয়ে আবারও প্রমাণ করলেন তিনি সাধারণ মানুষ মাত্র।

ভরসা দিলেন এ-বার শিগ্‌গির বিয়ে হবে। বাবাকে নিয়ে সমস্যার কথা বললাম। বললাম, এমন কাজ করি, যখন-তখন যেখানে-সেখানে দৌড়তে হয়। বাড়িতে থাকেন তখন বৃদ্ধা মা ও বৃদ্ধ বাবা। বাবা হাঁপানি-রোগী। মাঝে-মাঝে রাত-দুপুরে এখন-তখন অবস্থা হয়। ডাক্তার, অক্সিজেন—বৃদ্ধা মায়ের পক্ষে চাপ সামলানো মাঝে-মাঝে অসম্ভব হয়ে পড়বে। বাবাকে কি সুস্থ করা সম্ভব নয়?

সদানন্দ শান্ত গলায় বললেন, এই ধরনের অবস্থাই চলবে। '৯০ সাল পর্যন্ত বাঁচবেন।

ছদ্ম-পরিচয়ের আমি তখনই জানাতে পারলাম না আমার বাবা বছর দুয়েক আগে মারা গেছেন। আর, হাঁপানি কেন, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কোনও দিনই তেমন অসুখ-বিসুখে ভোগেননি। বরং বলা চলে খুবই নীরোগ স্বাস্থ্যের, প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা মানুষ ছিলেন।

সদানন্দের দাবি প্রমাণের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ২৬ ডিসেম্বর ১৯৮৯ একটি চিঠি দিই। চিঠিটি এখানে তুলে দিলাম।

শ্রীসদানন্দ দেবাঠাকুর
"আনন্দধারা" *২৬.১২.৮৯*
৭ অশ্বিনী দত্ত রোড,
কলকাতা-৭০০ ০২৮
মহাশয়,

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আপনার ভক্তদের দেওয়া কিছু বিজ্ঞাপন আমার চোখে পড়েছে। বিজ্ঞাপনগুলোতে আপনাকে 'অলৌকিক সিদ্ধ-পুরুষ', 'দেবপুরুষ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বছর দু-আড়াই আগে একাধিক সন্ধ্যায় আপনার আশ্রম থেকে প্রকাশিত দু-একটি বই আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। তারই একটি—'পরমপুরুষ

শ্রীশ্রীসদানন্দ লীলা মাহাত্ম্য' পড়ে জানলাম আপনার ভক্তরা অনেকেই আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ, কালী, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, বিষ্ণু, তারকেশ্বর ইত্যাদি হতে দেখেছেন। বহু রোগী আপনার অলৌকিক ক্ষমতায় রোগ মুক্ত হয়েছেন। বইটিতে আপনি জানিয়েছেন, "তোরা যেখানেই যাঁকে পুজো করিস না কেন জানবি তা—আমাতেই অর্পণ হয়।"

আপনার একটি কথায় বড়ই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। আপনি আমাকে জানিয়েছিলেন, মা হতে ইচ্ছুক রমণীকে আপনি মন্ত্র বলে মাতৃত্ব দিতে পারেন। এও জানিয়েছেন, আড়াই তিন হাজার বছরের প্রাচীন এই মন্ত্রের স্রষ্টা ভারতের প্রাচীন ঋষিরা। তাঁদের কাছ থেকেই শিষ্য পরম্পরায় এই মন্ত্র এসেছে আপনার কাছে।

আমার বিভ্রান্তির কারণ, আপনিই যখন ঈশ্বর তখন যা খুশি করার ক্ষমতা তো আপনারই হাতে। ইচ্ছুক রমণীকে গর্ভবতী করতে আপনার আবার মন্ত্রের প্রয়োজন কী?

অলৌকিক কোনও কিছুর অস্তিত্ব আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের দরবারে প্রমাণিত হয়নি, অথচ, অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদার বহু। আমি একজন সত্যানুন্ধানী। দীর্ঘদিন ধরে বহু অনুসন্ধান চালিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখেছি, অলৌকিক ক্ষমতার দাবিগুলি ছিল একান্তই অসার। আমার সত্যানুসন্ধানের প্রয়াসকে প্রতিটি সৎ মানুষের মতো আপনিও স্বাগত জানাবেন আশা রাখি। সেই সঙ্গে এও আশা রাখি, আপনার অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে অনুসন্ধানে আপনি আমার সঙ্গে সমস্ত রকমের সহযোগিতা করবেন।

আপনার কাছে হাজির করতে চাই পাঁচজন রোগী ও তিনজন মা হতে ইচ্ছুক অথচ অক্ষম রমণীকে। রোগীদের এক বছরের মধ্যে রোগমুক্ত করে ও ইচ্ছুক রমণীদের মাতৃত্ব দান করে আপনার ক্ষমতার প্রমাণ দিতে পারলে আমি এবং 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' আপনার অলৌকিক ক্ষমতা স্বীকার করে নেব এবং আপনাকে প্রণামী হিসেবে দেব পঞ্চাশ হাজার টাকা। সেই সঙ্গে আমাদের সমিতি ভবিষ্যতে সমস্ত রকম অলৌকিক বিরোধী কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকবে।

আগামী দশ দিনের মধ্যে আমাদের সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যোগাযোগ করে অনুসন্ধান বিষয়ে সহযোগিতা না করলে অবশ্যই ধরে নেব আপনার সম্বন্ধে প্রচলিত প্রতিটি কাহিনি এবং আপনার দাবি পুরোপুরি মিথ্যা।

আশা রাখি ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষে আমার এই চ্যালেঞ্জ আপনি গ্রহণ করবেন।

শুভেচ্ছা সহ
প্রবীর ঘোষ

সুনিশ্চিতভাবে জানি, ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জ গ্রহণের ধৃষ্টতা দেখালে সদানন্দ দেবাঠাকুরের দেবত্বর গ্যাস বেলুন ফেঁসে যাবেই।

১২ জানুয়ারি ১৯৯০। চিঠিটা ফেরত দিয়ে গেল ডাক বিভাগ। শ্রীসদানন্দ চিঠিটা নিতে রাজি হননি। হায় জীবন্ত ভগবান, স্বর্গের দেবতা, মর্তের তুচ্ছ এক মানুষকে এত ভয়!

আগুনে হাঁটার অলৌকিক ঘটনা

খুদাবক্স এমনই এক ভারতীয় ফকির যিনি বিলেতের মাটিতে এক অলৌকিক ঘটনায় সেখানে আলোড়ন সৃষ্টি করছিলেন। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৩৫ সালের ৯ ও ১৭ সেপ্টেম্বর লন্ডনে। জ্বলন্ত কাঠকয়লার আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেন খুদাবক্স। ইংরেজরা স্তম্ভিত হলো ভারতীয় ফকিরের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে। পূর্ব ঘোষিত এই আগুনে হাঁটা অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিজ্ঞানীরা খুদাবক্সের পা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হন যে, পায়ে কোনও কিছুর প্রলেপ লাগানো নেই। পা ছিল শুকনো। পায়ের চেটোর তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিক। হাঁটা শেষ করার ১০ সেকেন্ড পরও তাঁর চেটোর তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিক। খুদাবক্সের পায়ের একটা নখে ১/২ বর্গ ইঞ্চি মাপের একটা লিউকোপ্লাস্টার লাগানো ছিল। আগুনে হাঁটার পর সেটাও ছিল প্রায় অক্ষত। ১২ ফুট লম্বা ৬ ফুট চওড়া এবং ৮ ইঞ্চি গভীর অগ্নিকুণ্ডটা পার হতে খুদাবক্সের সময় লেগেছিল মোট ৫ সেকেন্ড। চারটি মাত্র পদক্ষেপে তিনি অগ্নিকুণ্ড পার হয়েছিলেন। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বার করলেন, প্রতি পদক্ষেপে আগুনের সঙ্গে পায়ের সংযোগ হয়েছিল মাত্র ১ সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশ সময়ের জন্য। ফলে পা কোন সময়ই ভালমতো জ্বলন্ত আগুনের স্পর্শে আসতে পারেনি। লন্ডনে হৈ-হৈ ফেলে দিয়েছিলেন খুদবক্স।

আমাদের মা-ঠাকুমাদের অনেককেই দেখেছি জ্বলন্ত উনুন থেকে কোনও জ্বলন্ত কাঁচা-কয়লা' কে চট করে দু'আঙুলে ধরে উনুন থেকে নামাতে। এতো দ্রুত তাঁরা কাজটা করেন যে, কয়লার তাপ ওই সামান্য সময়ের মধ্যে ভালমতো হাতের সংস্পর্শে আসতে পারে না। গ্রামেও অনেককে দেখেছি, খালি হাতে জ্বলন্ত কাঠকয়লা তুলে হুঁকোর কলকেতে বসিয়ে দিচ্ছে। ওরা হাতের তেলোয় জ্বলন্ত কাঠকয়লা বেশিক্ষণ রাখে না বলে ফোসকা পড়ে না।

ঝাড়খণ্ডের রাঁচি জেলায় গ্রীষ্মকালে আদিবাসীদের এক উৎসব পালিত হয়। নাম, মণ্ডাপরব। এই উপলক্ষে আগুনে হাঁটা অনুষ্ঠিত হয়। ওরা এই আগুনে হাঁটাকে বলে 'ফুলকুদনা', অর্থাৎ ফুলের উপর লাফানো। আট-দশ হাত লম্বা দু'হাত চওড়া ও আধ হাত গভীর কাঠকয়লার আগুন জ্বালানো হয়। পুরোহিত ওই অগ্নিকুণ্ডে

মন্ত্র পড়ে জল ছিটিয়ে দেন। আদিবাসীদের বিশ্বাস এই মন্ত্রপাঠের সঙ্গে-সঙ্গে দেবী পার্বতী আগুনের ওপর ফুলের মতো সুন্দর আঁচল বিছিয়ে দেন। এইবার কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে ওই আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে পায়ে ফোসকা পড়বে না। আদিবাসী ভক্তেরা পুকুরে স্নান করে ভিজে শরীরে নেচে-নেচে আগুনের ওপর দিয়ে লম্বালম্বিভাবে গোটা তিনেক পদক্ষেপেও হেঁটে যায়। আশ্চর্যের বিষয় (?) তাদের পায়ে ফোসকা পড়ে না। এই অলৌকিক ঘটনা দেখতে বিশাল ভিড় হয়। আদিবাসীরা বিশ্বাস করে এই অলৌকিক ঘটনার পেছনে রয়েছে পুরোহিতের অলৌকিক ক্ষমতা ও ভক্তদের ঈশ্বর-বিশ্বাস।

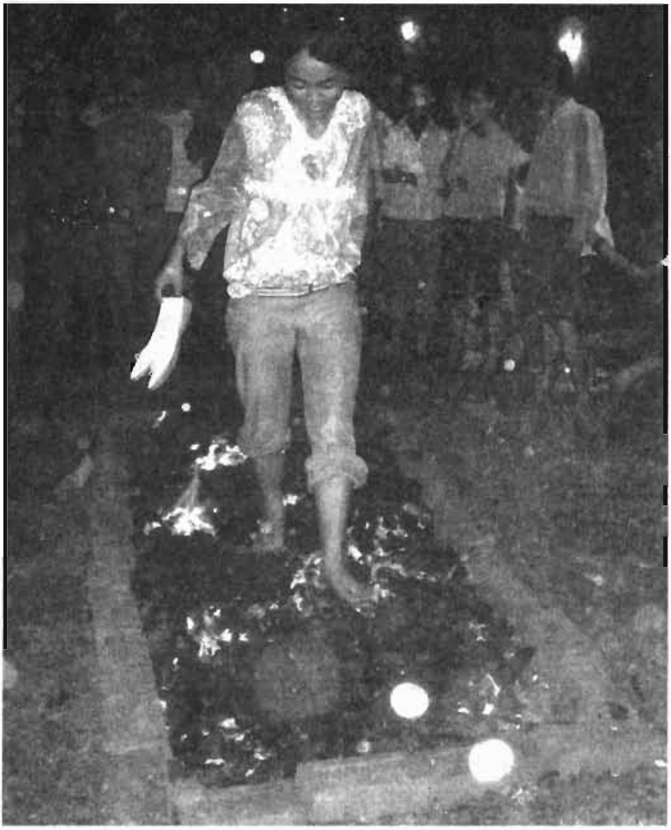

কার্সিয়াং শাখার জনৈকা সদস্যা

বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ প্রয়াত শ্রীনির্মলকুমার বসু কয়েকজন সহযোগী নিয়ে ঘটনাটা দেখতে হাজির হন। শ্রীবসু লক্ষ্য করেন অগ্নিকুণ্ড পার হতে ভক্তদের মোট সময় লাগছে ৮ সেকেন্ডের মতো। পা'দুটি এক সেকেন্ডেরও অনেক কম সময়ের জন্য

আগুনের স্পর্শ পাচ্ছে। না, কারও পায়েই ফোসকা পড়ছে না।

শ্রীবসুর এক সহযোগী দ্রুত আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু, পারেননি। পায়ে ফোসকা পড়েছিল। শ্রীবসুর আর এক সহযোগী ভক্তদের মতো স্নান করে ভেজা শরীরে, ভেজা পায়ে জ্বলন্ত আগুনের ওপর দিয়ে দ্রুত হেঁটে যান। তাঁর পায়ে কোনও রকম ফোসকা পড়েনি। তার দুটি কারণ হলো (১) ভেজা পায়ে কিছু নরম মাটির প্রলেপ পড়েছিল। (২) দ্রুত পদক্ষেপের দরুন মুহূর্তের জন্য পা আগুনের স্পর্শ পেয়েছিল।

১৯৯৩-তে বেলেঘাটা আই ডি হাসপাতালে আন্ত্রিকে গণমৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

উজ্জয়িনী জেলার তাজপুর গ্রামেও প্রতি বছর অলৌকিক আগুনে-হাঁটা অনুষ্ঠিত হয়। তাজপুরের এই আগুনে-হাঁটা ধর্মানুষ্ঠানে যারা হাঁটে তারা নাকি ভৈরবের উপাসক। হাঁটতে গিয়ে কারো পা পুড়লে ধরে নেওয়া হয়, অপবিত্র মনের দরুনই এমনটা হয়েছে।

বুলগেরিয়ার এক সমুদ্র-বন্দর বার্গাস (Burgus)। বার্গাসের ৩০ কিলোমিটার দূরে একটি গ্রাম পানিতচারো (Panitcharewo)। এই গ্রামের নেস্টিনারি (Nestinari) নামে একটি সম্প্রদায় প্রতি পছর ৩ জুন বাইজানটাইন সম্রাট কনস্টানটাইন ও সাম্রাজ্ঞী হেলেনাকে স্মরণ করে এক আগুনে-হাঁটা উৎসব পালন করে। জনসমাগমও হয় প্রচুর।

জাপান, মালয়, ফিজি, শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যান্ড ও স্পেনেও আগুনে-হাঁটা বা অগ্নি-উৎসবের প্রচলন রয়েছে।

আগুনে-হাঁটা একটি কৌশল মাত্র। এই কৌশলের জন্য প্রয়োজন ক্ষিপ্রতা ও তাপ-সহন শক্তি, অন্ধ-ভক্তি ও বিশ্বাস ভক্তদের মস্তিষ্কের সেই সব স্নায়ুকে নিষ্ক্রিয় রাখে যা পায়ের তাপের খবর পৌঁছে দেয়।

'যুক্তিবাদী সমিতি' আমাদের বহু সহযোগী সংস্থা, বিজ্ঞান ক্লাব ও যুক্তিবাদী সংগঠন আজ পর্যন্ত আনুমানিক হাজার-হাজার অনুষ্ঠানে জ্বলন্ত লাল টকটকে কাঠের আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে দেখিয়েছে। এমন অসাধারণ দুর্লভ দৃশ্য দেখেছেন অন্তত কয়েক লক্ষ মানুষ। প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানেই দর্শকদের মধ্যে অনেকেই আগুনে হাঁটায় অংশ নিয়েছেন এবং শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ ক্ষেত্রেই দর্শকদের পা আগুনে দগ্ধ হয়নি।

সাধারণত ১০ ফুট লম্বা ও ৪ ফুট চওড়া একটি আয়তক্ষেত্র তৈরি করা হয় ইট বিছিয়ে। গনগনে কাঠ কয়লার আঁচে যখন সাধারণ মানুষগুলো ছ'ফুট দূরে দাঁড়িয়েও প্রচণ্ড তাপে ঝলসাতে থাকে, তখনই "যুক্তিবাদী জিন্দাবাদ" ধ্বনির মধ্য দিয়ে জ্বলন্ত আগুনের ওপর দিয়ে দীপ্ত ভঙ্গিতে হেঁটে যেতে থাকে যুক্তিবাদী আন্দোলনের কর্মীরা। বহু মানুষের সোচ্চার ধ্বনি ও আমাদের সহযোগীদের হাঁটতে দেখে দর্শকরাও অনুপ্রাণিত হন। আমাদের আহ্বানে তাঁরাও এগিয়ে আসেন এই একান্ত বিশ্বাস নিয়ে—ওদের যখন পোড়েনি, আমারও পা পুড়বে না। এই মানসিক শক্তির সঙ্গে দ্রুত চলার ছন্দ যখনই যুক্ত হয়, তখনই আর পা পোড়ে না।

অধ্যায় : চার

সম্মোহন-আত্মসম্মোহন

শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জুনকে 'বিশ্বদর্শন' করিয়েছিলেন—তা কি সম্মোহন ছিল? হিটলার যে একটা গোটা জাতিকে হিস্টিরিক করে তুলেছিলেন? তাঁর একান্ত বাধ্য করে তুলেছিলেন? তাকে কি হিটলারের সম্মোহন শক্তি বলা যায়? রজনীশ কি তার চোখ ও কথা দিয়ে মানুষকে সম্মোহন করে রাখতেন? আমরা যে অভিনয় দেখতে দেখতে হাসি, কাঁদি, ক্রুদ্ধ হই, উত্তেজিত হই, তাকে কি অভিনেতার সম্মোহনী শক্তি বলবো? মহরমে বা চরকে ভক্তরা যে নিজেদের শরীরকে কষ্ট দেয়, কিন্তু কষ্ট অনুভব করে না—এর কারণ কী ওরা কি সেই সময় আত্মসম্মোহিত থাকে? ম্যানড্রেকের কমিকসে যেমন থাকে ভিলেনগুলি করতে গিয়ে দেখে হাতের রাইফেল বিষাক্ত সাপ হয়ে গেছে ইত্যাদি—সম্মোহনে এমন কিছু কি সত্যিই করা সম্ভব? জাদুকর কি সম্মোহন করে জাদু দেখান?

পি.সি. সরকারের আগেও এমনি ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেওয়ার গণসম্মোহনের আষাঢ়ে গল্প আরও অনেক জাদুকরকে ঘিরে বিভিন্ন সময়ে চালু ছিল। এইসব জাদুকররা হলেন রাজা বোস, জাদুকর গণপতি, রয়-দি-মিসটিক। পৃথিবীতে যাঁকে নিয়ে আষাঢ়ে গল্পটির শুরু, তিনি হলেন এক মার্কিন জাদুকর হাওয়ার্ড থার্সটন। জাদুকররা মাঝে-মধ্যে কেন, কোনও সময়ই সম্মোহনের সাহায্যে জাদু দেখান না। শূন্যে মানুষ ভাসিয়ে রাখতে, একটা ডাণ্ডার উপর মানুষকে ঝুলিয়ে রাখতে, করাতে দেহ দু'টুকরো করার খেলা, দেখাতে বা অন্য কোনও খেলায় জাদুকর চোখ বড় বড় করে দু'হাতের আঙুল নেড়ে নেড়ে, যে সম্মোহন (?) করেন, সেটা আদৌ সম্মোহন নয়। অভিনয়। জাদুকরের সঙ্গিনী বা সঙ্গী সম্মোহিত হওয়ার অভিনয় করেন। তারপর যা দেখানো হয়, তা সম্পূর্ণই কৌশলে দেখান। এইসব জাদুর পিছনে সম্মোহনের কোনও ভূমিকাই নেই। জাদুকরদের এই অভিনয় বা প্রতারণামূলক সম্মোহন কয়েক প্রজন্ম ধরে দেখতে দেখতে দর্শকরা 'সম্মোহন' সম্বন্ধে ভুল ধারণা একটু একটু করে নিজের মনের মধ্যে গড়ে তুলেছেন।

কোনও জাদুকর যখন জাদু দেখান, তখন সে'সবই দেখান নিছক কৌশলে, কোনও অলৌকিক ক্ষমতায়। প্রতিটি জাদুকরই সে'কথা মঞ্চে ও মঞ্চের বাইরে

স্বীকারও করেন। কিন্তু কেউ যদি তেমনটা না করে কোনও জাদু দেখাতে গিয়ে দাবি করেন—এটা এবার দেখাচ্ছেন মন্ত্রশক্তিতে, ঈশ্বরের কৃপায় বা ভূতকে কাজে লাগিয়ে, তবে তা হবে সত্য-লঙ্ঘন, প্রতারণা। এবং এ'ক্ষেত্রে যুক্তিবাদী প্রতিটি মানুষের উচিত এমন এক ভ্রান্ত ধারণাকে ভেঙে দিয়ে প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরা। ঠিক একইভাবে উচিত

অভিনয়কে সম্মোহন বলে মানুষকে প্রতারণার যে ঘটনা সুদীর্ঘকাল ধরে জাদু জগতে ঘটেই চলেছে, তাকে বন্ধ করা।

সম্মোহন বা মস্তিষ্কে ধারণা সঞ্চারের মধ্য দিয়ে বাস্তবিকই যা হয় তারও একটা সীমাবদ্ধতা আছে। সেই সীমাবদ্ধতাকে, সেই সত্যকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার স্বার্থেই এইসব 'না-সম্মোহন'কে 'সম্মোহন' বলে চালানোর বুজরুকির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো দরকার।

পি. সি. সরকার (জুনিয়র)-এর অমৃতসর এক্সপ্রেস ভ্যানিশ কি আদৌ কোনও কৌশলে দেখানো সম্ভব? ওই ব্যাপারটার পিছনে কি গণসম্মোহন কাজ করেনি? এ-জাতীয় অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় আমাকে এবং যুক্তিবাদী সমিতি'কে। উত্তরে প্রত্যেককেই যা জানিয়েছি, তা আবারও জানাচ্ছি—

ট্রেন ভ্যানিশের ম্যাজিকে না ছিল অমৃতসর এক্সপ্রেস, না একজন দর্শকও দেখেছিল ট্রেনটাকে ভ্যানিশ হতে। ম্যাজিকটা আদৌ দেখানোই হয়নি। গোটা ম্যাজিকটার ভিত্তি ছিল মিথ্যে প্রচার।

পুরো ঘটনাটা বিস্তৃতভাবে লেখা হয়েছে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটির চতুর্থ খণ্ডে, উৎসাহী পাঠক-পাঠিকারা পড়ে নিতে পারেন।

জাদুকর ম্যানড্রেকের কাহিনিতে যে সব সম্মোহন শক্তির কথা আপনারা কমিক্সের বইতে পড়েন, সে'সব নেহাতই 'গুল-গপ্পো'। অথচ অনবরত ওসব কাহিনি পড়তে পড়তে অনেকেই ভাবে, সম্মোহনের সাহায্যে সত্যিই বোধহয় এমনটাও ঘটানো সম্ভব। মজার কথা কী জানেন, বছর কয়েক আগে 'আনন্দমেলা'র পুজো সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার ম্যানড্রেকের গপ্পে প্রভাবিত হয়ে তাঁর উপন্যাসে 'ম্যানড্রেকি সম্মোহন' হাজির করেছিলেন। এমনকী 'সন্দেশ' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৪০২ (ডিসেম্বর, ১৯৯৫) সংখ্যায় সত্যজিৎ রায়ের অপ্রকাশিত নতুন যে ফেলুদা-উপন্যাস 'ইন্দ্রজাল রহস্য' প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও দেখা যাচ্ছে সূর্যকুমার নামে এক জাদুকর লালমোহনবাবুকে মঞ্চে ডেকে এনে তাঁকে সম্মোহন করে পেন্সিল খাওয়াচ্ছেন অথচ সম্মোহিত লালমোহনবাবু ভাবছেন তিনি চকোলেট

খাচ্ছেন। বাস্তবে এমনটি ঘটে না, এবং সবই হল ম্যানড্রেকি গল্পের প্রভাবের ফল বা জাদুকরদের মিথ্যে সম্মোহনের ফল।

অনেকে এমনও ভাবে, সম্মোহন করতে পারেন এমন লোকের কাছে যাওয়া দস্তুরমতো বিপজ্জনক। ওরা সম্মোহিত করে চুরি খুন-খারাপি—সবই করিয়ে নিতে পারে। এ'সবই সম্মোহন সম্বন্ধে না জানার ফল।

সম্মোহনের ইতিহাস, নানা মত

'সম্মোহন'-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'হিপ্নোটিজম্' (Hypnotism)। 'হিপনোটিজম্' কথাটি আবার এসেছে 'হিপ্নোসিস্' (Hypnosis) কথা থেকে। 'হিপ্নোসিস' কথার অর্থ 'ঘুম'। স্বাভাবিক ঘুমের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও 'সম্মোহন ঘুম' আর 'স্বাভাবিক-ঘুম' এক নয় কারণ অ-সাদৃশ'ও কম নয়। তবে এটা বলা যায়, সম্মোহন জেগে থাকা ঘুমের একটা অন্তর্বর্তী অবস্থা।

আধ্যাত্মিকতাবাদ ও জাদুবিদ্যার কবল থেকে মনোবিজ্ঞানকে মুক্ত করে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নত করতে প্রচুর বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল। সম্মোহনের ক্ষেত্রে এই বাধা ছিল আরও বহুগুণ বেশি। কারণ, এখানে রয়েছে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার।

ভারত, চীন ও গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতার আদিপর্বে ধর্মীয় ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সম্মোহনের প্রচলন ছিল। আমাদের অথর্ববেদে সম্মোহনের উল্লেখ দেখতে পাই। মহাভারতেও সম্মোহনের প্রয়োগের উল্লেখ আছে।

প্রাচীনযুগে সম্মোহনের যে মর্যাদা ছিল মধ্যযুগে সেই মর্যাদা হারিয়ে সম্মোহন হয়ে দাঁড়ায় 'ব্ল্যাক-ম্যাজিক' বা ডাকিনীবিদ্যা। কাপালিক বা তান্ত্রিকরা ইচ্ছে করলেই তাদের সম্মোহন শক্তির দ্বারা ক্ষতি করতে পারে, এমন একটা ভ্রান্ত ধারণার বশে আজও অনেকেই এদের সযত্নে এড়িয়ে চলেন।

আধুনিক যুগের সম্মোহনের সূচনা আঠারশ' শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ডক্টর মেসমার অনেক দুরারোগ্য রোগীকে সম্মোহিত করে মস্তিষ্কে ধারণা সঞ্চার করে (Suggestion পাঠিয়ে) সারিয়ে তুললেন। মেসমারের সম্মোহন চিকিৎসার এই অভাবনীয় সাফল্যে ইউরোপে হৈ-হৈ পড়ে গেল। সম্মোহন পরিচিত হলো 'মেসমারিজম' নামে।

এরপর উনিশ শতকের মাঝামাঝি স্কটল্যান্ডের ডাক্তার জেমস্ ব্রেইড-এর সম্মোহন নিয়ে গবেষণা আবার আলোড়ন তুলল। তিনি সম্মোহনের নাম দিলেন 'হিপনোসিস'

(hypnosis)। ডক্টর জেমস্ ব্রেইড সম্মোহন-ঘুমের ব্যাখ্যা করলেন বটে, কিন্তু, সম্মোহনকারী ও সম্মোহিত ব্যক্তির মধ্যে সম্মোহনকালে কী ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেই বিষয়ে সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। অতএব জানা গেল না, কীভাবে সম্মোহনকারী সম্মোহিত ব্যক্তিকে প্রভাবিত করেন। অর্থাৎ এটুকু বোঝা গেল যে, সম্মোহনকারী সম্মোহিতকে জেগে থাকা ও ঘুমের একটি অন্তর্বর্তী অবস্থায় নিয়ে এসে সম্মোহিতের মস্তিষ্কে বিশেষ একটি ধারণার সঞ্চার করতে থাকেন। যেই ধারণাটি সম্মোহিতের মস্তিষ্কে পৌঁছে দিতে সেই ধারণাটি সম্মোহিতের সামনে বারবার একঘেয়েভাবে আউড়ে যাওয়া হয়। সম্মোহনকারী ও সম্মোহিতের এই যোগাযোগটিকে মনস্তত্ত্বের ভাষায় বলা হয় 'সম্পর্ক' (rapport)।

উনিশ শতকের শেষ দশকে প্যারিসে শার্কো এবং ন্যানসিতে বার্নহাইম-এর নেতৃত্বে হিপনোসিস নিয়ে শুরু হলো নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

হিস্টিরিয়া ও সম্মোহনের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করে শার্কো মতপ্রকাশ করলেন—সম্মোহন হলো তৈরি করা নকল হিস্টিরিয়া। সম্মোহিত ব্যক্তিরা সকলেই নিউরোটিক। সম্মোহনকারীর ধারণা সঞ্চারের (Suggestion) ব্যাপারটাকে আদৌ গুরুত্ব দিলেন না তিনি।

বার্নহাইম মত প্রকাশ করলেন, সম্মোহন ধারণা সঞ্চারের ফল। সব মানুষের মস্তিষ্কেই কম-বেশি কোনও ধারণা সঞ্চারিত করা যায়। অর্থাৎ, সব মানুষকেই সম্মোহিত করা যায়। অবশ্য সম্মোহনের গভীরতা সব মানুষের ক্ষেত্রে সমান নয়। তবে যদি বোধ-বুদ্ধি থাকে।

আরও অনেক নতুন নতুন তত্ত্ব নিয়ে এলেন মেতেল, জিমসেন, ভেরওর্ন এবং বেকটেরেফ। ভেরওর্ন বললেন, সম্মোহন হলো অতি জাগ্রত অবস্থা, অর্থাৎ এই অবস্থায় মানুষের মস্তিষ্ক থাকে সবচেয়ে সজাগ। বেকটেরেফ বললেন—সম্মোহন হলো স্বাভাবিক ঘুমেরই রকমফের।

এলেন ফ্রান্সের এক বিখ্যাত মনোবিদ স্যানেট। তিনি যে তত্ত্ব দিলেন সেটা শার্কোর তত্ত্বের উন্নত সংস্করণ মাত্র।

ফ্রয়েড হাজির হলেন তাঁর সাইকো-অ্যানালিটিক থিওরি নিয়ে। ফ্রয়েডের মতে সম্মোহনকারী ও সম্মোহিতের মধ্যে 'সম্পর্ক' বা rapport গড়ে ওঠে পারস্পরিক প্রেম বা ভালবাসার ফলে। প্রেমে পড়া ও সম্মোহিত হওয়া একই ধরনের ব্যাপার। ফ্রয়েডের তত্ত্বে সম্মোহিত অবস্থার বিবরণ এবং সম্মোহনকারী ও সম্মোহিতের মধ্যে 'সম্পর্ক' সৃষ্টির ব্যাখ্যা মেলে। কিন্তু মেলে না সম্মোহিতের স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ ও সম্মোহনের কারণ।

এলেন পাভলভ। বললেন, সম্মোহন আংশিক ঘুম। জেগে থাকা ও ঘুমের একটা অন্তর্বতী অবস্থা। স্বাভাবিক ঘুমে মস্তিষ্কের কর্মবিরতি বা নিস্তেজনা (inhibiation) বিনা বাধায় সারা মস্তিষ্কে ও দেহে ছড়িয়ে পড়ে। সম্মোহন-ঘুম

বা হিপনোটিক ঘুমে মস্তিষ্কের যে-অংশ সম্মোহনকারীর নির্দেশে ও কণ্ঠস্বরে উদ্দীপ্ত হচ্ছে সেই অংশ জেগে থাকে। মস্তিষ্কের এই জেগে থাকা অংশই সম্মোহিত ব্যক্তির সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগের একমাত্র পথ। সম্মোহনকারীর নির্দেশ ছাড়া সম্মোহিতের পক্ষে কোন কিছু করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ, সম্মোহিতের স্বাধীন কোন ইচ্ছে থাকলেও নিষ্ক্রিয় থাকে।

পাভলভ ও ফ্রয়েড

এতক্ষণে আমি ছোট্ট করে আলোচনা করেছি সম্মোহনের ইতিহাস নিয়ে, কারণ সম্মোহন নিয়ে আলোচনার গভীরে ঢোকার আগে সম্মোহনের ইতিহাস জানবারও প্রয়োজন আছে। সম্মোহনের ইতিহাস বলতে গেলেই শুরু করতে হবে প্রাচীন সভ্যতার আদিপর্ব থেকে, আর শেষ করতে হবে এ যুগের মনোবিদ্যার দুই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব পাভলভ ও ফ্রয়েডের পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব আলোচনার মধ্য দিয়ে।

পাভলভ ও ফ্রয়েডকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর মনোবিজ্ঞানীরা চালিয়ে যাচ্ছেন ঠাণ্ডা-গরম লড়াই। পাভলভ ও ফ্রয়েড দু'জনেই সমসাময়িক। পাভলভ জন্মেছিলেন ১৮৪৮ সালে। মারা যান ১৯৩৬-এ। ফ্রয়েড জন্মেছিলেন ১৮৫৬ সালে। মৃত্যু ১৯৩৯ সালে। আমৃত্যু এই দুই মনীষীই ছিলেন স্বতন্ত্রে আত্মপ্রত্যয়ী ও সক্রিয়।

মানসিকতার হদিস পেতে পাভলভ মেতেছিলেন প্রকৃতিবিজ্ঞানের পথে উচ্চ-মস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার গবেষণায়, আর ফ্রয়েড মানসিকতার সন্ধান পেতে চেয়েছিলেন মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া মনে গভীরে। পাভলভ এগিয়ে ছিলেন উচ্চ-স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে, ফ্রয়েড এগিয়ে ছিলেন মনোবিজ্ঞানের চিকিৎসক ও রোগী দু'জনেরই মনোসমীক্ষার পথে। পাভলভকে আবিষ্কার 'উচ্চতর স্নায়ুবিজ্ঞান' এবং ফ্রয়েডের আবিষ্কার—'অবচেতন মনের বিজ্ঞান'। পাভলভ-তত্ত্বকে ঘিরে রয়েছেন 'Objective' (বস্তুবাদী) দৃষ্টিভঙ্গির মনোবিজ্ঞানীরা, আর ফ্রয়েডের তত্ত্বকে ঘিরে রয়েছেন 'Subjective' (আত্মবাদী) অন্তর্দর্শনে বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানীরা।

এই দুই মহারথীর তত্ত্বে বিরোধিতা রয়েছে ঘুম, স্বপ্ন, শিশুমন, শিশুশিক্ষা, মনোবিকারের কারণ, এবং চিকিৎসা প্রভৃতি নানা বিষয়ে।

যাই হোক, আসুন, এবার আমরা ইতিহাস ছেড়ে সম্মোহনের ভেতরে ঢুকি।

সম্মোহন নিয়ে কিছু কথা

কোলের ছোট্ট বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানোর কৌশল ও সম্মোহন-ঘুম পাড়ানোর কৌশল কিন্তু অনেকটা একই ধরনের। শিশুদের ঘুম পাড়ানো হয় একটানা একঘেয়ে সুরে গান গেয়ে। সম্মোহন-ঘুমের জন্যেও সম্মোহনকারী প্রায় একই

ধরনের পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। সম্মোহনকারী যাকে সম্মোহন করতে চায়, তাকে শুইয়ে দেয় একটা সুন্দর নরম-সরম ছিমছাম বিছানায়। নরম বালিশে মাথা রেখে সারা শরীরটাকে হালকাভাবে ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে থাকেন রোগী। ঘরে জ্বলে খুব কম শক্তির নাইটল্যাম্প।

সম্মোহনকারী ধীরে-ধীরে কিছুটা সুর করে টেনে-টেনে বলতে থাকেন, "আপনি এখন ঘুমিয়ে পড়ুন, ঘুমিয়ে পড়ুন। আপনার ঘুম আসছে। আপনার চোখের পাতা ভারী হয়ে যাচ্ছে। কপালের ও গালের পেশী শিথিল হয়ে যাচ্ছে। ঘাড়ের পেশী শিথিল হয়ে যাচ্ছে। এমনি করে হাত, বুক, পেট, কোমর, পা ইত্যাদি অঙ্গ শিথিল হয়ে যাচ্ছে, অবশ হয়ে আসছে। আপনার ঘুম আসছে, গভীর ঘুম আসছে।

...বাইরের সব শব্দ আপনার কাছে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাইরের গাড়ির শব্দ, ট্রামের শব্দ, কোন শব্দই আপনার কানে যাচ্ছে না। আমার কথা ছাড়া অন্য কোনও শব্দ আপনি শুনতে পাচ্ছেন না। ...আপনার হাত-পা ভারী হয়ে গেছে। ঘুম আসছে..." সম্মোহনকারী টানা-টানা একঘেয়ে সুরে বলে যেতে থাকে। এই কথাগুলো শুনতে শুনতে সম্মোহনের ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন শুয়ে-থাকা ব্যক্তি।

সম্মোহিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সম্মোহনকারীর এই কথা বা নির্দেশগুলোকে বলা হয় 'Suggestion', বাংলায় অনুবাদ করে বলতে পারি 'ধারণাসঞ্চার' বা 'চিন্তাসঞ্চার'।

অবশ্য আরও অনেক পদ্ধতির সাহায্যেই সম্মোহন-ঘুম আনা সম্ভব। যে কোনও ইন্দ্রিয়কে মৃদু উদ্দীপনায় উত্তেজিত করলেই ঘুম আসবে।

পাভলভ ও ফ্রয়েড দু'জনেই সম্মোহিত অবস্থাকে এক ধরনের ঘুমন্ত অবস্থা বলেই মত প্রকাশ করেছিলেন। সম্মোহন সম্বন্ধে জানতে গেলে ঘুম সম্বন্ধে দু-একটা কথা জানা খুবই প্রয়োজন, কারণ, ঘুম আর সম্মোহন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

ঘুম ও সম্মোহন

আমরা আমাদের জীবনের প্রায় তিনভাগের একভাগ ঘুমিয়েই কাটাই। মানুষ যখন ঘুমোয়, তখন কিন্তু তার সম্পূর্ণ মস্তিষ্কই কর্মহীন হয়ে পড়ে না। কিছু মস্তিষ্ক কোষ জেগে থাকে বা আধা-ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। সামগ্রিকভাবে উচ্চ-মস্তিষ্ক কাজ না করে বিশ্রাম নিলেও কিছু জেগে থাকা কোষের সাহায্যে আমরা ঘুমের মধ্যেও নড়াচড়া করি, পাশ ফিরি, মশা কামড়ালে জায়গাটা চুলকোই, স্বপ্ন দেখি ইত্যাদি অনেক কিছু করি। এই অবস্থায় কিন্তু সব পেশিও শিথিল হয়ে পড়ে না। ঘুমের মধ্যে মলমূত্রের নির্গমন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ না হারায় সেদিকে মস্তিষ্ক লক্ষ্য রাখে।

ঘুমের গুরুত্ব মানুষের জীবনে অসীম। পনেরো-কুড়ি দিন না খেয়ে থাকলে শরীর দুর্বল হয় বটে, কিন্তু সাধারণত মানসিক ভারসাম্যের অভাব হয় না। অথচ, পনেরো-কুড়ি দিন সম্পূর্ণ না ঘুমিয়ে কাটালে প্রায় ক্ষেত্রেই মানসিক ভারসাম্যের অভাব ঘটে।

আপনাদেরই পরিচিত এমন দু-একজন হয়তো আছেন যাঁরা মাসের পর মাস অথবা বছরের পর বছর অনিদ্রা রোগে ভুগছেন। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীবিমল মিত্র সুদীর্ঘ বছর অনিদ্রা রোগে ভুগেছেন। আপনাদের মনে নিশ্চয়ই এই প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারবে, এত দীর্ঘ অনিদ্রার পরেও এঁদের প্রত্যেকেরই মানসিক ভারসাম্য বজায় রেখেছিলেন কীভাবে?

না, আগে আমি যা বলেছি, সেটা মিথ্যে বলিনি। আবার, আপনারা যা দেখেছেন তাও মিথ্যে নয়। 'অনিদ্রারোগ' মস্তিষ্কের বিশেষ অসুস্থ অবস্থা। এই বিশেষ অবস্থায় মস্তিষ্কের অনেকগুলো কোষ দিনের ১৭/১৮ ঘণ্টা প্রায় ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। রাতে ৬/৭ ঘণ্টা কোষগুলো গভীর ঘুম দিয়ে বিশ্রাম নেয় এবং সজীব ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। অধিকাংশ অনিদ্রা রোগে গভীর ঘুম হয় না বটে, কিন্তু আধা-ঘুমন্ত অবস্থার মধ্যে একটা সময় কাটে। এই সময়টায় মস্তিষ্ককোষ তাদের প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নিয়ে নেয়, ফলে মস্তিষ্ককোষের বিশেষ কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয় না। এই ধরনের আধোঘুম অবস্থায় আমরা সুস্থ মানুষরা অনেক সময় কাটাই। বাসে, ট্রামে, ট্রেনে অথবা ইজিচেয়ারে বিশ্রাম নিতে নিতে অথবা নেহাতই অফিসের চেয়ারে বসে অনেক সময় ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি একটা অবস্থায় থাকি। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এই অবস্থার নাম 'hypnoid State' অনিদ্রা রোগ এই 'hypnoid State'-এরই দীর্ঘতম অবস্থা।

পাভলভ কী বলেন

পাভলভীয় বিজ্ঞানে ঘুমিয়ে-পড়া থেকে জেগে ওঠার মধ্যে চারটি প্রধান পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। **প্রথম পর্যায়** প্রায় জাগ্রত অবস্থার মতো। **দ্বিতীয় পর্যায়**-ও প্রায় প্রথম পর্যায়েরই মতো, তবে ঘুমের গভীরতা প্রথম অবস্থার চেয়ে দ্বিতীয় অবস্থায় বেশি। একে বলে ফেজ অব ইকোয়ালিটি। **তৃতীয় পর্যায়**-এর নাম ফেজ অব প্যারাডক্স। এই পর্যায়ে আমরা স্বপ্ন দেখি। শেষ এবং **চতুর্থ পর্যায়**-এর নাম ফেজ অব আলট্রা-প্যারাডক্স। এই পর্যায়ে আমরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকি।

সম্মোহিত অবস্থায় ঘুমের তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ 'প্যারাডক্সিকাল ফেজ' দেখা যায়। ঘুমের এই পর্বকে আর. ই. এম. বা 'র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট' পর্ব বলে। এই প্যারাডক্সিকাল ফেজে সম্মোহিতের ওপর সম্মোহনকারীর নির্দেশ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং প্রতিক্রিয়া খুবই অভাবনীয়। মস্তিষ্কের শারীরবৃত্তিক ধর্ম এবং বিশিষ্টতাই সম্মোহনকারীর শক্তি বলে প্রচারিত হয়ে আসছে।

স্বাভাবিক ঘুমে মস্তিষ্কের প্রায় সব স্নায়ুগুলো নিস্তেজ বা নিষ্ক্রিয় হতে থাকে এবং সারা দেহে এই নিষ্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই নিস্তেজ বা নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে বলা হয় 'Inhibition'। সম্মোহন-ঘুমে মস্তিষ্কের সব স্নায়ু নিষ্ক্রিয় হয় না। সম্মোহনকারীর নির্দেশমতো মস্তিষ্কের একটা অংশ জেগে থাকে ও উদ্দীপ্ত হতে থাকে। এই জেগে থাকা মস্তিষ্কের অংশ বা স্নায়ু সম্মোহিত ব্যক্তির সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগের একমাত্র পথ। সম্মোহনকারী ও সম্মোহিত ব্যক্তির মধ্যে এই যোগসূত্রকে বলা হয় 'rapport' বা 'সম্পর্ক'।

'Inhibition' অর্থাৎ বাংলায় বলতে গেলে নিস্তেজ বা নিষ্ক্রিয় থাকার অর্থ

পাভলভ

কিন্তু উত্তেজনার অভাব বা অনুপস্থিতি নয়। উত্তেজনার বিপরীতধর্মী একটি প্রক্রিয়াকে বোঝাতে 'Inhibition' কথাটি ব্যবহৃত হয়। মস্তিষ্কে উত্তেজনাধর্মী ও নিস্তেজধর্মী দুই ধরনের স্নায়ুপ্রক্রিয়া রয়েছে। এই দুই মিলেই স্নায়ুপ্রক্রিয়ার প্রকৃত রূপ। দুই প্রক্রিয়াই সব সময় গতিশীল এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

মস্তিষ্কের কোন স্নায়ু বা কেন্দ্রবিশেষ উত্তেজিত হলে, উত্তেজনার ঢেউ প্রথমে বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ে। এই ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতাকে বলা হয় 'irradiation'। সঙ্গে-সঙ্গে উত্তেজিত স্নায়ুকেন্দ্রের আশেপাশের স্নায়ুকেন্দ্রগুলোতে উত্তেজনার বিপরীতধর্মী নিস্তেজ অবস্থা বা 'inhibition' দেখা দেয়।

ঘুমিয়ে পড়লে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো বাইরের উদ্দীপনায় সাড়া দেয় না। উলটো দিক থেকে বাইরের উদ্দীপনা মস্তিষ্কে প্রবেশ করার পথগুলো আমরা বন্ধ করে দিলে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে। জার্মানে ডাক্তার স্ট্রামপল তাঁর এক বালক রোগীর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, বালকটির একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। একটি কানে শুনতে পেত না। দেহের ত্বকের অনুভূতি শক্তিও গিয়েছিল নষ্ট হয়ে। বালকটির সুস্থ চোখ ও কানের দেখা ও শোনা কোন কিছু দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বালকটি ঘুমিয়ে পড়ত। পাভলভও এই ধরনের একটি রোগীকে তার ইন্দ্রিয়-উপলব্ধি বন্ধ করে দিয়ে ঘুম পাড়াতেন। গ্যালকিস পামের আর এক বিজ্ঞানী কয়েকটি কুকুরের ঘ্রাণ, শ্রবণ ও দর্শন-ইন্দ্রিয়গ্রাহী স্নায়ুগুলো কেটে ফেলে দেখেছিলেন, কুকুরগুলো সারা দিনরাতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৩ ঘণ্টাই ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে।

মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলোর অবসাদ থেকেই যে সব সময় ঘুম আসে, এমনটি নয়। পাভলভের মতে, ঘুম একরকম 'conditioned reflex' বা 'শর্তাধীন প্রতিফলন'।

ঘুমের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখলে সাধারণত ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু একজন লোকের দীর্ঘ ঘুমের পরেও একটা বিশেষ পরিবেশে একজন সম্মোহনকারী আবার তাকে 'suggestion' দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে, এই সম্মোহন-ঘুমের ক্ষেত্রে ঘুম 'conditioned reflex' বা শর্তাধীন প্রতিফলন। আমি আমার এক পুস্তক প্রকাশক ব্রজ মণ্ডলের কথা আগেই বলেছি।

ব্রজদা প্রতি রাত্রেই ঘুম আনতে ঘুমের ওষুধ খেতেন। আমি একবার ঘুমের জোরাল ওষুধ বলে ভিটামিন ক্যাপসুল দিয়েছিলাম। ক্যাপসুল খেয়ে ব্রজদার খুব ভাল ঘুম হয়েছিল। আমার 'suggestion' বা ধারণা সঞ্চারের জন্য ভিটামিন ক্যাপসুল 'conditioned stimilus' বা শর্তাধীন উদ্দীপক বস্তুর কাজ করেছিল।

নানা ধরনের রোগের ওপরই হিপনোটিক সাজেশন বা সম্মোহন ধারণা সঞ্চারের ফলাফল ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। দেখা গেছে স্ট্যামারিং,

অ্যাজমা, কোলাইটিস, ইমনোটেন্সি, ফ্রিজিডিটি, হাইপোকনড্রিয়া এবং মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি reflex বা প্রতিফলন বিশৃঙ্খলায় (সাইকো-সোমাটিক) হিপটনিক-সাজেশনের সাহায্যে খুবই ভাল ফল পাওয়া যায়। উন্মাদরোগের মধ্যে স্কিজোফ্রিনিয়া এবং প্যারানইয়াতে হিপনটিক-সাজেশনে ভালই ফল পাওয়া যায়। অবশ্যই সেই সঙ্গে ওষুধও দিতে হয়। এছাড়াও যে কোন রোগেই সাহায্যকারী চিকিৎসা হিসেবে হিপনটিক-সাজেশন দেওয়া যেতে পারে।

সম্মোহনের সাহায্যে সম্মোহনকারী এমন অনেক ঘটনাই ঘটাতে পারেন যেগুলি শুনলে প্রাথমিকভাবে অসম্ভব বা অবাস্তব বলে মনে হয়।

সম্মোহনকারী সম্মোহিতকে যদি 'সাজেশন' দিতে থাকেন, 'এবার তোমার ডান হাতের কব্জিতে একটা গনগনে লোহা খুব সামান্য সময়ের জন্য ছোঁয়াব। লোহাটা আগুনে পুড়ে টকটকে লাল হয়ে রয়েছে, টকটকে লাল গরম লোহাটা এবার তোমার ডান কব্জিতে ঠেকানো হবে। ফলে একটা ফোসকা পড়বে। ভয় নেই, শুধু একটা ফোসকা পড়বে এই সাজেশনের সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের কব্জিতে ঠাণ্ডা লোহা ঠেকালেও দেখা যাবে যে ওখানে Second degree burn সৃষ্টি হয়ে ফোসকা পড়েছে।

আধুনিক শারীরবিজ্ঞানে শিক্ষিত অনেকের কাছেও আমার কথাগুলো একান্তই অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কারণ, শারীরবিজ্ঞানে বলে, শরীরের কোন স্থানে প্রচণ্ড উত্তাপ লাগলে সেখানে অনেকগুলো আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। বহু কোষ ফেটে যায়। কোষগুলোর ভেতরের রস বেরিয়ে আসে। এই কোষগুলোর রসই ফোসকায় জমা রসের প্রধান অংশ। শারীরবিজ্ঞানে এই ফোসকা পড়ার সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যোগাযোগ না থাকলেও ফোসকা পড়ার মুহূর্ত থেকে পরবর্তী পর্যায়গুলোতে 'Autonomus' (অটোনোমাস) স্নায়ুতন্ত্রের কিছু প্রভাব দেখা যায়, যা শরীরকে দুর্বল করে বা মানসিক আঘাত (shock) দেয় কিংবা peripheral circulatory failure ইত্যাদির ক্ষেত্রে কাজ করে।

'Autonomus nervous system' (অটোনোমাস নার্ভাস সিস্টেম) সম্পর্কে নতুন ধারণা না থাকার দরুন এবং উচ্চ মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবের দরুন অনেকের কাছেই আমার কথাগুলো উদ্ভট ও অবাস্তব মনে হতে পারে। এই বিষয়ে অবগতির জন্য জানাই, ১৯২৭ সালে বহু চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীদের সামনে V. Finne শুধুমাত্র হিপনোটিক-সাজেশনের দ্বারা একজন সম্মোহিতের শরীরে ফোসকা ফেলে দেখান। তারপর আজ পর্যন্ত বহুবার প্রয়োগ হয়েছে।

একজন মনযোগ দিয়ে 'সাজেশন' শুনলে তার পাঁচটি কর্মইন্দ্রিয়-ই নিয়ন্ত্রণ

করা সম্ভব। নিয়ন্ত্রণ করবেন সম্মোহনকারী। নিয়ন্ত্রিত হবে সম্মোহিত মানুষটির ইন্দ্রিয়গুলো। পাঁচটি কর্মইন্দ্রিয় হলো : চোখ, কান, নাক, জিভ ও ত্বক।

কয়েকশো অনুষ্ঠানে মঞ্চে দর্শকদের এনে সম্মোহিত অবস্থায় কাগজ ছুঁইয়ে বলছি—"ছুঁচ ফোটাচ্ছি।" তাঁরা প্রত্যেককেই ছুঁচ ফোটাবার যন্ত্রণা অনুভব করে চিৎকার করে উঠেছেন। আবার যখন 'সাজেশন' দিয়েছি—হাত অসাড় হয়ে গেছে, তখন ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ হাতে পুরোটা ঢুকিয়ে দিয়েছি। যাদের হাতে ঢুকিয়েছি, তাঁরা কেউ-ই টের-ই পাননি।

দর্শকদের মঞ্চে ডেকে সাজেশন দেওয়ার পর তাঁরা সিগারেট পান করে বিভিন্ন রকমের স্বাদ পেয়েছেন। কেউ টক, কেউ ঝাল, তো কেউ মিষ্টি। যাকে যেমন 'সাজেশন' দিয়েছি, তিনি তেমন স্বাদ পেয়েছেন।

এইসব অনুষ্ঠানের মধ্যে কয়েকটি হয়েছে 'কালটিভেশন অফ সায়েন্স', 'এশিয়াটিক সোসাইটি', 'আই আই টি' খড়্গাপুর, প্রেন্সিডেন্সি কলেজ-এর মতো উচ্চমেধার মানুষদের সামনে।

বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ আজ পৃথিবী থেকে মহাকাশ
পর্যন্ত বহু বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করলেও মানুষ
তার মন বা মস্তিষ্কের সম্বন্ধে
এখনও অনেক কিছুই
জানতে পারেনি।

(মনের নিয়ন্ত্রণ ও মেডিটেশান নিয়ে বিস্তৃত জানতে পারেন, 'মনের নিয়ন্ত্রণ-যোগ-মেডিটেশান')

অধ্যায় : পাঁচ

সমব্যথী চিহ্নের মহাপুরুষ

বিভিন্ন শতাব্দীতে এমন অনেক ‘stigmatist’ বা ‘সমব্যথী ক্ষতচিহ্নধারী’র কথা জানা গেছে। তাঁদের অনেকেই ধর্মীয় সমাজে অলৌকিক মহিমায় মণ্ডিত হয়েছেন।

কোনেরশ্রুত-এর থেরেসা নিউম্যান (Theresa Neuman of Konnersreuth) তাঁর Stigmatisation বা সমব্যথী ক্ষতচিহ্নের জন্য বিশ্বজুড়ে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিলেন। থেরেসা নিউম্যান জন্মেছিলেন ১৮৯৮-এর গুড ফ্রাইডের দিন, মৃত্যু ১৯৬২ সালে। ১৯২৬-এর ২ এপ্রিল থেরেসার হাত-পা থেকে প্রথম রক্ত ঝরতে নাকি দেখা যায়। তারপর প্রতি বছরই গুড ফ্রাইডেতেই থেরেসার হাত-পা থেকে ঝরতে লাগল রক্ত। যিশুর সঙ্গে একাত্মতার ফলেই যে এই রক্তপাত এই বিষয়ে ভক্তজনের কোন দ্বিমত ছিল না। থেরেসা এই সমব্যথী-চিহ্ন ‘আত্ম-সম্মোহন’ ও ‘স্ব-ধারণা সঞ্চার’ (auto-suggestion)-এর সাহায্যে সৃষ্টি করতেন না। তিনি এর জন্য চতুরতার আশ্রয় নিতেন। তাঁর এই জালিয়াতি শেষপর্যন্ত ধরা পড়ে।

ইতালিয়ান অন্ধ-ধর্মবিশ্বাসী গোম্মা গ্যালভানির হাতে-পায়েও এমনি পবিত্র সমব্যথী-চিহ্ন ফুটে উঠত। তাই নিয়ে ইউরোপে প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। গোম্মা গ্যালভানি জন্মেছিলেন ১৮৭৮ সালে, মৃত্যু ১৯০৩ সালে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে অভিমত প্রকাশ করেন যে, গোম্মা আত্ম-সম্মোহন (auto-suggestion) ও হিস্টিরিয়াগ্রস্ত (hustrrico epileptic fits) অবস্থায় নিজেই নিজের শরীরে নিজেই ক্ষতের সৃষ্টি করতেন।

সমব্যথী চিহ্নের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম উল্লেখ করা দরকার। শোনা যায়, একবার রামকৃষ্ণদেবের নিষেধ সত্ত্বেও একজন আর একজনকে মেরেছিল। সেই মারে রামকৃষ্ণদেব এতই সমব্যথী হয়েছিলেন যে, তাঁর পিঠেও আঘাত-চিহ্ন ফুটে ওঠে।

বস্তুবাদী মনস্তত্ত্ববিদ মাত্রেই আমার সুরে সুর মিলিয়ে বলবেন, যদি ঘটনাটা ঘটেও থাকে, তবু এর মধ্যে অলৌকিক কিছু নেই। রামকৃষ্ণদেব গভীর সংবেদনশীলতার (auto-ensetiveness) জন্যেই আত্ম-সম্মোহনের দ্বারা ও স্ব-ধারণা

সঞ্চারের (auto-suggestion) দ্বারা এমনটা ঘটাতে পেরেছিলেন। এই ঘটনার মধ্যে অস্বাভাবিকতা থাকতে পারে, কিন্তু অলৌকিকতা নেই। অর্থাৎ, সকলের পক্ষেই এমনটা ঘটানো সম্ভব নয় বটে, কিন্তু কিছু কিছু মানুষের বিশেষ শারীরিক ও মস্তিষ্কের গঠনের জন্য auto-suggestion-এর দ্বারা এই ধরনের ঘটনা তাদের পক্ষে ঘটানো সম্ভব।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবনেও নাকি এই ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছিল বলে তাঁর জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। একবার অনুকূলচন্দ্র কুষ্ঠিয়া যাচ্ছিলেন ঘোড়ার গাড়িতে। সহিস ঘোড়াকে চাবুক মারে চাবুকের দাগ ফুটে উঠেছিল অনুকূলচন্দ্রের গায়ে।

মনোরোগ চিকিৎসক ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'পাভলভ পরিচিতি', ২য় পর্ব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৭-এ একটি মেয়ের কথা পাওয়া যায়। মেয়েটির নাম অঞ্জনা। নিটোল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ১৯-২০ বছরের মেয়ে। বিয়ের বছরখানেক পর থেকেই দেখা দিয়েছে দাঁতে ব্যথা, সেইসঙ্গে বাঁ পা'টায় অসাড়তা। মাঝে-মধ্যে ডান দিকে তলপেটে তীব্র যন্ত্রণা হয়।

দাঁতের ডাক্তার, নিউরোলজিস্ট ও আরও কিছু ডাক্তার পরীক্ষা করেছেন। কেউই উপসর্গগুলোর কারণ খুঁজে পাননি।

শেষ পর্যন্ত কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন ডাক্তার গঙ্গোপাধ্যায়। বিয়ের আগে মেয়েটি একজন গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ত। শিক্ষকের নাম বঙ্কিমবাবু। বয়েসে অঞ্জনার দ্বিগুণ, বিবাহিত ও সন্তানের পিতা। তবু মেয়েটি বঙ্কিমবাবুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। বাড়ির লোকেরা বোধহয় কিছুটা সন্দেহ করেছিলেন, তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেন। অঞ্জনা প্রথমটায় বিয়েতে মত দেয়নি। কিন্তু, খুবই বিস্মিত হল ও দুঃখ পেল যখন দেখল তার মাস্টারমশাইও অঞ্জনার এই বিয়েতে আগ্রহী।

অভিমানে অঞ্জনা বিয়েতে রাজি হলো বটে, কিন্তু মনে চিন্তার বোঝা রয়ে গেল, এবার থেকে মাস্টারমশাই দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পেলে সে খবরও পাবে না। মাস্টারমশাইয়ের বাঁ পায়ে মাঝে-মাঝে একটা অসাড়তা দেখা দেয়, যখন অসাড়তায় মাস্টারমশাই কষ্ট পাবেন তখন সে থাকবে অনেক অনেক দূরে, সামান্য সহানুভূতিটুকু জানানোরও সুযোগ পাবে না।

বিয়ের দিন পায়ের ব্যথায় বঙ্কিমবাবু অঞ্জনাকে দেখতে আসতে পারলেন না। বিয়ের পর থেকেই অঞ্জনার দেখা দিল দাঁতে ব্যথা ও বাঁ পায়ের অসাড়তা। অঞ্জনার স্বামীর মাঝে-মধ্যে ডান দিকের তলপেটে খুব ব্যথা হয়। অঞ্জনারও মাঝে-মধ্যে শুরু হয়ে গেল ডান তলপেটে ব্যথা। এই সবগুলোই সমব্যথী-চিহ্নের ঘটনা। অঞ্জনা অবচেতন auto-suggestion-এর সাহায্যে মাস্টারমশাই ও স্বামীর রোগ-উপসর্গগুলো নিজের দেহেও প্রকাশ করত।

মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে অনেকেই এই ধরনের সমব্যথী-চিহ্নের বা 'Stigmatisation' সৃষ্টিকারীকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে ধরে নেন। মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য এই ঘটনার মধ্যে খুঁজে পান abnormal psycholбgy বা অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব। তাঁরা মনে করেন, সমব্যথী-চিহ্নের ঘটনাগুলো অস্বাভাবিক হলেও আদৌ অলৌকিক নয়। অর্থাৎ, সব মানুষের ক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও কিছুকিছু মানুষের শরীর-কাঠামোয় ও বিশেষ মস্তিষ্ক-কোষের জন্য এমনটা ঘটা সম্ভব।

V. Bekhterev, I. Tsctorch ও V, Myasichov বিশ শতকের এই তিন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, হিপনোটিক-সাজেশনের দ্বারা শরীরের কিছু কিছু অংশে রক্তচাপ প্রচণ্ডভাবে বাড়িয়ে রক্তবাহী শিরা (capillary) ফাটিয়ে রক্তপাত ঘটানো সম্ভব।

বিশ্ববিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী R. L. Moody এই ধরনের একটি ঘটনা তাঁর The Lancet 1948;। গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (পৃষ্ঠা ৯৬৪)। তাঁর এক রোগিণীকে শৈশবে তাঁর বাবা-মায়ের কেউ একজন চাবুক দিয়ে ভীষণ মেরেছিলেন। বড় হয়েও মহিলাটি ওই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ভুলতে পারেননি। তাঁর স্মৃতিতে ঘটনাটা এমনই গভীরভাবে দাগ কেটেছিল যে, ওই ঘটনার কথা গভীরভাবে মনে করলে মহিলাটির মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলো শৈশবের বীভৎস সময়টির অবস্থায় ফিরে যেত এবং শৈশবে শরীরে যে সব জায়গায় চাবুকের তীব্র আঘাত পড়েছিল সেইসব জায়গাগুলো লাল হয়ে ফুলে উঠত, এমন কী ওই জায়গাগুলো থেকে রক্তও ঝরত।

এই ধরনের সমব্যথী ঘটনা সকলের ক্ষেত্রে না ঘটলেও কোনও কোনও হিস্টিরিয়া ও মৃগী রোগীদের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে, বিশেষ করে যদি তাদের রক্তবাহী সরু নালীগুলো (capillary) খুব পলকা (fragile) হয়। এইসব ঘটনা এক ধরনের pathological ক্রিয়া। নিজের মস্তিষ্কে নির্দেশ পাঠিয়ে (auto-suggestion) এই ধরনের ঘটনা ঘটানো সবক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও কিছুকিছু ক্ষেত্রে সম্ভব। এই প্রসঙ্গে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী প্লাটানভ-এর (Platanov) The world as a Physiological & Therapeutic Factor : 1959, পৃষ্ঠা ১৯০-এ বলছেন, the literature on suggestion & hyposis contains numerous indications of the possibility of influencing the activity of the heart, the state of the cardiovascular system and in particular of the possibility of influencing changes in the state of the vasomotor centre by verbal suggestion.

এবার যে ঘটনাটি বলছি, সেটা ঘটেছিল এই কলকাতাতে। মনোরোগ চিকিৎসক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে স্বর বন্ধ হওয়া একটি রোগী এসেছিল আজ থেকে প্রায় বছর পঁয়তিরিশ আগে। কথা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে বলা চলে না, বহু কষ্টে

ফিসফিস করে কথা বলতে পারে। রোগীটি ফুসফুসের যক্ষ্মা রোগে ভুগছিল। ডাঃ গাঙ্গুলি দেখলেন বিশেষজ্ঞের অভিমত functional paralysis of vocal chord। এই স্বর প্রথম যখন বন্ধ হয় তখন রোগীর ফ্রেনিক নার্ভ-এর ওপর অপারেশন চলছিল। বোঝা যায় ভয়ই এই অসাড়তার কারণ।

স্বরের সাড় ফিরিয়ে দেওয়ার সম্মোহন-চিকিৎসা চালাতে গিয়ে ডাঃ গাঙ্গুলি আর এক সত্যকে আবিষ্কার করলেন, সেই সত্যের দিকেই আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রোগীটি ছিল পূর্ববঙ্গের এক বড় ব্যবসায়ীর দ্বিতীয় পক্ষের শেষ সন্তান। '৪৬ -এর দাঙ্গার পর ব্যবসা বেশ পড়ে যায়। এই সময় বাবা মারা যান। বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা ওকে আলাদা করে দেয়। কয়েক হাজার টাকা ও বিধবা মাকে নিয়ে আলাদা সংসার পাতলেও টাকাগুলোকে ঠিক কেমনভাবে ব্যবসায় খাটানো উচিত ষোল বছরের বালক ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। মায়ের পীড়াপীড়িতে বিয়েও করে ফেলে। মা আর বউকে দেশে রেখে সামান্য যা পুঁজি ছিল তাই নিয়ে এসে হাজির হয় কলকাতায়। কলকাতায় এসে ব্যবসা করতে গিয়ে প্রায় সব পুঁজিই লোকসান দিল। দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাসায় এসে ওঠে। সেখানে জোটে শুধু অনাদর। এখানেই একদিন ফুসফুসের যক্ষ্মা রোগ ধরা পড়ল। অনেক তদ্বিরের পর বেসরকারি হাসপাতালে জায়গা পেলেও সঞ্চয়ের শেষ তলানিটুকু এখানেই শেষ হয়ে যায়।

চিকিৎসায় রোগী ভাল হয়। রোগীর দাদারা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গেই আছে শুনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওর দাদাদের চিঠি দেয়। কোন উত্তর আসে না। তিন তিনখানা চিঠি দিয়েও জবাব না পেয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীকে জানিয়ে দেন, সুস্থকে আর হাসপাতালে রাখা সম্ভব নয়, এবার বেড খালি করতে হবে। পরদিনই দেখা যায় সুস্থ মানুষটি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। গায়ে জ্বর, সঙ্গে কাশি। কয়েকদিন পর এক্স-রে করে দেখা গেল ফুসফুসে আবার ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে।

এবার রোগীটির স্থান হলো সরকারি উদ্বাস্তু হাসপাতালে। এখানে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করা গেল। বার-বারই রোগী চিকিৎসার দ্বারা সুস্থ হয়ে উঠছে এবং বেড খালি করে দেওয়ার কথা বলার পরই দেখা যাচ্ছে আবার ফুসফুসের পুরনো ক্ষত সক্রিয় হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় অপারেশন করতে গিয়েই এই স্বর নিয়ে বিপত্তি।

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি বুঝেছিলেন রোগীর জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অসহায়তা ও আশ্রয়হীনতার মানসিকতা কাটিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে না আনতে পারলে, মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের সহনশীলতা না বাড়াতে পারলে, শুধুমাত্র সম্মোহন-চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যাবে না। রোগ মুক্তির পর হাসপাতালের নিশ্চিত আশ্রয় থেকে অনিশ্চিত জীবন সংগ্রামের পথে নামতে হবে ভাবলেই রোগর উপসর্গগুলো আবার

হাজির হয়, সৃষ্টি হয় ক্ষত। অনিশ্চয়তার কারণ দূর না করলে রোগের পুনঃ আক্রমণের সম্ভাবনা দূর হবে না। সম্মোহন-চিকিৎসার শেষে রোগীর একটা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, ছোট একটা সরকারি কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ফল পাওয়া গিয়েছিল হাতে হাতে। রোগী তার স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধরত সৈনিকদের মধ্যে হিস্টিরিক-অন্ধত্ব ও স্মৃতিভ্রংশের অনেক ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। এদের প্রতিটি অন্ধত্ব ও স্মৃতিভ্রংশ বহিরাগত কোনও কারণে হয়নি, হয়েছে মস্তিষ্ক-কোষের জন্য। ওদের অবচেতন মন রক্ত দেখতে চাইছে না। হত্যার বীভৎস স্মৃতি ধরে রাখতে চাইছে না। এই না চাওয়ার তীব্র আকুতি থেকেই দৃষ্টি হারিয়েছে, স্মৃতি হারিয়েছে।

আঘাতে যে বেশি ভয় পায়, তার ব্যথা বেশি লাগে ও রক্তপাত বেশি হয়। অপারেশনের ক্ষেত্রেও ভয় পেলে ব্যথা ও রক্তপাত বাড়ে। যে রোগী আপ্রাণ বাঁচতে চায় তার আরোগ্য দ্রুততর হয়। আবার, শুধু চিন্তার প্রভাবেই ঘা সৃষ্টি হতে পারে। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার জন্যে পেটে অত্যধিক অ্যাসিড নিঃসৃত হয়। দীর্ঘকাল এই রকম চলতে থাকলে ঘা তৈরি হয় ও রক্তক্ষরণ হয়। গ্যাসট্রিক আলসার, কোলাইটিস ও কিছু ক্যান্সার কেবলমাত্র মানসিক কারণেই হয়ে থাকে। ভয় পাওয়া যদিও মানসিক ব্যাপার, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শরীরে তার বিরাট প্রভাব পড়ে। ভয়ে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, শরীর ঘামে, অনেক সময় পায়খানা বা প্রস্রাবের বেগ দেখা যায়। রাগ হলে রক্তচাপ বাড়ে, চোখ-মুখ রক্তাভ হয়ে ওঠে।

মস্তিষ্কের বিশেষ গঠন-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বা হিস্টিরিয়া রোগীরা বিভিন্ন ধরনের অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার এবং সংবেদনশীলতার জন্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই নিজের অজান্তে স্বনির্দেশ (auto-suggestion) পাঠিয়ে 'সমব্যথী-চিহ্ন' বা ওই জাতীয় অস্বাভাবিক সব কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে ফেলেন।

অধ্যায় : ছয়

হিস্টিরিয়া, গণ-হিস্টিরিয়া, আত্ম-সম্মোহন, নির্দেশ

হিস্টিরিয়া রোগী সাধারণত অশিক্ষিতদের মধ্যে বেশি। অশিক্ষিত, কুসংস্কারে আচ্ছন্নদের মস্তিষ্কের কোষের নমনীয়তা (elasticity) কম এবং আবেগপ্রবণতা খুব বেশি। ফলে কোনও কিছুই তারা যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে গভীরভাবে তলিয়ে দেখতে পারে না। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মানুষের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর সংখ্যাও কমছে। তবে, নামসংকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেগ চেতনা হারিয়ে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়তে এখনও কিছু কিছু নারী-পুরুষকে দেখা যায় বই কী।

প্রাচীনকালে গণ-হিস্টিরিয়া সৃষ্টির বিষয়ে প্রধান ভূমিকা ছিল ধর্মের। এখন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা। ধর্মান্ধতা, আবেগপ্রবণ জাতীয়তাবোধ, তীব্র প্রাদেশিকতা, রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি অন্ধ আনুগত্য বহুজনের যুক্তি-বুদ্ধিকে গুলিয়ে দিয়ে তীব্র ভাবাবেগে চলতে বাধ্য করে। এই গণ-হিস্টিরিয়া বা গণ-সম্মোহনের ক্ষেত্রে সম্মোহন-ঘুম না পাড়িয়ে Suggestion দিয়ে তীব্র উত্তেজনা তৈরি করা হয়। প্রয়োজনীয় ফল লাভ করা যায়। সাধারণত মানুষ যখন কোনও কারণে ভীত, উত্তেজিত বা ভক্তিরসে আপ্লুত হয় তখন ধর্মগুরু, রাষ্ট্রনেতা ও রাজনৈতিক নেতাদের Suggestion অনেক সময় অসম্ভব রকম কার্যকর হয়।

আত্ম-সম্মোহন ও স্ব-নির্দেশ (auto-suggestion) যেমন একজন ব্যক্তির নিজের ইচ্ছের হতে পারে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে তার অজ্ঞাতসারেই সে auto-suggestion দ্বারা নিজেকে নিজে সম্মোহিত করতে পারে। এইসব ক্ষেত্রেও শারীরবৃত্তি তার স্বাভাবিক নিয়ম মেনে চলে না। অস্বাভাবিক আচরণ করে। এই ধরণের আচরণ অস্বাভাবিক হলেও শারীরবৃত্তিরই অংশ।

তারকেশ্বরে বাবা তারকনাথকে পুজো দেওয়ার জন্য ভক্তরা যখন প্রচণ্ড শীতের মধ্যে মন্দির সংলগ্ন পুকুরে স্নান করে ভিজে কাপড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন ভক্তি ও বিশ্বাস মস্তিষ্কের কোষগুলোকে ঠাণ্ডা লাগার জন্য নির্দেশ পাঠায় না, ফলে ঠাণ্ডা লাগে না।

এই ভক্তরাই প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দুপুরে আগুন হয়ে থাকা দেবস্থানের সিমেণ্ট বা পাথরে ছাওয়া চাতালে খালি পায়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। যে তাপ অসহ্য, দেবস্থানে এলে সেই তাপেই কষ্টের কোন অনুভূতি ভক্তদের মধ্যে দেখা যায় না।

দুটি ক্ষেত্রেই ঈশ্বর-মাহাত্ম্যের কথা ভেবে ভক্তেরা নিজের অজান্তেই নিজেরা সম্মোহিত হয়ে পড়েন এবং সেইভাবেই তাঁদের মস্তিষ্কের কিছু কিছু স্নায়ুকে auto Suggestion-এর দ্বারা পরিচালিত করেন।

অতীতের এক বিখ্যাত সাধক সম্বন্ধে শোনা যায়, খাবারের সঙ্গে তাঁকে কোনও দুষ্টপ্রকৃতির লোক বিষ খাইয়েছিল। বিষ খাওয়ার পরেও সাধকের জীবনহানি ঘটেনি। কী করে এমনটা হলো? যুক্তিবাদী হিসেবে ধরে নিচ্ছি কারণ ছিল। এ-যুগে আধুনিক চিকিৎসায় বিষপানের রোগীর পাকস্থলী পাম্প করে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। সেই সাধকও কী তবে আত্ম-সম্মোহন ও স্ব-নির্দেশের দ্বারা বমি করে পাকস্থলীর বিষাক্ত খাবার উগরে দিয়েছিলেন? প্রাচীন এই কাহিনির সত্যতা কতটুকু তা জানতে না পারলেও এইটুকু বলতে পারা যায়, আত্ম-সম্মোহনের ও স্ব-নির্দেশের দ্বারা বমি করা সম্ভব।

ভাবুন, আপনি খেতে বসেছেন। পরিপাটি করে খাবার সাজিয়ে দিয়েছেন আপনার স্ত্রী। ভাত ভেঙে মাছের ঝোলের বাটিটা ভাতে ঢালতেই টকটকে লাল ঝোলটা ভাতের ওপর দিয়ে গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল থালায়। মুহূর্তে আপনার মনে পড়ে গেল, ঘণ্টাখানেক আগে দেখা সেই বাসে-চাপা পড়ে মরে যাওয়া লোকটার কথা। তার সারা শরীর বেয়ে এমনি ঝোলের মতোই গড়িয়ে পড়ছিল রক্ত। ঘটনাটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই আপনার গা গুলিয়ে উঠল। আপনি বমি করে ফেললেন। আপনার চোখের সামনে ভেসে ওঠা দৃশ্য আপনার মস্তিষ্কের সেই স্নায়ুগুলোকে উদ্দীপিত করল, যা বমি নিয়ে আসে। এবার, যখন বমি করা প্রয়োজন তখন যদি আপনি তীব্র ঘৃণা সঞ্চার করে, এমন কোন দৃশ্য চোখের সামনে জীবন্ত করে ভাসিয়ে রাখতে পারেন, তবে মস্তিষ্কের বিশেষ স্নায়ুগুলো এমনভাবে উদ্দীপিত হবে, যার দরুন আপনার গা গুলিয়ে বমি এসে পড়বে।

১৯৮৩-র জানুয়ারিতে এক প্রকাশক বন্ধুর সঙ্গে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম একটি বিশেষ কাজে। উঠেছিলাম কলাভবনের কাছেই একটি হোটেলে। পৌছতে বেশ রাত হয়েছিল। মধ্যরাতে খাওয়ার পাট চুকোলাম ভাত আর হাঁসের ডিম দিয়ে। তারপর, আরও অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল অস্বস্তিতে। আমার হার্টে একটু গণ্ডগোল আছে। সেটাই বেড়ে উঠল ডিম খাওয়ার ফলে উইন্ডে, বুকে চিনচিনে ব্যথা, বাঁ হাত, ঠাণ্ডা, সারা মুখও স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা। এই রাত-দুপুরে ডাক্তার চাইলেই পাব কি না সন্দেহ। বমি করে পেটের খাবার বের করে দিলে

ভাল লাগবে। গলায় আঙুল দিয়ে যে বমি করব, তারও উপায় নেই। গলায় একটা ক্ষত আছে এই অবস্থায় নিজেকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় আত্মসম্মোহন করে বমি করা। কুকুরের গায়ের এঁটুলি দেখলেই ঘেন্নায় আমার গা শিরশির করে ওঠে। শরীরের বেশ কিছু লোম খাড়া হয়ে ওঠে। গা চুলকোতে থাকে। বমি এসে পড়ে। আমি একান্তভাবে এঁটুলি বোঝাই কুকুরের কথা ভাবিতে শুরু করলাম, সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকারের এঁটুলি দেখলে, আমার শরীরে যেসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হতে থাকে সেগুলি হতে শুরু করল, তারপরই আরম্ভ হলো প্রবল বেগে বমি। বমিতে পেট হালকা হতেই শরীরের অস্বস্তি ও কষ্ট দূর হলো।

অনেক সাধু-সন্তদের সম্বন্ধে শোনা যায়, তাঁরা প্রচণ্ড শীতেও খালি গায়ে থাকতেন, যোগ সাধনার ফলে নাকি শীত বোধ হতো না। অনেক সময় মানুষ অভ্যাসের মধ্য দিয়ে ঠাণ্ডা বা গরমকে সহ্য করে নেয়। এই প্রসঙ্গে আমার একটি গল্প মনে পড়ে গেল, গল্পটি সম্ভবত রস-সাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষের মুখে শুনেছিলাম। একবার কুমারেশদা কনকনে শীতের সকালে পুরুলিয়ার রাস্তায় (বাঁকুড়াও হতে পারে) একটি অনাবৃত গায়ের খাটো ধুতি পরা রাখাল ছেলেকে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কী রে, এই শীতে খালি গায়ে তোর কষ্ট হচ্ছে না?"

ছেলেটি উত্তরে বলেছিল, "আপনার মুখটাও তো বাবু খালি রয়েছে, ঢাকেননি, মুখে ঠাণ্ডা লাগছে না?"

সহ্য-শক্তির ব্যাপার ছাড়াও কিন্তু আর একটি ব্যাপার আছে, যার সাহায্যে কেউ কেউ সহ্যাতীত শীত বা গরমকেও আত্ম-সম্মোহনের দ্বারা নিজের সহ্য সীমার মধ্যে নিয়ে আসেন।

একজন সম্মোহনকারী যে সব সময়েই সম্মোহন-ঘুম পাড়িয়ে suggestion দিয়ে থাকেন, তেমন কিছু নয়। অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ঘুম না পাড়িয়েও একজনের মস্তিষ্ক কোষে suggestion পাঠিয়ে আশ্চর্য ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। এই ধরনের সম্মোহনের একটি ঘটনা বলছি।

একসময় ফলিত জ্যোতিষ নিয়ে পড়াশুনা করেছি। পড়ে এবং বাস্তবক্ষেত্রে পরীক্ষা করে স্পষ্টই বুঝেছি ফলিত জ্যোতিষ নেহাতই ক্ষীণ চান্সের ব্যাপার। অর্থাৎ মিলতেও পারে, না-ও মিলতে পারে। অনেকেই আমার কাছে ছক বা হাত হাজির করেছে। আমি রাশিচক্র বা হস্তরেখা বিচার করে যখন অতীত নিয়ে বলেছি, তখন প্রায় সব-ই ভুল হয়েছে। একটু সাধারণ বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে যখন অতীত বা বর্তমান বিষয়ে বলে গেছি, তখন অনেক কথাই মিলেছে। যদিও আমি জানি, আমার যত ভবিষ্যদ্বাণী মিলেছে, মেলেনি তার বহুগুণ। আর এও জানি, ফলিত

জ্যোতিষ ও অলৌকিকে বিশ্বাসী লোকেরা ওই দু-একটি মিলে যাওয়া ভবিষ্যদ্বাণীকেই মনে রাখেন এবং অন্যের কাছে সেটাকেই আরও ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলেন। না মেলা কথাগুলো চটপট ভুলে যান। আসলে, ফলিত জ্যোতিষের প্রতি অন্ধ-বিশ্বাসই তাদের এমনটা করতে বাধ্য করে।

আমার বেলায় তার অন্যথা হয়নি। সুতরাং একটা পরিচিত গণ্ডির মধ্যে জ্যোতিষী হিসেবে ফাটাফাটি নাম ছিল। আমার প্রতি এমনই এক অন্ধ-বিশ্বাসী হলো দমদমের বাঙুর অ্যাভিনিউ নিবাসী প্রবীর সাহা। ঘটনাটি ১৯৮১ সালের। বয়েসে তরুণ প্রবীর একদিন হঠাৎ এসে হাজির হল আমার অফিসে। কাঁদো-কাঁদো ভাবে বললো "প্রবীরদা, আমাকে বাঁচান।"

ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার, খুলে বল তো। আমার যদি সাধ্যে কুলোয় নিশ্চয়ই করব।"

প্রবীর আমার মুখোমুখি বসে যা বলল তা হলো, সম্প্রতি বন্ধুদের সঙ্গে ও একটা পিকনিকে গিয়েছিল, সেই পিকনিকে একটি ছেলে ছিল যে জ্যোতিষী হিসেবে একটু-আধটু নাম কিনেছে। জ্যোতিষী বন্ধু প্রবীরের ভাগ্য বিচার করে জানিয়েছে, ওর মৃত্যুযোগ খুব কাছেই। মাস কয়েকের মধ্যেই। পিকনিক থেকে ফেরার পর দিনকয়েক জ্যোতিষী বন্ধুর কথাটা মনের মধ্যে খচ-খচ করে বিঁধতে লাগল। শেষ পর্যন্ত একদিন কলকাতার অন্যতম সেরা গ্রহরত্নের প্রতিষ্ঠানে গিয়ে হাজির হলো। সেখানকার এক জ্যোতিষীকে বন্ধু জ্যোতিষীর ভবিষৎবাণীর কথা বলে জানতে চাইলো—সত্যটা কী? জ্যোতিষীর থেকে যা উত্তর পেল তাতে বেচারা একেবারে ভেঙে পড়ল। জ্যোতিষীর মতে, খুব কাছেই মৃত্যুযোগ। হ্যাঁ, জীবনের পরিধি আর মাত্র মাসকয়েক। এবার বাড়িতে মা-বাবার কাছে দুঃসংবাদটা ভাঙল। মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের আদরের ছেলে। মা আর দেরি না করে প্রবীরকে ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর পরিচিত এক তান্ত্রিকের কাছে। সব শুনে, হাত দেখে তান্ত্রিক খুব একটা ভরসা দিতে পারেননি, পাঁচ হাজার টাকা খরচের যজ্ঞ করার পরও। অতএব, ও যে এখন মৃত্যুর মুখোমুখি এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে।

দিনকয়েক আগে ডালহৌসি স্কোয়ারে টেলিফোন ভবনের সামনে বাস থেকে নেমে গাড়িতে চাপা পড়া একটা লোকের মৃতদেহ দেখে প্রবীরের গা গুলিয়ে ওঠে। মাথা ঘুরে যায়। ফুটপাতেই বসে পড়ে নিজের পতন রোধ করে। তারপর থেকে ওর সব সময়ই মনে হচ্ছে, এই বোধহয় কোন দুর্ঘটনা হবে। মৃত্যু যে ওঁর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরছে! ওই বীভৎস মৃত্যুটা দেখার পর থেকে গত ছ'টা রাত এক মিনিটের জন্যেও ঘুমোতে পারেনি।

ঘটনাটা বলে বলল, "আপনি আমাকে বাঁচান, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। দিনের পর দিন না ঘুমিয়ে আমার হাত-পা কেমন যেন কাঁপে, মাথা ঘোরে।

রাতে সকলে যখন ঘুমোয়, আতঙ্কে আমার চোখে কিছুতেই ঘুম আসে না। ক্যামপোস খেয়ে দেখেছি, তাতেও কাজ হচ্ছে না। আমি আর পারছি না। আমাকে আপনার বাঁচাতেই হবে।”

কথাগুলো শেষ করবার আগেই ওর গলা ধরে এলো। দেখলাম, ও একান্তভাবে কান্না চাপার চেষ্টা করছে। বেচারা একেবারেই ভেঙে পড়েছে। বুজরুক জ্যোতিষী আর তান্ত্রিকদের ওপর রাগে সারা শরীর রি-রি করে উঠল। সমাজের বুকে বসে সম্মানের সঙ্গে ওরা প্রবীরকে একটু একটু করে খুন করছে। প্রবীরের মৃত্যু হলে তার জন্য দায়ী ওই সব প্রতারকরা।

প্রবীরকে বললাম, “দুটো হাতই পাশাপাশি মেলে ধরো তো।” মেলে ধরল। হাতের রেখাগুলোর ওপর গভীরভাবে চোখ বোলাবার অভিনয় করলাম। কিছুক্ষণ মাপামাপি করে বললাম, “দিন কয়েকের মধ্যে তোমার পেটে কোনো গণ্ডগোল হয়েছে, এই পেট খারাপের মতো কিছু?”

প্রবীর সাহা উৎসুক চোখে বলল, “হ্যাঁ, সত্যিই তাই।”

আমার এই সঠিক বলতে পারার পেছনে অলৌকিকত্ব বা হাত দেখার কোনও ব্যাপারই ছিল না। স্নায়ুদুর্বলতার দরুন কয়েকটা রাত ভাল ঘুম না হলে পেট খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। আর, এই সম্ভাবনাটুকুর কথাই আমি প্রশ্নের আকারে প্রকাশ করেছিলাম।

আমার এই সামান্য মিলে যাওয়া কথাটাই আমার প্রতি প্রবীর সাহার বিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে তুলল।

এবার ওর ডান হাতের প্রায় অস্পষ্ট একটা রেখাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললাম, “আমার ওপর তোমার বিশ্বাস আছে তো?”

“নিশ্চয়। আর, সেই জন্যেই তো বাধ্য হয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে আসা।”

জ্যোতিষশাস্ত্র কোনই বিজ্ঞানই নয়, একটি অপবিজ্ঞান, এই কথাটা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে এখন প্রবীরকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা বৃথা। ওর বর্তমান মানসিক অবস্থা যুক্তি বিচারের পর্যায়ে নেই। এই মানসিক অবস্থার কোনও মানুষকে তার অন্ধ বিশ্বাসের মূলে আঘাত করার মত বোকামি প্রায় কোনও মানসিক চিকিৎসকই করবেন না। সাময়িকভাবে ওর জ্যোতিষ বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই ওকেই বাঁচাতে চাইলাম। অর্থাৎ সেই প্লাসিবো চিকিৎসা।

এবার কণ্ঠস্বরে যথাসম্ভব আত্মবিশ্বাসের সুর মিশিয়ে বললাম, “তোমার জ্যোতিষ বিচার করতে গিয়ে সকলেই এক জায়গায় মারাত্মক রকমের ভুল করেছেন। আমি তোমাকে বলছি, তুমি বাঁচবেই। তোমার কিছুই হবে না। এই ছোট্ট রেখাটা বলে দিচ্ছে, একটা কিছু ঘটার যে সম্ভাবনা ছিল, তা কেটে গেছে। তোমার জীবনের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে বলছি, তোমার কিছুই হবে না। তবে তোমাকে একটা জিনিস

পরতে বলব। পরলে তোমার গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগবে না।"

এবার ও প্রশ্ন করল, "কী?"

বললাম, "একটা পাঁচ-ছ'রতির ভাল মুক্তো সোনায় বাঁধিয়ে আগামী শুক্লপক্ষের বৃহস্পতিবার সকালে পরতে হবে। মুক্তোটা দিয়ে আংটি বানিয়ে শোধন করে নিও। আর, এই শুক্লপক্ষ পর্যন্ত দিনগুলোর জন্যে তোমার ভাল-খারাপের দায়িত্ব আমি নিলাম। আর একটা কথা, বাড়ি ফিরে ধনে ও মৌরি ভিজিয়ে রাখবে শোবার আগে ওই ধনে-মৌরি ভেজানো জলটা খেয়ে ফেলবে। আজ থেকে তোমার সুন্দর ঘুম হবে, কোন চিন্তা নেই।"

মুক্তোর কথাটা এলোমেলোভাবে মনে এলো বলেই বলে ফেললাম। প্রবীর সাহার প্রবল জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসই ওকে একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে নিয়ে চলেছিল। এই জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস দিয়েই ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করলাম, ওর স্নায়ুগুলোকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসার চেষ্টা করলাম।

কাজও পেলাম হাতে হাতে। পরের দিনই প্রবীর এসে উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে খবর দিল, "কাল রাতে ভালই ঘুম হয়েছিল।"

বুঝলাম আমার Suggestion-এ ভালই কাজ হচ্ছে। এই লেখার মুহূর্ত পর্যন্ত প্রবীর দিব্যি সুস্থ-সবল হয়ে বেঁচে রয়েছে তিন জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীকে উপেক্ষা করে। বিয়েও করেছে প্রবীর। কয়েক মাসের বদলে কয়েকটা বছর নিশ্চিন্তে পার হওয়ার পর প্রবীরকে উপহার দিলাম এই বইটি-ই, বললাম তোমার কথাও লেখা আছে এখানে।

এবার যে ঘটনাটার কথা বলছি, তার নায়ক আমারই সহকর্মী অরুণ চট্টোপাধ্যায়। থাকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পোলঘাট গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন মানিকপুরে। ১৯৭৮-এর পঞ্চায়েতের নির্বাচনে পোলঘাট এলাকা থেকে অরুণ নির্বাচিত হয় নির্দল প্রার্থী হিসেবে। নির্দল হিসেবে জিতলেও ওর গায়ে আছে একটা রাজনৈতিক গন্ধ। ওই এলাকায় বিরোধী রাজনৈতিক দলের তখন দারুণ রমরমা। ডামাডোলের বাজারে ওই তল্লাটে রাজনৈতিক খুন তখন 'ডাল-ভাত'। অরুণ তখন নতুন বিয়ে করেছে। বউ, একটি ছেলে, মা-বাবা আর ভাই-বোন নিয়ে গড়ে ওঠা সুখের সংসারে হঠাৎই হাজির হলো রাজনৈতিক আক্রমণ শঙ্কার কালো মেঘ। বিরোধী আক্রমণের আশঙ্কায় শঙ্কিত অরুণ একদিন আমাকেই মুশকিল আসানের জন্য গ্রহশান্তির ব্যবস্থাপত্র করে দিতে বলল। অরুণের সঙ্গে কথা বলে স্পষ্টতই আমার ধারণা হয়েছিল ও এবং ওদের পরিবারের সকলেই গভীরভাবে ভাগ্যে এবং জ্যোতিষ বিচারে বিশ্বাসী। ঈশ্বরে বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ পরিবারে যে পরিবেশে অরুণ এত বড় হয়েছে, আমার শুকনো উপদেশে সেই পরিবেশের সংস্কার এক মুহূর্তে ধুয়ে-মুছে যাবে না। অথচ, চোরাগোপ্তা খুন হওয়ার চিন্তায়

ওর মানসিক ভারসাম্যের যে অভাব দেখতে পেলাম, সেই অভাবটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূর করার প্রয়োজন রয়েছে।

এই মুহূর্তে অফিসের পাশাপাশি চেয়ারে বসে সম্মোহন-ঘুম এনে Suggestion দিয়ে ওর মানসিক জোর ও ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার চিন্তা একান্তই অবাস্তব। অথচ, ওর ফলিত জ্যোতিষ-বিশ্বাসকে এই মুহূর্তে যুক্তির কূটকৌশলে ভাঙার চেষ্টা না করে, যদি ওর বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েই মনোবল বাড়াতে পারি, বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারি যে, ও খুন হবে না, তবে অরুণের সঙ্গেসঙ্গে ওর পরিবারের সকলেরও মানসিক ভারসাম্য ফিরে আসবে।

অরুণের হাত দেখে বললাম, "তোর রক্তপাতের কারণ মঙ্গল। তুই, ডান হাতে একটা ২৫ থেকে ৩০ গ্রাম ওজনের তামার বালা পর। বালাটা যে কোন চেনা সোনার দোকানে বললে বানিয়ে দেবে। কয়েকটা কথা স্পষ্ট মনে রাখবি। (১) বালাটা বানাতে দোকানদার যে দাম চাইবে, সেই দামই দিবি। কোন দরদাম করবি না। (২) বালাটা শোধন করিয়ে আগামী মঙ্গলবার ভোরে সূর্য ওঠার সঙ্গেসঙ্গে স্নান করে ডান হাতে পারবি। (৩) বালাটার ওজন কম হলে কাজ হবে না। কিন্তু বেশি হলে বালাটা পরার পর সারা শরীরে যেন বিদুৎ খেলে যাবে, গা প্রচণ্ড গরম হয়ে উঠবে।

সেদিনই বাড়ি ফেরার পথে পাড়ার সেকরার কাছে তামার বালা বানাতে দিয়ে গেল অরুণ। তারপর বোধহয় দিন-দু'য়েক পরেই একদিন আমাকে বালাটা দেখাল। বলল, "ঠিক আছে?"

বললাম, "বালাটা খাঁটি তামার বটে, কিন্তু ওটার ওজন তো মনে হচ্ছে অনেক বেশি। তুই ওজন দেখে নিসনি?"

অরুণ বলল, "না, নেওয়ার সময় আর ওজন দেখে নিইনি। ঠিক আছে, আজই যাওয়ার পথে দোকান থেকে ওজনটা জেনে যাব। আজ রাতে বালাটা শোধন করে নেব, কালই তো পরব।"

পরের দিন অরুণ অফিসে এলো ঝোড়ো কাকের মতো। বালাটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। বালার বাঁকানো, জোড়া না লাগানো মুখের কাছটা এমনভাবে হাঁ হয়ে আছে যে, বুঝতে অসুবিধে হয় না, বালাটা যথেষ্ট শক্তি ব্যয় করে হাত থেকে তাড়াতাড়ি খোলা হয়েছে।

অরুণ যা বলল, তাতে জানতে পারলাম, কাল সোনার দোকানে বালাটা ওজন করিয়ে দ্যাখে, ওটা প্রায় ৪৫ গ্রামের। রাতে শোধন করিয়ে সকালে পরেছে। তারপর বেরিয়ে পড়েছে অফিসে। ট্রেনে ওঠার পর সারাগায়ে কেমন একটা জ্বালা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শরীর গরম হয়ে উঠতে থাকে, অসহ্য গরম। সেই সঙ্গে গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে ওঠে, শিরশির করে ওঠে। গোটা শরীরটায় যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। অরুণের বুঝতে অসুবিধে হয় না, এই সবই বেশি ওজনের

তামা ধারণের ফল। ট্রেনে বালাটা খুলে ফেলার কিছুক্ষণের মধ্যে আবার শরীর স্বাভাবিক হয়!

অরুণের এই শরীর খারাপ হওয়ার পেছনে বেশি ওজনের তামার কোনও কার্যকর ভূমিকা ছিল না। গোটা ব্যাপারটাই ছিল মনস্তাত্ত্বিক। আমার কথার ওপর অন্ধ-বিশ্বাসের দরুনই এমনটা ঘটেছে। অরুণের মস্তিষ্ক কোষে যে ধারণা আমি সঞ্চার করেছিলাম তারই ফলে অরুণের শরীর এইসব অস্বাভাবিক আচরণ করেছে।

অরুণের মনের ভুল ধারণাটা ভাঙার দরকার ছিল। ১৯৯০ সালে ওকে বইটি উপহার দিই। অরুণ সব জানার পরও ঠিকঠাক আছে।

ফোটো-সম্মোহন কি সম্ভব?

আজকাল পঞ্জিকার ব্যবহার কিছুটা কমে গেছে। আমাদের ছোটবেলায় পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন পড়ে বেশ মজা পেতাম। তাতে কত যে অদ্ভুত সব বিজ্ঞাপন থাকত তার ইয়ত্তা নেই। এখনও থাকে। ফোটো-সম্মোহনের বিজ্ঞাপন এখনও পঞ্জিকা খুললে চোখে পড়বে। সে'সব বিজ্ঞাপনের ভাষাও বিচিত্র—"আপনি কি ভালবাসায় ব্যর্থ হয়ে বেঁচে থাকার আনন্দ হারিয়েছেন? ফোটো সম্মোহনের সাহায্য নিন। দেখবেন, যিনি আপনাকে দূর দূর করেছেন, তিনিই আপনার হুকুমের চাকর হয়ে গেছেন, আপনার বিরহে ছটফট করছেন।"

ফোটো-সম্মোহন করার ব্যাপারটা কী? আপনি যাকে সম্মোহিত করে হুকুমের চাকর করতে চান, তার একটা ছবি আর মোটা টাকা দক্ষিণা তুলে দিন যে সম্মোহন করবেন, তাঁর হাতে। তাহলেই নাকি যার ছবি সে আপনার হুকুমের দাস, আপনার ভালবাসায় পাগল হয়ে যাবে।

ফোটো-সম্মোহন করতে পারেন, এমন দাবি যাঁরা করেন, তাঁদের মধ্যে খ্যাতি বা কুখ্যাতির শীর্ষে আছেন হাওড়ার জানবাড়ির পাগলাবাবা, প্রাক্তন লেকটাউন নিবাসী গৌতম ভারতী।

ফোটো-সম্মোহন একটি আগাপাশতলা প্রতারণা বই কিচ্ছু নয়। গৌতম ভারতীর ফোটো সম্মোহনের বুজরুকি ফাঁস করেছিলাম। তারপর সে এক বিশাল ব্যাপার। গৌতমের মিথ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার, বিজ্ঞাপনের মিথ্যেচারিতা ফাঁস, সাময়িক ভারসাম্য হারিয়ে গৌতমের আত্মহত্যার চেষ্টা (গোটা ঘটনাটাই লিখেছি 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে)।

ফোটো-সম্মোহনের বুজরুকি নিয়ে 'আলোকপাত' বাংলা মাসিক পত্রিকায় আমার কিছু চাঁছাছোলা বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর একজন আমাকে চ্যালেঞ্জ জানালেন। চ্যালেঞ্জারের নাম : কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী। নিবাস : বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া। 'আলোকপাত' এর ১৯৮৮-র জানুয়ারি সংখ্যায় কাজী সাহেব ঘোষণা

করলেন—"প্রবীরবাবু যদি তাঁর পরিচিত কোন নারীকে প্রকৃতই বিয়ে করার ইচ্ছে থাকে তাহলে কোন ছবি-টবি নয়, শুধুমাত্র কয়েকটি প্রকৃত তথ্য দিলেই হবে। তথ্যগুলো অবশ্যই অপার্থিব নয়। যদিও তিনি ফোটো-সম্মোহন বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করেছেন তবুও তিনি আগ্রহী হলে তাঁর এ প্রক্রিয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি।"

চ্যালেঞ্জের অর্থ মূল্য আমার তরফ থেকে তখন ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে চিঠি দিলাম। জানালাম, আমি বিবাহিতা। আমার চিকিৎসক বন্ধু অনিরুদ্ধ কর অবিবাহিত। তাঁর মনের মত মেয়েটিকে জীবনসঙ্গিনী করে দিলে হার মেনে নেব। মেয়েটির বিষয়ে অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং জানা সম্ভব, এমন সব তথ্যই দেব, এমনকি বাড়তি দেব মেয়েটির ছবি।

অনিরুদ্ধ আমাকে বলেছিলে, "মেয়েটিকে পছন্দ করার পর কাজী সাহেব যদি সেই মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগ করে ওর হাতে পায়ে ধরে আমার সঙ্গে বিয়ে ঘটিয়ে দেয়?"

বলেছিলাম, "আপনার শ্রীদেবী, রেখা অথবা এদের চেয়েও দুর্লভ মেয়েকে বিয়ে করতে কোনও আপত্তি নেই তো?"

অনিরুদ্ধ প্রাণখোলা হাসি হেসে বলেছিলেন, "কাজী সাহেব আপনার চিন্তার হদিশ পেলে চ্যালেঞ্জ জানাবার দুঃসাহস দেখাতেন না।"

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি—সম্মোহন করে হুকুমের দাস বানানো বাস্তবে সম্ভব নয়! ও'সব বিজ্ঞাপনে আর গল্পে হয়।

অধ্যায় : সাত

সম্মোহন কীভাবে করবেন?

সম্মোহন কীভাবে করবেন—তা জানার আগে সম্মোহন নিয়ে আরও একটু আলোচনা করে নিলে ভালো হয়।

আমরা চিন্তা করি মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের সাহায্যে। অর্থাৎ, আমাদের চিন্তা-ভাবনা হলো মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের কাজ-কর্মের ফল। 'সম্মোহন' হলো মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষে কোনও একটা ধারণাকে সঞ্চারিত করা বা পাঠান। এ'কথা আগেই আলোচনা করেছি।

মনে করুন টিভি'তে 'জুরাসিক পার্ক' দেখছেন। দেখতে দেখতে এতটাই মগ্ন যে, বাইরের জগতের সঙ্গে আপনার চেতনার সম্পর্কটা গেছে ছিন্ন হয়ে। সমস্ত চিন্তাচেতনা জুড়ে শুধু ছবির জগৎ, ডাইনোসরদের ঘিরে রোমাঞ্চকর সব কাণ্ডকারখানা। মা কাঁধ ধরে ধাক্কা দেওয়ায় মগ্নতা ভঙ্গ হলো। "কি রে? তখন থেকে কলিংবেল বেজে যাচ্ছে হুঁশ নেই যা, তলায় গিয়ে দরজাটা খুলে দিয়ে আয়।"

মা'র কথাগুলো শুনতে শুনতেই কানে আসতে লাগলো কলিংবেলের আওয়াজ। আশ্চর্য! অথচ মা'র কাছ থেকে ধাক্কা খাওয়ার আগেও এই আওয়াজ হচ্ছিল। কিন্তু খেয়ালই করতে পারেননি। টিভির দিকে গভীর মনঃসংযোগের জন্যে টিভির বাইরের জগতের সঙ্গে মনের যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ার পরিণতিতেই এমনটা হয়েছে।

মনে করুন ফুটবল খেলার দিনগুলোর কথা। খেলা শেষ হওয়ার পর একসময় আপনার খেয়াল হয়েছে পায়ের ক্ষতের দিকে। খেলার দিকে মনোযোগ এতটাই ছিল যে তখন এই আঘাতের কথা খেয়ালই হয়নি। তারপর পায়ে ব্যথা অনুভব করায় এতক্ষণে নজরে এসেছে ক্ষত।

এই যে দু'টি উদাহরণ হাজির করলাম, তার থেকে একটা জিনিস নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন; কোনও কিছুতে গভীরভাবে মনঃসংযোগ করলে পারিপার্শ্বিক অপরাপর বিষয়ে মনঃসংযোগ শিথিল হয়।

সম্মোহন করার সময় একজন সম্মোহন করে এবং অপরজন সম্মোহিত হয়।

দু'জনেরই গভীর মনঃসংযোগের প্রয়োজন হয়। সে মনঃসংযোগ সম্মোহিতের জ্ঞাতসারে না হয়ে অজ্ঞাতসারে হতে পারে। কিন্তু মনঃসংযোগহীন সম্মোহন কখনই সম্ভব নয়।

'অজ্ঞাতসারে মনঃসংযোগ' কথাটা শুনে যাঁরা হোঁচট খেয়েছেন, ওঁদের বিষয়টা বোঝাতে একটি উদাহরণ হাজির করছি।

সম্মোহনে আত্মা এলো 'সানন্দা'য়

বছর কয়েক আগের ঘটনা। 'সানন্দা' একটি বিখ্যাত পাক্ষিক পত্রিকা। পত্রিকার দপ্তরে গিয়েছি। যেতেই সম্পাদক সংযোগী দীপান্বিতা জানালেন, আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনি 'প্ল্যানচেট' নিয়ে। তুমি ওসব মান না বলে তোমাকে কাজে লাগাচ্ছি না। বুঝলাম, প্ল্যানচেটের ব্যাপারটা পাঠক-পাঠিকাদের খাওয়াতে চাইছেন ওঁরা। তাই প্ল্যানচেট বিরোধিতার কথা ছেপে জনগণের অন্ধ আবেগের উত্তেজনায় ঠাণ্ডা জল ঢালতে নারাজ। আমার একটা দুষ্টুবুদ্ধি মাথায় খেলে গেল। বললাম, "না না, প্ল্যানচেটে বিশ্বাস করব না কেন? প্ল্যানচেট তো হয়ই। আমি নিজেই তো প্ল্যানচেট করি।"

শুনে অবাক দীপান্বিতা বললেন, "প্ল্যানচেট করে দেখাবে?"

"কেন দেখাব না। নিশ্চয়ই দেখাব।"

"কবে?"

"বললে আজই, এখুনি, এ ঘরেই দেখাতে পারি।"

সম্পাদকের ঘরে বসল সম্মোহনের বৈঠক। ঘরে জনা দশেক সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিক। প্ল্যানচেট করতে 'মিডিয়াম' দরকার। 'মিডিয়াম' অর্থাৎ যাঁর মাধ্যমে আত্মা উত্তর দেবে। 'মিডিয়াম' হলেন নিবেদিতা মজুমদার। একটা কাগজে যোগ চিহ্ন এঁকে যোগ চিহ্নের কেন্দ্রে সুতোয় আংটি ঝুলিয়ে বসলেন নিবেদিতা। যোগ চিহ্নের দুই বিপরীত দিকে 'হ্যাঁ' ও 'না' লেখা। নিবেদিতার উল্টো দিকের চেয়ারে বসলাম আমি। ঘরে স্বল্প আলো। উত্তেজিত কিছু মানুষ অদ্ভুত কিছু দেখার আগ্রহে চুপ।

কার আত্মা আনা হবে? সাংবাদিকরা চাইলেন উত্তমকুমার। আমি নিবেদিতার উদ্দেশে বলতে লাগলাম—"একমনে ভাবতে থাকুন উত্তমকুমারের কথা। গভীরভাবে ভাবতে থাকুন। যোগ চিহ্নের কেন্দ্র বিন্দুর দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকুন। উত্তমকুমারের আত্মা নেমে আসবেনই। আত্মা নামলেই আংটিটা আপনা আপনি দোল খেতে থাকবে।"

কথাগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একনাগাড়ে ধীরে ধীরে, গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে আমি বলে যাচ্ছিলাম। মিনিট দু'য়েকও পার হয়নি, আংটি দুলতে লাগলো। সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে বললাম, "উত্তমকুমারের আত্মা এসে গেছেন। আপনারা এমন প্রশ্ন

করুন, যার উত্তর 'হ্যাঁ' ও 'না' তে হয়। আত্মা আংটিটাকে স্পষ্টভাবে 'হ্যাঁ' বা 'না'-এর দিকে দোলাতে দোলাতে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন।"

প্রশ্ন শুরু হলো। প্রশ্ন করছিলেন সাংবাদিক বন্ধুরা। আংটি পেন্ডুলামের মতো দুলতে দুলতে কখনও 'হ্যাঁ', কখনও বা 'না'য়ের উপর দোল খেতে খেতে উত্তর দিতে লাগল।

এমসময় 'মিডিয়াম' পাল্টাতে হল নিবেদিতা বেহুঁশের মতো হয়ে যাওয়ায়। সাংবাদিকদের দাবিতে এ'বার মিডিয়াম হলেন সুদেষ্ণা রায়। প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা। একইভাবে আংটি বাঁধা সুতো ধরলেন। এলেন সত্যজিৎ রায়ের আত্মা। আবার প্রশ্নবাণ। আবার আংটির উত্তরদান। একসময় দীপান্বিতা জিজ্ঞেস করলেন, "আত্মাকে দিয়ে রাইটিং প্যাডে লেখানো যাবে না?"

বললাম, "নিশ্চয়ই যাবে।"

রাইটিং প্যাড এলো। প্যাডে ডটপেন ঠেকিয়ে 'মিডিয়াম' হিসেবে সুদেষ্ণা আবার রাজীব গান্ধীর আত্মার আগমন কামনা করতে লাগলেন। আমি ধীর ও প্রত্যয়ী স্বরে বলে যাচ্ছিলাম, "গভীরভাবে ভাবতে থাক রাজীব গান্ধীর আত্মা আসছে। পেনের ডগার দিকে তাকিয়ে থেকে গভীরভাবে ভাবতে থাক। আমি এই যে ধারণা সঞ্চার করছিলাম, বা 'সাজেশন' দিচ্ছিলাম তা কিন্তু বেশিক্ষণ দিতে হল না। মাত্র মিনিট দু'য়েক। পেন কাঁপতে লাগল। আবার সাংবাদিকদের প্রশ্নবাণ। এবার প্রশ্নের উত্তরগুলো আসতে লাগল লিখিতভাবে।

অনেক ছবি-টবি উঠল, এবং প্ল্যানচেট পর্ব শেষ হতে রহস্য ভাঙলাম। আমি নিবেদিতা ও সুদেষ্ণার মনে ধারণা সঞ্চারিত করেছিলাম আত্মাকে গভীরভাবে ভাবতে থাকলে আত্মা আসবেন এবং উত্তর দেবেন। দু'জনের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমাকে অতি বিশ্বাসযোগ্য মানুষ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। দু'জনের মনেই সচেতন বা অচেতনভাবে আত্মার অমরত্ব নিয়ে একটা বিশ্বাস বা দ্বিধা ছিল। এ'সবের ফলস্বরূপ দু'জনেই সম্মোহিত হয়ে আংটি দুলিয়েছেন, লিখেছেন। এঁরা কেউই সচেতনভাবে বা জ্ঞাতসারে এ'সব উত্তর দেননি। অবচেতন বা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই গভীরভাবে মনঃসংযোগ করেছিলেন বলেই এমনটা ঘটেছিল।

একইভাবে যাকে সম্মোহিত করছেন, তাকে যদি বলেন, "একমনে শুধু আমার কথাই শুনবে" এবং যে যদি আপনার নির্দেশ মেনে আপনার কথা গভীরভাবে শুনতে থাকে, তবে একসময়ে বাইরের কোনও শব্দ, কোনও আওয়াজ আর তার চিন্তাকে প্রভাবিত করতে পারবে না। কী যা বলতে পার, বাইরের জগতের শব্দ এবং সমস্ত চিন্তা থেকেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। বাইরের জগতের সঙ্গে তখন একমাত্র যোগসূত্র থাকে যিনি সম্মোহিত করছেন তিনি। এই সময়ে যিনি সম্মোহিত করছেন। তিনি যদি বলতে থাকেন (ধারণা সঞ্চারিত করতে থাকেন) শরীরের

কোনও একটি অঙ্গ অসাড় হয়ে যাচ্ছে, তবে একসময় অসাড়ই হয়ে যায়।

সম্মোহন নিয়ে নানা ভুল ধারণা

৯ জানুয়ারি '৯৬। গতকাল একটি দৈনিক পত্রিকায় লেখা জমা দিতে গিয়েছিলাম। লেখাটি পেতেই সম্পাদক পড়তে দিয়ে দিলেন এক সম্পাদক সহকারীকে। বিষয়—'সম্মোহন'। লেখাটি হাতে নিয়ে এ'বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার আমার কাছে উপুড় করে দিতে বললেন "এ তো জানি-ই। সম্মোহন ব্যাপারটাই তো বুজরুকি।"

তাঁর মারাত্মক জানার পরিচয়ে চম্‌কে উঠলাম। বললাম, "সম্মোহন ব্যাপারটা কেন বুজরুকি হতে যাবে। যে সব মনোরোগ চিকিৎসক পাভলভিয়ান পদ্ধতিতে মনোরোগের চিকিৎসা করেন, তাঁরা সম্মোহনের সাহায্য নেন।

জাদুকরেরা সম্মোহনের নামে বুজরুকি করেন বলেই অনেকেই 'সম্মোহন' ব্যাপারটাকে 'বুজরুকি' বলে ভুল করেন।"

'সম্মোহন' সম্বন্ধে দু-দল মানুষের মধ্যে দুটি প্রচলিত ধারণা রয়েছে। এক, জাদুকররা সম্মোহন জানেন এবং জাদু দেখাতে সম্মোহন প্রয়োগ করেন। দুই, 'সম্মোহন' ব্যাপারটা 'অস্তিত্বহীন কল্পনা', 'বুজরুকি'। দুটি ধারণাই ভুল।

ইভান পেত্রভিচ পাভলভ-এর গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু ছিল 'Conditioned reflex' বা 'শর্তাধীন প্রতিফলন'। পরিপাকগ্রন্থি নিয়ে কাজ করতে করতে পাভলভ শর্তাধীন প্রতিফলনের সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। যে শর্তাধীন প্রতিফলন গবেষণার হাত ধরে বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। পাভলভ ১৯০৪ সালে 'ফিজিওলজি অ্যান্ড মেডিসিন' বিভাগে নোবেল পুরস্কার পান তাঁর গবেষণা কর্মের জন্য।

প্রাক-সম্মোহন প্রস্তুতি

সম্মোহন করার আগে যাকে সম্মোহিত করব, তাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নেওয়াটা খুবই জরুরি। যখন কোনও সভায় বা সেমিনারে সম্মোহন করি, তখন সম্মোহন নিয়ে একটা মোটামুটি আলোচনা সেরে নিই। এই আলোচনা সাধারণত চলে আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা পর্যন্ত। বিপুল শ্রোতা ও দর্শকদের সামনে কয়েকজনকে সম্মোহন করে দেখাবার আগে এই সময়টা ব্যয় করা প্রয়োজনীয় বলে আমার মনে হয়। কারণ আলোচনা শেষে দর্শকদের কাছে আমি আবেদন রাখি, যাঁরা বাস্তবিকই সততার সঙ্গে আমার কথা বা 'সাজেশন' গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনবেন, তাঁরা মঞ্চে উঠে আসুন।

উঠে আসাদের মধ্যে থেকেই প্রথম আসা দু-তিনজনকে প্রথম দফায় বেছে নিই। সভার সময়, দর্শকদের মুড ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে কত রকমের সম্মোহন দর্শকদের সামনে হাজির করব, তা ঠিক করি। তারপর প্রয়োজন মতো দফায় দফায় কয়েকজন করে দর্শককে মঞ্চে ডেকে নিই।

ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্যে যখন কাউকে সম্মোহন করার প্রয়োজন হয় তখন তাঁর সঙ্গে সম্মোহন বিষয়ে কিছু আলোচনা সেরে নিই। উদ্দেশ্য :

(ক) সম্মোহন সম্পর্কে অলীক ভয় দূর করা।

(খ) সম্মোহনের কার্যকারিতা ও উপকারিতা।

(গ) সম্মোহনের ক্ষেত্রে রোগীর চূড়ান্ত মনোযোগ ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা।

প্রয়োজনে দু-একটি সম্মোহনের ঘটনার উল্লেখ করতে হয়। আর এই প্রয়োজনটা সাধারণভাবে হয় সেমিনার বা সভায়।

এটা গেল যাকে সম্মোহিত করব, তাকে মানসিকভাবে তৈরি করার প্রথম ধাপ। এবার আসছি দ্বিতীয় ধাপে।

রোগীর ক্ষেত্রে যে'ভাবে সাজেশন দেওয়া হয়

রোগীদের সাজেশন দেওয়ার বেলায় সাধারণত তাঁকে সুন্দর ও আরামদায়ক বিছানায় শোবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। ঘরের জোরালো আলো নিভিয়ে দিয়ে জ্বেলে দেওয়া হয় নাইট ল্যাম্প। নাইট ল্যাম্প এমনভাবে লাগানো দরকার, যাতে সম্মোহিত বিছানায় শুয়ে চোখ মেলার পর বাল্বটি দেখতে না পায়। খুব লো ভলিউমে উত্তেজক নয়, মনকে আরাম দেওয়ার মতো বাজনার ক্যাসেট চালাবার ব্যবস্থা রাখতে পারলে আরও ভাল হয়।

যাঁকে সম্মোহিত করা হবে, তাঁকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে প্রথম ধাপ অতিক্রম করুন। দ্বিতীয় ধাপে বলুন, "আমি আপনাকে 'সাজেশন' দেব। অর্থাৎ কিছু কথার বলব। আপনি খুব মন দিয়ে কথাগুলো শুনতে থাকবেন। এই শোনার ফলে আপনার মধ্যে একটা আধা-ঘুম আধা-জাগরণের অবস্থা তৈরি হবে। তারপর আপনার সমস্যা মেটাতে সাজেশন দেব। সমস্যা মিটে যাবে।"

রোগী বিছানায় আরাম করে শুলেন। পুরুষ হলে ট্রাউজারে সার্ট গোঁজা থাকলে সার্টটা ট্রাউজার থেকে বের করে নিতে বলুন। কোমরে বেল্ট থাকলে খুলতে বলুন। খুলে ফেলতে বলুন ঘড়ি, চশমা ইত্যাদি। ট্রাউজার কোমরে টাইট হলে বোতাম খুলে হালকা হয়ে শুতে বলুন।

মেয়েদের ক্ষেত্রে শাড়ি, সালোয়ার বা প্যান্ট কোমরে টাইট হলে হালকা করে পরতে বলুন। ব্রা ঢিলে করতে বলুন। ঘড়ি, চশমা ইত্যাদি একইভাবে খুলে রাখতে বলুন। মেয়েদের ক্ষেত্রে কোনও পুরুষ সম্মোহিত করতে চাইলে ঝুঁকি না নিয়ে

মহিলার কোনও সঙ্গীকে ঘরে বসাবার ব্যবস্থা করুন। নতুবা ভয় বা অস্বস্তির জন্য আপনার কাছে মহিলাটির স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশ কিছুটা কম থাকে। এছাড়াও মহিলার তরফ থেকে কোনও অভিযোগ এড়াতে সঙ্গীকে ঘরে রাখা জরুরি।

বড় লাইট বন্ধ করে নাইট ল্যাম্প জ্বেলে দিন। বাজিয়ে দিন খুব লো ভলিউমে মনকে প্রশান্ত করার মতো বাজনা। তারপর শুরু করুন সাজেশন দেওয়া। প্রতিটি বাক্য চার-পাঁচ বার করে ধীরে, সামান্য টেনে, গভীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ গলায় বলে যেতে থাকুন।

সাজেশনের বাক্যগুলো এই ধরনের :

"একমনে এবার আপনি আমার কথাগুলো শুনতে থাকুন। আপনার ঘুম পাচ্ছে। ঘু...ম। চোখের পাতায় নেমে আসছে ঘুম। চোখের পাতাগুলো ভারী হয়ে আসছে। আপনি ঘুমিয়ে পড়ছেন। এ'ভাবে চিন্তা-শূন্য হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে আপনার ভাল লাগছে। আপনার কপালের চিন্তার রেখাগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে। কপালের পেশীগুলো নরম, শিথিল হয়ে যাচ্ছে। আপনার গালের পেশী নরম, শিথিল হয়ে যাচ্ছে। আপনার চোয়ালের পেশী নরম, শিথিল হয়ে যাচ্ছে। আপনি ঘুমিয়ে পড়ছেন। ঘু...ম।"

"আপনার চোখের পাতা ভারী হয়ে গেছে। দু'চোখের পাতায় নেমে আসছে ঘুম। আপনার ডান কাঁধটা নিয়ে ভাবুন। ডান কাঁধের পেশী শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে। আপনার ডান কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত পেশীগুলো শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে। ডান হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত ভাবুন। কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত পেশীগুলো শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে। হাতের তালু ও আঙুলগুলোর পেশী শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে। ডান হাতটা ভারী হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। ডান হাতটা ভারী হয়ে গেছে।"

একইভাবে বাঁ কাঁধ থেকে সাজেশন দেওয়া শুরু করে হাত ভারীতে শেষ করুন।

"আপনার বুকের কথা ভাবুন। বুকের পেশীগুলো শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে।"

"আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ ধীরে ও গভীরভাবে হচ্ছে। আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। এভাবে চিন্তা-শূন্য হয়ে ঘুমোতে আপনার ভাল লাগছে।"

"আপনার পেটের পেশীগুলো শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে।"

"ডান পায়ের থাইয়ের পেশী নিয়ে ভাবতে থাকুন। থাইয়ের পেশী শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে। ডান পায়ের কাফের পেশী নিয়ে ভাবুন। পেশীগুলো শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে। ডান পায়ের পাতা ও আঙুলগুলোর পেশী শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে। ডান পা'টা ভারী হয়ে যাচ্ছে। ভারী হয়ে বিছানার উপর পড়ে আছে।"

একইভাবে বাঁ পা নিয়ে সাজেশন দিতে থাকুন।

সাজেশন শেষে বাস্তবিকই যদি পরীক্ষা করতে চান—সম্মোহন করতে পেরেছেন কি না, তবে এই ধরনের সাজেশন দিন :

"আপনার ডান হাতটায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে বিরাট একটা গ্যাসবেলুন। গ্যাসবেলুনের টানে আপনার ডান হাতটা হালকা মনে হচ্ছে। ডান হাতটা একটু একটু করে ওপরে উঠছে।"

দেখতে পাবেন—সাজেশনের সঙ্গেসঙ্গে সম্মোহিতের ডান হাত বিছানা ছেড়ে একটু একটু করে উপরে উঠে যাচ্ছে।

এ'বার আমরা আসব বিভিন্ন রোগ বা সমস্যায় সাজেশনের রকম-ফের প্রসঙ্গে।

সাজেশনের রকম-ফের

সম্মোহিত করা তো শেখানো গেল। কিন্তু কেন সম্মোহিত করা? কোনও সমস্যা সমাধানের জন্যে? তাহলে সম্মোহিতকে প্রয়োজনীয় 'সাজেশন' দিতে হবে। নাকি শুধুই সম্মোহন নিয়ে খেলা? খেলা হলে, কিছুক্ষণ সম্মোহিত অবস্থায় রাখার পর সাজেশন দিতে থাকুন—"আপনার ঘুম ভাঙছে।"

সাজেশনে ঘুম না ভাঙলে বুঝবেন ঘুমটা একটু কড়া হয়ে গেছে। তালি বাজান বা দু'আঙুলে চুট্‌কি বাজান এবং সঙ্গে ঘুম ভাঙার সাজেশন দিন। সম্মোহন অবস্থা থেকে রোগী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবেন।

অধ্যায় : আট

ঈশ্বর দর্শন ও ভ্রান্ত অনুভূতির রকমফের

বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ধর্মীয় বহু সাধকদের সম্বন্ধেই প্রচলিত আছে, তাঁরা ঈশ্বরের দেখা পেয়েছেন। যাঁরা ঈশ্বর দেখেছেন বা ঈশ্বরের বাণী নিজের কানে শুনেছেন বলে দাবি করেন, মনোবিজ্ঞানের চোখে তাঁরা মানসিক রোগী মাত্র। ঠিকমতো চিকিৎসা হলে তাঁদের এই ধরনের মানসিক ভ্রান্তি কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাঁরা আবার ফিরে আসতে পারেন সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এই ধরনের ভ্রান্ত অনুভূতিকে বলা হয় 'illusion' 'hallucination', 'delusion', ও 'paranoia' ইত্যাদি। মনোবিজ্ঞান কিন্তু একজন মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু কোষকে নিস্তেজ রেখে hallucination (হ্যালুসিনেশন) বা delusion (ডিলিউশন)-এর অবস্থা সৃষ্টি করে ঈশ্বরের দেখা পাওয়া, ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার অনুভূতি তৈরি করতে পারে।

মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জেমস ওল্ড্‌স্, সুইজারল্যাণ্ডের প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ডঃ ওয়াল্টার হেজ, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জে. ডেলাগাজো সহ বিশ্বের বহু মনোবিজ্ঞানী এবং এই লেখক বহু মানুষের মনে ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বরের কথা শোনার অনুভূতি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন।

এঁরা প্রমাণ করেছেন, বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়ুকোষে উত্তেজনা ও নিস্তেজ অবস্থার সৃষ্টি করে আধ্যাত্মিক অনুভূতি আনা সম্ভব, একইভাবে সম্ভব প্রেম, ঘৃণা, ভয় ও সাহসের অনুভূতি তৈরি করা। আবার ধারণা সঞ্চারের সাহায্যেও এমন অবস্থা তৈরি করা সম্ভব।

Illusion (ভ্রান্ত অনুভূতি)

অভিধানে illusion ও delusion এর অর্থ দেওয়া আছে, 'মোহ' এবং 'ভ্রান্তি'। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে illusion, hallucination ও delusion প্রতিটি কথাই ভিন্ন

ভিন্ন অর্থ বহন করে।

মনোবিজ্ঞানে illusion হচ্ছে, কোন বস্তু প্রকৃতপক্ষে যা, তাকে সেইভাবে উপলব্ধি না করা। একটা সোজা হাতলের চামচের কিছুটা অংশ জলে ডুবিয়ে রাখলে সোজা চামচটা আর সোজা দেখায় না। দেখলে মনে হয় চামচটা বেঁকে আছে। আমাদের দর্শানুভূতি ভুল করছে। ছবি ১ দেখুন।

ছবি– ১

ছবি ২ দেখুন। এখানে যে চারটি দীর্ঘ রেখা দেখা যাচ্ছে সেগুলোকে দেখলে বাঁক মনে হলেও চারটি দীর্ঘ রেখাই সরল—সমান্তরাল।

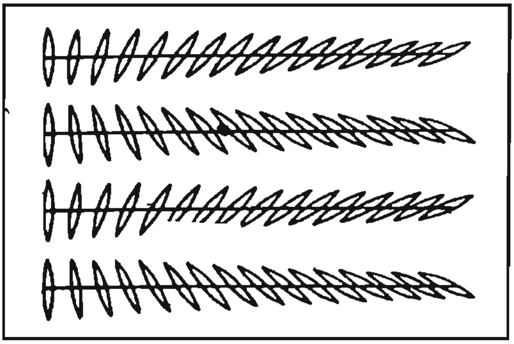

ছবি– ২

ছবি ৩ দেখুন। চারটি অক্ষরই বাঁকা বলে আমাদের দৃষ্টিতে মনে হলেও বাস্তবে প্রতিটি অক্ষরই খাড়া।

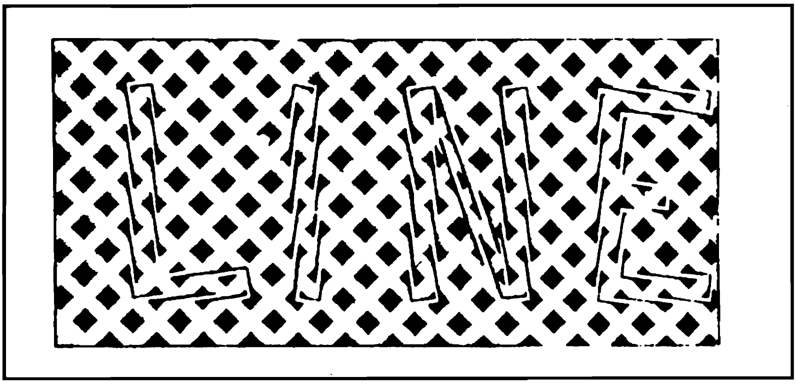

ছবি– ৩

ছবি ৪ দেখুন। বক্ররেখাগুলো দেখলে কুণ্ডলী বলে মনে হচ্ছে। বাস্তবে বক্ররেখাগুলো বৃত্ত।

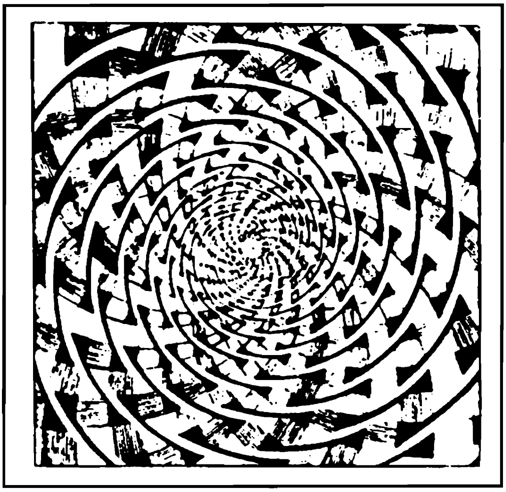

ছবি– ৪

১৯৯১ সালের অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহের একটা ঘটনা বলছি। আমার স্ত্রী সুমি চেয়ারে বসে বই পড়ছে। ডাইনিং টেবিলের আর একটা চেয়ারে বসে ছেলে পিংকি মেতে রয়েছে এর কার্টুন সিরিজ 'বার্ডম্যান' আঁকা নিয়ে। আমি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে রেডিওতে সংকর্ষণ রায়ের বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প শুনছিলাম। সুমি পড়তে

পড়তেই একটা চড় বসাল কাঁধে। মুখে বলল, "মশা বেড়েছে।"

একটু পরেই দেখলাম পিংকি উঠে দাঁড়াল। আর তার একটু পরেই সুমি আবার চাপড় বসাল ঘাড়ের নীচে। পিংকি হো-হো করে হেসে উঠল। সুমি বলল, "দেখলে, তোমার ছেলে কেমন দুষ্টু হয়েছে?"

আসল ঘটনা ছিল, পিংকি ওর মায়ের ঘাড়ের নীচে আলতো করে আঁকার তুলিটা ছুঁইয়েছে। তুলির ছোঁয়াকে মশার উপস্থিতি ভেবে সুমি চড় চালিয়েছে। এটা স্পর্শানুভূতির ভ্রান্তি।

মরুভূমিতে অনেক সময় দূর থেকে বালিকেই জল বলে ভুল হয়। এটা দর্শানুভূতির ভ্রমের উদাহরণ।

১৯৮৪-র ডিসেম্বরের শীত শীত সন্ধ্যায় ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ করে লিখতে বসেছি, হঠাৎ 'ঘেউ ঘেউ' 'ঘেউ ঘেউ' একটানা চিৎকারে বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে বারান্দায় বেরোলাম, কী ব্যাপার হঠাৎ এত কুকুরের চেঁচামেচি? দেখি না 'ঘেউ ঘেউ' নয়, ভোটের মিছিল বেরিয়েছে, তারাই চেঁচাচ্ছে 'ভোট দিন'। 'ভোট দিন' শব্দটাই 'ঘেউ-ঘেউ' হয়ে আমার কানে পৌঁছচ্ছে। শ্রবণানুভূতির ভুলে এমনটি হয়েছে।

আপনি হয়ত সকালবেলায় চায়ের কাপটা নিয়ে ইজিচেয়ারে বসে আয়েস করে খবরের কাগজটা পড়ছেন। পড়ছেন আপনার প্রিয় দলের ফেডারেশন কাপ জেতার বিবরণ, এমনি সময় গিন্নি বাজারের ব্যাগটা নিয়ে এসে হাজির হলেন। বললেন, "আজ কিন্তু চা আনতে হবে। দুশো গ্রামের একটা হলুদ গুঁড়ো আনবে।"

আপনার পড়ায় মন দিতে অসুবিধা হচ্ছে। বললেন, "আর কিছু লাগবে না তো? ঠিক আছে ব্যাগ এখানেই—"

কথা শেষ করতে পারলেন না। লাফিয়ে উঠলেন শিরশিরে এক আতঙ্কে। খোলা কাঁধের ওপর কী যেন একটা—বিছে নয় তো? চলকানো চায়ের কাপটা ইজিচেয়ারের সামনে রাখা টুলটায় নামিয়ে রেখে প্রায় লাফাতে লাফাতে ডান হাত দিয়ে কাঁধটা ঝেড়ে ফেলতেই মেঝেতে পড়ল এক টুকরো সুতো। গিন্নির হাত থেকে বা ব্যাগ থেকে কাঁধে পড়েছে। স্পর্শানুভূতির ভ্রান্তিতে আপনি সুতোকেই ভেবেছিলেন বুঝি বিছে।

এই ধরনের ভ্রম স্বাদগ্রহণের অনুভূতি ও ঘ্রাণানুভূতির ক্ষেত্রেও হতে পারে।

পঞ্চেন্দ্রিয়কে ভিত্তি করে বা ভ্রান্তিকে (illusion) পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে—১. দর্শানুভূতির ভ্রম (optical illusion অথবা visual illusion), ২. শ্রবণাভূতির ভ্রম (auditory illusion), ৩. স্পর্শানুভূতির ভ্রম (talctile illusion), ৪. ঘ্রাণানুভূতির ভ্রম (offactory illusion), ও ৫. স্বাদগ্রহণের বা জিহ্বানুভূতির ভ্রম (taste illusion)

Hallucination (অলীক বিশ্বাস)

অভিধানে hallucination কথার বাংলা অর্থ দেওয়া আছে 'অলীক কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস'। অলীক বা অস্তিত্বহীন কোন কিছু সম্পর্কে অনুভূতি লাভ করাকেই মনোবিজ্ঞানের ভাষায় hallucination বলা হয়। অতএব, hallucination এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'অলীক বিশ্বাস' কথাটাই আশা করি ঠিক হবে।

ধরে নিলাম, রামবাবু পুজো-আর্চা করেন। অফিস যাওয়ার আগে স্নানটি সেরে ঠাকুরপুজো করে খেতে বসেন। সেদিন শনিবার, কালীর ছবিতে অপরাজিতার মালা পরিয়ে প্রদীপ জ্বেলে ধূপ-ধুনো দিয়ে পুজো করছেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন মা কালী ছবি ছেড়ে এক'পা এক'পা করে বেরিয়ে এলেন। Optical hallucination বা Visual hallucination-এর রোগীরা এই ধরনের দৃশ্য দেখেন।

সুন্দরী তরুণী সুমনা বিয়ের এক বছরের মধ্যে স্বামীকে হারিয়েছে। স্বামী শ্যামলেন্দু অফিস যাওয়ার পথে স্কুটার অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে। শ্যামলেন্দুর ব্যাঙ্কে সুমনা চাকরি পেয়েছে। সহকর্মী ধ্রুবকে ভালই লাগে। ধ্রুবও ওকে চায়, সেটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না। একদিন ধ্রুব বিয়ের প্রস্তাব দিল সুমনাকে। আর, সেই রাতেই শুতে যাওয়ার আগে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে ক্লিনজিং মিল্ক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে করতে সুমনা তাকাল ড্রেসিং টেবিলে রাখা শ্যামলেন্দুর ছবির দিকে, আর অমনি স্পষ্ট শুনতে পেল শ্যামলেন্দুর গলা, "তুমি আমাকে এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে সুমনা?" Auditory hallucination-এর রোগী এই ধরনের কথা শুনতে পায়।

•

আমার বন্ধু অমিত সেন-এর বড়দা (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেনের ভাইপো) সুজিত সেন মারা যান ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ সালে কেদারে। একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে অমিতের বড়দা ও বৌদি খুবই মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন। বেরিয়েছিলেন তীর্থদর্শনে। কেদারের পথে হাঁটতে হাঁটতেই অমিতের বড়দা হার্টে ব্যথা অনুভব করেন। আত্মীয় বন্ধুহীন এই তীর্থযাত্রায় দাদার একমাত্র সঙ্গী বৌদি পাগলের মতোই সাহায্যের জন্য চেঁচাতে থাকেন। একসময় বৌদি হঠাৎ-ই দেখতে পান এক সন্ন্যাসী ছুটতে ছুটতে আসছেন। মরণপথযাত্রী বড়দার সামনে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসী বড়দার মুখে প্রসাদ ও কমণ্ডলুর জল দিয়ে, যেমন এসেছিলেন তেমনি আবার ছুটতে ছুটতে চলে যান। একটু পরেই বড়দা মারা যান। বৌদি আশ্রয় পেলেন এক আশ্রমে। বড়দার শেষ কাজ বৌদিই করলেন আশ্রমের সন্ন্যাসীদের উপদেশ মতো। সন্ন্যাসীরা এই মৃত্যুকে মহাপুরুষের মৃত্যু হিসেবে ধরে নিয়ে মৃতদেহ না পুড়িয়ে জলে ভাসিয়ে দিলেন। দু-একদিন পরে বৌদি কেদারনাথকে দর্শন করতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এ কী, এই কী

কেদারনাথ? ইনিই তো সেদিন স্বামীর মুখে জল ও প্রসাদ তুলে দিয়েছিলেন।

অমিতের বৌদি ঈশ্বরে বিশ্বাসী, দীর্ঘদিনের সংস্কার, তীর্থক্ষেত্রের ধর্মীয় পরিবেশ, প্রচণ্ড মানসিক আঘাতের আবেগ ও সন্ন্যাসীদের আধ্যাত্মিক কথাবার্তা এই ধরনের Visual hallucination সৃষ্টি করেছিল।

আমার সহকর্মী মণি দালালের এক আত্মীয় হঠাৎই একদিন আবিষ্কার করলেন তাঁর বাড়িতে কলকাতা কর্পোরেশনের যে জল আসে তাতে প্রস্রাবের গন্ধ। তাঁর দৃঢ় ধারণা হলো এর পেছনে আছেন তাঁরই এক আত্মীয়। বাড়ির লোকজনেরা বোঝালেন, এটা অলীক চিন্তা। ভদ্রলোক কিন্তু বুঝলেন না। তিনি সন্দেহ প্রকাশ করলেন, দুষ্টু আত্মীয়টি কর্পোরেশনের লোকজনদের হাত করে প্রস্রাব মেশাচ্ছেন।

দীর্ঘদিন ধরে আর স্নান করেননি তিনি। অতি সামান্য জল খেতেন এবং সেই জলও নিজেই নিয়ে আসতেন দূরের এক টিউবওয়েল থেকে। এটা ঘ্রাণভিত্তিক ভ্রান্তির (Olfactory Hallucination) উদাহরণ।

আমার অফিসের এক বড় অফিসার তাঁর চেম্বারে ডেকে আমাকে বললেন, তাঁর স্ত্রী বোধহয় কোনও তুকতাক করেছে, অথবা কোন পিশাচ ঘরে ঢুকেছে। শাশুড়ির মৃত্যুর পর থেকে তিনি ঘরে পিশাচের গন্ধ পাচ্ছেন। পিশাচের গন্ধ তিনি কী করে চিনলেন, কে জানে? ভদ্রলোক আমাকে একদিন তাঁর বাড়িতেও নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি 'পিশাচের' কোনও গন্ধ না পেলেও তিনি কিন্তু তখনও গন্ধ পাচ্ছিলেন, এটাও একটা ঘ্রাণভিত্তিক হ্যালুসিনেশনের দৃষ্টান্ত।

একদিন আড্ডা দিচ্ছিলাম চিত্রকর গণেশ হালুইয়ের সল্টলেকের বাড়িতে। সেই আড্ডায় আমরা দু'জন ছাড়া ছিলেন আর একজন ছিলেন আর একজন শিল্পী। তাঁর নাম প্রকাশে একটু অসুবিধে থাকায় ধরে নিচ্ছি তাঁর নাম শ্যামবাবু। শ্যামবাবু শ্রীমার পরম ভক্ত। সঙ্গের ওয়ালেটে সব সময় শ্রীমার ছবি থাকে। একদিন তিনি অসতর্কভাবে রাস্তা পার হতে গিয়ে ডবলডেকার বাসে চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে যান। সেদিনের আড্ডায় শ্যামবাবুর প্রতিটি কথা আক্ষরিকভাবে মনে না থাকলেও কথার ভাবটুকু আমার স্মৃতিতে জমা পড়ে রয়েছে। শ্যামবাবু মোটামুটিভাবে সেইদিন এই ধরনের কথা বলেছিলেন, বুঝতে পারছিলাম চাপা পড়বই। আর এক মুহূর্তের মধ্যে আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে। শেষ সময়ে শ্রীমা'কে স্মরণ করতেই ঘটে গেল অলৌকিক ঘটনা। দেখতে পেলাম আমার পাশে শ্রীমা। তারপরই অনুভব করলাম একটা হ্যাঁচকা টান। হুড়মুড় করে চলে গেল বাসটা। দেখলাম আমি বেঁচে আছি। সেদিনের সেই অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা বলতে গেলে আজও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

অস্তিত্বহীন শ্রীমার আত্মা উপস্থিত হয়ে শ্যামবাবুকে বাঁচিয়েছেন এবং শ্যামবাবু স্বচক্ষে শ্রীমাকে দেখেছেন এই অলীক চিন্তাই হলো দৃষ্টিভিত্তিক হ্যালুসিনেশন।

অতীন মিত্র একটা আধা সরকারি সংস্থায় মোটামুটি ভাল পদেই কাজ করেন। একমাত্র সন্তান রুণা রসগোল্লা খেতে গিয়ে গলায় আটকে মারা যায়। তারপর থেকেই অতীনবাবুর স্ত্রী কোন মিষ্টি খেতে পারেন না। মুখে দিলেই মনে হয় বিষ তেতো। এটা স্বাদভিত্তিক বা taste hallucination অসুস্থ মস্তিষ্কের ফল। Hallucination ও পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভর করে পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থের (chemical stimulus) সাহায্যেও hallucination সৃষ্টি করা সম্ভব। গাঁজা, আফিম, L.S.D., ভাঙ, কোকেন, চরস ইত্যাদি প্রয়োজনীয় মাত্রায় শরীরে গ্রহণ করলেও অনেক সময় তুরীয় আনন্দ, আধ্যাত্মিক আনন্দ, দেবদর্শন বা দেববাণী শোনা যায়। আমার এক পরিচিত তরুণ আমাকে বলেছিল, সে একবার L.S.D. খাওয়ার পর অনুভব করেছিল, তার দেহটা খাটে শুয়ে আছে এবং আত্মা সিলিং-এ ঝুলে রয়েছে।

Delusion (মোহ, অন্ধ ভ্রান্ত ধারণা)

Delusion কথার অর্থ যে মোহ তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। Illusion ও hallucination এর সঙ্গে Delusion (ডিলিউশন) এর অনুভূতির পার্থক্য রয়েছে।

Delusion রোগীর মধ্যে বদ্ধমূল কিছু ভ্রান্ত ধারণা থাকে। এই যুক্তিহীন ভ্রান্ত ধারণা অসুস্থ মস্তিষ্কেরই ফল। Delusion রোগী ভাবল, সে এমন একটা মন্ত্র পেয়ে গিয়েছে, যার সাহায্যে দূরের যে কোন লোকের মৃত্যু ঘটাতে পারে।

কেউ হয়তো ভাবতে শুরু করল শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ তার স্বামী। যে যখন রাতে শোয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ তার শয্যায় নেমে আসে।

আমাদের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত একটি মেয়ের কথা বলছি। মেয়েটির নাম প্রকাশে অসুবিধা থাকায় ধরে নিলাম তার নাম শ্রী। বয়েস বছর ষোলো। দেখতে যথেষ্ট সুন্দরী। মেয়েটির মা আরও অনেক বেশী সুন্দরী। মেয়েটির হঠাৎ বদ্ধমূল, ধারণা হলো মা ওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন, জলে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে ওকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছেন। ও বাড়ির জল খায় না, আশেপাশের বাড়িতে গিয়ে জল খেয়ে আসে।

আমার এক বন্ধুর স্ত্রীর অন্ধ-বিশ্বাস তার শ্বশুরমশাই পূর্বজন্মে তার ওপর পাশবিক অত্যাচার করেছিলেন। বন্ধুর সংসার বলতে নিজে, স্ত্রী, একটি ছোট্ট মেয়ে ও বাবা। বন্ধু অফিসে বেরোলেই ওর স্ত্রী ভয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিত। বাড়িতে সবসময়ই কাজের জন্য একটি মেয়ে ছিল, মেয়েটি কখনও দু-চার দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গেলে বন্ধু-পত্নীও মেয়েকে নিয়ে চলে যেত বাপের বাড়ি। বন্ধু-পত্নীর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, ওর বদ্ধমূল ধারণা পূর্বজন্মে ওর শ্বশুর ছিলেন আকবর, আর ও ছিল আনারকলি।

রামকৃষ্ণদেব, রামপ্রসাদ, বামাক্ষ্যাপা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন মা কালী বা মা তারা তাঁদের সঙ্গে সবসময় কথা বলছেন, ঘুরছেন, ফিরছেন, দৈনন্দিন কাজকর্মে সাহায্য করছেন। দীর্ঘকাল ধরে লালিত বিশ্বাসই একসময় বদ্ধমূল ভ্রান্ত বিশ্বাস বা delusion-এ পরিণত হয়েছে।

আমার এক মধ্যবয়স্ক সহকর্মী ছিলেন, যিনি delusion-এর রোগী। নাম প্রকাশে অসুবিধে থাকায় ধরে নিচ্ছি তাঁর নাম যদুবাবু। যদুবাবুর দৃঢ় ধারণা সহকর্মীরা তাঁর প্রতি সহানুভূতিহীন, হীনচরিত্র ও দুষ্ট প্রকৃতির। সহকর্মীরা নিজেদের মধ্যে কথা বললে যদুবাবু ধরে নেন ওরা তাঁর সম্বন্ধেই কথা বলছে। কোন দুই সহকর্মী নিজেদের দিকে তাকালে যদুবাবু ধরে নেন, তাঁকে উদ্দেশ্য করেই ওরা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল। ও কেন আমার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সিগারেটের প্যাকেট বের করল? আমার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কেন আমজাদ খাঁর গল্প করল এরা? আমি কি ভিলেন? অফিসের বিবেক ঘোষ কেন আমাকে হেমামালিনীর ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডার দিল? আমি কী লম্পট? আমি সেকশনে ঢুকতেই ওরা সকলে হেসে উঠল। আমি কী ওদের হাসির রসদ? এই রকম নানা ধরনের আত্মপ্রাসঙ্গিক ভ্রান্তি নিজের সঙ্গে জুড়ে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করে রোগী। নির্যাতনমূলক এই delusion রোগী কিন্তু নিজের প্রতিটি ধারণা ও ব্যাখ্যাকে অভ্রান্ত বলে মনে করে।

পাভলভের মতে Delusion-এর উৎপত্তির মূলে রয়েছে প্রথমত মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের বিকারগত অনড়ত্ব, আর দ্বিতীয় কারণ হলো, অতি স্ববিরোধী মানসিক অবস্থা। এই দুটি ব্যাপারই একসঙ্গে বা পরপর ঘটতে পারে। সেই অনুসারে delusion রোগীর উপসর্গেরও কিছু হেরফের হয়।

Paranoia

'Paranoia' কথাটির অভিধানগত অর্থ 'বদ্ধমূল ভ্রান্তিজনিত মস্তিষ্ক বিকৃতি'। বাংলা প্রতিশব্দ সৃষ্টি করার চেষ্টা না করে একে আমরা বরং বাংলায় 'প্যারানইয়া'ই বলি।

'প্যারানইয়া' রোগী delusion রোগীর মতোই অন্ধ ভ্রান্ত বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয় বটে, কিন্তু প্যারানইয়া রোগী তার এই বিশ্বাসের পেছনে এমন সুন্দর যুক্তি হাজির করতে থাকেন যে, একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পক্ষেও অনেক সময় বিচার করা কঠিন হয়ে পড়ে—উনি মানসিক রোগী অথবা বক্তব্যের যুক্তিগুলো সত্যি?

ধরুন, মধুবাবু একদিন আপনাকে বললেন, তাঁর স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত। শুধু এই কথাটাই বললেন না, তাঁর বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে যে সব ঘটনা ও যুক্তি হাজির করলেন তাতে আপনি প্রাথমিকভাবে হয়ত বিশ্বাসই করতে বাধ্য হবেন, মধুবাবুর স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত। মধুবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়ার সুবাদে আপনি আপনার পরিচিত প্রাইভেট গোয়েন্দা লাগালেন, নিজেও লেগে পড়লেন বন্ধুকে নষ্টা স্ত্রীর হাত থেকে বাঁচাতে। শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করলেন বন্ধুর প্রতিটি সন্দেহ ভিত্তিহীন।

নিজের ভুল বিশ্বাসকে যুক্তিসহ হাজির করার প্রচেষ্টাই প্যারানইয়া রোগীর বৈশিষ্ট্য। নিজের ওই বিশেষ ভ্রান্ত বদ্ধমূল বিশ্বাসের বাইরে প্যারানইয়া রোগীকে পুরোপুরি সুস্থ ও স্বাভাবিক মনে হয়।

এবার এক সুন্দরী রমণীর কথা বলছি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকায় এখানে তাঁর নাম দিলাম রাধা। রাধা শুধু সুন্দরীই নন, যথেষ্ট গুণীও। স্বামী, ধরা যাক নাম তার সত্য, সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। রাধার বদ্ধমূল ধারণা সত্যর চরিত্র ভাল নয়। সুযোগ পেলেই আত্মীয়া-অনাত্মীয়া, কুমারী, সধবা, বিধবা, যে কোন বয়েসের মেয়ের সঙ্গেই ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যান। এই বিষয়ে রাধা যেসব যুক্তি হাজির করেন, যেসব ঘটনার অবতারণা করেন, সেসব শোনার পর রাধার বান্ধবীদের অনেকেরই ধারণা সত্য একটি 'প্লে-বয়'।

বেচারা সত্যকে রাধার তৈরি যুক্তি-তর্কের কালি মেখেই থাকতে হচ্ছে।

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগালের মতে—প্যারানইয়া রোগীর গোপন মনে হীনমন্যতাবোধ বা পাপবোধ লুকিয়ে থাকার দরুন ভ্রান্ত বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে এক ধরনের শান্তি পায়। নিজের অন্যায় কাজকে 'জাস্টিফাই' করে প্রশান্তি পায়।

অধ্যায় : নয়

পীঠস্থান ও স্থান মাহাত্ম্য রহস্য

আদ্যা'মা রহস্য

দক্ষিণেশ্বরের কাছে আদ্যাপীঠের মন্দির ভারতীয় এবং হিন্দুদের কাছে এক পবিত্র মন্দির। বহু বাড়িতেই আদ্যামারূপী কালীমূর্তির ছবি যথেষ্ট ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে পূজিত হয়। কথিত আছে, আদ্যামায়ের স্তব পাঠ করলে অনেক মুশকিলের অবসান হয়। আদ্যাস্তবেই বলা হয়েছে, তিন পক্ষকাল আদ্যাস্তব শ্রবণ করলে অপুত্রার পুত্র হয়। দু'মাস শুনলে বন্ধন মুক্তি ঘটে (জেল থেকে খালাস পেতে অপরাধীরা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন)। মৃতবৎসা দু'মাস স্তব শ্রবণে জীববৎসা হয়। ঘরে লিখিত স্তব রেখে দিলে অগ্নি এবং চোরের দ্বারা কোন ক্ষতি হবে না (সরকারি উদ্যোগে কয়েক কোটি স্তব ছাপিয়ে প্রতিটি পরিবারপিছু একটা করে বিলি করলে আর অহেতুক ফায়ার ব্রিগ্রেড পুষতে হয় না, পুলিশের ওপরেও চাপ কমে। অন্ততঃ ব্যাঙ্কগুলো চোর-ডাকাতের হাত থেকে বাঁচতে আদ্যাস্তবের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন)।

আদ্যামায়ের এই কালীমূর্তি মাটি ফুঁড়ে উঠেছিলেন কলকাতার ইডেন গার্ডেনে। সালটা সম্ভবত ১৯২৮। শ্রীঅন্নদা ঠাকুর নাকি স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন যে, আদ্যাকালী গঙ্গার তীরে ইডেন গার্ডেনে হাজার হাজার বছর ধরে মাটির তলায় বন্দিনী হয়ে রয়েছেন। এবার মা তাঁর বন্দীদশা কাটিয়ে মেদিনী ভেদ করে উঠবেন। স্বপ্নাদেশ পেয়ে শ্রীঅন্নদা ঠাকুর ইডেনে গেলেন, সেখানেই পেলেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা আদ্যাকালীকে। সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হলো দক্ষিণেশ্বরের কাছে আদ্যাপীঠের মন্দিরে। এরই মধ্যে কিছু লোক সন্দেহ প্রকাশ করলেন যে, মুর্তিটি আদৌ হাজার হাজার বছর ধরে ইডেনে ছিল না। দু-এক দিন আগে মাটিতে পোঁতা হয়েছিল। মূর্তির তলায় ঢালা হয়েছিল বস্তাখানেক শুকনো ছোলা। ছোলাতে জল ঢেলে মাটি বুজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শুকনো ছোলা জল পেয়ে ফুলতে শুরু করে। প্রচুর ছোলা ফুলছে, আয়তন বাড়ছে, অতএব আশেপাশে চাপও বাড়ছে, গর্তের চারপাশে চাপ বাড়লেও শক্ত মাটিতে কিছুই করারও উপায় নেই। স্বাভাবিক কারণেই ছোলার ওপর চাপানো মূর্তিটিকে ঠেলে ছোলাগুলো নিজেদের জায়গা

বাড়িয়েছে। তাই মূর্তিও একটু একটু করে মাটি ঠেলে ওপরে উঠেছে। অন্য মতে মূর্তিটি পাওয়া গিয়েছিল ইডেন গার্ডেনের জলাশয়ে।

আদ্যামায়ের ভক্তেরা এ'সব শুনে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন, কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন কালীমূর্তিটি ওঠার পেছনে কোন চাতুরী নেই, এসবই মায়ের অলৌকিক লীলা মাত্র।

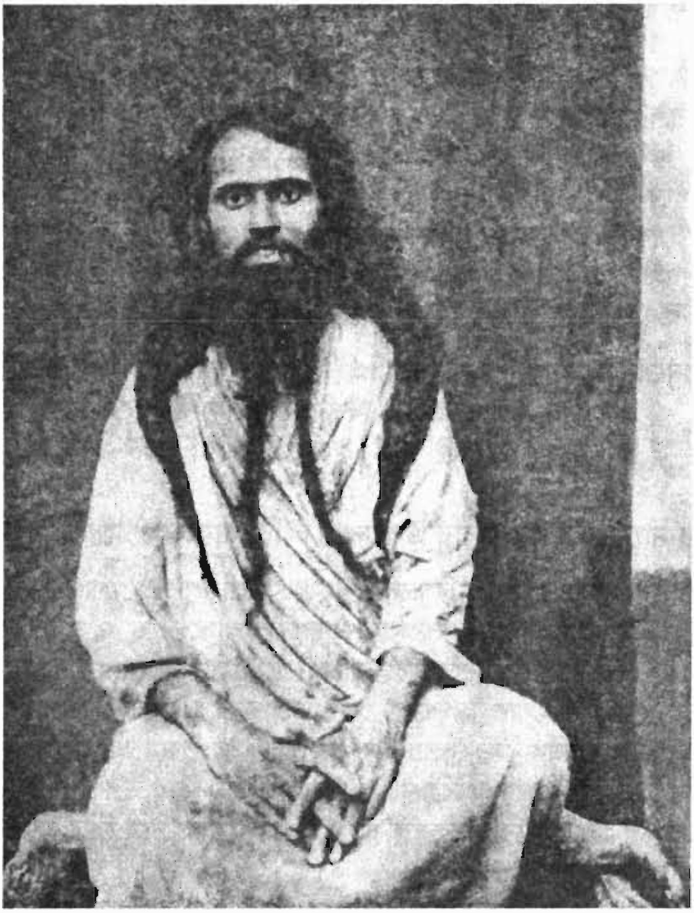

শ্রীঅন্নদা ঠাকুর

এগিয়ে এলেন বিশ্ববিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আদ্যাপীঠের কালীবিগ্রহ দেখে ও পরীক্ষা করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানালেন, এই মূর্তি সম্প্রতি তৈরি করা হয়েছে। একে কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন বলাটা নিছক মূর্খতা।

খবরটা ছড়িয়ে পড়াতে বহু সাধারণ মানুষ এই ধরনের ছলনায় ও চতুরতায় ক্ষিপ্ত হলেন। সম্ভবত সাধারণের রোষ থেকে বাঁচতে মায়ের প্রধান ভক্তেরা আদ্যামূর্তি বিসর্জন দিলেন গঙ্গায়। রটালেন, মা স্বপ্নে বিসর্জন দিতে আদেশ করেছেন।

এরপর বেশ কিছু বছর আদ্যামায়ের মন্দির বিগ্রহ-শূন্য থাকার পর বর্তমানের আদ্যামূর্তিটি তৈরি করিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

আমাদের দেশে এই ধরনের ঘটনা অবশ্য বহুবার বহু জায়গায় ঘটেছে। কেউ স্বপ্ন দেখে মাঠে গিয়ে খুঁজে পান স্বপ্নের দেবমূর্তিকে, কেউ দেবমূর্তিকে আবিষ্কার করেন গরু খুঁজতে গিয়ে। দেখেন গরু একটি মূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে আছে, গরুর বাঁট থেকে আপনা-আপনি দুধ ঝরে পড়ছে; কেউ নতুন কাটা পুকুরে আবিষ্কার করেন দেবমূর্তি। দেবমূর্তি আবিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় প্রচার। স্বপ্নে পাওয়া দেবতার সঙ্গে দু-একটা অলৌকিক ঘটনা জুড়ে দিতে পারলে তো কথাই নেই। অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি সবই একে একে এসে পড়বে পূজারীর হাতে।

মানুষের দুঃখকষ্ট, অসহায়তা ও মানসিক দুর্বলতার পরিণতিতে এসেছে ঈশ্বর-বিশ্বাস। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেনি, মানুষই সৃষ্টি করেছে ঈশ্বর।

ধর্মের নামে লোক ঠকাবার উপদেশ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে

সাধারণ মানুষের ঈশ্বর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে আখের গোছানোর ধান্দা পৃথিবীর ইতিহাসে অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। ভারতও এর বাইরে নয়। ২২০০ বছর আগে ভারতবর্ষে ঈশ্বরের নামে লোকঠকানো যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' তার উল্লেখ পাই। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য তাঁর বর্ণাশ্রম নীতি রক্ষার জন্য 'অর্থশাস্ত্র'-এর পঞ্চম অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিছু উপায় বর্ণনা করেছেন। কৌটিল্য-বর্ণিত নীতি ও উপদেশগুলো নিয়ে আলোচনা করলে দেখতে পাবেন কী প্রচণ্ড মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তিনি প্রজাশোষণ করতে উপদেশ দিয়েছেন।

"কোন প্রসিদ্ধ পুণ্যস্থানে ভূমি ভেদ করে দেবতা উঠেছেন বলে প্রচার করতে হবে। অথবা রাত্রিতে বা নির্জনে একটি দেবতা স্থাপন করে ও এই উপলক্ষে উৎসবাদি ও মেলা বসাতে হবে। শ্রদ্ধালু লোকের প্রদত্ত ধন দেবতাধ্যক্ষ গোপনে রাজসমীপে অর্পণ করিবেন।" (কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, ৫ম অধিকরণ, ২য় অধ্যায়, ৯০তম প্রকরণ)।

'দেবতাধ্যক্ষ' কথাটি লক্ষ্য করুন। সেনাদের দেখার দায়িত্ব ও পরিচালনার দায়িত্ব

যাঁর ওপর থাকত তাকে বলা হতো সেনাধ্যক্ষ। তেমনি দেবস্থান অর্থাৎ মন্দির এবং পুরোহিত ও পণ্ডিতদের দেখাশুনোর দায়িত্ব যার ওপর থাকত তাকে বলা হতো দেবতাধ্যক্ষ। এই দেবতাধ্যক্ষ কাজ চালাতো তার অধীন পণ্ডিতকুল ও পুরোহিতকুলের সাহায্যে।

ওই গ্রন্থের ৯০তম প্রকরণে আরও বলা হয়েছে, "দেবতাধ্যক্ষ ইহাও প্রচার করিতে পারেন যে, উপবনে একটি বৃক্ষ অকালে পুষ্প ও ফলযুক্ত হইয়াছে এবং ইহা হইতেই সেখানে দেবতার আগমন নিশ্চিত হইয়াছে।"

"সিদ্ধপুরুষের বেশধারী গুপ্তচরেরা কোন বৃক্ষে প্রতিদিন এক-একটি মানুষ ভক্ষণার্থ কররূপে দিতে হইবে তা জানাতে। এই মর্মে রাক্ষসের ভয় উৎপাদন করিয়া পৌর ও জনপদজন হইতে বহু টাকা লইয়া সেই ভয়ের প্রতিকার করিবে। রাক্ষস-ভয়ে স্ব-জীবনার্থ প্রদত্ত টাকা রাজাকে গোপনে অর্পণ করিবে।"

অর্থাৎ, প্রজাদের শোষণ করার জন্য চাণক্য শুধু দেবতাদেরই সৃষ্টির কথা বলেননি, ভূত বা রাক্ষস সৃষ্টির কথাও বলেছেন। রাক্ষসের ভয় দেখিয়ে তারপর রাক্ষস তাড়াবার নাম করে অর্থ আদায়ের এই পন্থা বাইশশো বছর পরে আজও তেমনই রয়েছে। আজও ভারতের বহু প্রান্তে ভূত ধরা ও ভূত তাড়ানোর নানা অলৌকিক (?) খেলা সমানে চলেছে।

৫ম অধিকরণ, ২য় অধ্যায়ের ৯০ তম প্রকরণে আরও রয়েছে, "দেবতাধ্যক্ষ দুর্গের ও রাষ্ট্রের দেবতাগণের ধন যথাযথভাবে একস্থানে একত্রিত রাখিবেন এবং সেইভাবে রাজাকে আনিয়া দিবেন।"

ধর্মের নামে সুন্দর ব্যবসা ফেঁদে বসাতে হবে এবং সাধারণকে দোহন করে রাজকোষ বাড়াতে হবে। রাজকোষ বাড়াবার জন্যে ধনীদের স্বার্থরক্ষার জন্যেই চাণক্য পুরোহিতদের কাজে লাগাবার কথা উল্লেখ করেছেন।

একালের মতোই সেকালেও কিছু যুক্তিবাদী লোক ছিলেন, যাঁরা 'সকলেই যা মেনে নিয়েছে তাই সত্য' এই যুক্তিতে বিশ্বাস করতেন না। বিশ্বাস করতেন না, রাজা, পুরোহিত বা প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতরা মেনে নিয়েছেন বলেই কোন কিছুকে যুক্তি দিয়ে বিচার না করেই মেনে দিতে হবে। তাঁরা সর্বযুগের যুক্তিবাদীদের মতো সব কিছুকেই যুক্তি দিয়ে বিচার করতেন এবং তারপরই সেটা মেনে নিতেন অথবা বর্জন করতেন। এই সব যুক্তিবাদীরা শাসক, পুরোহিত, পণ্ডিতসমাজ ও ধনীদের পক্ষে ছিলেন যথেষ্টই বিপজ্জনক। মানুষকে দুর্বল, অসহায় ও ঈশ্বর-নির্ভর করে তোলার পক্ষে এই সব ঈশ্বরে শ্রদ্ধাহীন যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন যথেষ্ট বাধা স্বরূপ। এঁদের সম্বন্ধে চাণক্যের উপদেশ হলো, "যাহারা অশ্রদ্ধালু, বেশি জিজ্ঞাসু, তাহাদিগকে ভোজন ও স্নানাদি-দ্রব্যে স্বল্পমাত্রায় বিষ প্রয়োগ করিয়া মারিয়া ফেলিবে। তারপর 'ইহা দেবতার অভিশাপ' বলিয়া প্রচার করিবে।"

প্রধানত রাজা-রাজড়াদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই গড়ে উঠেছিল সেকালের বিখ্যাত

মন্দিরগুলো, যেগুলো আজও লক্ষ-কোটি ভক্তদের আকর্ষণ করে ও আদায় করে প্রণামী। প্রণামীর একটা অংশ যেত রাজকোষে। প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু মন্দির আজও ভারতের বিখ্যাততম ধনীদেরও ঈর্ষা জাগাবার মতো সম্পদের অধিকারী। স্বাধীন ভারতে মন্দিরের সম্পদ মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডের। অর্থাৎ ধর্মগুরুদের। এক-একজন ধর্মগুরুর সম্পদ দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পপতিদের সম্পদকেও হার মানায়।

ভারত সত্যিই বিচিত্র দেশ—প্রাচীন খারাপ ঐতিহ্যকে গর্বের সঙ্গে ধারণ করে আছে।

সোমনাথ মন্দিরের অলৌকিক রহস্য

সোমনাথ মন্দিরের কথা প্রাইমারী স্কুলের গণ্ডি পেরোনো সকলেরই জানা। বিশ্ববিখ্যাত সেই মন্দিরের বিপুল ধনরত্ন একাদশ শতাব্দীতে লুণ্ঠন করেছিলেন গজনীর সুলতান মামুদ। সোমনাথ মন্দিরের শুধু ঐশ্বর্যই সুলতানকে আকর্ষণ করেনি, আকর্ষণের আর একটি প্রধান কারণ ছিল মন্দিরের বিগ্রহের অলৌকিকত্ব।

সোমনাথ মন্দিরের দেবমূর্তির অলৌকিকত্বের কথা যুগ-যুগ ধরে দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। দেব-বিগ্রহ কোন বেদিতে বসানো ছিল না। বিগ্রহ অবস্থান করতেন মন্দিরের মাঝখানে শূন্যে। শূন্যে ভাসমান সোমনাথদেবকে দর্শনের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে বহু কষ্ট স্বীকার করেও হাজির হতেন লক্ষ লক্ষ ভক্ত। অলৌকিকের আকর্ষণ বড় আকর্ষণ। চাক্ষুষ অলৌকিক শক্তির প্রকাশ এবং জাগ্রত দেবতাকে দেখার সুযোগ কে-ই বা অবহেলায় নষ্ট করবে? কে-ই বা জীবন্ত দেবতাকে দেখে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে অক্ষয় স্বর্গবাসের সুযোগ নেবে না? ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা নির্বিশেষে লক্ষ-কোটি ভক্ত দর্শক এসেছেন এব দেবতার অসাধারণত্ব ও অলৌকিকত্ব দেখে নিজেদের সাধ্যমতো প্রণামী উজাড় করে ঢেলে দিয়ে গেছেন। দীর্ঘ বছরের সঞ্চয়ে মন্দিরে জমে উঠেছিল কুবেরের ঐশ্বর্য।

শূন্যে ঝুলন্ত দেবমূর্তির অসাধারণত্ব সুলতান মামুদকে আকর্ষণ করে। মামুদ শুধু মন্দিরের ধনরত্ন লুঠ করেই বিরত হননি। তিনি যুক্তিবাদী মন নিয়ে দেবমূর্তির শূন্যে ঝুলে থাকার কারণ জানতে উৎসুক হয়ে ওঠেন। তাঁর সঙ্গে আসা বিজ্ঞানী, ধাতুবিদ ও বাস্তুকারদের নিয়ে মূর্তিটি পরীক্ষা করে দেখেন যে ওটি লোহার তৈরি। বিশেষজ্ঞরা আরও মত প্রকাশ করেন যে, সম্ভবত মন্দিরের দেওয়ালের চারপাশে চুম্বক-পাথর বসানো আছে। এমন করে চুম্বক-পাথর বসানো হয়েছে, যাতে, লোহার মূর্তিটি মাঝামাঝি একটা জায়গায় এনে ছেড়ে দিলে বিভিন্ন প্রান্তের চুম্বক-আকর্ষণে শূন্যে ভেসে থাকছে।

সুলতান মামুদের নির্দেশে দেবমূর্তিকে আবার শূন্যে স্থাপন করা হল। তারপর, তাঁর লোকজনদের মন্দিরের দেওয়ালে লাগানো পাথরগুলো আস্তে আস্তে খুলে ফেলতে বললেন। এক পাশের দেওয়ালের পাথর একটি একটি করে খুলে ফেলতেই খুলে এলো চুম্বক পাথর বা 'ম্যাগনেটাইট'। দেবমূর্তি শূন্য থেকে পড়ে গেল মেঝেতে। 'অলৌকিক' দেবমূর্তির রহস্য ভেদ হলো। বোঝা গেল দেবতার বদলে এক টুকরো লোহা রাখলেও ভাসত। মন্দিরের পুরোহিতরা এবং কোন ধাতুবিদ বাস্তুকার তাঁদের জ্ঞানের অপপ্রয়োগ করে শুধু লোক ঠকিয়ে বিপুল অর্থ ও সমীহ আদায় করেছিল।

মামুদ তথাকথিত অলৌকিক কিছু দেখেই যুক্তিহীন হয়ে পড়েননি বলেই প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছিল। নতুবা আরও কত শত বছর ধরে সোমনাথ মন্দিরের লোক ঠকানোর রমরমা ব্যবসা চলত, তা কে জানে। হয়ত আমাদের দেশের নেতারা নির্বাচনের আগে সোমনাথের আশীর্বাদ নিতে দৌড়তেন। সাধারণ মানুষ অসাধারণদের অনুসরণ করে ভিড় বাড়াতেন।

প্রাচীন মিশরের ধর্মস্থান রহস্য

Physics for entertainment; Ya. Perelman; Vol. 1. Mir Publishers, Moscow 1975-এ প্রাচীন মিশরের ধর্মস্থানের এক সুন্দর অপকৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাচীন মিশরের এক বিখ্যাত ধর্মস্থান একটি বিশেষ অলৌকিকত্বের জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। দেবালয়ের মূল কক্ষের দরজা ছিল দুটি। একটি ছিল প্রধান দরজা, যার বাইরে অগণিত ভক্ত অপেক্ষা করতেন দেব-মাহাত্ম্যে দরজা খুলে যাওয়ার অপেক্ষায়।

দ্বিতীয় ছোট দরজাটি ছিল পুরোহিতদের যাতায়াতের জন্য। নির্ধারিত সময়ে পুরোহিত মূল কক্ষে প্রবেশ করে একটা যজ্ঞবেদিতে অগ্নিসংযোগ করতেন। মঞ্চের আগুনে ফেলতেন সুগন্ধী ধূপ, সঙ্গে চলত মন্ত্রপাঠ। কক্ষের বাইরে অপেক্ষমান ভক্তেরা শুনতেন সেই অলৌকিক মন্ত্রোচ্চারণ। কিছুক্ষণ চলার পর ভক্তেরা সবিস্ময়ে দেখতেন দরজা একটু একটু করে খুলে যাচ্ছে। অথচ না, দরজার দু'পাশে কেউ কোথাও নেই। দরজায় নেই কোন দড়ি বাঁধা, যে দড়ি টেনে থিয়েটারের স্ক্রিন টানার মতো করে কেউ দরজা খুলবে। কক্ষে একমাত্র লোক পুরোহিত, তিনি গভীর মনযোগের সঙ্গে যজ্ঞের আগুনে ধূপ ফেলে মন্ত্র পড়ে চলেছেন। যজ্ঞবেদিতে আগুন জ্বলছে দাউ-দাউ করে। না, কোন কৌশল নেই। সবটাই অলৌকিক!

প্রাচীন মিশরের এই অলৌকিকত্বময় ধর্মস্থানের আসল রহস্য জানতে পারি প্রাচীন গ্রীসের গণিতজ্ঞ ও যন্ত্রবিদ আলেকজান্দ্রিয়া হেরোর উল্লিখিত যান্ত্রিক কৌশল থেকে।

ধর্মস্থানের মূল কক্ষের যজ্ঞবেদিটি হতো ফাঁপা ও ধাতুর তৈরি। বাকি কলাকৌশল ছিল পাথরের মেঝের তলায়। ফাঁপা যজ্ঞবেদি থেকে একটা নল যেত একটা জল-পাত্রে। জল-পাত্র থেকে একটা নল যেত ঝুলন্ত একটা বালতির মুখে। প্রধান দরজার পাল্লার নীচে পাল্লার সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় মেঝের তলায় লুকোনো থাকত দুটি খুঁটি। এই খুঁটি দুটির সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হতো বালতিটা।

বেদিতে আগুন জ্বললে বেদির ভেতরের বাতাস গরম হয়ে আয়তনে বেড়ে ক্রমাগত চাপ বাড়াতে থাকবে বেদির নীচে রাখা জল-পাত্রের ওপরে। জলের মধ্যে সেই চাপ সঞ্চারিত হয়ে নল দিয়ে একটু একটু করে জল বের করে এনে ঝুলন্ত বালতিতে ফেলবে। বালতিতে বাঁধা দড়িতে টান পড়বে। ঘুরবে দড়িতে বাঁধা খুঁটি, সেইসঙ্গে ঘুরবে দরজার পাল্লা।

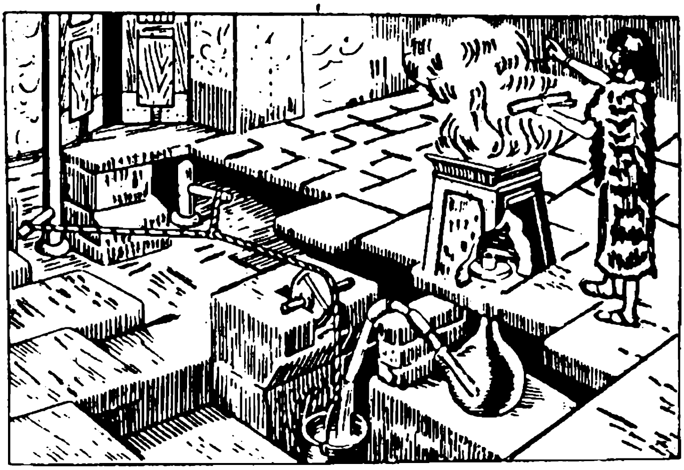

প্রাচীন মিশরের ধর্মস্থানে অপকৌশল

এমনি করেই বারবার বিজ্ঞানের জ্ঞান ও কৌশলকে কাজে লাগিয়ে প্রবঞ্চক পুরোহিত ও গুরুরা অলৌকিক ক্ষমতাবান বলে নিজেদের প্রচারিত করে অথবা নিজের মন্দিরকে অলৌকিকত্ব আরোপ করে জনসাধারণকে ঠকিয়ে শুধু দোহনই করেছে। সাধারণের কাছ থেকে ঘৃণার পরিবর্তে আদায় করেছে অন্ধ ভক্তি, অন্ধ-বিশ্বাস, ভয় ও অর্থসম্পদ।

কলকাতায় জীবন্ত শীতলাদেবী ও মা দুর্গা

১৯৬৮-৬৯ সাল নাগাদ আমাদের কলকাতার বুকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত রোড ও রূপনারায়ণ নন্দন লেন-এর মোড়ে শীতলা মন্দিরের শীতলামূর্তি হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠলেন। মায়ের চোখ দিয়ে ঝরতে লাগল জল, মা কাঁদছেন। অন্ধ ভক্তের অভাব হলো না। প্রণামীর টাকায় ঘন-ঘন থালা ভরে উঠতে লাগল। শহর কলকাতায় ঘটনাটা এতই উত্তেজনা, ধর্মোন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল যে, পত্রিকাতেও খবর বেরিয়ে গেল। কিছু যুক্তিবাদী অনুসন্ধিৎসু লোক কার্যের পেছনে কারণটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করতেই মা শীতলার পুরোহিত ব্যবসা গোটালো।

গত শতকের ন'য়ের দশকের গোড়ায় দক্ষিণ কলকাতার হরিশ মুখার্জি রোডের ২৩ পল্লীর দুর্গাপুজো নিয়ে কলকাতা তথা সারা বাংলাদেশে কম হৈ-চৈ হয়নি। দুর্গাঠাকুর বিসর্জন দিতে গিয়ে দেখা গেল মা কাঁদছেন। মা বিদায় নিতে কাঁদছেন, অতএব বিসর্জন হয় কী করে? বিসর্জন বন্ধ রইল। সারা শহর তোলপাড়, পত্রিকায় খবর পড়ে ঈশ্বরে ও অলৌকিকে বিশ্বাসীরা নতুন প্রেরণা পেলেন। কলিযুগেও তবে আবার মায়ের আবির্ভাব হলো।

প্রতিদিনই কাতারে কাতারে লোকের ভিড়। মা দুর্গার চোখের জল আর শুকোয় না, বিসর্জনও হয় না। একটু একটু করে রহস্যের পরদা উঠল, ব্যাপারটা নাকি পুরোপুরি জমি দখলের চক্রান্ত। উদ্দেশ্য, বেদখল জমিতে পাকাপাকি একটা মন্দির তৈরি। ঘটনাটা ফাঁস হতেই অলৌকিক খেলা সাঙ্গ করে মা দুর্গাকে বিসর্জন দেওয়া হলো।

জব্বলপুরে জীবন্ত দুর্গা

মা দুর্গাই আবার সারা দেশের খবর হয়ে দাঁড়ালেন, এবারের ঘটনাস্থল জব্বলপুর। সাল ১৯৮২। ২৯ অক্টোবর ভেড়াঘাটে নর্মদা নদীতে শ্রীভবানী মণ্ডল দুর্গোৎসব কমিটির দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হলো, জলে ফেলতে প্রথমে প্রতিমা ডুবে গিয়েছিল, কিন্তু একটু পরেই দেখা গেল কিছুটা দূরে, নর্মদার ডান তীরে প্রচণ্ড স্রোতের মধ্যেও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দুর্গা প্রতিমা। প্রতিমা তীব্র স্রোতকেও উপেক্ষা করে অনড় হয়ে রয়েছেন। নর্মদার তীব্র স্রোত ভেসে চলেছে মা দুর্গার পা ধুয়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মা দুর্গার এই অলৌকিক কাহিনি শহরে ছড়িয়ে পড়ল। সেই রাতেই হাজারে হাজারে লোক এসে হাজির হলো এই অলৌকিক দৃশ্য দেখতে। পরের দিন, ৩০ অক্টোবর ভেড়াঘাটে তিলধারণের জায়গা রইল না। বিভিন্ন রুট থেকে বাস সরিয়ে ভেড়াঘাটে অনবরত বাস যাচ্ছে আর আসছে। ভেড়াঘাট বিরাট একটা মেলার রূপ পেল। নানা রকমের দোকান, খাবার, ফুল, ফলের দোকানেই

ভিড় সবচেয়ে বেশি। লক্ষ লক্ষ ভক্ত মা দুর্গার উদ্দেশে নর্মদাতেই ছুঁড়ে দিচ্ছে ফুল, ফল বা মিঠাই। লক্ষ লক্ষ ধর্মপাগলকে সামলাতে শহরের পুলিশ হিমশিম খেয়ে গেল। এইসঙ্গে ব্যাপক হারে বিক্রি হতে লাগল অলৌকিক মা দুর্গার ফোটোগ্রাফ। এমন জীবন্ত দুর্গার ছবি বাড়িতে থাকলে দুর্গতি দূর হবে এই বিশ্বাসে বহু ভক্তই মা দুর্গার ফোটোগ্রাফ কিনল। বলতে গেলে ফোটো কেনার হুজুগ পড়ে গেল ওখানে। জব্বলপুরের হিন্দি দৈনিক পত্রিকা 'নবভারত'-এর দেওয়া তথ্য অনুসারে ৩০ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর মাত্র চার দিনেই জব্বলপুরের মতো একটি মাঝারি শহরে ছবি বিক্রি হলো ৪ থেকে ৫ লক্ষ। দাম হিসেবে জনসাধারণের পকেট থেকে চলে গিয়েছিল ৩৫ লক্ষ টাকার মতো। সেই সঙ্গে দেবী দুর্গার কৃপায় অন্যান্য দোকানেরও বিক্রি-বাটার রমরমা ছিল দেখার মতো। স্থান-মাহাত্ম্যের স্থায়ী রূপ দিয়ে এই জায়গাটাকে একটা তীর্থক্ষেত্র বানিয়ে ফেলতে পারলে আখেরে যে প্রচুর লাভ হবে এটুকু বুঝে নিয়েছিল স্বার্থসংশ্লিষ্ট লোকেরা।

এরই মধ্যে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। দুই উৎসাহী যুবক গাঞ্জীপুরার রামকিষণ সাহু ও অজয় বর্মন দেবীপ্রতিমাকে স্পর্শ করতে সাঁতার কেটে এগোতে গিয়ে নর্মদার তীব্র স্রোতে ভেসে গেল। দুই তরুণের এই মৃত্যুতে পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন চিন্তিত হলেন। বুঝলেন, দেবীপ্রতিমা পাথরের খাঁজে যতদিন আটকে থাকবে, ততদিনই আরও দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েই যাবে। ধর্মান্ধ লোকেরা জাগ্রত দুর্গাকে স্পর্শ করতে গিয়ে মৃত্যু হলে অক্ষয় স্বর্গবাস হবে বলে যদি একবার ধরে নেয়, তবে বিপর্যয় ঘটে যাবে। গণহিস্টিরিয়ার প্রকোপে স্বর্গবাসের বাসনায় অনেকেই আত্মাহুতি দেবে। পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিলেন প্রতিমা ডুবিয়ে দেবেন।

এইবার বোধহয় জব্বলপুরের ভেড়াঘাট সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ভেড়াঘাট জব্বলপুরের বিখ্যাত দ্রষ্টব্য স্থান। ভেড়াঘাটে এলে দেখতে পাবেন বিশ্ববিখ্যাত 'মার্বেল রক'-এর অসাধারণ শোভা। দু'পাশে সাদা মার্বেল পাহাড়ের মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে নর্মদা নদী।

নদীতে বোটে চেপে পর্যটকেরা পাহাড়ের সৌন্দর্য পান করেন। এখানকার প্রাকৃতিক গঠন বৈশিষ্ট্যের জন্য নদীর বাঁ-দিক বেশ গভীর, কোথাও কোথাও এই গভীরতা তিন চারশো ফুট পর্যন্ত। স্বভাবতই গভীরতার দরুন নদীর বাঁ দিকের জল শান্ত ও স্রোত কম। ডান দিকে নদীর গভীরতা খুবই কম। এত কম যে, কোথাও কোথাও জলের উপর পাথরও চোখে পড়ে। জলের দু-চার ফুট গভীরতার মধ্যে রয়েছে বহু পাথর ও পাথরের তৈরি খাঁজ। তাই ডান দিকে নদীর স্রোত খুব তীব্র।

বাঁ-দিকে বেশি জলে বিসর্জন দেওয়ায় ডুবে গিয়েছিল বটে কিন্তু ডুবন্ত অবস্থায় স্রোতের টানে ডান দিকে চলে যায় এবং প্রতিমার পাটাতন আটকে যায় কোন ডুবন্ত পাথরের খাঁজে। জলের তীব্র ধাক্কায় আটকে থাকা প্রতিমা সোজা দাঁড়িয়ে

পড়ে। ব্যাপারটা অসাধারণ হলেও অলৌকিক নয়।

২ নভেম্বর বিকেলে কোমরে নাইলনের দড়ি বাঁধা ডুবুরিরা নামল প্রতিমা ডোবাতে। পুলিশের এমন অর্ধামিক কাজে জনতা উত্তেজিত হলো। পুলিশ উত্তেজিত জনতার ওপর লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হলো। ডুবুরিরা দেবীপ্রতিমার পাটাতন কেমনভাবে পাথরের খাঁজে আটকে গেছে পরীক্ষা করে মূর্তিকে দড়ি বেঁধে টানাটানি করল, শাবল দিয়ে চাড় দিল, মূর্তি কিন্তু তেমনই দাঁড়িয়ে রইল। উন্মত্ত দড়ি জনতা ডুবুরিদের থামাতে পাথর ছুঁড়তে লাগল। তারই সঙ্গে মাঝে মাঝে সমস্বরে চিৎকার করতে লাগল, "জয় দুর্গে, জয় নর্মদে", "ধর্ম কী জয় হো, অর্ধমকা নাশ হো।" দারুণ উত্তেজনার মধ্যে দীর্ঘ সংগ্রামের পর রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ অধার্মিকেরাই জিতে গেল। মা দুর্গা অবশেষে ডুবলেন।

খেজুরতলার মাটি সারায় যত রোগ

সময় ২০০২ সাল। খবরটা দিয়েছিল সুদীপ চক্রবর্তী। যুক্তিবাদী সমিতির উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক। হাবড়া পারপাটনা থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে একটা খেজুর গাছের তলার মাটি খেতে নাকি প্রতিদিন কয়েক হাজার করে মানুষ আসছেন। শনি-মঙ্গলে ভিড় বাড়ে ব্যাপক। মাটি খেলে নাকি যে কোনও অসুখ সারে, তা সে ক্যানসার হোক, কী এডস।

প্রাথমিক সত্যানুসন্ধানের দায়িত্ব দিলাম সুদীপকে। পলাশ ও টিটু দুই যুক্তিবাদীকে নিয়ে সুদীপ অনুসন্ধান চালালেন। মছলন্দপুরের এক এস টি ডি বুথের মালিক তাপস রায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। অনেক তথ্য জানালেন খেজুরতলা ও বুড়ি মা'র বিষয়ে। সুদীপ জানালেন, এখন প্রত্যেকদিন ভক্ত সমাগম হচ্ছে অন্তত ১৫ হাজার। শনি-মঙ্গলে ভিড়টা ৩০-৪০ হাজারে পৌঁছচ্ছে। খেজুরতলায় বুড়ি মা'র থানে পুজো দিয়ে বুড়ি মা'র দেখা পাওয়া ব্রজেন ব্রহ্মের ছোঁয়া মাটি খেলেই শুধু অসুখ নয়, সব সমস্যা-ই মিটে যায়। বুড়ি মা আসলে ব্যাঘ্র বাহিনী দুর্গা, নাকি বনবিবি—এই নিয়ে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে।

সবশুনে ঠিক করলাম 'খোঁজ খবর'-এর সঙ্গে কাজটা করব। সুদীপকে আমার পরিকল্পনাটা জানিয়ে বললাম ৪ জুন মঙ্গলবার সকাল ৮টার মধ্যে হাবড়ায় ২ নম্বর রেল গেটে পৌঁছে যাচ্ছি। যাওয়ার আগে একটা কাজ সেরে ফেললাম। বেলঘরিয়ার আশিস মণ্ডল আশৈশব তোতলা। আশিসকে নিয়ে গেলাম কান-নাক-গলা বিশেষজ্ঞ ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্যের কাছে। তিনি পরীক্ষা করে নিজের ছাপান প্যাডে লিখেছিলেন বর্তমানে ওর তোতলা হওয়ার কারণ জিভ ও আলজিভের বিশেষ গঠন বৈশিষ্ট্য। বৈশিষ্ট্যের কারণ লিখে দিলেন।

দমদমে আমার ফ্ল্যাটে খোঁজখবর-এর গাড়ি এলো সকাল ৬টায়। সঙ্গী ফটোগ্রাফার দেবজ্যোতি ও আশিস। সকাল ৮টায় হাবড়া ২ নম্বর রেল গেটে পৌঁছে গেলাম। আমাদের জন্য সঙ্গীদের নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন সুদীপ। সুদীপকে গাড়িতে তুললাম। ওঁর সঙ্গীদের বললাম, আমাদের অপরিচিত হিসেবে আমাদের কাছাকাছি থেকে খেজুর তলার দিকে এগোতে। কোন সিচুয়েশনে কী করতে হবে তাও বোঝালাম। এখান থেকেই ভ্যান রিকশা, সাইকেল আর অটোর বিশাল ভিড়। বাস, ট্রেকার, মোটরগাড়ি ও মোটর বাইকেরও দেখা মিলছে মাঝে-মাঝেই। ওদের গন্তব্যস্থল কুমড়ো কাশীপুরের মোড়।

হাওড়া-মগরা রোড ধরে ভিড় ঠেলে এগোলাম। এসে পৌঁছলাম কুমড়ো কাশীপুর মোড়ে। এখান থেকে সবাই ঢুকবে পিচ রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তা ধরে। মোড়ের পাশে গাড়ি দাঁড় করালাম। দেবজ্যোতিকে বললাম 'বুম' থেকে (যেটা বাগিয়ে ধরে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়) 'খোঁজখবর'-এর 'লোগো'টা খুলে নিতে। এখন থেকে আমাদের প্রত্যেককে ভুলে যেতে হবে—খোঁজখবরের হয়ে ছবি তোলা হচ্ছে। আমি আর দেবজ্যোতি ছাড়া সুদীপ আমাদের টিভি টিমের সঙ্গী হিসেবে পরিচয় দেবেন। তাপস রায় তিন সঙ্গী ও এক সঙ্গিনী এবং মা, বউদি-কে নিয়ে আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন ওখানে। তাঁদের প্রত্যেকের করণীয় বুঝিয়ে দিলাম।

মোড়ের ভিড় সামলাচ্ছে গাদাগুচ্ছের ভলেন্টিয়ার। ২৫-৩০ জন কিশোর থেকে যুবক ফেরি করছে খেজুর তলার বুড়ি মা'র পাঁচালী। ২০-২৫ জন লেখকের লেখা পাঁচালিগুলোর দাম ৫ টাকা থেকে ১০ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ থেকে ১৬। খেজুর তলার হাতে আঁকা ছবির ছাপানো কপি বিক্রি হচ্ছে ১০ টাকা করে। নকুলদানা-ধূপকাটি-ফুল-বেলপাতার প্যাকেট বিক্রি হচ্ছে ৫ টাকা, সবের-ই দেদার বিক্রি। চা-বিস্কুট-ওমলেট-পরোটা-ঘুগনি-আলুরদমের দোকানগুলোয় গিজগিজ করছে ভিড়। খেজুরতলার কল্যাণে ওদের শ্রী ফিরেছে।

দেবজ্যোতি কিছুক্ষণ ছবি তুললো। আমাদের গাড়ি এগোলো কাঁচা রাস্তা ধরে। কাঁচা রাস্তায় দু-চার দিন হল রাবিশ পড়েছে। হাজারে হাজারে মানুষ চলেছেন ভারতীনগর কলোনি। সেখান থেকে জলা পেরিয়ে যেতে হবে পারপাটনা গ্রামের খেজুরতলায়। খেজুরতলার কৃপায় বহু নতুন অটো পথে নেমেছে। অত্যন্ত ধীর গতিতে এগুচ্ছি। আগে-পিছু হেঁটে, ভ্যান রিকশায়, অটোয়, সাইকেলে, বাইকে, কারে ভক্তরা চলেছেন। হাজারে-হাজারে মানুষ ফিরছেনও। ভ্যান রিক্সোয় পঙ্গু, অশক্ত, শায়িত রোগী-রোগিনী বেশি। ওঁদের অনেকেই এসেছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা এমনকী বাংলাদেশের খুলনা থেকে। রাত কাটিয়েছেন হাবড়া স্টেশনে অথবা যশোর রোডের পাশে গজিয়ে ওঠা বুড়িমার যাত্রীনিবাসে। যাত্রীদের শতকরা ৯০ ভাগ-ই অত্যন্ত গরিব ও শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া মানুষ।

রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় যাত্রীদের সুবিধার জন্য বহু মজুর খাটছেন মাটির পথকে রাবিশ ঢেলে গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত করতে।

দু কিলোমিটার গিয়ে আমাদের গাড়ি থামাতে হল। ভ্যান রিকশা থেকে মোটর বাইক—সবার যাত্রাপথ এখানেই শেষ। জায়গাটার নাম ভারতীনগর কলোনি। দু'দিন আগের অজ গাঁ, আশ্চর্য জাদুতে জমজমাট। গাড়ি জমা রাখতে হচ্ছে কলোনীর কুঁড়েঘরগুলোর সামনে। টাকা আদায় করছেন বাড়ির মেয়ে-বউরা। দক্ষিণা সাইকেল থেকে গাড়ি—এক টাকা থেকে পাঁচ টাকা। রাতারাতি প্রচুর দোকান গজিয়ে উঠেছে। দোকানে পাওয়া যাচ্ছে চা, বিস্কুট, ওমলেট, মুড়ি, ঘুগনি, ফুল-বাতাসা-ধূপ-বুড়িমা'র পাঁচালি, ছোটদের খেলনা-বেলুন, পান-বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি।

আর কয়েক পা এগোলেই বিস্তীর্ণ জলাভূমি। জলাভূমি পার হয়ে আবার তিন কিলোমিটারের মতো হাঁটলে খেজুরতলা, বুড়িমা'র থান। জলা পার হতে রয়েছে সাঁকো ও নৌকো। সাঁকোয় পার হতে এক টাকার টিকিট। নৌকোয় দু'টাকা।

ভারতীনগর কলোনিতে আমরা পা দিতেই খেজুরতলা মন্দির কমিটির নেতারা ও স্বেচ্ছাসেবকরা আমাদের গাড়ি ঘিরে ধরলেন। কোন টিভি কোম্পানির হয়ে আসছি, কীভাবে বিষয়টা দেখাতে চাই ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন তাঁদের। মন্দির কমিটির কেউই 'কাচ্চা খিলাড়ি' নন। তাঁরা রাজনীতি করেন। সি পি এম থেকে তৃণমূল—সবার শান্তিপূর্ণ সহবস্থান। মাইক ফুঁকে ভক্তদের উদ্দেশে জানান হচ্ছে—কোনও অসুবিধে হলে তাঁরা মন্দির কমিটির অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। বাঁশের খুঁটির ওপর টিনের চাল ও রঙিন কাপড়ে ঘেরা মন্দির কমিটির অফিস, মন্দির কমিটির অনুরোধে আমাদের চা ওমলেট খেতে হল। আমাদের উপর নজর রাখার জন্য তিনজন স্বেচ্ছাসেবী দিয়ে দিলেন। ওই তিনজন এখন গাইড।

নৌকোয় উঠলাম আমরা। যাত্রী আরও অনেকেই। গাইডদের কল্যাণে আমরা বিনে পয়সার সওয়ার। লগি ঠেলে মিনিট পনেরো জল কেটে আমরা পারে পৌঁছলাম। ডাঙায় নামতেই জুতো সমেত পা আধ-হাঁটু জলের তলায়। আলপথ আর ধানখেত মিলে-মিশে একাকার লক্ষ মানুষের দাপা-দাপিতে। চ্যাট-চ্যাটে কাদা ভেঙে পতন সামলাতে সামলাতে এগোচ্ছি আমরা। হাজারে-হাজারে কাতারে-কাতারে মানুষের মহামিছিল। একদল যাচ্ছেন। একদল ফিরছেন। দূরে দেখা যাচ্ছে সাঁকো পথে পিঁপড়ের সারির মত মহামিছিল। এঁটেল মাটি থেকে পা তুলে তুলে পতন সামলাতে সামলাতে এগোনোর চেষ্টা আমাদের মত অনভিজ্ঞ শহরবাসীদের কাছে যে কী কষ্টকর—তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম। তিন কিলোমিটার পথ পেরুতে আমাদের প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় লাগল।

একটা লম্বা খেজুর গাছ ঘিরে বিশাল এলাকা জুড়ে উঁচু টিনের শেড গড়ে

উঠেছে। খেজুর গাছটার বৈশিষ্ট্য, সাধারণ খেজুর গাছের তুলনায় অনেক বেশি লম্বা। উচ্চতায় ৪০-৪৫ ফুট হবে। আমাদের দেশের মানুষ অসাধারণ অনেক কিছুতেই দেবত্ব আরোপ করেন। যেমন জোড়া মানুষ, বাড়তি পা-ওয়ালা গরু ইত্যাদি। তেমন-ই ব্যাপারটা ঘটেছে খেজুরের এই গাছের বেলায়। তবে এমন লম্বা বা এর চেয়েও লম্বা খেজুর গাছ আমার যাযাবর জীবনে এর আগেও কয়েকবার দেখেছি।

খেজুরতলার গায়ে-ই মানিক পিরের মাজার। এই মাজার-ই বলতে গেলে এখন বুড়িমার থানে রূপান্তরিত হয়েছে।

যখন পৌঁছলাম, তখন খেজুর গাছ পুজো হচ্ছে। গাছ ঘিরে নতুন টিনের বিশাল হল গড়ে উঠেছে। গাছের তলায় ঘট পাতা। ঘটের উপর প্রচুর শাড়ি। খেজুর গাছেও প্রচুর শাড়ি জড়ানো। ঢাকের বাদ্যি, কাসর ঘণ্টার আওয়াজ, ধুনোর ধোঁয়া ও গন্ধ হাজার ভক্তের ভিড়। পুরোহিত ব্রজেন ব্রহ্ম। তাঁকে ঘিরে একগাদা নারী-পুরুষ। এঁরা পুরোহিতের সাহায্যকারী। এঁরা হাতে হাতে মাটির তাল এনে দিচ্ছেন ব্রজেন ব্রহ্মের কাছে। ব্রজেন ব্রহ্ম মাটির তাল খেজুর গাছে ছুঁইয়ে আবার ফিরিয়ে দিচ্ছেন। তাল হাতে হাতে ফিরে এসে ছোট ছোট নাড়ু বা মোয়ার সাইজ হয়ে ভক্তদের হাতে যাচ্ছে। অনেকে ওখানেই পরম ভক্তির সঙ্গে কপ-কপ করে কামড়ে মাটি খেয়ে নিচ্ছেন। সে এক অদ্ভুত গণউন্মাদনা। মন্দির কমিটির এজেন্টরা গোটা দশেক মাইকে ঘোষণা করে চলেছেন, আপনারা যাঁরা খেজুর তলার অলৌকিক মাটি সংগ্রহ করেছেন, তাঁরা বেরিয়ে আসুন ও বাইরে অপেক্ষারত হাজার হাজার ভক্তদের ঢোকবার সুযোগ করে দিন। টিনের শেডের তলায় অন্তত ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবী। তাঁরা ভিতরের ভক্তদের বের করে দিয়ে বাইরের মানুষদের ঢুকতে সাহায্য করছেন। থেকে থেকে স্লোগান উঠছে 'জয় খেজুরতলার জয়', 'জয় বুড়িমা'র জয়'। স্লোগান দিচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবীরা। সুর মেলাচ্ছেন ভেতর-বাইরের হাজার হাজার ভক্ত। গণহিস্টিরিয়া তৈরির সব প্রকরণ-ই তৈরি।

মাইকে যিনি ঘোষণা করছিলেন তাঁকে অনুরোধ করলাম, সাক্ষাৎকার নেবো ব্রজেন ব্রহ্মের, এইসময় ঢাক-কাঁসর আর জয়ধ্বনি যেন বন্ধ থাকে। মাইকে ঘোষণা করা হলো—কলকাতা থেকে টিভি টিম এসেছে। তাঁরা ব্রজেন ব্রহ্মের ইন্টারভিউ নেবেন। তাই ঢাক ও কাঁসর বাজানো বন্ধ রাখতে অনুরোধ করছি।

ব্রজেন ব্রহ্ম ওরফে ব্রজেন ব্রহ্মচারী স্বাস্থ্যবান লম্বায় ৫ ফুট ১০ থেকে ১১ ইঞ্চির মধ্যে। গায়ের রঙ কালো। পরনে লাল পাড় সাদা শাড়ি, খালি গা। সাক্ষাৎ দিলেন। শোনালেন বুড়ি মা'কে পাওয়ার কাহিনি।

শিক্ষার সুযোগ মেলেনি। পেশা—আশেপাশের গাঁ থেকে ডিম কিনে হাবড়া বাজারে বিক্রি করা। থাকেন মাঠপাড়ায়। ওপার বাংলার ছিন্নমূল উদ্বাস্তু। গুছিয়ে কথা বলতে অভ্যস্ত।

জানালেন, মাসখানেকও হয়নি; গত ৮ জ্যৈষ্ঠ দুপুর বেলার ঘটনা। ডিমের ঝুড়ি নিয়ে খেজুরতলা দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঠা-ঠা রোদ্দুর। হঠাৎ পেটে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হল। ডিমের ঝুড়ি নামিয়ে পেটে চেপে কাতরাতে থাকেন। ঠিক সেইসময় ওখানে আবির্ভূতা হলেন অসাধারণ সুন্দরী এক বৃদ্ধা। পরলে লাল পাড়ের সাদা শাড়ি। গোটা শরীর থেকে সূর্য-রশ্মির মত তেজ বেরচ্ছে। বুড়ি মা বললেন, ভক্তি আর বিশ্বাস নিয়ে এই খেজুরতলার মাটি খা, তোর ব্যথা সেরে যাবে।

খেতে সত্যিই মুহূর্তে ব্যথা সেরে গেল। বুড়ি মা-কে গড় হয়ে প্রণাম করলেন ব্রজেন ব্রহ্ম। মা বললেন, "বাবা ব্রজেন, তুই এই কথা প্রচার কর, যে ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে খেজুরতলার মাটি খাবে, বুড়ি মা'র কৃপায় সে যে কোনও রোগ থেকে মুক্ত হবে।"

ব্রজেন ব্রহ্ম তারপর পারপাটনা গ্রামের কয়েকজনকে ঘটনার কথা বলেন। গ্রামের কার্তিক পাড়ুই, মাধব হাজরা আরও কিছু যুবকের নেতৃত্বে খেজুর গাছের আশে-পাশের জঙ্গল কেটে বুড়ি মা'র থান তৈরি করে। মা'য়ের কৃপায় দেখতে দেখতে এখন প্রত্যেকদিন হাজার তিরিশেকের মতো লোক হচ্ছে। শনি-মঙ্গলবার ৪০-৫০ হাজার। ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে এই খেজুর তলার মাটি খেয়ে এডস রোগী, ক্যানসার রোগীও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। যে কোনও সমস্যা নিয়ে-ই আসুন, অলৌকিক মাটির গুণে সব সমস্যার-ই সমাধান হবে।

আশিস মণ্ডলকে এগিয়ে দিয়ে জানালাম, বেচারা তোতলা। ওকে মাটি খাইয়ে সারিয়ে তুলতে পারলে আমরা হাতে গরম প্রমাণ পেয়ে যাই।

ব্রজেনবাবু আশিসকে মাটি খাওয়ালেন। সে'সব ছবিও ডিজিটাল ক্যামেরায় তুললেন দেবজ্যোতি।

জিজ্ঞেস করলাম, মানিক পিরের মাজারকে আপনারা বুড়িমা'র থান বানিয়ে স্রেফ ব্যবসা করছেন বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় মুসলিম ধর্মের মানুষরা। এখানে বনবিবির পুজো করতেন স্থানীয় মানুষরা। বনবিবিকে আপনারা বুড়ি মা বানিয়ে টাকা কামাচ্ছেন, লোক ঠকাচ্ছেন বলে ওঁদের অভিযোগ। আপনি কী বলেন?

ব্রজেন ব্রহ্ম এমন বেয়াড়া প্রশ্নের জন্য বোধহয় তৈরি ছিলেন না। তারপর হঠাৎ করে ক্ষোভ উগরে দিলেন মন্দির কমিটির উপর। বললেন, যা প্রণামী পড়ে, ছবি, সাঁকো, নৌকো থেকে যা রোজগার, সবই নিয়ে নেয় মন্দির কমিটি। ব্রজেন ব্রহ্ম মাসে মাত্র দেড় হাজার টাকা পান। নৌকোর মাঝি থেকে স্বেচ্ছাসেবকরাও মাসে সামান্য টাকা মাইনে পান। এ'সবই দেয় মন্দির কমিটি। খেজুরতলা মন্দির কমিটিতে যাঁরা আছেন তাঁরা-ই মোটা টাকা কামাচ্ছেন। আর তাইতে-ই রাগ গ্রামের মুসলিম মুরুব্বিদের। তাঁদের আসল উদ্দেশ্য, চাপ দিয়ে মন্দির কমিটিতে ঢুকে

পড়া। এই জমিটা ইউনিস বিশ্বাসদের। তারাও মন্দির কমিটিতে ঢুকতে চায়, টাকার গন্ধে।

—মন্দির কমিটিতে কারা আছেন?

—আশে-পাশের অঞ্চলের রাজনীতিকরা লোকগুলোই মন্দির কমিটির নেতা হয়ে বসেছেন। আমাকে ভাঙিয়ে খাচ্ছে, হাড়-ভাঙা খাটাচ্ছে, আমাকেই ঠকাচ্ছে। আপনারা একটু দেখুন।

বললাম, ভক্তি আর বিশ্বাস নিয়ে মাটি খেয়ে নিজের সমস্যার সমাধান করছেন না কেন? কেন আমাদের সাহায্য চাইছেন? তার মানে, আপনি নিজে-ই খেজুর তলার মাটির অলৌকিক গুণে বিশ্বাস করেন না!

না। কিছুক্ষণ আমতা-আমতা করলেন। জবাব দিতে পারলেন না।

গেলাম মন্দির কমিটির অফিসে। খেজুরতলা থেকে দশ গজের পথ। নতুন ঢেউখেলানো টিন দিয়ে সদ্য তৈরি একটা হল। কয়েকটা টেবল জোড়া দিয়ে বসানো হয়েছে হলের মাঝে। চার-পাশেই পাতা হয়েছে অনেকগুলো ফোলডিং চেয়ার।

মন্দির কমিটির অনেককেই পেয়ে গেলাম। সভাপতি কালীপদ বিশ্বাস পেশায় সাব-ইনস্‌পেকটর অফ স্কুল। যুগলচন্দ্র দাস সম্পাদক। এখানকার প্রভাবশালী সি পি এম রাজনীতিক। সুনীলকুমার বিশ্বাস কোষাধাক্ষ। পেশায় উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক। ৩৭ জনকে নিয়ে গড়ে উঠেছে মন্দির কমিটি। কমিটিতে সি পি এম, তৃণমূল, কংগ্রেস শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করছেন।

আমাদের সঙ্গে কথা বলার দায়িত্ব নিয়েছিলেন কালীপদ বিশ্বাস, যুগলচন্দ্র দাস, সুনীল বিশ্বাস ও কমিটির সদস্য কার্তিক দাস (স্থানীয় তৃণমূল নেতা)। টি ভি ক্যামেরার সামনে কথা বলতে হবে বুঝে-সমঝে। যে কোনও হিজিবিজি লোককে তো আর মুখপাত্র হিসেবে হাজির হতে দেওয়া যায় না। মুখপাত্রদের হিসেব—দৈনিক গড়ে ৩০-৪০ হাজার লোক হচ্ছে। গত শনি-মঙ্গল হয়েছে ৬০ থেকে ৮০ হাজার। প্রণামী পড়ছে দু-পাঁচ টাকা থেকে হাজার টাকাও। বললাম, তাহলে গড়ে দৈনিক অন্তত লাখ দুয়েক টাকা আয় হচ্ছে? অনিচ্ছায় সে কথা স্বীকার করলেন কোষাধ্যক্ষ। ব্রজেনবাবুর অভিযোগের উত্তরে জানালেন, প্রণামীর টাকা জমা রাখছি মন্দির, ভক্তদের জন্য রাত্রিনিবাস, রাস্তা তৈরির জন্য খরচ করব বলে।

কোনও ব্যাঙ্কে নিশ্চয়-ই জমা রাখছেন? জিজ্ঞেস করলাম।

উত্তর না দিয়ে কোনও একটা কাজের কথা হঠাৎ করে মনে পড়ে যাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কথায় কথায় খেজুরতলা মন্দির কমিটির মুখপাত্ররা স্বীকার করলেন, (১) কয়েক দিন আগে একটা বিবাদ হয়েছিল। কিছু লোভী মানুষ তাদেরও মন্দির কমিটিতে ঢোকার দাবি তুলে ঘোঁট পাকিয়ে ছিল। (২) ঘোঁটটা একটু বড় আকার ধারণ

করায় দেগঙ্গা থানাকে খবর দিতে হয়। (৩) থানার অফিসার ইনচার্জ—অরুণকুমার হাজরা নিজে-ই এসেছিলেন। গোলমাল মিটে গেছে। (৪) বুড়িমা আসলে ব্যাঘ্রবাহিনী দুর্গা। স্থানীয় কিছু মুসলিম বদ মতলবে মা দুর্গাকে বনবিবি বলে চালাতে চাইছে। (৫) হ্যাঁ, এই খেজুর তলায় বনবিবির থান ছিল, তো কী হয়েছে? (৬) ডাকাত বাল্মীকি অবতার হয়েছিলেন। আবার ভক্ত রাবণ নারী লোভে সোনার লঙ্কা ছারখার করে দিলেন। ব্রজেন ব্রহ্ম'কে মা দুর্গা দেখা দিলেন, এরপরও লোকটা রাবণের মত-ই লোভি হয়ে উঠছে বলতে হবে—যদি ওর ক্ষোভের কথা সত্যি হয়। (৭) পারপাটনার চাষী লক্ষ্মণ দাস একদিন রাতে জমিতে জলসেচ দিতে এলে দেখেন এক অপূর্ব সুন্দরী বৃদ্ধা বিশাল এক বাঘের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। (৮) ওই গ্রামের-ই আর এক চাষী জগদীশ দাস একদিন রাতে জমিতে জলসেচের জন্য পাম্প চালাতে এলে দেখেন, দুর্গা প্রতিমার মত রূপের এক বৃদ্ধা তিনটে বিশাল বাঘকে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। (৯) তিন বোবার নাম ঠিকানা দিলেন যাঁরা মাটি খেয়ে কথা বলছেন। তাঁরা হলেন (ক) বোধ দাস, দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা (খ) দীপক ভট্টাচার্য, পারপাটনা, উত্তর ২৪ পরগনা (গ) প্রদ্যুৎ দাস, এ জি কলোনি, হাবড়া। দশ বছর ধরে প্যারালিসিস ছিলেন গাইঘাটার নিখিল দে। মা'য়ের অপার কৃপায় স্বাভাবিকভাবে হাটতে শুরু করেছেন মাটি খাওয়ার পরের দিন থেকেই। কুমড়ার (একটা জায়গার নাম) অনিল ঘোষের নাতি থ্যালাসেমিয়া রোগী। মাটি খেয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ। ধীরেন গোলদার। নিবাস কুমড়া, উত্তর ২৪ পরগণা। উন্মাদ পাগল। মা'য়ের কৃপায় এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। এমনি মাটি খেয়ে রোগমুক্ত হওয়া মানুষের আরও ঠিকানা ওঁরা দিতে পারেন—যদি আমরা চাই। (১০) গঙ্গানগর থানার ওসি অরুণ হাজরা নিজেই মন্দির কমিটির সদস্য।

ভক্তদের মধ্যে অনেকেই বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, সে তো আগেই বলেছি। কিন্তু তাঁদের কেউই পাসপোর্ট বা ভিসা নিয়ে আসেননি। ~~এসেছেন দালাল ধরে,~~ দু'পারের সীমান্তরক্ষিদের ঘুষ দিয়ে। সে'সব কথাও ক্যামেরার সামনেই ওঁদের অনেকেই বললেন। আরও একটা জরুরি তথ্য জানালেন, দেগঙ্গা থানার যে ক'জন পুলিশ এখানে ডিউটি করেন, তাঁরা নাকি ওদের ভাষা শুনে ঠিক ধরে ফেলেন। তারপর নাকি অবৈধভাবে প্রবেশের জন্য গ্রেপ্তার করে কোর্টে তোলার নাম করে যার কাছ থেকে যতটা পারেন লুটে নেন।

গঙ্গানগর থানার অফিসার ইনচার্জকে থানায় পেলাম। তাঁকে বে-আইনি অনুপ্রবেশ ও পুলিশি অত্যাচারের কথা জানালাম। এই অনুপ্রবেশকারীদের কেউ যদি পাকিস্তানের গুপ্তচর বা আলকায়দার সদস্য হয়? এত বড় জনসমাবেশে বিস্ফোরণ ঘটায়? তখন আপনার পুলিশকেই আমরা এর জন্য দায়ী করব।

ওসি অরুণকুমার হাজরা কাঁধ থেকে মাছি তাড়াবার মতো করেই বিষয়টা

উড়িয়ে দিলেন—ধুর! এমন ঘটনা ঘটতে-ই পারে না। অনুপ্রবেশ ঘটলে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ খবর দিত।

বর্তমানে খেজুরতলার বুড়িমা

ওসি'র সামনে রেকর্ড করা ক্যাসেট চালু করলেন দেবজ্যোতি। সব দেখেশুনে অরুণবাবু থতমত। শুধু বললেন, এসব জানতাম না। এখন জানলাম। যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিচ্ছি। স্বীকার করলেন, বনবিবির থানকে বুড়ি মা'র মন্দির তৈরি করা নিয়ে একটা উত্তেজনা রয়েছে। দিন কয়েক আগে রায়টের মতো একটা পরিস্থিতি হয়েছিল। পুলিশবাহিনী নিয়ে ওখানকার পরিস্থিতি সামলাই। মন্দির কমিটিতে কয়েকজন মুসলিমকেও নিয়েছি। হ্যাঁ মন্দির কমিটিতে আমি আছি।

খেজুরতলার মাটি খেলে যে কোনও অসুখ সেরে যাবে বলে যে প্রচার মন্দির কমিটি চালাচ্ছে, তা সম্পূর্ণ বে-আইনি। ড্রাগ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট থেকে ড্রাগ লাইসেন্স না নিয়ে এমন অলৌকিক ওষুধ বিক্রির কম করে শাস্তি পাঁচ বছরের

জেল। আপনার কি ড্রাগকন্ট্রোল ডিপার্টমেণ্টকে খেজুরতলার মাটি দিয়েছিলেন পরীক্ষা করতে? তাঁরা কি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, এই মাটিতে যে কোনও অসুখ সারাবার ক্ষমতা রয়েছে। তাঁরা কি এই মাটি সব রোগের দাওয়াই হিসেবে রোগীদের হাতে তুলে দেবার জন্য লাইসেন্স দিয়েছেন? (এই আইন বিস্তৃতভাবে জানতে 'জ্যোতিষীর কফিনে শেষ পেরেক' পড়তে পারেন)।

—আমি জানি না। এ বিষয়ে কিছু জানতে হলে মন্দির কমিটিকে জিজ্ঞেস করুন। বললেন অরুণবাবু।

—আপনিও মন্দির কমিটির সদস্য। সুতরাং আপনাকেও এ'সব প্রশ্নের উত্তর জানতে-ই হবে। মাটি খেয়ে অনেকের অসুখ বেড়েছে কি না, খবর নিয়েছেন? বাড়লে বা নতুন অসুখ হলে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে প্রতারণার অভিযোগ আপনাদের বিরুদ্ধে আনা যায়। এ ধরনের গুজব ছড়ানোটা ক্রাইম। আপনি কী বলেন?

মন্দির কমিটি নিয়ে স্থানীয় মানুষদের আরও অভিযোগ আছে। মন্দির কমিটির বিশাল আয়, কিন্তু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই। অভিযোগ উঠেছে, প্রণামীর টাকা মন্দির কমিটির নেতারা-ই মেরে দিচ্ছেন। খরচ করছেন ছিঁটে-ফোটা। মন্দির কমিটির একজন হিসেবে অভিযোগের তিরটা আপনার দিকেও আছে।

অপ্রিয় প্রশ্নগুলো শোনার পর অরুণবাবুর মনে পড়ে গেল একটা জরুরি কাজের কথা। বললেন, এক্ষুণি বের হতে হবে। আপনারা বরং আর কিছু জানতে হলে সাব-ইনস্‌পেকটর অর্ঘ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলুন। মিস্টার চক্রবর্তী পাশের রুমে আছেন। আমি ওকে বলে দিচ্ছি আপনাদের সাহায্য করার জন্য।

অর্ঘ চক্রবর্তী টি ভি সিরিয়ালে অভিনয় করেন। ওসি'র কাছে করা কোনও প্রশ্নের-ই উত্তর দিলেন না বা দিতে পারলেন না। ও সি যে আমাদের এড়াতেই অর্ঘকে দেখিয়ে দিয়েছেন বুঝতে অসুবিধে হলো না।

একটা ঘটনা সাংঘাতিকভাবে নাড়া দিল। অন্তত দশ জন জমির মালিক জানালেন, গত দু মাস আগে এখানে জমির দাম ছিল বিঘা ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা। এখন বিঘা ৫ লাখে উঠেছে। দাম আরও উঠবে ভেবে অনেক জমির মালিক এখন জমি ছাড়তে চাইছে না। গত মাস খানেক আগে যারা বিঘা ১৫-২০ হাজারে জমি বায়না নামায় সই করে অ্যাডভান্স নিয়েছেন, তারা এখন কপাল চাপড়াছেন।

কত জমি এমন বায়না নামায় বাঁধা পড়েছে?

আমার এই প্রশ্নের উত্তরে মন্দির কমিটির সভাপতি কালীপদ বিশ্বাস জানালেন শ'দুয়েক বিঘা তো হবে-ই। সম্পাদক যুগলচন্দ্র দাসের অনুমান তিন'শো বিঘার কম নয়। খেজুরতলার জমি যাদের, সেই বিশ্বাস পরিবারের ইউনিস ভাই বললেন, আমাদের জমি বিক্রি করার জন্য চাপ আসছে। খেজুরতলার লাগোয়া জমি। দাম

অনেক উঠবে। তবে অনেকেই বায়না নামায় সই করে টাকা নিয়েছেন।

একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হল, সমস্ত জমি কেনার জন্য বায়না করেছেন একজন-ই। আবার সেই একজন-ই নাকি চাকলার বিস্তীর্ণ জমির মালিক ছিলেন। তিনিই সস্তায় প্রচুর জমি কিনে চাকলাকে লোকনাথের জন্মস্থান বলে প্রচার করতে শুরু করেন। চাকলায় বাঁকে জল নিয়ে মানুষের মিছিলের পরিকল্পনা নেন। সেই মত লোকনাথ ভক্তদের জন্য পথের পাশে-পাশে শ'য়ে শ'য়ে অস্থায়ী বিশ্রামালয় তৈরি করে দেন। সেখানে বাঁকগুলো ঝুলিয়ে রেখে ভক্তরা জল- শরবত-ফল-বাতাসা-সন্দেশ খান, চেয়ারে বসে জিরিয়ে নিয়ে আবার পথ চলেন। ম্যারাপ বেঁধে, মাইকে লোকনাথের গান বাজিয়ে, হাজার হাজার ছেলে-মেয়েদের কাজে লাগিয়ে একটা পরিকল্পিত গণউন্মাদনা তৈরি করা হয়েছিল। ফল মিলেছিল হাতে হাতে। ৩-৪ হাজার টাকা বিঘায় কেনা জমি এখন ৫০ হাজার থেকে ৭৫ হাজার টাকা কাঠায় বিকোচ্ছে। অর্থাৎ ১৫০ টাকা কাঠায় কেনা জমি বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে ৭৫ হাজারে।

যে লোকনাথের নাম কোনও ঐতিহাসিকের জানা ছিল না,
ইতিহাসে অনুল্লিখিত লোকনাথ'কে প্রচারে কিংবদন্তি
করে দিলো এক জমির প্রোমোটার!
প্রোমোটার এখন কয়েকশো
কোটি টাকার মালিক।

সে নাকি এ'বার খেজুরতলাকে তীর্থ বানাতে হাত বাড়িয়েছেন।
সত্যিই বড় আশ্চর্য আধ্যাত্মবাদের দেশ এই ভারত?
এই এপিসোড দেখান হলো খোঁজ খবর-এ।

বিশিষ্ট রসায়নবিদ ডঃ শ্যামল রায় চৌধুরীর হাতে তুলে দিলাম খেজুরতলার মাটি। কয়েকদিন সময় নিলাম মাটি পরীক্ষার দিতে। সাত দিন পরে রিপোর্ট মিললো। মাটিতে পাওয়া গেছে ক্রিমি, ক্রিমির ডিম ও নানা রোগ-জীবাণু।

সাত-দিনেও আশিসের তোতলামোর একটুও উন্নতি দেখা গেল না। ডা. অমিতাভ ভট্টাচার্য আশিসকে আবার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে জানালেন, আশিসের গলার অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে।

তা-হলে?

আমরা খেজুরতলায় যা দেখেছি, যা পেয়েছি, সব-ই দেখান হল খোঁজ খবর-এ। তারপর দ্রুত কয়েকটি ঘটনা ঘটলো। (১) একটি বিজ্ঞান সংগঠন কুমড়ো কাশীপুর বাজার মোড়ে খেজুর তলার বুজরুকির বিরুদ্ধে সভা করতে গিয়ে আক্রান্ত হল। (২) বিশাল এলাকা জুড়ে যুক্তিবাদী সমিতির পোস্টার পড়ল, বিষয়—খেজুরতলার বুজরুকি। (৩) স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দাবদাহ'-তে আমার সত্যানুসন্ধান-এর রিপোর্ট এবং খেজুরতলার বুজরুকির খবর প্রকাশিত হতে-ই দাবদাহ-এর সম্পাদক কালীকুমার চক্রবর্তী খুনের হুমকি দেওয়া কয়েকটা ফোন পেলেন। একদিন বাড়িতে চড়াও হয়ে কয়েকজন হুমকি দিয়ে গেল। দলে চাকলা'র কয়েকজন মস্তান, কুমড়ো কাশীপুরের মস্তান ও যুক্তিবাদী সমিতি থেকে বহিষ্কৃত দীপককে দেখা গেছে। অশোকনগর থানাকে বিষয়টি জানিয়েছেন কালীকুমার চক্রবর্তী। (৪) ভক্তের ভিড়ে স্পষ্টত-ই ভাটার টান দেখা দিয়েছে।

২৩ দিন পর আবার আমরা হাজির হলাম খেজুরতলায়। এ'বারও আমি আর দেবজ্যোতি। হাবড়া থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন সুদীপ চক্রবর্তী। কাছি-কাছি অঞ্চলের যাঁরা রোগমুক্ত হতে মাটি খেয়েছেন, তাঁদের ঠিকানা গতবার-ই সংগ্রহ করা ছিল। সে'সব বাড়ি খুঁজে-খুঁজে তাঁদের শারীরিক অবস্থার খবর নিলাম। উপেন-এর মোড়ের এক নিঃসন্তান মহিলা মাটি খেয়ে পেট ব্যথায় নার্সিংহোমে ছিলেন পাঁচ দিন। মাটি-খাওয়া মানুষগুলো ক্যামেরার সামনে প্রচণ্ড ক্ষোভ উগরে দিলেন—বিশাল কষ্ট করে খেজুরতলায় গিয়ে মাটি খেয়ে রোগ তো সারে-ইনি, বরং বেড়েছে। মন্দির কমিটির দেওয়া রোগমুক্তদের তালিকা খুঁজতে গিয়ে অবাক হলাম, ওঁদের বাস্তব অস্তিত্ব-ই নেই।

গঙ্গানগর থানার ইটভাটায় দাঁড়িয়ে থাকে ডজন'খানেক লরিতে মাটি বোঝাই হচ্ছে দেখে আমাদের গাড়ি থামল। মাটি কোথায় যাবে? জিজ্ঞেস করতেই আশ্চর্য উত্তর পেলাম। রাতে এইসব লরি যাবে খেজুরতলায়, মাটি ফেলতে। কমে যাওয়া মাটি ভরাট করার কী বিচিত্র কারচুপি?

কুমড়ো কাশীপুরের মোড়ে এলাম। এখানে আমাদের জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। সেই ভিড় কোথায়? লোক কোথায়? ভক্তরা ভ্যানিশ?

হায় প্রোমোটার! হায় মন্দির কমিটি! হায় বুড়ি মা'র খেজুরতলা! গুজবের ঢাউস গ্যাস বেলুনে পিন ফোটাতেই ফু-উ-স, চুপসে মাটিতে।

খোঁজ খবর-এর দ্বিতীয় এপিসোডে দেখানো হল রসায়ন বিজ্ঞানী ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরীর মতামত, আশিস সম্বন্ধে ডা. অমিতাভ ভট্টাচার্যের মতামত, মাটি ফেলার কেচ্ছা, মাটি খেয়ে আরও অসুস্থ হয়ে পড়া মানুষদের তীব্র ক্ষোভ ও

সুপার-ফ্লপ ভক্ত-সমাগম, অন্য জায়গা থেকে মাটি এনে খেজুরতলায় ফেলার কাহিনি।

এখন মানুষ আর মাটি খেতে যায় না।

পক্ষিতীর্থমের অমর পাখি

'পক্ষিতীর্থম' দক্ষিণ ভারতের একটি প্রখ্যাত ধর্মস্থান। মাদ্রাজ থেকে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দূরে থিরুকালিকণ্ডুম নামে একটা জায়গায় পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পক্ষিতীর্থ মন্দির। প্রতিদিন বেলা এগারোটা থেকে বারোটা নাগাদ একটি বা দুটি পাখি উড়ে আসে পক্ষিতীর্থে। পুরোহিতের নিবেদন করা ভাত, ময়দা, ঘি ও চিনিতে তৈরি খাবার খেয়ে আবার ওরা উড়ে চলে যায়। পুরোহিত বলেন, প্রতিদিন এই পক্ষিদেবতা বা দেবতারা উড়ে আসেন সুদূর বারাণসী থেকে, নিবেদিত খাদ্য গ্রহণের পর আবার ফিরে যান বারাণসীতে। পুরোহিতেরা আরও বলেন, এই পক্ষিদেবতারা অমর। যুগ-যুগান্ত ধরে তাঁরা এমনি করেই প্রতিদিন উড়ে এসে পুজো গ্রহণ করে আবার ফিরে যান। এরা নাকি পৌরাণিক যুগের পাখি। দীর্ঘকাল আগেই নাকি এই জাতীয় পাখি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জীব মাত্রেই মরণশীল—এই তত্ত্ব পক্ষিদেবতাদের বেলাতে খাটে না। পুরোহিতদের প্রতিটি কথাকে অভ্রান্ত সত্য বলে ধরে নেওয়ার মতো ভক্তের অভাব নেই আমাদের দেশে। তারা পক্ষিতীর্থের পক্ষিদেবতার অলোকিকত্বকে স্বীকার করে নিয়ে পরম ভক্তির সঙ্গে পুজো দিতে যায়।

অনেক মানুষই অলৌকিক কোন কিছুকে দেখতে আগ্রহী, অলৌকিকে বিশ্বাস করতে আগ্রহী। তাই, অস্বাভাবিক কোন কিছু দেখলেই অন্ধ বিশ্বাসে তাকেই অলৌকিক বলে ধরে নেয়।

পাখিদের ঠিক একই সময়ে উড়ে আসা এবং খাবার খাওয়ার মধ্যে কিছুটা অস্বাভাবিকতা থাকলেও অসম্ভব কিছু নয়। আপনার বাড়ির আশেপাশের কাকদের নিয়ম করে কিছুদিন দিনের যে কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে খাবার দিতে থাকুন, কয়েকদিন পরেই দেখবেন, ঠিক খাবার দেওয়ার সময় কাকেরা এসে হাজির হচ্ছে।

আমার স্ত্রী এক সময় প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে ন'টার মধ্যে একটা কাক ও একটা চড়ুইকে নিজের হাতে খাওয়াতো। প্রতিদিন ঠিক ওই সময়ে পাখি দুটো এসে হাজির হতো এবং ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিত। বেশি চেঁচামেচি করলে আমার স্ত্রী ধমক দিত। ওরাও বকুনি খেলে দিব্যি বুঝদারের মতো চুপ করে যেত। পাখিদের এই ধরনের ব্যবহারের কারণ হলো অভ্যাস বা ট্রেনিং।

এই পাখি দুটির ব্যবহার অন্য পাখিদের তুলনায় কিছুটা অস্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়।

অনেকের মনে হতে পারে, খাবার খেতে শুধু দুটি মাত্র পাখি আসে কেন? কেন অন্য পাখিরাও আসে না?

আমার স্ত্রী সীমাকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখেছি চারদিকে খাবার ছিটিয়ে অনেক পাখিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা না করে, একটা বা দুটো পাখিকে আলাদা করে খাওয়াবার চেষ্টা করলে শুধু তারাই খাবার দেবার নির্দিষ্ট সময়ে এসে হাজির হয়। আমি একবার প্রায় এক বছর ধরে সামনের বারান্দায় বসে সকালের চা খেতাম এবং আমার বিস্কুট থেকে একটা টুকরো একটা কাককে দিতাম। প্রতিদিনই কাকটা বিস্কুটের টুকরোর লোভে আমার সকালের চা খাওয়ার সময়ে এসে হাজির হতো।

তাহলে এটুকু নিশ্চয়ই বোঝা গেল যে, পক্ষিতীর্থের পাখিদের নির্দিষ্ট সময়ে খেতে আসার মধ্যে কোন অলৌকিক নেই। এবার দেখা যাক, পাখি দুটো সত্যিই প্রতিদিন ১৩০০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে কাশী থেকে উড়ে আসে এবং তাদের নিবেদিত ভোগ গ্রহণ করে আবার কাশীতেই ফিরে যায় কি না?

সত্যিই যদি কাশী থেকেও পাখিরা আসছে বলে ধরে নিই, তবুও তাকে অলৌকিক কিছু বলা যায় না, ১৩০০ কিলোমিটার কেন, কয়েক হাজার কিলোমিটার পথ উড়ে যাযাবর পাখিরা জায়গা চিনে এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশের নির্দিষ্ট কোন চিড়িয়াখানায় বা জলাশয়ে বিশেষ একটা নির্দিষ্ট সময়ে এসে হাজির হয়।

কিন্তু পক্ষিবিশেষজ্ঞদের মনেও বিস্ময় জাগে, যখন শোনা যায় পক্ষিদেবতা প্রতিদিনই ১৩০০ কিলোমিটার পথ উড়ে আসে এবং ১৩০০ কিলোমিটার উড়ে ফিরে যায়।

সত্যিই যে ওরা বারাণসী (কাশী) থেকে আসে তার কোন প্রমাণ নেই। অবশ্য কিছু পক্ষিবিশেষজ্ঞের মতে পাখি দুটি উৎসর্গীকৃত ভোগ গ্রহণের পর একটু দূরের একটা ছোট পাহাড়ে তাদের বাসায় চলে যায়। আবার সেখান থেকে পরের দিন ফিরে আসে।

বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এই বিষয়ে অনুসন্ধান চালাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু মন্দিরের পুরোহিতরা ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী কিছু ব্যক্তি সোসাইটির গবেষকদের অনুসন্ধান চালাতে দেননি। ফলে, পক্ষিবিশেষজ্ঞদের কথাকে গুরুত্ব দিয়ে আমরা ধরে নিতে পারি, বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত পাখিরা সুদীর্ঘকাল ধরে এমনি করেই কিছুটা দূরের বাসা থেকে উড়ে এসে ভোগ খেয়ে যাচ্ছে। পাখিদের অমর বলে চালানোর জন্য প্রয়োজনমতো বৃদ্ধ বা আহত পাখি বদল করা হচ্ছে।

এখন দেখা যাক, পাখি দুটি কোন জাতীয় পাখি? পুরোহিতদের কথামতো পাখি দুটি এতই প্রাচীন আমলের যে, এই জাতীয় পাখি বর্তমান বিশ্বে আর নেই।

পৌরাণিক যুগের পাখি হলে অবশ্য বিলুপ্ত প্রাণী হওয়াই স্বাভাবিক। ওই জাতীয় পাখির বংশধরদের রূপান্তর ঘটতে ঘটতে আজ সম্পূর্ণভাবে অন্য জাতের পাখিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সাধারণ ভক্ত-দর্শকরা অবশ্য বিশ্বাস করেন এ ধরনের পাখি আগে তাঁরা কখনও দেখেননি। তাঁদের কাছে এই অচেনা পাখির রহস্যময় চালচলন পুরোহিতদের কাহিনির প্রতি বিশ্বাস এনে দেয়।

সকলেই পক্ষিতত্ত্ববিদ নন। তাই বিরল শ্রেণির পাখি চিনতে না পারাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, এই বিষয়ে পক্ষিতত্ত্ববিদদের মতামতটা কী, তা একবার দেখা যাক।

প্রখ্যাত পক্ষিতত্ত্ববিদ শ্রী অজয় হোম ১৯৬৫ সালে পক্ষিতীর্থমে গিয়েছিলেন। তিনি বেলা সওয়া এগারোটা নাগাদ উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঈগলের চেয়ে ছোট, প্রায় চিলের মতো দুটি পাখিকে উড়ে আসতে দেখেন। পাখিরা এসে নামল ভোগের থালা থেকে হাত পাঁচেক দূরে। তারপর অজয় হোমের ভাষায়, "ও হরি, এ যে আমার অত্যন্ত চেনা পাখি। গিরিডিতে হাটের পাশে ডাঁই করা জঞ্জালের উপরে, পাশে কত দেখেছি। এ তো গিন্নি শকুন (নিওফ্রন পেবক্নোপটেরাস) ইং, স্ক্যাভেঞ্জার ভালচার।" (আজকাল, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৮২ সাল)

তামিলনাড়ু সরকারের একটি রঙিন প্রচারপত্রে পক্ষিতীর্থদের পাখির ছবি ছাপা হয়েছে। সেই ছবি দেখে আরও পক্ষিতত্ত্ববিদ মত প্রকাশ করেছেন, এটা শ্বেত-শকুন (Neophron Vulture)। শ্বেত-শকুন বিরল হলেও আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে এই জাতীয় শকুনের দেখা মেলে, অর্থাৎ এরা অবলুপ্ত নয়।

যে গাছ কাটা যায় না

সালটা ঠিক মনে নেই, বোধহয় ১৯৬৩-৬৪ হবে। তখন ভি. আই. পি. রোড তৈরির কাজ হচ্ছে, এখন যার নাম নজরুল সরণি। বাগুইহাটি ও কেষ্টপুরের মাঝামাঝি জায়গায় রাস্তা তৈরির কাজে বাধা দেখা দিল। শুনলাম রাস্তার মাঝখানে পড়ে যাওয়া একটা গাছ কাটতে গিয়ে নাকি কেউ গাছটাকে কাটতে পারছে না। কুড়ুল তুললে তা আর নেমে এসে গাছে পড়ছে না। এও শুনলাম, বুলডোজারও নাকি ওপড়াতে এসে ফেল মেরে গেছে। গাছের কাছাকাছি এসে থেমে পড়ছে, আর এগোতে পারছে না। এই অলৌকিক গাছকে পুজো দিতে আশপাশের অঞ্চল থেকে নাকি ঝেঁটিয়ে লোক আসছে।

অনেকে মত প্রকাশ করলেন, একেই বলে স্থান-মাহাত্ম্য। গাছটা হলো দেবস্থান, তাই বিজ্ঞানও এখানে অচল হয়ে যাচ্ছে।

যখন অন্ধ ভক্তদের সমর্থন নিয়ে গাছতলায় একটা মন্দির গড়ে তোলার পরিকল্পনা কার্যকর হতে চলেছে, সেইসময় কোন এক অধার্মিক, বেরসিক গাছটা কাটতে এগিয়ে এলো। সাহসী ওই লোকটিকে ধর্মান্ধ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট লোকদের

হাত থেকে বাঁচাতে রাস্তা নির্মাণ কর্তৃপক্ষ পুলিশের সাহায্য নিল। পুলিশী সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, দেখা গেল বেশ কিছু লোক লাঠিসোটা নিয়ে গাছ কাটা প্রতিরোধ করতে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু গাছের অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী লোকদের গাছের অলৌকিক শক্তিকে অবিশ্বাস করে লৌকিক সাহায্যের হাত বাড়ানোর কোনও প্রয়োজন ছিল কী? এ তো তাদের জানা থাকাই উচিত যে, এই লোকটিও গাছ কাটতে ব্যর্থ হবে। লোকটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়নি, গাছটি কাটাতে সমর্থ হয়েছিল। বুঝতে অসুবিধে হয় না অলৌকিকত্ব আরোপ করে মন্দির গড়তে পারলে বিনা শ্রমে লোক ঠকিয়ে টাকা রোজগার করা যাবে ভেবেই সমস্ত ব্যাপারটা সাজানো হয়েছিল। গাছ কাটতে এসে যার কুড়ুল থেমে গিয়েছিল, গাছের ওপর দিয়ে বুলডোজার চালাতে গিয়ে যে ব্যর্থ হয়েছে, তারা ছিল সাজানো লোক, স্রেফ অভিনয় করেছে।

গাইঘাটার অলৌকিক কালী

১৯৮৩ সাল। গাইঘাটার অলৌকিক কালী রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার কলাসীম বাজারের কাছেই এই কালীমন্দির। পত্রপত্রিকার প্রচারে ভিড়ে ভিড়ে ছয়লাপ। ১৯৮৩-র ১২ এপ্রিল সন্ধে নাগাদ চব্বিশ পরগনার গাইঘাটার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল এক ক্ষণস্থায়ী তীব্র ঘূর্ণিঝড়। এই ঝড়ে ২০টি গ্রাম প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২৩ জনের মৃত্যু হয়। আহতের সংখ্যা ছিল ২০০ মতো। ঝড়ে পঞ্চায়েত অফিসের ছাদ উড়ে গিয়ে পড়ে প্রায় ১০০ ফুট দূরে। বিদ্যুৎ দপ্তরের পাকা বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চারটি রিভার লিফট পাম্প উপড়ে ফেলে। সুপুরি ও খেজুরগাছ মাথা কাটা কণিষ্ক হয়ে যায়। কলাসীম স্কুলবাড়ির একতলা পাকা ঢালাই ছাদ পুরোটাই উড়িয়ে নিয়ে যায় প্রলয়ঙ্কর ঝড়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথামতো ঝড়ের সময় মনে হলো একটা আগুনের গোলা তীব্র বেগে ঘুরতে ঘুরতে চলে যাচ্ছে। আগুনের গোলা ও ঝড় দুটো একই সময় একই সঙ্গে বিদায় নেয়। ঝড়ের প্রচণ্ডতায় এত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়েছে কলাসীম বাজারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মন্দির। সন্ধ্যায় মন্দিরের পুরোহিত মানিক গাঙ্গুলি মায়ের পুজো করছিলেন। ঝড় সবকিছু তছনছ করে চলে গেল, শুধু স্পর্শ করল না মায়ের মন্দির। সাধারণের মনে প্রশ্ন এলো, এটা কী দেবী-মাহাত্ম্য নয়? একে মায়ের লীলা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়? সাধারণের অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে আর একটু ইন্ধন যোগাল পত্রপত্রিকাগুলো। মন্দির অক্ষত রাখার কারণ অনুসন্ধানে কোন আবহাওয়া বিজ্ঞানীর সাহায্য না নিয়ে, যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যার জন্য কোনও কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা না করে, বেশির ভাগ পত্রপত্রিকাগুলোই মন্দিরে আবিষ্কার করল 'মায়ের লীলা'। অগ্নিগোলকেও আবিষ্কার করল 'মায়ের লীলা'।

যে ঝড়টি সেদিন সন্ধেতে গাইঘাটার বুকে প্রলয় তুলেছিল, আবহাওয়াবিদদের

ভাষায় সেই ঝড়টির নাম 'Tornado' (টর্নেডো)। টর্নেডোর প্রকৃতি সম্বন্ধে সামান্য কয়েকটা কথা অন্তত না বললে এই ঘটনাটার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাও অনেকের বুঝতে অসুবিধে হতে পারে।

এপ্রিল-মে মাসে কালবৈশাখীর সময় যে কালো ঝটিকা মেঘবাহিনীকে দেখা যায়, সেগুলোতেই থাকে টর্নেডো ঝড়ের সম্ভাবনা। টর্নেডো ঝড়ের সৃষ্টিকর্তা মেঘগুলোর মাথা থাকে প্রায় ৪০ হাজার ফুট উঁচুতে, মেঘের তলদেশ থাকে মাটি থেকে প্রায় ২ হাজার ফুট উঁচুতে। এই কুচকুচে কালো ঝটিকা-মেঘের ভেতর তীব্র বেগে আলোড়িত হতে থাকে এবং ঘুরতে থাকে কয়েক লক্ষ টন ওজনের জলকণা। জলকণাগুলোর অনবরত প্রচণ্ড ঘর্ষণে মেঘরাশি হয় বজ্রগর্ভ। এই ঝটিকা-মেঘের তলার দিকের অংশের কোন স্থানে কখনও আলোড়ন তীব্র হয়ে ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়। এই ঘূর্ণির মেঘ নেমে আসে মাটির অনেক কাছাকাছি। ঝটিকা-মেঘ থেকে নেমে আসা হাতির শুঁড়ের মতো দেখতে এই ঘূর্ণি মাটি বা জল ছুঁয়ে যায়, কখনও কখনও বা চলে যায় মাটি থেকে ১০, ১৫ বা ২০ ফুট উঁচু দিয়ে। তবে, যখন বয়ে যায়, তখন রেখে যায় তার চিহ্ন। অথচ আশ্চর্য এই যে,

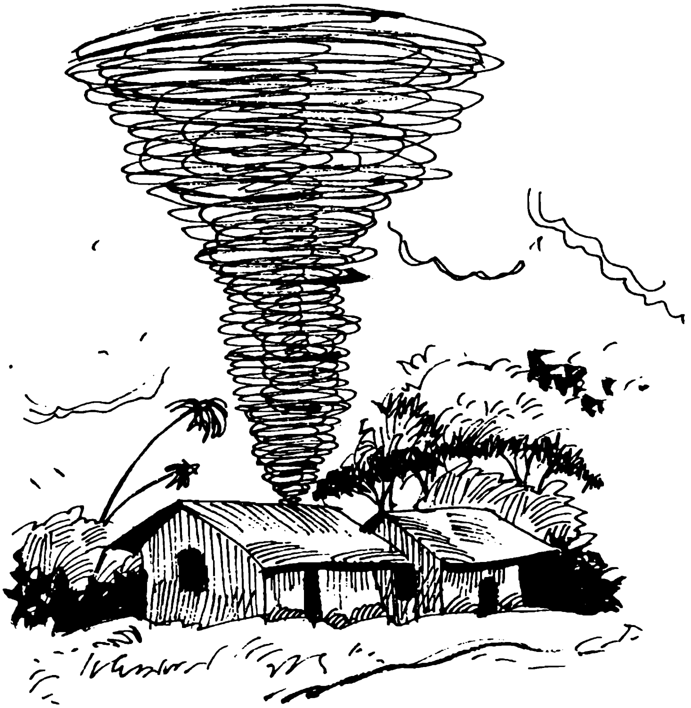

কলাসীমায় ঝড়ের প্রকৃতি কেমন ছিল

টর্নেডো যদি ১৫ ফুট উঁচু দিয়ে যায় তবে তার যাত্রাপথে পনেরো ফুটের বেশি উঁচু গাছ, কী বাড়ির ছাদ যাই পড়ুক ভেঙে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, আর ১০-১২ ফুট পেঁপেগাছ, কলাগাছ কী চালাবাড়ি সবই থাকবে অটুট।

ঘূর্ণির এই হাতির শুঁড় তার যাত্রাপথে কখনও মাটি ছুঁয়ে চলে, কখনও কিছুটা উঁচু দিয়ে চলে, কখনও উঠে যায় অনেক উঁচুতে।

আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা মনে করেন টর্নেডো ঝড়ের তীব্র ঘূর্ণিতে ধূলিকণাগুলো ঘূর্ণিত হতে থাকে। ঘর্ষণের তীব্রতায় সৃষ্টি হয় প্রচুর ঘর্ষণজনিত বিদ্যুৎ। এই ঘর্ষণজনিত বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ গোলার সৃষ্টি করে। এই ধরনের বিদ্যুৎ গোলাই সেদিন দেখেছিলেন গাইঘাটার লোকেরা।

কলাসীম বাজারের মন্দির আমি দেখেছি। মন্দিরটির বয়েস বছরখানেক। উচ্চতা ফুট দশের মতো। ওই তল্লাটের কিন্তু শুধু মন্দিরই রক্ষা পায়নি, আরও অনেক কিছুই রক্ষা পেয়েছে। পঞ্চায়েত অফিসের ছাদ উড়লেও অফিসের লাগোয়া ফুট দুয়েক নীচু গাছগুলোর সামান্যতম ক্ষতি হয়নি। আরও লক্ষণীয়, পঞ্চায়েত অফিস ও বিদ্যুৎ দপ্তরের ছাদ গেলেও দেওয়াল বা দরজা, জানালার ক্ষতি হয়নি। তার কারণও ওই একটিই। টর্নেডো দরজা-জানালার চেয়েও উঁচু দিয়ে বয়ে গেছে।

কলাসীম বাজারের উলটোদিকে একটি বাড়ি দেখেছিলাম, যার চাল উড়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওদের কলাগাছগুলোর কোনও ক্ষতি হয়নি। কলাগাছ খুবই নরম জাতীয় গাছ। ঝড়ে এদেরই সবচেয়ে আগে শুয়ে পড়ার কথা। কলাগাছের উচ্চতার দিকে তাকালেই বোঝা যায় স্বল্প-উচ্চতাই এদের রক্ষা পাওয়ার কারণ। পনেরো ফুট উচ্চতার সাইনবোর্ডকে ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন দেখেছি। আর তারই পাশে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি আট ফুট উচ্চতার চালাঘরকে। অতএব ১০ ফুট উঁচু মন্দির রক্ষার সঙ্গে দেবী-মাহাত্ম্যের কোন প্রমাণ আমি পাইনি। বুঝেছি টর্নেডো ঝড়ের গতি-প্রকৃতির জন্যেই এমনটা হয়েছে।

যে পাথর শূন্যে ভাসে

বাংলা ভাষার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'পরিবর্তন'-এর ১৬ মে ১৯৭৯-র সংখ্যাটি আর এক ঝড় তুলল। অলৌকিকে ও ঈশ্বর-মাহাত্ম্যে বিশ্বাসীরা পরিবর্তনে প্রকাশিত সংবাদ পাঠে যেমন আপ্লুত হলেন, তেমনি যুক্তিবাদীরা হলেন হতচকিত। সংবাদটির শিরোনাম ছিল, 'আঙুলের ছোঁয়ায় যে পাথর শূন্যে ভাসে'। প্রতিবেদক শ্রীবিকাশ লিখেছেন, পুণের ২০ কিলোমিটার দূরে এক জাগ্রত পীরের অলৌকিক দরগার কথা। এই দরগার মাজারে রয়েছে দুটি পাথর। একটির ওজন ৬০ কিলোগ্রাম ও অপরটির ওজন ৯০ কিলোগ্রাম। তারপর শ্রীবিকাশ যা লিখেছেন তাই

আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। "প্রথমটিতে ৭ জন ও অপরটিতে ৯ জন মানুষ যদি একত্রে একটি করে আঙুল ছুঁয়ে চিৎকার করে বলে, 'কামার আলিশা দরবেশ...' তাহলে পাথর দুটি আপনা থেকেই শূন্যে ভেসে ওঠে। পাথর শূন্যে ভেসে থাকে আঙুলগুলি স্পর্শ করে; কিন্তু আঙুলে বিন্দুমাত্র ওজন অনুভব হয় না। যতক্ষণ একটানা একশ্বাসে চিৎকার চলে, ততক্ষণ পাথর শূন্যে ভাসে। যার কণ্ঠ আগে বন্ধ হয় পাথর পাথর গড়িয়ে পড়ে তারই দিকে। কেউ একজন চিৎকার না করে তাহলে পাথরটি সামান্য একটু ওপরে উঠে নীচে আছড়ে পড়ে।'

"সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার, কামার আলিশা দরবেশের নাম ছাড়া অন্য কোন নামে বা শব্দে পাথর দুটির একটিও শূন্যে ভাসে না।"

যদিও প্রতিবেদক জানিয়েছেন এমন অলৌকিক ঘটনা, যার ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিতে সক্ষম হয়নি। তবু বিজ্ঞানেরই সামান্য সাহায্য নিয়ে ও যুক্তি দিয়ে ঘটনার ব্যাখ্যা করছি এবং সেই সঙ্গে এও জানিয়ে রাখি, কলকাতার বুকেই যুক্তিবাদে বিশ্বাসী, বিজ্ঞানমনস্করাই বেশ কয়েকবার কম বেশি ওই ওজনের পাথর একই পদ্ধতিতে আঙুল ঠেকিয়ে শূন্যে ভাসিয়েছেন। না, তাঁরা পাথর ভাসাবার জন্য কোনও পির বা সাধু-সন্ন্যাসীর নাম উচ্চারণ করেননি।

প্রাথমিকভাবে পরিবর্তনের খবর আমাকে যথেষ্ট আকর্ষণ করেছিল। যদিও বুঝেছিলাম ৯০ কেজি পাথর ৯ জনের হাতের ছোঁয়ায় উঠে থাকলে বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম অনুসারে এক একজনকে তুলতে হয়েছিল কম-বেশি ১০ কেজি ওজন। আর দ্রুত একশ্বাসে দরবেশের নাম একসঙ্গে চিৎকার করে উচ্চারণ করার মধ্যে তৈরি হচ্ছিল Impulsive force (ইম্পালসিভ ফোর্স)। শ্রমিকেরা ভারি কিছু তোলার সময় 'আউর থোড়া', 'হেঁইয়ো', 'মারো জওয়ান হেঁইয়ো' ইত্যাদি বলতে থাকে এ নিশ্চয়ই আপনারা প্রায় সকলেই দেখেছেন। 'হেঁইয়ো' কথাটা সব শ্রমিককে একই সঙ্গে ইম্পালসিভ ফোর্স তৈরি করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ সব শ্রমিক একই সময়ে স্থিরভাবে বল (force) প্রয়োগ না করে 'এক ঝটকায় বল' (Impulsive force) প্রয়োগ করে। ঝটকা দিয়ে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যে ফল পাওয়া যায় যা স্থিরভাবে শক্তি প্রয়োগের চেয়ে বেশ কয়েকগুণ বেশি। ফলে বিজ্ঞানের নিয়মমাফিক বাস্তবক্ষেত্রে এক হ্যাঁচকাটানে ১০ কেজি তুলতে এক একজন ভক্তকে ২ থেকে ২১/২ কেজি ওজন সাধারণভাবে তোলার মতো শক্তি নিয়োগ করতে হয়।

সময় ১৯৮০-র ডিসেম্বর ইলোরা থেকে গোয়া যাওয়ার পথে পুণে নেমেছিলাম প্রধানত কামার আলিশা দরবেশ-এর দরগা দেখতে। পুনে থেকে ২০ কিলোমিটার মতো দূরে ব্যাঙ্গালোর রোডের ওপর শিবাপুর স্টপেজে নেমে দরগায় যেতে হয়। একটা ছোট পাহাড়ের ওপর দরগা।

পরিচ্ছন্ন দরগা। মাঝখানে মাজার-ঘর, দরবেশের সমাধি। মাজারের সামনে মাটিতে রয়েছে দুটো পাথর, যার ওজন সম্বন্ধে প্রতিবেদক লিখেছিলেন ৬০ কেজি ও ৯০ কেজি। সঠিক ওজন জানার মতো কোনও ব্যবস্থা ওখানে ছিল না। দরগার ফকিরদের বলা ওজনের হিসেব সঠিক না-ও হতে পারে।

মাজারে মহিলাদের প্রবেশাধিকার নেই, সুতরাং স্ত্রীকে বাইরে রেখেই আমি আর ছেলে পিংকি মাজারে গিয়েছিলাম। ওখানে আমরা বেশ কিছুক্ষণ ছিলাম। তারই মধ্যে কয়েকবার কিছু ভক্ত আঙুল ছুঁইয়ে ছোট আর বড় দুটো পাথরই তুললেন। ছোট পাথর তুলতে ৯ জন এবং বড় পাথর তুলতে ১১ জনের প্রয়োজন হচ্ছিল। আমি দরগার ফকিরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "শুনেছি, ছোট আর বড় পাথরটা তুলতে ৭ জন ও ৯ জনের প্রয়োজন হয়।"

ফকির বললেন, "না, ভুল শুনেছেন, ৯ জন আর ১১ জনের আঙুল ছোঁয়াতে হয় পাথরের তলায়। সবাই একসঙ্গে 'কামার আলিশা দরবেশ' বলে যত জোরে সম্ভব একবার উচ্চারণ করুন, দেখবেন দরবেশের কৃপায় পাথর শূন্যে উঠে যাচ্ছে।"

দেখলামও বেশ কয়েকবার। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, প্রতিবার পাথরে আঙুল, ছোঁয়ার সময় ভক্ত দর্শকদের চেয়ে দরগার ফকিরের সংখ্যা থাকছে বেশি।

আমি কিছুক্ষণের অপেক্ষায় আমাকে নিয়ে ৮ জন দর্শক যোগাড় করতে সক্ষম হয়েছিলাম। ৯ জন পূর্ণ করতে আমাদের একজন ফকিরের সাহায্য নিতে হয়েছিল। আমরা ফকিরেরই সঙ্গে সুর মিলিয়ে একসঙ্গে চিৎকার করলাম 'কামার আলিশা দরবেশ'। কথাটা উচ্চারণ করতে আমাদের সময় লেগেছিল ১ সেকেন্ডের মতো। আমরা প্রতিটি দর্শক আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম পাথর উঠল না। অমনি আমাদের কাছে ছুটে এলো আর কয়েকজন ফকির। তারা বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কয়েকজন খারাপ লোক আছে, তাই পাথর ওঠেনি। বুঝেছিলাম, ক্ষিপ্ততা আসলে অভিনয়। পাথর না ওঠার কারণ যাতে দর্শকদের যাতে গ্রহণযোগ্য মনে হয়, তাই তাদের এই ছেঁদো যুক্তি সহযোগে অভিনয়। আসলে পাথর দরবেশের নামের জোরে ওঠে না। ওঠে দরগার ফকিরদের অভিজ্ঞ হাতের আঙুলের ছোঁয়ায়। ফকিরদের হাতের হ্যাঁচকায় পাথর ওঠে পাথর উঠতে থাকার স্থায়িত্বকাল দরবেশের নাম উচ্চারিত হওয়া পর্যন্ত এবং সেটা দেড় সেকেন্ডের মতো, Impulsive force প্রয়োগ করার সময় পর্যন্ত। অন্ধ ভক্তেরা ধরে নেন পাথর উঠল তাঁদের হাতের ছোঁয়ায় ও দরবেশের নামের জোরে।

প্রতিবেদক লিখেছেন, "আঙুলে বিন্দুমাত্র ওজন অনুভব হয় না।" আমি পরীক্ষা করে ও যাঁরা তুলেছেন তাঁদের জিজ্ঞেস করে দেখেছি, স্বল্প হলেও প্রত্যেকেই ওজন অনুভব করেছেন। বুঝেছি মস্তিষ্কের কোষগুলো স্বাভাবিক থাকলে প্রত্যেকেই ওজন অনুভব করবেন।

প্রতিবেদক লিখেছেন, "সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার; কামার আলিশা দরবেশের নাম ছাড়া অন্য কোন নামে বা শব্দে পাথর দুটির একটিও শূন্যে ভাসে না।"

তাহলে শ্রীবিকাশের পক্ষে আরও আশ্চর্য হওয়ার মতো একটি খবর দিই, কলকাতার যুক্তিবাদীরা একাধিকবার এই ধরনের পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন, ৯ জনের আঙুলের ছোঁয়ায় Impulsive force ব্যবহার করে ৫০ কেজি পাথর তোলা যায়, যাকে প্রতিবেদকের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—'পাথর ভাসানো' যায়। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখি। যুক্তিবাদীরা পাথর তোলার সময় চেঁচিয়েছিলেন ঠিকই, তবে ভুলেও কোন অবতারের নাম নিয়ে নয়।

আমি মাজারে দুটি পাথর তোলার ক্ষেত্রেই একাধিকবার আঙুল ছুঁইয়েছি। 'কামার আলিশা দরবেশ' উচ্চারণ করার বদলে একই সুরে অন্য কথা উচ্চারণ করে পরীক্ষা চালিয়েছি। কিন্তু আমার দিকে পাথর গড়িয়ে পড়েনি। প্রতিবেদক নিজেই অথবা যে কেউ আমার কথার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

অলৌকিক প্রদীপে মৃত বাঁচে

কামার আলি দরবেশের দরগাতেই আছে এক আশ্চর্য অলৌকিক প্রদীপ। "পিরের কবরের পশ্চিম দিকে মাথার ওপর একটা চৌকোণা লণ্ঠন ঝোলানো আছে। লণ্ঠনের ভেতরে একটি প্রদীপ বাদাম তেলে ২৪ ঘন্টা জ্বলে। প্রদীপটির বিশেষত্ব হচ্ছে : কোন সাপে কাটা রোগীকে যদি তিন ঘন্টার মধ্যে এখানে এনে প্রদীপের চারপাশে ৭ পাক ঘোরানো যায়, তাহলে রোগী চার ঘন্টার মধ্যে সম্পূর্ণ বিষমুক্ত হয়ে ওঠে। বিষাক্ত সাপে কাটার পরে মরে গিয়ে নীল হয়ে গেছে এমন অনেক রোগীও এখানে এসে সেরে উঠেছে বহুবার।" পরিবর্তন সাপ্তাহিক পত্রিকার ঐ সংখ্যাটিতেই শ্রীবিকাশ এই কথাগুলো লিখেছেন।

মৃতকে বাঁচাতে বিজ্ঞানও যেখানে ব্যর্থ, সেখানে অলৌকিক দরগার অলৌকিক প্রদীপের চারপাশে ৭ বার ঘোরালেই সাপে কাটা মৃতও বেঁচে ওঠে—এটা যে কোনও লোকের কাছেই একটি অসাধারণ খবর। কিন্তু, এখানেও পত্রিকা তার দায়িত্ব সেরেছে একান্তই দায়সারাভাবে। মৃতকে জীবন দেওয়ার একটা বিশাল খবর প্রকাশিত হলো, কিন্তু এই নিয়ে আদৌ কোনও অনুসন্ধান চালানো হলো না। ওই দরগার কোনও দরবেশ কী বিষাক্ত সাপের কামড় খেয়ে মারা যাওয়ার পর আবার বেঁচে উঠে তাঁদের দাবির সত্যতা প্রমাণ করতে পারবেন? একজন যুক্তিবাদী হিসেবে আমার চ্যালেঞ্জ রইল, এই ধরনের পরীক্ষায় কোন দরবেশ বা প্রতিবেদক স্বয়ং জিতে গেলে আমি যুক্তিবাদকে বিসর্জন দিয়ে অলৌকিকের পূজারী হব।

বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেল রহস্য

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এক অখ্যাত লেখক চার্লস বার্লিৎজ্ ১৯৭৫ সালে একটা বই লিখে প্রায় রাতারাতি পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। বইটির নাম, 'বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেল'। 'সত্য-ঘটনা' বলে বর্ণিত এমন রহস্যময়, রোমাঞ্চকর, চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বই সম্ভবত এর আগে পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনও লেখক লেখেননি। বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুড়ি-মিছিড়ির মতো লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে। অতি দ্রুত পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। অনূদিত হয়েছে বাংলা ভাষাতেও।

'বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেল' বইটিতে বলা হয়েছে এই বিশেষ অঞ্চলে নাকি রহস্যজনকভাবে বহু জাহাজ ও বিমান যাত্রীসহ রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছে। নিখোঁজ হওয়ার আগে অভিশপ্ত ওইসব জাহাজ ও বিমান থেকে যে সব বার্তা পাঠানো হয়েছিল তাতে নাকি জানা গেছে তাদের কম্পাসের কাঁটা আশ্চর্যজনকভাবে বনবন করে ঘুরতে আরম্ভ করেছিল এবং একটা অ-প্রাকৃতিক পরিবেশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এমনি আরও অনেক কথাই বইটিতে লেখা ছিল। বইটির মোদ্দা বক্তব্য—বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেল এমন এক অলৌকিক রহস্যময়তার ফাঁদ পেতে বসে রয়েছে, যার রহস্য উদ্ধার করা কোনও মানুষের বা বিজ্ঞানের কর্ম নয়। অর্থাৎ 'যুক্তিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না।'

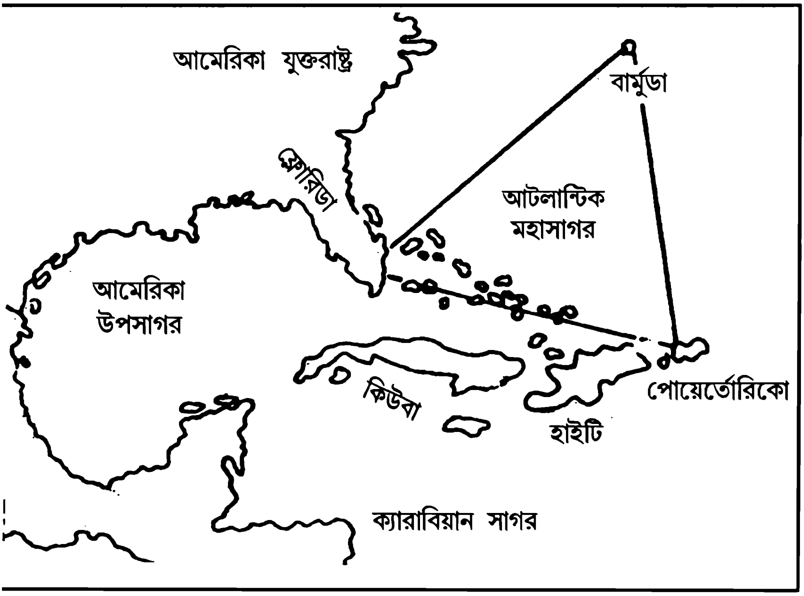

বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেল বইটি গোটা পৃথিবী জুড়ে এত বেশি আলোড়ন তুলেছিল যে, একাধিক রাষ্ট্র বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেলের রহস্য অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে, এগিয়ে আসেন

বহু বিজ্ঞানী। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ব্যাপক অনুসন্ধান চালায়। এই বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেল রহস্য অনুসন্ধান কর্মসূচীর নাম দেওয়া হয়েছিল 'পলিমোড' প্রোগ্রাম।

পলিমোড প্রোগ্রাম থেকে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে জানা গেছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী ও বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেল অঞ্চল দিয়ে জাহাজ চলাচল করে বছরে প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। প্রতি বছর ওই সব জাহাজ থেকে গড়ে দশ হাজার সাহায্য-বার্তা পাঠানো হয়। সেই অনুপাতে ওই অঞ্চলে নিখোঁজ জাহাজের সংখ্যা বিস্ময়করভাবে কম। অনুসন্ধানকারী সংস্থা আরও জানিয়েছে পৃথিবীতে প্রতি বছর দু-তিনটি বড় জাহাজ নিখোঁজ হয়। কয়েক বছরের হিসেব নিয়ে অনুসন্ধানকারীরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, যে-সব অঞ্চলে জাহাজ চলাচল অত্যন্ত বেশি সেইসব অঞ্চলের তুলনায় বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেলে জাহাজ ডুবির সংখ্যা মোটেই বেশি নয়। যে-সব বিমান সংস্থার বিমান এই অঞ্চল দিয়ে যাতায়াত করে সে-সব বিমান সংস্থার গত বারো বছরের রেকর্ড পরীক্ষা করে অনুসন্ধানকারীরা দেখেছেন, এই বারো বছরের মধ্যে তাদের কারোরই কোনও বিমানই বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেলে নিখোঁজ হয়নি।

'বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেল' বইটির একটি অতি উত্তেজক রহস্য-কাহিনি হল ১৯৬৩ সালে দুটি 'কে. সি. জেট স্ট্র্যাটোট্যাংকার' বিমানের রহস্যময় অদৃশ্য কাহিনি। লেখক বার্লিৎজ লিখেছেন, বিমান হঠাৎই রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয় এবং অনুসন্ধানের পর বিমান দুটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় একশো মাইল ব্যবধানে। কী করে এরা ধ্বংস হল? সংঘর্ষে? সংঘর্ষেই যদি হবে, তবে দুটি বিমানের ধ্বংসাবশেষ একই জায়গায় পাওয়া গেল না কেন? কী সেই রহস্যময় কারণ, যার দরুন দুটি বিমান সংঘর্ষ ছাড়া ধ্বংস হল?

এতো গেল বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেল বইয়ের কথা। আসুন, এবার আমরা দেখি, অনুসন্ধানকারীদের অনুসন্ধানে কী সত্য উঠে এলো।

অনুসন্ধানকারীরা যে তথ্য পেয়েছিলেন তা হলো (১) দুটি বিমানের ধ্বংসাবশেষ একই জায়গায় পাওয়া গিয়েছিল। (২) সে-দিনের আবহাওয়া ছিল দুর্যোগপূর্ণ। (৩) দুটো বিমান খুব কাছাকাছি, পাশাপাশি উড়ছিল।

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে পাশাপাশি উড়তে গিয়ে সংঘর্ষ হয়েছিল বলে সরকারি রিপোর্টও উল্লেখ আছে। অনুসন্ধানকারীরা সেই রিপোর্ট দেখেছেন। সব কিছু বিচার করার পর এ-টুকু অবশ্যই বলা যায় যে, ঘটনাটির মধ্যে কোনও অলৌকিকতার ছোঁয়া ছিল না। বার্লিৎজ তাঁর লেখায় রহস্যময়তা আনার জন্যেই মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন। স্বেচ্ছাকৃতভাবেই তিনি কিছু তথ্য পরিবেশনে বিরত ছিলেন এবং কিছু মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করেছিলেন।

'বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেল' বইয়ের আর একটি ঘটনায় বলা হয়েছে, ১৯৭৬-এর

ডিসেম্বরে এক শান্ত-শীতল দিনে মিয়ামির উপকূল থেকে মাত্র এক মাইল দূরে 'কেবিন ক্রুজার উইচক্র্যাফট' জাহাজ দুটি রহস্যজনকভাবে হঠাৎই বেপাত্তা হয়ে গেল। শান্ত সমুদ্রে উপকূলের এত কাছে আচমকা নিখোঁজ হওয়ার পেছনে কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছিল না। তবে কেন নিখোঁজ হল? কী সেই রহস্য?

পলিমোড প্রোগ্রামের অনুসন্ধানকারীরা আমেরিকান নৌবাহিনীর সীমান্তরক্ষীদের রেকর্ড থেকে জানতে পারেন, সে-দিন সামুদ্রিক ঝড়ে সমুদ্র ছিল উত্তাল। 'কেবিন ক্রুজার' থেকে একসময় রেডিও বার্তায় বার-বার ঘোষণা করা হতে থাকে ঝড়ে তাদের প্রপেলারটি ক্ষতিগ্রস্ত। জাহাজটি অশান্ত বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে অসহায়ভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে। ডুবে যাওয়ার আগে পর্যন্ত জাহাজ থেকে সাহায্যের আবেদন পাঠানো হয়।

সামুদ্রিক ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজের ডুবে যাওয়ার মধ্যে অলৌকিক বা রহস্যময় কিছু নেই। বার্লিৎজ তাঁর কাহিনিকে চটকদার করার জন্য বিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে শান্ত করেছিলেন। আর, তাইতেই যত রহস্যময়তার সৃষ্টি।

বইটিতে আরও একটি ঘটনায় বলা হয়—জাপানি ট্যাংকার 'রাইফুকু মারু' বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেল থেকে এস. ও. এস. পাঠিয়ে শান্ত সমুদ্রে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায়।

অনুসন্ধানকারীদের অনুসন্ধানে জানা যায় জাপানি ট্যাংকারটি শেষ রেডিও বার্তা পাঠিয়েছিল তা গ্রাহক স্টেশনের রেডিও লগ বইতে লেখা আছে। বার্তাটি ছিল, 'এখন খুব বিপদ, শীগগির এসো।' এস. ও. এস. পাবার পর একটি উদ্ধারকারী জাহাজ দ্রুত রওনা হয় এবং ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখতে পায় ঝড়ে উত্তাল সমুদ্রে ট্যাংকারটি ডুবে গেছে। উত্তাল সমুদ্রে জাহাজডুবি কোনও অলৌকিক ঘটনা নয়।

বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেলের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ মাথার চুল খাড়া করা কাহিনি হল—১৯৪৫-এর ডিসেম্বরে ছ'টি বিমানের অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ। ঘটনাটিকে নিয়ে নাকি সেই সময় পৃথিবী জুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল।

বইটির কাহিনিতে বলা হয়েছে—১৯৪৫-এর ৫ ডিসেম্বর আমেরিকার ফোর্ট-লউভার এল ন্যাভাল বিমান বন্দর থেকে মার্কিন নৌবাহিনীর পাঁচটি অ্যাডভেঞ্চার বোমারু বিমান চোদ্দজন আরোহী নিয়ে পরিষ্কার দিনের আলোয় আকাশে ওড়ে। রুটিন মাফিক প্রশিক্ষণে বেরিয়ে ছিলেন তাঁরা। দিনের বেলা, আকাশ ছিল সম্পূর্ণ পরিষ্কার। রুটিন ওড়ার শেষে অবতরণের আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি। বিমানবন্দরের কন্ট্রোল-টাওয়ার চোদ্দজন বৈমানিকের দলনেতা লেফটেন্যান্ট চার্লস টেলরের কাছ থেকে বিপদ বার্তা পেলেন। টেলরের গলার স্বরে প্রচণ্ড আতঙ্ক। তিনি জানালেন, "আমরা বোধহয় পথ থেকে সরে এসেছি। আমরা মাটি দেখতে পাচ্ছি না। জানি না কোনটা কোনদিক। সবকিছু উলটো পালটা লাগছে..... এমনকি সমুদ্রটাকেও যেমন দেখাবার কথা সে-রকম লাগছে না..... মনে

হচ্ছে আমরা যেন.....” টেলর তার-বার্তা পাঠানো সম্পূর্ণ করতে পারেননি। রহস্যজনকভাবে বার্তা প্রেরণ বন্ধ হয়ে গেল। ওই বিমানগুলোর খোঁজে বিমানচালক সমেত তেরোজনের উদ্ধারকারী দল নিয়ে একটি বিমান যাত্রা করে। কিন্তু আগের পাঁচটি নিখোঁজ বিমানের মত এই উদ্ধারকারী বিমানটিও আমেরিকান সেনাবাহিনীকে হতবাক করে নিখোঁজ হয়। নিখোঁজ ছ'টি বিমান ও সাতাশজন যাত্রীকে খুঁজে বের করতে মার্কিন নৌ-বাহিনী ও বিমান-বাহিনী ব্যাপক অনুসন্ধান চালায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিখোঁজ বিমানগুলোর কোনও হদিশ পায়নি।

এতো গেল বইয়ে কী প্রকাশিত হয়েছিল সে-কথা। এ-বার দেখা যাক অনুসন্ধানকারীরা বাস্তবে কী ঘটেছিল বলে জানতে পেরেছিলেন।

বিমানগুলো পরিষ্কার দিনের আলোয় আকাশে উড়ে অদৃশ্য হয়নি। সে-দিন আবহাওয়া ছিল খারাপ। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার পরও তারা আকাশে ছিল। ওই সময় সামুদ্রিক ঝড় ওঠে। দলনেতা টেলর ছাড়া সকলেই শিক্ষার্থী। টেলর তাঁর অবস্থান নির্ণয়ে ভুল করেন। সেটা অস্বাভাবিক কোনও ঘটনা নয়। ফ্লোরিডা কী ও বাহামা দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বড় বেশি সাদৃশ্য থাকার জন্য এর আগেও অনেক বৈমানিকই খারাপ আবহাওয়ায় ওই ধরনের ভুল করেছেন। টেলরও বাহামাকে ফ্লোরিডা মনে করায় উত্তর-পূর্বে বিমানবন্দর মনে করে বিমানগুলোকে সেই দিকে চালাতে নির্দেশ দেন। বাহামার উত্তর-পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর। অবশেষে আটলান্টিকের উপর দিয়ে যেতে যেতে বিমানগুলো এক সময় জ্বালানির অভাবে সমুদ্রে আছড়ে পড়ে। এর বেশি আর কিছুই ঘটেনি। পলিমোড় প্রোগ্রামের অনুসন্ধানকারীদের অন্তত এইমত।

টেলরের পাঠান বার্তা সরকারি লগ-বুকে লেখা আছে। সেটাতে দেখা যায় টেলর আদৌ অলৌকিক কোনও দৃশ্যের বর্ণনা দেননি। বরং বলেছেন, “আমি আমার অবস্থান জানি...ভুল করে বাহামা পেরিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে এসে পড়েছি...”

অনুসন্ধানকারীরা গোটা ঘটনাটার মধ্যে কোনও অলৌকিক রহস্যের খোঁজ পাননি। এটা ছিল নেহাৎই দুর্ঘটনা।

বার্লিৎজ্ বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেলের রহস্যের কথা লিখতে গিয়ে তাঁর আর একটি বই ‘উইদাউট এ ট্রেস’-এ লিখেছেন, স্যাটেলাইট এম. ও. এ. এ.-কে পাঠানো হয়েছিল মেঘ সম্বন্ধে বেতার সংকেত পাঠানোর জন্যে। কিন্তু, বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেলের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় কোনও রহস্যময় কারণে বেতার সংকেত পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়। জায়গাটা অতিক্রম করার পর আবার বার্তা প্রেরণ চালু হয়।

অনুসন্ধানকারীরা যে সত্য উদঘাটন করেছিলেন, তা হল, কৃত্রিম উপগ্রহ এম. ও. এ. এ. মেঘ বিষয়ক যে সংকেত পেত সে-গুলো টেপে ধরে রাখা হতো এবং

ভূকেন্দ্রে পাঠান হতো। টেপের সংকেত প্রচার শেষ হলে টেপটা গুটিয়ে নিয়ে আবার সংকেত প্রেরণ শুরু করা হতো। এই টেপ গোটানোর সময় স্বভাবতই কোনও বেতার সংকেত পাঠানো সম্ভব নয়। ঘটনার দিন বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেলের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় স্যাটেলাইটটি সংকেত পাঠানো বন্ধ করে টেপ গোটাচ্ছিল। এই স্বাভাবিক ব্যাপারটাকেই অস্বাভাবিক হিসেবে পরিবেশন করেছিলেন চতুর রহস্য-ব্যবসায়ী লেখক।

বার্লিৎজে্র তৈরি আর একটি গা শিরশিরে রহস্যময় ঘটনা হলো—ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের একটি বিমান মিয়ামি যাওয়ার পথে বার্মুডা পৌঁছতেই মিয়ামি বিমানবন্দরের র‍্যাডার থেকে অদৃশ্য হয়। বিমান হয়তো কোনও দুর্ঘটনায় পড়েছে, এমন অনুমান করে সমস্ত বিমান বন্দরকে মুহূর্তে সতর্ক করে দেওয়া হয়। অথচ, দশ মিনিট পরেই আবার বিমানটি র‍্যাডারে ধরা পড়ে। মিয়ামি বিমানবন্দরে অবতরণের পর দেখা যায় প্রত্যেক বিমানযাত্রীদের ঘড়ির সময় কোনও এক অদৃশ্য কারণে দশ মিনিট করে পিছিয়ে গেছে।

রুশ-মার্কিন যৌথ অনুসন্ধানকারী দল অনুসন্ধান করে দেখেন, মিয়ামি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বা ইস্টার্ন এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ এই ধরনের কোনও ঘটনার বিষয়ে কিছুই জানেন না। অর্থাৎ, ঘটনাটি আদৌ ঘটেনি।

বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেল নিয়ে এমনি আরও গাদা-গাদা তথাকথিত রহস্য নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে অনুসন্ধানকারীরা দেখেছেন, কোনটির পিছনেই সত্য নেই।

কোনও সত্য যদি ঘটনাগুলোর পিছনে নাই থাকবে তবে বার্লিৎজ কেন এই ধরনের পাগলের মতো লিখতে গেলেন? অনেকের মনেই এই ধরনের প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এমন পাগলামি করে রাতারাতি কোটিপতি ও বিখ্যাত হতে পারলে সেই সুযোগ অনেক সুযোগ সন্ধানীরাই নেন বই কী। তবে, বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেলের আসল রহস্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর বার্লিৎজ আর বিখ্যাত নন, কুখ্যাত ব্যক্তি।

অধ্যায় : দশ

পরামনোবিদ্যা ও অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি
(Parapsychology & E.S.P.)

Parasychology (পরামনোবিদ্যা)

গত কয়েক বছর হলো Parasychology বা পরামনোবিদ্যার রমরমা বাজার। ভূত নিয়ে তৈরি হচ্ছে প্রচুর সিনেমা ও টিভি সিরিয়াল। জাতীয়স্তরের নিউজ চ্যানেলগুলোতে ভূত, জাতিস্মর, তন্ত্র প্ল্যানচেট নিয়ে 'গপ্পোকে 'খবর' বলে পরিবেশন করা হচ্ছে। গত এক বছরে কত যে ভূতের 'সত্যিকাহিনি' ওরা প্রচার করেছে তার হিসেব রাখা মুশকিল। উত্তরপ্রদেশের লালগঞ্জ থানা নাকি এখন পুলিশদের বদলে ভূতের আস্তানা। গুজরাটের ভালেজ গ্রামের মানুষদের উপর গান ভূত ভর করেছে। হিমেশের নাকি সুরের গান শুনলেই না কি ঘাড়ে ভূত চাপে। বিহারের ইনসপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ অনিল সিন্‌হার পাটনার বাড়িতে ভূতের উপদ্রব ঠেকাতে যজ্ঞ হচ্ছে—আমরা LIVE অনুষ্ঠানে দেখলাম। উত্তরপ্রদেশের একটি স্কুলের মেয়েরা বার বার দৌড়ে চলে যাচ্ছিল একটা পুকুরের দিকে। ওদের না কি ভূতে ধরেছিল, তাই এমন সর্বনাশা কাণ্ড। ওড়িশার ছাত্রীদের উপর তথাকথিত ভূতে ভরের ঘটনা আমরা দেখেছি। বর্ধমানের বেনাগ্রাম-এর প্রতিটি পরিবার ভূতের ভয়ে গ্রাম ছাড়া হয়েছিলেন। 'লাইট ভূত' মাস দু'য়েক ধরে বীরভূম ও বর্ধমানের মেয়েদের শরীরে আঁচড়ে দিয়েছে। 'মোবাইল ভূত' নাকি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্যানিক তুলেছে। একটি মেয়ে দাবি করেছে—গতজন্মে সে নাগিন ছিল। নাগও নাকি জন্মেছে। গ্রামের একটি তরুণ-ই নাকি গতজন্মের নাগ। কে নাকি ফটো সম্মোহন করে পছন্দের মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। কোন এক শ্রীগৌতম কামাক্ষাদেবীর কৃপায় মন্ত্রে গর্ভবতী করে দিচ্ছে। সর্বভারতীয় নিউজ চ্যানেল থেকে বাঙলা নিউজ চ্যানেল সর্বত্র সপ্তাহে অন্তত একটা করে কাহিনি থাকছে যাতে আছে ভূত, ব্ল্যাকম্যাজিক, তন্ত্র, প্ল্যানচেট, জ্যোতিষীদের নিয়ে এমনি নানা আজগুবি গপ্পো। ভয়ংকর ব্যাপার হলো, এই 'গপ্পো' গুলোকে সত্যি বলে হাজির করা হচ্ছে। টিভি নিউজ চ্যানেলগুলোর সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে সংবাদপত্রও গুলগপ্পো' কে কাহিনি করে প্রচার চালাচ্ছে। পাবলিক খাচ্ছে, সুতরাং পরামনোবিদ্যা এখন ভালো 'সাবজেক্ট'। এইসব নিয়ে বেশ গা ছমছমে সাবজেক্ট। এর টিভি স্ক্রিপ্ট লেখার লোক ভালই রোজগার করছেন।

পরামনোবিদ্যা (Parapsychology)

পরমনোবিদ্যা বা Parapsychology নিয়ে আলোচনার গভীরে ঢোকার আগে Parapsychology-র বিষয়বস্তু কী? সংজ্ঞা কী? এগুলো আগে জানা থাকলে পরবর্তী আলোচনায় আমাদের ঢুকতে কিছুটা সুবিধে হবে।

যুগ যুগ ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্মগুরু, পুরোহিত, ওঝা-গুণিন ইত্যাদির উৎপত্তি হয়েছে, হচ্ছে এবং জানি না আরও কত যুগ ধরে হবে। এই সব শ্রেণীর লোকেরা বারবারই নিজেদের প্রচার করেছেন, বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বলে। আমাদের সাধারণভাবে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। বিশেষ কোনও কারণে ইন্দ্রিয় পাঁচের কম হতে পারে। কিন্তু পাঁচের বেশি হতে পারে না। এই পাঁচটির কোনও এক বা একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও কিছু অনুভব করি। ক্ষমতালোভী কিছু মানুষ নিজেদের ষষ্ঠ ইন্দ্রয়ের অধিকারী বলে দাবি করে। এরা তান্ত্রিক, ওঝা বা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করেন। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পাওয়া অতিরিক্ত অস্বাভাবিক ক্ষমতার নাম দিয়েছেন, 'অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা', ইংরেজিতে যাকে বলে Extra-sensory perception বা সংক্ষেপে E.S.P.।

Parapsychology বা পরামনোবিদ্যা গড়ে উঠেছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (E.S.P.). জাতিস্মর ও মৃতব্যক্তির আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ (Planchette)-কে আশ্রয় করে।

পরামনোবিদ্যার ওপর গত কয়েক বছরে বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। সবগুলো পড়ার সুযোগ না হলেও কয়েকটি পড়েছি। তাতে লক্ষ্য করেছি নতুন তথ্যের অভাব এবং পুরনো তথ্যগুলোকেই বিজ্ঞানগ্রাহ্য করে তোলার চেষ্টা। পরামনোবিজ্ঞানীদের একটা প্রচেষ্টা বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো, তা হলো, ওঁরা প্রমাণ করতে চান রাশিয়ার মতো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী দেশের বিজ্ঞানীরাও পরামনোবিদ্যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। Wolman সম্পাদিত "hand-book of Parapsychology", Van Nostrand—New York 1971 বইটিতে 'Soviet Institute of Brain Research'-এ গবেষণারতদের পরামনোবিদ্যা সংক্রান্ত কিছু মন্তব্যের উল্লেখ আছে। যেমন, "Their (the research team of the Soviet Institute of Brain Research) first efforts were directed towards confirming" one ... Italian physiologist's claim "that he had discovered brain waves approximately 1 c.m. in length, which could be ideal basis of telephathy, Soviet Scientists failed to confirm this claim." (Page 887)

Wolman-এর Handbook of parapsychology বইটিতে আরও বলা হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে "ন্যাটিলাশ" ডুবোজাহাজে আমেরিকান সেনাবাহিনীর সাহায্যে টেলিপ্যাথি সংক্রান্ত যে সফল পরীক্ষা চালানো হয়েছিল তা রাশিয়াকেও

অনুপ্রাণিত করে। ক্রুশ্চফ-এর শাসনকালে রুশ সরকার পরামনোবিদ্যার চর্চাকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করে! "The Nautilus experiment was later shown to be a hoax of finction masquerading as science but it was apparently quite seriously taken up in Russia. From the political point of view the authorities, it appears, were reluctant toignor parapsychology if there was any likelihood that the American military establishment was conducting successful experiments in U.S.A." (Page-887)

আর এক পরামনোবিজ্ঞানী Hans Hozer তাঁর "Truth About E.S.P." বইটিতে জানান, "রাশিয়ায় অন্তত ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরো সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কর্মী নিয়োগ করে পরামনোবিদ্যার গবেষণা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আরও কথা হলো, ওখানে গবেষকদের কাজ-কর্মের ওপর কোনওরকম বাধানিষেধ আরোপ করা হয় না (সরকারি তরফ থেকে) এবং স্বাধীনভাবে যে কোনও কিছু ছেপে প্রকাশ করতে দেওয়া হয়, এমন কী তা মার্কসবাদকে সমর্থন করুক বা না করুক।" (পৃষ্ঠা-১৮)

"At this time there are at least 8 Universities in the Soviet Union with full time, full-staffed research centres in Parapsychology. What is more, there is no restrictians placed upon those working in the field and they were free to publish anything they confirm to dialectical Marxism." (Page 18)

ঐ বইয়েই Holzer বলেছেন, "E.S.P. is no way interferes with their political philosophy; dialectical Marxism may be opposed to the soul in man, but it seems quite compatible with telepathy and communication between minds,....Although the Russions cling to the nation that there is a physical basis for E.S.P. faculties. (ibid, Page 40)

বইগুলোর এই লেখাগুলি পুরোপুরি সত্যি হলে শুধুমাত্র এইটুকুই ধরে নেওয়া যায় রাশিয়াতেও এক সময় পরামনোবিদ্যা নিয়ে গবেষণা চলেছে। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, পরামনোবিদ্যাকে রাশিয়ার 'বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি' স্বীকৃতি দিয়েছে। এই গবেষণার ফলে পরামনোবিদ্যার যথার্থতা বা অসারতা দুইয়ের যে কোনটিই প্রমাণ হতে পারে।

আমি প্রবীর ঘোষ, অতীন্দ্রিয় শক্তি নিয়ে অনুসন্ধান করছি বলে এই নয় যে, আমি এর যথার্থতা স্বীকার করে নিয়েছি। অনুসন্ধান বা গবেষণা কোনও কিছুর স্বীকৃতি নয়।

যতদিন না অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, জাতিস্মর ও প্ল্যানচেট সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য 'বিজ্ঞানসম্মত তথ্য' পরামনোবিজ্ঞানীরা হাজির করতে পারছেন, ততদিন কোনও বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী মানুষ এই তথ্যকে সত্য বলে স্বীকার করে নেবেন না। 'বিজ্ঞানসম্মত তথ্য' বলতে বোঝাচ্ছি সেইসব তথ্যকেই যা অন্য পরীক্ষাকেন্দ্রেও একই শর্তাধীন অবস্থায় অন্য পরীক্ষকদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং সমর্থিত।

Hans Holzer রাশিয়ায় ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চলার কথা বলেছেন, কিন্তু তাদের নাম উল্লেখ করেননি, ফলে তাঁর বক্তব্যের সত্যতা বিষয়ে বেশ কিছুটা সন্দেহ থেকে যায়। রাশিয়ায় পরামনোবিদ্যা চর্চার সত্যতা জানতে ১৯৭৫ সালে 'সোভিয়েত বিজ্ঞান অ্যাকাদেমি'র সঙ্গে যোগাযোগ করেন ভারতের কিছু প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ও শারীরবিজ্ঞানী। উত্তরে বিজ্ঞান অ্যাকাদেমির সাইন্টিফিক সেক্রেটারী আর. এল. গলিনোভা ১৯৭৫-এর ১৭ এপ্রিল যে চিঠি পাঠান, তা পড়লেই বোঝা যায়, এই বিষয়ে রাশিয়ায় উচ্চতম বিজ্ঞান চর্চার সংস্থা 'বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি' খুব একটা আগ্রহী বা ওয়াকিবহাল নন।

বিখ্যাত রুশ মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক আসরেটিয়ান রাশিয়ায় পরামনোবিদ্যা বা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার চর্চা বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে একটি চিঠিতে লেখেন, "There is no Special Institute in our country on investigations in the field of "mystic process" but there are some scientists, and particularly. Dr. Yu. A. Kholodov, in our institute, who works on the problems, which are closed to that you are interested in. And under separate cover I am sending to you some reprints of Dr. Yu. A. Kholodov's works." ('মানবমন' পত্রিকার ১৯৭৫ সাল সংখ্যা)

ডঃ খোলোজেভ্-এর Dr. Kholodov গবেষণার যে বিবরণ চিঠির সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল, তা পড়লে স্পষ্টতই বোঝা যায়, তাঁর অনুসন্ধানের বিষয়—তড়িৎচুম্বক শক্তি কী ভাবে অনেক সময় ইন্দ্রিয় মাধ্যম ছাড়াই মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করতে পারে। তাঁর লেখায় এমন কিছুই ছিল না, যার দ্বারা মনে হতে পারে তিনি পরামনোবিদ্যাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন বা কোনও অতীন্দ্রিয় শক্তির পরিচয় পেয়েছেন।

আসুন, এবার দেখা যাক পরামনোবিজ্ঞানীদের পীঠস্থান আমেরিকায় পরামনোবিদ্যা নিয়ে কী ধরনের কাজ চলছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পরামনোবিদ্যায় চর্চা শুরু হয়েছে জোর কদমে। ডঃ জে. বি. রাইন, ডঃ মিসেস লুইসা রাইন, ওয়াল্টার লেভি ইত্যাদি পরামনোবিজ্ঞানীরা প্যারাসাইকোলজির পক্ষে নানা ধরনের সফল পরীক্ষা (?) চালিয়ে সারা বিশ্বে দস্তুর মতো ঝড় তুলেছিলেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ-ক্যারোলিনা স্টেটের ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরামনোবিদ্যার অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা শ্রী ও শ্রীমতী রাইন

পরামনোবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করে বেশ কিছু বই প্রকাশ করেন। ডঃ জে. বি. রাইন পরবর্তীকালে ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারাসাইকোলজি বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। অবশ্য একসময় ডঃ রাইন-এর অবৈজ্ঞানিক কাজকর্মে অসন্তুষ্ট হয়ে ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর 'গবেষণা' বন্ধ করে দেন। তাতে অবশ্য রাইনের মতো করিৎকর্মা লোক দমে না গিয়ে তাঁর স্ত্রী লুইসা ই. রাইন-এর সহযোগিতায় নর্থ ক্যারোলিনা স্টেটেই ডারহাম-এ Institute of Parapsychology প্রতিষ্ঠা করেন। ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর হন আর এক পরামনোবিজ্ঞানী ওয়াল্টার লেভি।

১৯৭৪-এর আগস্ট, পরামনোবিজ্ঞানীদের কাছে 'কালা দিবস' হিসেবে পরিচিত। এই বিশেষ দিনটিতে ওয়াল্টার লেভি সফল পরামনোবিদ্যার পরীক্ষা দিতে গিয়ে তাঁরই প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীদের হাতে ধরা পড়ে যান। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে যাঁরা পরামনোবিদ্যার সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে অথবা সত্যতা অনুসন্ধানের জন্য এই ইনস্টিটিউটে যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরাই এই অতীন্দ্রিয় পরীক্ষার সফলতার পিছনে যে যান্ত্রিক কলা-কৌশল আছে—তা ফাঁস করে দেন। শ্রী ও শ্রীমতী রাইন-কে চূড়ান্ত অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে ফেলে ওয়াল্টার লেভি পালিয়ে যান।

ভারতেও পরামনোবিদ্যা নামক অবিজ্ঞানের ঢেউ এসে লেগেছে। ১৯৮৪-র ২১ ও ৩৩ এপ্রিল নয়াদিল্লির গান্ধী মেমোরিয়াল হলে পরামনোবিদ্যার এক আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র হয়ে ছিল। আমন্ত্রিত ছিলেন দেশ-বিদেশের প্রচার মাধ্যমগুলো ও কিছু ভি. আই. পি. ব্যক্তি। আর উপস্থিত ছিলেন পরামনোবিজ্ঞানী এবং সর্বোপরি পরামনোবিদ্যার অধিকারী অবতারেরা।

ঈশ্বরের অবতারেরা প্রথম দিনেই বক্তব্য রাখলেন—যে বিদ্যা আয়ত্ত করা দুনিয়ার সব থেকে কঠিন, তা হলো পরাবিদ্যা। পরামনোবিদ্যাই হলো ব্রহ্ম বিদ্যা। পরাবিদ্যার সাহায্যে নিজেকে জানা যায়, নিজের আত্মাকে (?) জানা যায়।

অধিবেশনে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছিলেন লিন ডেভিড মার্টিন, দুবাই থেকে ঈশ্বর বাবা, কানাডা থেকে ফ্লাইংবাবা। আরও যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের সব অদ্ভুত অদ্ভুত নাম, যেমন, আত্মা বাবা, পাইলট বাবা, লাল বাবা, বালতি বাবা, তৎ বাবা, আরও কত কী। এছাড়াও ছিলেন স্বামী আত্মানন্দ, সাধক সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। বাবাদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার খবর আমাদের দেশের প্রায় সব-ভাষাভাষীর প্রধান পত্র-পত্রিকাগুলোতেই প্রকাশিত হয়েছিল। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদনটির কিছুটা এখানে তুলে দিচ্ছি। এই প্রতিবেদনটি পড়লে বাবাদের ক্ষমতার কিছুটা আঁচ আপনারা পাবেন বই কী :

এক একজন এক এক ধাঁচের অলৌকিক শক্তির অধিকারী। কেউ নাকি মাসের পর মাস সমাধিস্থ থাকতে পারেন প্রাণ স্পন্দনকেও থামিয়ে দিয়ে। কেউ আবার

কার কী জিজ্ঞাসা আছে এবং তাঁর নাম, ধাম পরিচয়ই বা কী, তাও আগে ভাগে বলে দিতে পারেন।

তাঁদের কেউ কেউ অধীত শক্তির পরিচয় দিলেন। সঠিক উত্তর না পেয়ে দর্শকদের মধ্যে থেকে অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করতেও ছাড়লেন না। বাবারা অবশ্য নির্বিকার। সন্দেহকারীদের দিকে কৃপার দৃষ্টি হেনেছেন শুধু। ভাবখানা যেন, আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছ?

অবিশ্বাসের গোড়াপত্তন কিন্তু আলোচনাচক্রের শুরু থেকেই। কৃষি দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী যোগেন্দ্র মাকোয়ানা ভগবান বিষ্ণুর ছবিতে মালা দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধনী ভাষণ শুরু করলেন এভাবে—"অবিশ্বাসী হলেও খোলা মন নিয়ে আমি এসেছি, কারণ দেশের অনেক ঋষি-মহর্ষিই এক সময় আমাকে ভগবান দর্শনের জন্য মন্দিরে ঢুকতে দেননি। আমি নাকি অচ্ছুৎ। ঈশ্বর দর্শন করতে তাই আমি মন্দিরে যাই না। যে-সব বাবা এখানে এসেছেন, তাঁরা নাকি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁরা নাকি অতীন্দ্রিয় শক্তির অধিকারী। বিশ্বাস আমি করি না, তবে মন খোলা রেখেছি। বিশ্বাস করলে বলে যাব। আমি বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, বুজরুকিতে নই।"

মাকোয়ানার এই কথায় যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। মঞ্চে বসা পাইলট বাবা, বালতি বাবার চোখ জ্বলে উঠল। বিচারপতি ভি কৃষ্ণ আয়ার পাক্কা সাতান্ন মিনিট ধরে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন, পরাবিদ্যা ও অতীন্দ্রিয় শক্তি নিয়ে শুধু ভারতেই নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে আজ চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষা চলছে রাশিয়া-আমেরিকার মতো বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলিতেও। তিনি জানালেন, অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রয়োগেই জর্জিয়ার এক মহিলা অসুস্থ রুশ প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভকে দীর্ঘ স্বস্তি দিয়েছিলেন। রুশরা এই পরাবিদ্যাকে বলছে বায়ো-এনার্জি। এটা শুধু বিজ্ঞান-নির্ভর নয়, পুরোপুরি বিজ্ঞান।

বক্তৃতায় আর মন ভরছে না। সুবেশা মহিলারা আসনে এগিয়ে বসেছেন আগ্রহে; বাবাদের কৃপাপ্রার্থী তাঁরাই বেশি। অতঃপর বালতি বাবার ক্ষমতা দেখানো শুরু হল। পাঁচজন সাংবাদিক, পাঁচজন মহিলা ও পাঁচজন সাধারণ দর্শক নির্দিষ্ট হলে একটি করে প্রশ্ন মনে মনে তাঁরা ভাববেন। উনি বলে দেবেন কে কী ভেবেছে। কীভাবে?

মঞ্চে একটা বালতি এল। তাতে পরিমাণমতো জল ও দুধ ঢাললেন তিনি। সাদা কাগজ ফেলে দিলেন তাতে। বালতির মুখ চাপা দিলেন খবরের কাগজ দিয়ে। অল্পক্ষণ মুদ্রিত নেত্রে ধ্যান। তারপর হাত ঢুকিয়ে সেই সাদা কাগজ বের করা হবে। তাতে লেখা থাকবে প্রশ্নকর্তার নাম ও উত্তর।

নির্দিষ্ট সাংবাদিকদের মধ্যে আমি ছিলাম। প্রশ্ন ছিল মেহতা ও ইদ্রিস হত্যার প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন হবে কি না। বালতিবাবা কোন উত্তর কিন্তু দেননি। পাশে

বসা এক মহিলা সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিল লোকসভার নির্বাচন হবে না পিছবে। তার কোন জবাবও তিনি দিলেন না। ১৫ জনের মধ্যে জবাব পেলেন পাঁচজন। তাঁরা অবশ্য জানালেন জবাবে সন্তুষ্ট।

এইভাবে ক্যালিফোর্নিয়ার 'সাধক' লিন ডেভিড মার্টিনও তাঁর অধীত শক্তির পরীক্ষা দিলেন। ভাঁজ করা প্রশ্ন চোখ বন্ধ করে কপালে ঘষে তিনি জবাব দেন। চারজন প্রশ্নকর্তা বললেন, উত্তরটা কেমন যেন ভাসা ভাসা হলো। আর একজন মঞ্চে উঠে গিয়ে তাঁকে স্পষ্ট বলে এলেন, এই প্রশ্ন আমি করিনি। জবাবটাও আমার নয়। আমি জানতে চেয়েছিলাম আমার বন্ধুর হারিয়ে-যাওয়া ছেলেটি ফিরবে কি না। লিন কড়া চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বসে পড়েন। আর কোন প্রশ্নকর্তার জবাব তিনি দেননি। আমারটাও নয়।

সেমিনারের কনভেনার এম সি ভাণ্ডারি কলকাতার মানুষ। তাঁর ভাষায়, বিজ্ঞান ও অলৌকিকতার পার্থক্য, প্রকৃত সাধক ও জোচ্চোরদের পার্থক্য দেখতেই এই আলোচনা সভার আয়োজন। আর বিশ্বশান্তির জন্য যোগীরা কী অসাধ্য সাধন করতে পারেন, সাধারণ মানুষকে তা জানানোই সম্মেলনের লক্ষ্য। সুযোগ দিলে এই যোগীরা নাকি মহাশূন্যের হাঁড়ির খবর দিয়ে দিতে পারেন। পাইলট বাবা সে কথাই সগর্বে ঘোষণা করলেন, "এই সরকার এত অর্থ ব্যয় করে রাকেশ শর্মাকে মহাকাশে পাঠাল। কী তথ্য সে জানিয়েছে? দিক আমার দায়িত্ব, হাজার গুণ বেশি খবর আমি জানিয়ে দেব।"

তাই শুনে কলকাতার যোগী ও দিল্লিতে আশ্রম তৈরি করে সমাজসেবায় ব্যস্ত 'মাধবী মা' বললেন, "যত সব বুজরুকি। জানান না যা উনি জানাতে পারেন। কেউ বারণ করেছে?"

পাইলট বাবাকে এই কথা জানাই। বিহারের সাসারামের এই যোগী তা শুনে করুণার দৃষ্টিতে তাকালেন। শুধু বললেন, '৫৬ থেকে '৭১ সাল পর্যন্ত ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সে ন্যাট ও হান্টার চালিয়েছি। '৬৫-তে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। তারপর আত্মসন্ধানে সংসারত্যাগী হই। ব্রহ্মের দেখা পাই মহাকাশে বিমান চালানোর সময়। একাধিকবার। '৭৩ থেকে হিমালয়ে সাধনা। সিদ্ধি পেয়ে চলে এসেছি '৮০ সালে। এখন বিশ্বশান্তির জন্য কাজ করছি। সারা পৃথিবীতে ১০ কোটি শিষ্য। এই মহাশূন্য, এই ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে জানি না এমন কিছুই নেই। সরকার দায়িত্ব দিক, সব সন্দেহ দূর করে দেব।'

দুদিন ধরে বাবাদের এই কাণ্ড চলবে। তৎ বাবা চোখ বন্ধ করিয়ে কুণ্ডলিনীর স্পর্শ দেবেন। পাইলট বাবা সমাধিস্থ হয়ে থাকবেন। তাঁর আত্মা ত্যাগ করবে শরীর, বন্ধ হবে প্রাণের স্পন্দন। সেই অবকাশে তিনি বিচরণ করবেন মহাশূন্যে। কানাডার ফ্লাইং স্বামী সমাধিস্থ অবস্থায় ভেসে থাকবেন দীর্ঘ সময়।

কলকাতা থেকে সম্মেলনে আমন্ত্রিত সাধক সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়। "অতীন্দ্রিয়

শক্তি, সাধনায় অর্জন করা সম্ভব"—বললেন তিনি। "তেমন সাধক বামাক্ষ্যাপা, তৈলঙ্গস্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। ঠাকুর অষ্ট অনিষ দান করেছিলেন স্বামীজিকে। স্বামীজিই পেরেছিলেন তা প্রত্যাহার করতে। কারণ এই শক্তি মানুষকে লোভী করে তোলে, করে ধাপ্পাবাজ। সাধক শঙ্করাচার্য রাজা আমরূপের দেহে প্রবেশ করেছিলেন কামশাস্ত্র জানতে। যোগ সাধনায় সিদ্ধ না হলে এ অসম্ভব। আর অনেক সিদ্ধ পুরুষই ধর্মান্ধতার সুযোগ নিয়ে অনাচারী হয়ে ওঠে। ব্যবসায়ী হয়। দেখতে হবে এখানে কতজন প্রকৃত, কতজন জাল।"

হিমালয়সিদ্ধ স্বামী আত্মানন্দের আগমনও এই এক উদ্দেশ্যে। আমন্ত্রিত নন উনি। বললেন, হিমালয়ে থাকি। নির্দেশ পেয়ে চলে এসেছি। সুবেশা দুই তন্বীর সঙ্গে একান্তে আলাপচারী স্বামীজিকে জিজ্ঞেস করি—কী বুঝছেন? কতটা দুধ, কতটা জল? প্রশ্ন শুনে উনি গম্ভীর হন এবং স্থান ত্যাগ করেন সঙ্গীদের বিমূঢ় রেখে। সম্মেলনে নিন্দুকের অভাব ছিল না। প্রকাশ্যেই আলোচনা শোনা গিয়েছে, রাজনীতিবিদদের ওপর যোগীদের প্রভাবের কথা। স্থানীয় এক সাংবাদিক চেপে ধরেছিলেন সম্মেলনের কনভেনার ভাণ্ডারিকে। উনি বললেন, যোগীরা বলেছেন, ওঁর হাতে নাকি বড় রাজনীতিক হবার রেখা আছে।

Extra-sensory perception বা E.S.P. (অতীন্দ্রিয় অনুভূতি)

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা E.S.P. মোটামুটিভাবে সাধারণত চার রকমের। (১) Telepathy (দূরচিন্তা) (২) Precognition (ভবিষ্যৎ দৃষ্টি) (৩) Clairvoyance (অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি) (৪) Psycho-Kines বা PK (জড় পদার্থে মানসিক শক্তি প্রয়োগ) আগেই স্পষ্ট বলে রাখা ভাল, এই ধরনের ভাগগুলো করা হয়েছে পরামনোবিদ্যারই সূত্র ধরে। বিজ্ঞানের কাছে এইসব ভাগ একান্তই মূল্যহীন, কারণ বিজ্ঞানে অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তার স্থান নেই।

অধ্যায় : এগারো

Telepathy (দূরচিন্তা)

পরামনোবিজ্ঞানীদের তুরুপের তাস হলো ' টেলিপ্যাথি', যার সাহায্যে তাঁদের অলৌকিক বিশ্বাসকে (নেহাতই অন্ধ বিশ্বাস) বিজ্ঞানের লেবেল এঁটে বার বারই চালাবার চেষ্টা করে চলেছেন।

পরামনোবিজ্ঞানীদের ধারণায় চিন্তার সময় মস্তিষ্ক থেকে রেডিও ওয়েভের মতো এক ধরনের তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে প্রবাহিত হতে থাকে। দূরের কোনও লোকের পক্ষে তার মস্তিষ্কের গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে এই তরঙ্গকে ধরে প্রেরকের চিন্তার হদিস পাওয়া কঠিন হলেও অসম্ভব বা অবাস্তব নয়। পরামনোবিজ্ঞানীরা এই ধরনের কোনও চিন্তাতরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেননি, যেমনটি প্রমাণ করা যায় শব্দ বা আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রে।

শব্দ বা আলোক তরঙ্গ নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক, গতি ও মাত্রায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এটা প্রমাণিত। রেডিও এবং টেলিভিশন এই শব্দ তরঙ্গ ও আলোক তরঙ্গকে ধরে শব্দ ও দৃশ্যকে আমাদের সামনে হাজির করে। যেহেতু 'চিন্তা তরঙ্গ' বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব শুধু কল্পনাতেই রয়ে গেছে, বাস্তবে প্রমাণিত হয়নি, তাই এই অস্তিত্বহীন চিন্তা তরঙ্গকে ধরা নেহাতই অবাস্তব কল্পনা মাত্র।

বিজ্ঞান স্বীকার করে ও জানে শব্দ শক্তি বা আলোক শক্তির মতো চিন্তা কোনও শক্তি নয়। চিন্তা স্নায়ু ক্রিয়ারই একটি ফল। টেলিপ্যাথির কোনও ঘটনা আজ পর্যন্ত ঘটেছে বলে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত হয়নি। তবে টেলিপ্যাথির নামে বহু প্রতারণার ঘটনা পৃথিবী জুড়ে ঘটেছে।

আসুন, পরামনোবিজ্ঞানীরা টেলিপ্যাথির অস্তিত্বের সপক্ষে যেসব ঘটনার উল্লেখ করেছেন সেগুলোই এখন একটু নেড়েচেড়ে দেখি।

১৯৫৯ সালে বিখ্যাত পরামনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডঃ জে. বি. রাইন টেলিপ্যাথির সফল পরীক্ষা (?) চালিয়ে সবচেয়ে সারা বিশ্বে দস্তুরমতো একটা ঝড় তুলেছিলেন। তাঁর পরীক্ষার এই অভাবনীয় সাফল্যের খবর বিশ্বের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলোর দ্বারা প্রচারিত হতেই বিভিন্ন দেশের পরামনোবিজ্ঞানীরা নতুন শক্তি পেলেন। এলো পরামনোবিদ্যা বা Parapsychology-র জোয়ার। টেলিপ্যাথির সপক্ষে তাঁরা প্রত্যেকেই হাজির করতে লাগলেন ডঃ রাইনের ন্যাটিলাশ ডুবোজাহাজে চালানো সফল পরীক্ষার খবর।

ডুবোজাহাজে টেলিপ্যাথির পরীক্ষা

ডঃ জে. বি. রাইন দাবি করেন, ১৯৫৯ সালের ২৫ জুলাই তিনি টেলিপ্যাথির সাহায্যে ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন 'ন্যাটিলাশ'-এ খবর পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন। পরীক্ষা চালাবার সময় ন্যাটিলাশ ছিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১২০০ মাইল দূরে এবং জলের তলায়। এই পরীক্ষায় অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন মার্কিন বিমান বাহিনীর উইলিয়ম বাওয়ার। বিশ্বের বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমগুলো গুরুত্বের সঙ্গে তাঁর এই দাবিগুলোকে প্রচার করে। প্রচার মাধ্যমগুলো ডঃ রাইনের দাবির সত্যতার অনুসন্ধানে সময় নষ্ট না করে পড়ি-মরি করে সাধারণ মানুষকে গপ্পোটা গেলাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলো। একটা মানুষের মনে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি করল। প্রচার মাধ্যমগুলো যে নিজেদের ব্যবসা দেখতে গিয়ে লক্ষ-কোটি লোকের মধ্যে অ-বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও যুক্তিহীন কুসংস্কারের বীজ বপন করল।

এই অসাধারণ আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটার চার বছর পরে অর্থাৎ ১৯৬৩ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'দিস উইক' পত্রিকার তরফ থেকে ঘটনাটির ওপর একটি বিশেষ অনুসন্ধান চালানো হয়। উদ্দেশ্য ছিল টেলিপ্যাথি পরীক্ষাটির ওপর একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করা। আর, তাইতেই বেরিয়ে আসে 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ'। ন্যাটিলাশ আণবিক সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন উইলিয়ম অ্যান্ডারসন জানান ১৯৫৯-এর ২৫ জুলাই ন্যাটিলাশ ছিল ডকে। কিছু সারাইয়ের কাজ চলছিল। ক্যাপ্টেন উইলিয়ম পরিস্কার ভাবে এও জানান যে, আজ পর্যন্ত টেলিপ্যাথির কোনও পরীক্ষাই ন্যাটিলাশে চালানো হয়নি।

টেলিপ্যাথির পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত বলে কথিত মার্কিন বিমান বাহিনীর উইলিয়ম বাওয়ার পত্রিকার অনুসন্ধানকারীদের জানান—টেলিপ্যাথির কোনও পরীক্ষার সঙ্গেই তিনি যুক্ত ছিলেন না। ১৯৫৯-এর ২৫ জুলাই তিনি আদৌ ন্যাটিলাশে ছিলেন না। ছিলেন আলাবামা বিমান বাহিনীর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

টেলিপ্যাথির সাহায্যে নোটের নম্বর বলা

শ্রীলঙ্কার যুক্তিবাদী ডঃ আব্রাহাম থোম্মা কোভুর ১৯৬৩ সালে টেলিপ্যাথি ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ২৫ হাজার সিলোনিজ টাকা পর্যন্ত বাজি রাখেন। কোভুর ঘোষণায় বলেছিলেন—টেলিপ্যাথি ক্ষমতার অধিকারী দু-জনের মধ্যে একজনকে একটি কাগজের টাকা দেখান হবে। সেই টাকার নম্বর অন্যজনকে বলে দিতে হবে।

অবশ্য এই ধরনের পরীক্ষায় কেউ সাফল্য দেখালেই সেটাকে টেলিপ্যাথির সফল পরীক্ষা বলে মেনে নিতে আমি রাজি নই। কারণ ওর মধ্যেও থাকতে পারে কিছু কৌশল। আমি আমার ১১ বছরের ছেলে পিংকির সহায়তায় বহুবার এই ধরনের টেলিপ্যাথি সেমিনার ও অনুষ্ঠানে দেখিয়েছি। অনেকেই এটাকে খাঁটি টেলিপ্যাথি বলেই যে ধরে নিয়েছিলেন। বোঝাবার পর ভুল ভেঙেছে।

আমার এক বন্ধুর বাড়িতে সপরিবারে বেড়াতে গিয়ে আড্ডায় বেশ জমে উঠেছিলাম। 'ধান ভানতে শিবের গীত'-এর মতোই বন্ধু বলল, টেলিপ্যাথি ব্যাপারটিকে তুই কী বলবি—সত্যি, না কি বুজরুকি?

বললাম, "বেশ তো, তোদের একটা টেলিপ্যাথি করে দেখাচ্ছি। ব্যাখ্যা পরে দেবো।

"পিংকি (আমার একমাত্র ছেলে। বয়েস এগারো আমার যুক্তিবাদী কাজকর্মের সঙ্গী) এই ঘরেই থাকুক। আমি যাচ্ছি তোর সঙ্গে পাশের ঘরে। তুই যে কোনও একটা কাগুজে টাকা আমাকে দেখাবি। নোটের নম্বরটা দেখে আমি টেলিপ্যাথির সাহায্যে পিংকির মস্তিষ্কে চিন্তাটা পাঠাব। পিংকি নোটের নম্বর বলে দেবে।"

পাশের ঘরে বন্ধুর দেওয়া নোটের নম্বরটা দেখলাম ১০৯৬৩৬। বন্ধুকে বললাম, "এবার পিংকি ঠিক আমার চিন্তা ধরে নেবে। তারপর বল, এবার পুজোয় তুই কোথায় যাচ্ছিস?"

বন্ধু বলল, "কিছুই ঠিক করিনি।"

বললাম, "এবার আমার রাজস্থান, দিল্লি, আগ্রা সাইডটা দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বোধহয় যাওয়া হবে না। আগামী পুজোর আগে হবে বলে মনে হচ্ছে না। দুই প্রকাশকের দুটো বড়-সড় কাজ রয়েছে হাতে। অতএব পুজোটা খাতা-কলম নিয়েই কাটাতে হবে মনে হচ্ছে।"

ও ঘর থেকে পিংকি জবাব দিল, "নোটের নম্বর ১০৯৬৩৬।"

১৯৮৬-র ১৬-১৭ই ফেব্রুয়ারি। স্থান : কলকাতার মৌলালী যুবকেন্দ্রে। মনোবিজ্ঞানী, মনোরোগ চিকিৎসক এবং সমাজবিজ্ঞানীদের নিয়ে "মানসিক ব্যাধি ও আমাদের কর্তব্য" শিরোনামে দু'দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো। আয়োজক, ছিলেন "মানব মন রজত জয়ন্তী উৎসব কমিটি।" উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের

সে সময়কার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু।

প্রথমদিনের অধিবেশনে আমি বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অবতার এবং প্যারাসাইকোলজিস্টরা অলৌকিক বলে যা দেখিয়েছেন তার কিছু কিছু করে দেখাই বলি, "এগুলো সবই দেখালাম লৌকিক কৌশলের সাহায্যে।" শেষে টেলিপ্যাথির আলোচনায় এলাম। দেখালাম নানা ধরনের টেলিপ্যাথির কৌশল। শেষে একজন দর্শককে একটা কাগুজে টাকা দিতে অনুরোধ করলাম। মঞ্চে এলেন দুইজন দর্শক। একজন দিয়েছিলেন এক টাকার নোট। আর একজন পাঁচ টাকার।

চোখ বাঁধা অবস্থায় পিংকি বসেছিল স্টেজে। আমি প্রথম দর্শকের নোটটি নিয়ে পিংকিকে বলতে বলেছিলাম, "কত টাকার নোট এবং নম্বর কত?"

পিংকি উত্তর দিয়েছিল, "এক টাকার নোট, নম্বর ২৩৩২৭৯।"

দ্বিতীয় দর্শকের দেওয়া নোটটির ক্ষেত্রেও সঠিকভাবে বলে দিয়েছিল, "পাঁচ টাকার নোট, নম্বর ৭৭১৩২০।"

'সাপ্তাহিক পরিবর্তন' পত্রিকার ব্যবস্থাপনায় টেলিপ্যাথি

এক সময় সবচেয়ে জনপ্রিয় 'সাপ্তাহিক ছিল 'পরিবর্তন'। 'পরিবর্তন' পত্রিকার সম্পাদক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় রাশিয়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ওখানে দেখেছিলেন মাদাম কুলাগিনার টেলিপ্যাথি। আমি বলেছিলাম—ওটা টেলিপ্যাথি নয়; কৌশল। আমিও অমন টেলিপ্যাথি দেখাতে পারবো শুনে পার্থদা পরিবর্তন পত্রিকার তরফ থেকে লৌকিক-অলৌকিক' নামের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে (৩রা ডিসেম্বর, ১৯৮৫) টেলিপ্যাথির কিছু 'খেলা' ছিল অন্যতম আকর্ষণ। আমি যা দেখতে পাচ্ছিলাম, চোখ বাঁধা পিংকির কাছেও তা দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। নোটের নম্বর বলা দিয়ে প্রদর্শনী শেষ করে বসলাম সম্পাদক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পাশের চেয়ারে। আমার পাশে বসল পিংকি। পার্থদা একটা কয়েন (coin) বার করে বললেন, "এই কয়েনটার সাল পিংকি বলতে পারবে?"

বললাম, "কেন পারবে না? আপনি কী ভেবেছেন, যিনি টাকা দিয়েছিলেন তিনি আমার দলের কেউ?"

পার্থদা সালটা আমাকে দেখিয়ে কয়েনটা মুঠিবদ্ধ করলেন।

আমি পিংকিকে প্রশ্ন করতেই ও সালটা বলে দিল। স্বভাবতই পার্থদা অবাক।

টেলিফোনে টেলিপ্যাথি : আয়োজক লন্ডনের 'সানডে মিরর'

লন্ডনের 'সানডে মিরর' পত্রিকা ১৯৭৩-এর ১০ ডিসেম্বর এক টেলিপ্যাথি যোগাযোগের পরীক্ষা গ্রহণ করে। না, এরা কেউই পাশাপাশি ঘরে ছিলেন না। ছিলেন না একই হলের ভেতর। একজন পরামনোবিদ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন লন্ডনে অন্য পরামনোবিদ্যাবিশারদ ছিলেন নিউইয়র্ক-এ। দু'ঘণ্টা ধরে ফোনের মাধ্যমে

চলেছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তারপর 'সানডে মিররে' প্রকাশিত হলো টেলিফোন টেলিপ্যাথির অসাধারণ 'সাফল্য কাহিনি'। ছ-সাত মাস ধরে বহুবার তাদের এই

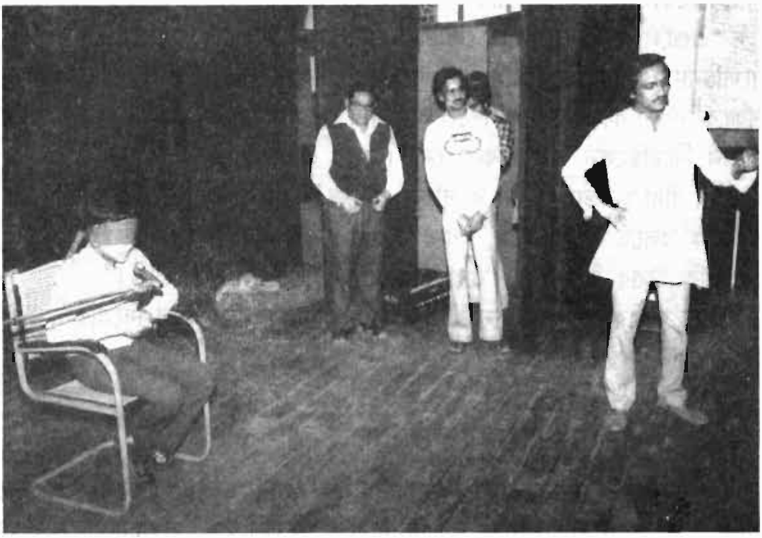

পরিবর্তন আয়োজিত টেলিপ্যাথি অনুষ্ঠানে পিনাকী ঘোষ ও লেখক

টেলিপ্যাথি পরীক্ষার খবর প্রকাশ করেছে। খবরটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই যথেষ্ট প্রচার পেয়েছে। ভারতীয় পত্র-পত্রিকাগুলোও এই বিষয়ে পিছিয়ে ছিল না। পরামনোবিজ্ঞানীদের কাছে এই সফল (?) পরীক্ষাটি বিরাট একটা 'প্লাস পয়েন্ট।'

আমাদের দেশেরই কয়েকজন মনোবিজ্ঞানী, বিজ্ঞানী ও ডাক্তারকে জানি যাঁদের এক সময় যুক্তিবাদী হিসেবে ও কুসংস্কার বিরোধী হিসেবে যথেষ্ট পরিচিতি ছিল, তাঁরাও প্রধানত 'সানডে মিরর' আয়োজিত টেলিপ্যাথি পরীক্ষায় সাফল্য দেখে তাঁদের বিশ্বাস থেকে টলে গিয়েছেন। যে পরীক্ষায় এই অসাধারণরাও টলেন, সেই পরীক্ষার সাফল্যের খবর পড়ে সাধারণের কী অবস্থা হবে, তা অনুমান করতে অসুবিধে হয় না।

পরীক্ষক হিসেবে কারা ছিলেন

'সানডে মিরর' আয়োজিত টেলিফোন টেলিপ্যাথির এই পরীক্ষায় লন্ডনের পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন চিন্তা প্রেরক হিসেবে টেলিফোন যোগাযোগকারীর ভূমিকায় সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অর্থার এলিসন। অর্থার এলিসন-এর আর এক পরিচয়, তিনি 'সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চ'-এর সভাপতি। এই সোসাইটির প্রধান কাজ হলো প্যারাসাইকোলজি ও অতীন্দ্রিয়বাদের প্রচার।

আর যাঁরা লন্ডন অফিসে সেদিনের পরীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন, মিররের বিজ্ঞান-সম্পাদক রোনি বেডফোর্ড, সানডে মিররের দূরদর্শন সম্পাদক ক্লিফোর্ড ডেভিস, 'নিউ সায়েনটিস্ট' পত্রিকার পক্ষে ডঃ ক্রিস্টোফার ইভান্স এবং যোশেফ হ্যানলন, সেইসঙ্গে কয়েকজন বিজ্ঞানী, পরামনোবিজ্ঞানী, সাংবাদিক ও কিছু বিশিষ্ট দর্শক।

নিউইয়র্ক অফিসে ছিলেন টেলিপ্যাথি ক্ষমতার অধিকারী বিশিষ্ট অতীন্দ্রিয় শক্তিধর ব্যক্তিটি ও তাঁর এক সহকর্মী, সানডে মিররের প্রতিনিধি এবং 'নিউ সায়েন্টিস্ট'-এর প্রতিনিধি সিডনি ইয়াং।

পরীক্ষা কেমন হল

লন্ডনের পরীক্ষাকেন্দ্রে 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার তরফ থেকে এক গোছা বন্ধ খাম রাখা হয় টেবিলের ওপর। খামের ভিতরে কী আছে তা 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার ডঃ ক্রিস্টোফার ইভান্স এবং ডঃ যোশেফ হ্যানলন ছাড়া আর কেউ জানতেন না। এই খামের ভিড়ের থেকে একটা খাম তুলে এগিয়ে দেওয়া হল অধ্যাপক অর্থার এলিসন-এর হাতে। খাম খুলতেই বেরিয়ে এল একটা ফোটোগ্রাফ। ফোটোগ্রাফটা একটা পুলিশের গাড়ি, গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন পুলিশ।

ছবিটি টেবিলের ওপর রাখা হল। সকলেই ছবি দেখলেন। নিউইয়র্ক পরীক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করলেন অর্থার এলিসন। তারপর ইংলন্ডে বসে থাকা এলিসনের সঙ্গে নিউইয়র্কে বসে থাকা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিটির শুরু হলো কথোপকথন। মাঝে মাঝে কথা, মাঝে মাঝে নীরবতা। এমনি করে কেটে গেল ঘণ্টা দুয়েক। শেষ পর্যন্ত নিউইয়র্ক থেকে টেলিফোনে ভেসে এলো—"গাড়ি গাড়ি গাড়ি। গাড়ির কথাটাই সবার আগে মনে এসেছে আমার। একটা চকচকে লম্বা গাড়ি।"

পরামনোবিদ অধ্যাপক অর্থার এলিসন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। জানালেন, "পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য লক্ষ্য করা গেছে।"

প্রচার মাধ্যমগুলোতে প্রচারিত হলো আটলাণ্টিক সাগর পেরিয়ে আশ্চর্য টেলিপ্যাথি যোগাযোগের বিস্ফোরক সংবাদ, তবে সংক্ষিপ্ত আকারে। পত্র-পত্রিকাগুলোতে বেশি কিছুদিন ধরেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে টেলিফোন টেলিপ্যাথির অসাধারণ সফল্যের কথা প্রচারিত হল। 'নিউ সায়েনটিস্ট' পত্রিকায় ডঃ যোশেফ হ্যানলন্ তাঁর লেখা প্রতিবেদনে পুরো ঘটনাটার খুঁটিনাটি বিবরণ দিলেন। দিলেন টেলিফোনে কথাপকথনের বর্ণনা। সেই সঙ্গে তাঁদের পত্রিকার নিউইয়র্ক প্রতিনিধি সিডনি ইয়াং কী দেখেছেন, তারও বিবরণ। ফলে গোটা ব্যাপারটার যে ছবি নিখুঁত ফুটে উঠল, সেটা আপনাদের সামনে পর্যালোচনার জন্য তুলে ধরছি।

'নিউ সায়েনটিস্ট' পত্রিকা কী বলছে

অধ্যাপক অর্থার এলিসন-এর সঙ্গে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিটির সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপনের পর নিউইয়র্কের তরফ থেকে দীর্ঘ নীরবতা। সম্ভবত নিউইয়র্কের পরামনোবিদ মনসংযোগ করছেন। দীর্ঘ নীরবতায় শেষ পর্যন্ত এলিসনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি এ-প্রান্ত থেকে চেঁচালেন—"এখন তুমি অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় কী দেখতে পাচ্ছ?" পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের আগেই জানানো হয়েছিল, এলিসনের হাতে তুলে দেওয়া হবে একটি বন্ধ খাম, যাতে থাকবে কোন কিছুর ছবি। নিউইয়র্ক থেকে বলতে হবে লন্ডনে এলিসনের সামনের টেবিলে কীসের ছবি রাখা হয়েছে।

—"আমি তিনটে জিনিসের ছবি দেখতে পাচ্ছি।" নিউইয়র্ক থেকে খবর ভেসে এলো।

—"ঠিক কী ধরনের ছবি তুমি দেখতে পাচ্ছ, বলো। আমাদের ছবির সঙ্গে তার মিল কতখানি দেখি।"

অন্যপ্রান্ত কোন উত্তর দিল না। দীর্ঘ কুড়ি মিনিটের নীরবতার পর ভেসে এল একটি ক্লান্ত কণ্ঠস্বর, "আমি ক্লান্ত।"

পরামনোবিদ এলিসন উৎসাহ যোগালেন, "এত তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হচ্ছ কেন আজকাল? মনস্থির করে বসো। বসে ভাবতে থাক। বলো, আমরা এখানে যে ছবিটার দিকে মনসংযোগ করেছি, সেটা তোমার মনে কী ভাবে ভেসে উঠেছে?"

—"একটা সাদা কোন কিছুর ওপর তিনটে মানুষের ছবি।"

এলিসন কোনও উৎসাহ দেখাতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পরে নিউইয়র্ক থেকে ভেসে এলো, "একটা লম্বা মতো..."

ও প্রান্ত কথা শেষ করার আগেই উত্তেজিত এলিসন চেঁচিয়ে উঠলেন, "ঠিক ঠিক, লম্বাটে ধরনেরই কিছু বলে যাও।"

এলিসন-এর এই সাহায্যে কোনও কাজ হলো না। লম্বাটে ধরনেরই একটা কিছুর ছবি বলে জানানো সত্ত্বেও ও প্রান্ত থেকে যা বললো তা এলিসনের পক্ষে যথেষ্ট হতাশজনক।

—"হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি একটা লম্বা কুকুর, একটা ঘোড়া আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে।"

এলিসন কোনও উৎসাহ দেখালেন না। ও-প্রান্ত বুঝে নিল, উত্তর ঠিক হয়নি। আবার নতুন করে শুরু করল, "আমি দেখতে পাচ্ছি একটা তিনকোনা মতো—একটা অর্ধবৃত্ত—একটা পাহাড়—"

এলিসন কোনও সাড়া দিলেন না।

ও-প্রান্ত হঠাৎই উত্তেজিত কণ্ঠে বলল... "ঘোড়া, কুকুর...কুকুর।"

ছবিটির কোথাও কুকুর নেই। এলিসন তাই নীরব।

ও-প্রান্ত নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলল, "দেখুন তো ঘরে কোনও কুকুরের ছবি আছে কি না?"

না, অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ঘরে কোনও কুকুরের ছবি দেখা গেল না। এলিসন তাঁর প্যারাসাইকোলজিকে এমনভাবে মার খেতে দেখে আবার নতুন উদ্যমে শুরু করলেন, "লম্বা কোনও কিছুর কথা বলছিলে না তুমি?"

ও-প্রান্ত বলল, "একটা ছবি আমি খুব স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছি।"

—"তার কথাই বলো।"

"একটা চওড়া মতন লম্বা বস্তু, উজ্জ্বল রঙের।"

—"বাঃ, খুব ভাল বলছ। বলে যাও।"

"টেবিল-ফুল—"

এলিসন কোনও উত্তর দিলেন না।

নিউইয়র্কের অতীন্দ্রিয়-ক্ষমতাবানেরও গলা নীরব হলো। মিনিট পাঁচেক পরে নিউইয়র্ক থেকে ভেসে এলো আর একটি কণ্ঠস্বর। এটি 'নিউ সায়েনটিস্ট' পত্রিকার সিডনি ইয়াং-এর।

ইয়াং বললেন, "ও টেলিপ্যাথির সাহায্য নিয়ে একটা ছবি আঁকছে। ছবিটা গাড়ির বা শুয়োরছানার।

এলিসন উৎসাহ দিলেন, "ওকে চালিয়ে যেতে বলুন।"

—ছবিটা এখন দাঁড়িয়েছে একটা কাঠের খেলনার মতো। "গাড়ি বা শুয়োরছানার মতো ওপরটা। নীচে চাকা বা পা নেই, গোল মতো।"

—"ও অনেকটা সফল হয়েছে। আপনি ছবি দেখে বলে যেতে থাকুন।"

—"ছবিটা এবার থালার আকার নিয়েছে। সেটার দিকে হাতির পায়ের মতো কিছু একটা নেমে আসছে। এবার মনে হচ্ছে একটা স্তনের মতো কিছু।"

ছবি আঁকা শেষ হতে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার মানুষটি নিজেই ফোন ধরলেন। জানতে চাইলেন, "কীসের ছবি তোমরা দেখছ?"

—"এটা পুলিশের গাড়ির ছবি।" এলিসন জানালেন।

—"গাড়ি-গাড়ি। এই ছবিটাই তো কতবার এঁকেছি। একটা চকচকে লম্বা গাড়ি।"

এলিসন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, "ঠিক ধরেছ, একটা চকচকে লম্বা গাড়ি।"

ও-প্রান্ত থেকেও উচ্ছ্বাস ভেসে এলো—"আমি এত দূরে থেকেও ছবিটা দেখতে সফল হয়েছি। সত্যিই আমি খুশি।"

এতেই পরামনোবিদ অধ্যাপক এলিসন পরামনোবিদ্যার 'অভাবনীয় সাফল্য খুঁজে পেলেন।'

যেহেতু বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষ অলৌকিক কোনও কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী, জনপ্রিয় পত্রিকাগুলো ও টিভি চ্যানেলগুলো তাই প্রকৃত ঘটনায় কাঁচি চালিয়ে অলৌকিকের মোড়কে মুড়িয়ে লোভনীয় চাটনির মতোই পরিবেশন করছে।

'নিউ সায়েনটিস্ট' পত্রিকার প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, "সে যে ছবি এঁকেছে, সেটা জন্তুর, টেবিলের, পাহাড়ের অথবা বিশ্বের যে কোনও বস্তুর বলে দাবি করা যেতে পারে।"

মুখেও সে ছবির বর্ণনা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তবু প্রচার-মাধ্যমগুলোর পূর্ণ সহযোগিতায় একটা মামুলি ব্যাপার অলৌকিকের চেহারা পেল।

'নিউ সায়েনটিস্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটির বিরুদ্ধে যদিও কোনও প্রতিবাদ 'সানডে মিরর' পত্রিকার তরফ থেকে ওঠেনি।

টেলিফোন টেলিপ্যাথির আর এক আকর্ষণীয় ঘটনা

এবারের ঘটনায় এক অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাবানের সামনে বাহান্নটা তাস মেলে ধরে সাজিয়ে রাখা হলো। বিছিয়ে রাখা তাস থেকে একটা তাস তুলে দেওয়া হলো যিনি টেলিপ্যাথি করবেন, তাঁর হাতে। লোকটি তাঁর বন্ধুর ফোন নম্বর ও নাম জানালেন পরীক্ষকদের। ফোনে যোগাযোগ করা হলো বন্ধুটির সঙ্গে। তিনিও এক অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী, চিন্তা গ্রহণ ও প্রেরণে সক্ষম। তাঁকে বলা হলো, "এখানে আপনার বন্ধুর হাতে আমরা একটা তাস তুলে দিয়েছি। আপনি বলুন তো কী তাস?"

কয়েক মিনিটের নীরবতা, দু'জনে দু-প্রান্তে মনসংযোগে ব্যস্ত। একসময় জবাব পাওয়া গেল। ফোনের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা থাকায় উত্তরটা লাউডস্পিকারের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ল দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে। দেখা গেল উত্তর সঠিক।

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। (১) ফোনে যোগাযোগকারী কোনও প্যারাসাইকোলজিস্ট অথবা টেলিপ্যাথি ক্ষমতাধারী ব্যক্তিটি নন। (২) উত্তর 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি'র মতো নয়, স্পষ্ট।

এই ধরনের টেলিফোন টেলিপ্যাথির সফল পরীক্ষা নিজের চোখে দেখার পর কী বলবেন? নিশ্চয়ই টেলিপ্যাথির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেবেন? কিন্তু আরও অবাক হওয়ার মতো খবর দিচ্ছি, এর মধ্যেও একটা ফাঁকি রয়ে গেছে। বিশ্বাস হচ্ছে না? না হওয়ারই কথা অবশ্য। তবু সবিনয়ে জানাই এই একই খেলা আমি নিজেই বিভিন্ন জায়গায় দেখিয়েছি।

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই টেলিফোন টেলিপ্যাথির গুপ্ত কৌশল শুনে

আমাকে বলেছিলেন, "তুমি কৌশলটা না বললে এটা কিন্তু টেলিপ্যাথির আশ্চর্য সফল পরীক্ষা বলে মনে হয়। এই খেলাই তোমাকে রাতারাতি বিখ্যাত Psychic (অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী) করে দিত।"

আসল রহস্যটা নিশ্চয়ই জানার আগ্রহ হচ্ছে। ভাবছেন এই ধরনের ঘটনায় বন্ধুকে সংকেত পাঠাবার সুযোগ আমার কোথায়? না, আমার কোনও চেনা লোক আগের থেকে ঠিক করে রাখা তাস তুলে দেন না। সেই সুযোগ ঠিক এই ধরনের খেলায় পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এইসব ক্ষেত্রে দেখা যায় সাধারণত সবচেয়ে প্রবীণ বা সবচেয়ে নামী-দামি ব্যক্তিই সকলের অনুরোধে তাস নির্বাচন করেন।

তাস পাওয়ার পর আমি পরীক্ষকদের বন্ধুর ফোন নম্বর ও নাম বলি। যিনি ফোন করেন, তিনি নিজের অজান্তেই সংকেত বহন করেন।

ফোন নম্বরটা সঠিক দিতেই হয়। এখানে কৌশলের কোনও সুযোগ নেই। কৌশল যা কিছু, তা ওই বন্ধুর নামটুকুর মধ্যে। বাহান্নটা তাসের জন্য বাহান্নটা নাম আমি ও আমার টেলিপ্যাথি পার্টনার দীপ্তেন মুখস্থ করে রেখেছি। তাস পাওয়ার পর সেই তাসের 'কোড' নামটাই বন্ধুর নাম হিসেবে বলি। দীপ্তেন ফোন করলে অবশ্যই বলে, দীপ্তেন বলছি।" অন্য প্রান্ত থেকে যখন বলা হয়, "অমুকবাবুকে ডেকে দিন তো?" দীপ্তেন প্রশ্ন করে, "আপনি কে বলছেন? কী দরকার বলুন।"

টেলিপ্যাথির প্রয়োজনে ফোন করা হয়েছে শুনলে দীপ্তেন বলে, "ধরুন, ওকে ডেকে দিচ্ছি। তারপর একটু সময় নিয়ে ও নিজেই আবার ফোন ধরে। ফোনে অন্যপ্রান্তের কথাগুলো শুনে বলে, "আচ্ছা চেষ্টা করছি।"

ফোন যিনি করছেন তিনি কোন নামের লোকটিকে চাইছেন, সেই লোকটির নাম শুনলেই দীপ্তেন বুঝতে পারে আমার হাতে কী তাস আছে। যেমন ধরুন, বন্ধুর নাম অনিন্দ্য বললে 'থ্রি ডায়মন্ড', 'সুপ্রিয়'-র নামে ফোন এলে দীপ্তের উত্তর দেয় 'টু হার্টস' বা 'পুলক'কে ডাকলে দীপ্তেন বুঝে নেয় আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে 'ফোর হার্টস'। দীপ্তেন-এর বদলে ফোন বাড়ির অন্য কেউ ধরলেও কোনও অসুবিধে হয় না। ফোনে উলটো-পালটা নাম শুনলে প্রয়োজনটুকু শুনে নেয়। 'টেলিপ্যাথির জন্য ডাকা হচ্ছে শুনলে বলে, "ধরুন, ডেকে দিচ্ছি।" তারপর দীপ্তেনই আমার ওই নামের বন্ধু হিসেবে ফোন ধরে।

'ডেইলি মেল' ও 'রিভিউ অফ রিভিউজ' এর টেলিপ্যাথির পরীক্ষা

১৯৮৫-র আগস্ট মাসে 'পরিবর্তন' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়-এর সঙ্গে আমার আলোচনা হচ্ছিল 'র‍্যাশানালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া' এবং র‍্যাশানালিস্ট আন্দোলন নিয়ে। ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় কথা প্রসঙ্গে আমাকে জানালেন, এবার রাশিয়ায় তিনি যে ধরনের অদ্ভুত টেলিপ্যাথি দেখেছেন, তার কাছে অমুকের (এক বিখ্যাত জাদুকরের নাম বললেন) এক্স-রে আইয়ের

খেলাকেও জোলো মনে হয়। একটি মেয়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মেয়েটির সহকারী হিসেবে একজন লোক দর্শকদের মধ্যে নেমে এসে দর্শকদের সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন। মেয়েটি প্রতিটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রশ্নগুলো ছিল এই ধরনের—

ইনি পুরুষ না মহিলা?

—এঁর কোটের রঙ কী?

—কী রঙের প্যান্ট পরেছেন?

—এঁর পকেটে কী?

এঁর হাতে কী রয়েছে?

দর্শকদের পকেট থেকে পাসপোর্ট তুলে জিজ্ঞেস করলেন—এটা কী নিলাম?

"এই ধরনের নানা রকম প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন মেয়েটি। লোকটা যা দেখছে চিন্তার ওয়েভ ছুঁড়ে তাই জানিয়ে দিচ্ছে মেয়েটিকে। এটাকে এ-ছাড়া আর কী ব্যাখ্যা দেবে তুমি?" ডঃ চট্টোপাধ্যায় আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

আমি বলেছিলাম, "এই খেলাটা আমি আর পিংকি দেখাতে পারি এবং অবশ্যই তা লৌকিক উপায়ে।"

হ্যাঁ, দেখিয়েছিলাম 'পরিবর্তন' আয়োজিত অনুষ্ঠানে। সে কথা আগেই বলেছি।

গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে লন্ডনের আলহামব্রা হলে জ্যাগনিস দম্পতি এই ধরনের টেলিপ্যাথির খেলা দেখিয়ে বুদ্ধিজীবী মহলকে তাক লাগিয়ে দিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'ডেইলি মেল' পত্রিকার মালিক লর্ড নর্থক্লিফ এবং আর এক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা, 'রিভিউ অফ রিভিউজ'-এর সম্পাদক উইকহ্যাম স্টেড।

মিস্টার জুলিয়াস দর্শকদের দেওয়া এক একটি জিনিস হাতে নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে চিন্তার তরঙ্গ ছড়িয়ে দেন। দূরে চোখ বাঁধা অবস্থায় মিসেস অ্যাগ্নিস গভীর মনসংযোগের সাহায্যে ধরে নেন জুলিয়াসের চিন্তা তরঙ্গ। ফলে প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই জিনিসের নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে চলেন অ্যাগ্নিস।

জ্যাগনিস দম্পতির 'টেলিপ্যাথি' ক্ষমতা পরীক্ষা করে ডেইলি মেল-এর মালিক লর্ড নর্থক্লিফ ও রিভিফ অফ রিভিউজ-এর সম্পাদক উইকহ্যাম স্টেড নিশ্চিত হলেন, এর মধ্যে কোনও ফাঁকি নেই। জুলিয়াস ও অ্যাগ্নিস সত্যিই 'Psychic' অর্থাৎ 'অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী'। এঁরা অলৌকিক ক্ষমতা বলে একজনের চিন্তা আর একজন ধরে ফেলছেন।

দুটি পত্রিকাতেই ফলাও করে জ্যাগনিস দম্পতির টেলিপ্যাথির খবর প্রচারিত হতে ওরা রাতারাতি বিশ্বখ্যাতি পেয়ে গেলেন। মাত্র কয়েকটা বছরের মধ্যে জ্যাগনিস দম্পতি হয়ে উঠলেন প্রচণ্ড ধনী। আমেরিকার ছেলে জুলিয়াস ও

ডেনমার্কের বিকলাঙ্গ মেয়ে অ্যাগ্নিস বিয়ের পর 'জ্যাগনিস দম্পতি' নামেই বিখ্যাত হয়েছিলেন।

এমিল উদ্যাঁ ও রবেয়ার উদ্যাঁ'র টেলিপ্যাথি

জ্যাগনিস দম্পতিরও অনেক আগে একই ধরনের টেলিপ্যাথি দেখিয়ে বিশ্বকে বিস্মিত করেছিলেন ফ্রান্সের প্রখ্যাত জাদুকর রবেয়ার উদ্যাঁ ও তাঁর ছেলে এমিল উদ্যাঁ।

রবেয়ার উদ্যাঁ যদিও জাদুকর, কিন্তু এই টেলিপ্যাথির খেলা দেখাবার সময় এটা জাদুর খেলা বলে দেখাননি। দেখিয়েছেন, অলৌকিক ক্ষমতার বিস্ময়কর প্রকাশ হিসেবে।

১৮৪৫-এর জুলাইতে এবং ১৮৪৬-এর ১২ ফেব্রুয়ারি বাপ-ছেলেতে দেখালেন টেলিপ্যাথির বিস্ময়কর ক্ষমতা। রবেয়ার উদ্যাঁর ছাপানো অনুষ্ঠান সূচিতে যা লেখা ছিল তা হলো—

"রবেয়ার উদ্যাঁর পুত্র তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ও বিস্ময়কর অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দ্বারা চোখে পুরু ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় দর্শকদের পছন্দ করা যে কোনও জিনিসের বর্ণনা করবে।"

রবেয়ার যখন এই টেলিপ্যাথি দেখান তখন ছেলে এমিল-এর বয়েস বছর পনেরো মাত্র।

এই খেলা আমাদের দেশে

আমাদের দেশের কিছু ভবঘুরে সম্প্রদায় এই ধরনের খেলা রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে সুন্দরভাবে দেখায়। তবে, ওরাও এটাকে জাদুর খেলা বা কৌশলের খেলা হিসেবে স্বীকার করতে নারাজ। ওরাও এটাকে সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দ্বারাই ঘটে থাকে বলে জানায়।

ওদের একজন চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে থাকে। তার বুকের উপর রাখা হয় একটা সত্য সাঁইয়ের তাবিজ। প্রশ্ন করে তার সঙ্গী। নিখুঁত উত্তর দিয়ে চলে শুয়ে থাকা মানুষটি। এই বিষয়ে ওদের সাফ জবাব—এটা শুধু সত্য সাঁইয়ের তাবিজের গুণে হয়। দর্শক বিশ্বাসও করেন সে-কথা। প্রতিটি খেলার শেষেই বেশ কিছু তাবিজও ওরা বিক্রি করে।

এই ধরনের টেলিপ্যাথির আসল রহস্য

এই একই ধরনের টেলিপ্যাথির খেলা কোন অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার সাহায্য ছাড়াই আমি আর আমার পুত্র পিংকি বহু অনুষ্ঠানে ও সেমিনারে সুন্দরভাবে দেখাতে সক্ষম হয়েছি।

একদিনের ঘটনা ১৯৮৫-র ২২ শে সেপ্টেম্বর রবিবারের সকাল। ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে জনা বারো বিশিষ্ট যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিদের সামনে ঠিক এই ধরনের টেলিপ্যাথির খেলাই আমরা দু'জনে দেখিয়েছিলাম। সেদিনের প্রদর্শনীতে যদিও আমি সোজাসুজি বলে নিয়েছিলাম যে, আমাদের এই খেলাগুলোর মধ্যে কোনও অতীন্দ্রিয় ব্যাপার-স্যাপার নেই, অতএব অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস নিয়ে দেখার মধ্যে যে নাটকীয়তা, উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ আছে তা আমাদের খেলার মধ্যে পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তবু চোখ বাঁধা পিংকি ওর স্মৃতিশক্তিকে ঠিক মতো কাজে লাগিয়ে আমার অতি সূক্ষ্ম সংকেতগুলোকে ধরে প্রতিটি প্রশ্নের নিখুঁত উত্তর দিয়ে দর্শকদের বিস্মিত করেছিল।

—সেদিন আমার প্রশ্ন আর ওর উত্তরগুলো ছিল এই ধরনের—

—"এটা কী?"

—"ফ্যান।"

—"এটা কী?"

—"ক্যালেন্ডার।"

—"উনি কী পোশাক পরে আছেন?"

—"প্যান্ট-সার্ট।"

—"এই ভদ্রলোকের প্যান্টের রঙ কী?"

—"নীল।"

—'এটা কী?"

—"চশমা।"

—"এই ভদ্রলোক পায়ে কী পরেছেন?"

—"চটি।"

—"এই ভদ্রলোক কী পোশাক পরে আছেন?"

—"উনি ভদ্রলোক নন, মহিলা। পরে আছেন নীল ছাপা শাড়ি।

—"আমার হাতে এটা কী?"

—"কলম।"

—"এবার হাতে কী নিয়েছি?"

—"ডট পেন।"

—"আমার হাতে কী?"

—"একটা বই।"

—"এটা?"

—"একটা ব্যাগ।"

একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, আমি একাধিকবার প্রশ্ন করে বিভিন্ন ধরনের উত্তর পেয়েছি। যেমন—"এটা কী?" এই একই প্রশ্ন করে এক একবার এক এক

ধরনের উত্তর পেয়েছি। 'কখনও উত্তর ছিল "ফ্যান", কখনও "ক্যালেন্ডার", কখনও "চশমা"। অর্থাৎ সাধারণভাবে কেউ যদি ভেবে থাকেন, প্রশ্নের মধ্যে শব্দ সাজানোর হেরফেরই শুধু সংকেত পাঠানো হয় তবে তাঁরা ভুল করবেন। একই শব্দের উচ্চারণের সামান্য পার্থক্যও ভিন্নতর সংকেত বহন করে, যেটা বাইরের কারও পক্ষে অনেক সময় বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না।

অতীন্দ্রিয় ইউরি গেলারকে নিয়ে 'নেচার'(Nature)-এর রিপোর্ট

'নেচার' (Nature) পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা, ১৯৭৪-এর ১৮ অক্টোবর সংখ্যা নেচার-এ ইউরি গেলারের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার পরীক্ষা বিষয়ে আমেরিকা

ইউরি গেলার

যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত বিজ্ঞান গবেষণাগার স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়া জুড়ে বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যম ও পত্রপত্রিকাগুলো প্রচণ্ড রকমের হইচই শুরু করে দিল। প্রচারগুলো প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ছিল অসত্য।

ইউরি একজন সুদর্শন ইজরাইলীয়। জন্ম ১৯৪৬-এর ২০ ডিসেম্বর, তেল আভিভ-এ। ১৮ বছর বয়সে প্রথমে ইজরাইল ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে গুপ্তচর

হিসেবে এবং পরে প্যারাসুট-সেনা বিভাগে যোগ দেন। ১৯৬৮-তে সেনাবাহিনী ছেড়ে জাদুর খেলাকে পেশা করেন। সহকারী হন শিমসন শট্রাং, সংক্ষেপে শিপি। বড় বড় পার্টিতে ওঁরা দেখাতে শুরু করলেন অতীন্দ্রিয় টেলিপ্যাথির ক্ষমতা। একজনের চোখ বাঁধা থাকে। অন্যজন দর্শকদের এক একজনের কাছ থেকে এক একটা জিনিস নিয়ে তুলে ধরতে তাকেন। বাঁধা চোখের কাছ থেকে আসতে থাকে সঠিক বর্ণনা। এদিকে জাদুর অপব্যবহারের অভিযোগ লন্ডন ম্যাজিক সার্কেলের সদস্য পদ বাতিল হয়।

১৯৭১-এ ইউরির জীবনে এলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবের বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানের দরবারে অতীন্দ্রিয় শক্তির অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ হঃ অ্যানড্রিজা পুহারিক। ডঃ পুহারিক ইউরি এ শিপিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে এলেন। ডঃ পুহারিক অর্থ, প্রচার ও বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ইউরিকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাধর মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার কাজে লেগে পড়লেন। প্রচুর দূরদর্শন অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন ইউরি। ডঃ পুহারিক ইউরির অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার ওপর পরীক্ষা ও গবেষণা চালাবার জন্য কয়েকজন প্যারাসাইকোলজিস্টদের সহায়তায় ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত বিজ্ঞান গবেষণাগার SRI বা স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। SRI অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন সংস্থার হয়ে গবেষণার কাজ করে বা গবেষণা-কাজে সাহায্য করে থাকে। গেলারের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দাবির ওপর পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব নিলেন চুক্তিকারীদের অন্যতম দুই প্যারাসাইকোলজিস্ট ডঃ হ্যারল্ড ই পুটহফ এবং ডঃ রাসেল টার্গ। কি সুন্দর ব্যবস্থা অতীন্দ্রিয়তাকে যাঁরা বিজ্ঞানের মোড়কে মুড়তে চান তাঁরাই হলেন ইউরির পরীক্ষক। ডঃ পুটহফ এবং ডঃ টার্গ দুজনেই লেজাররশ্মি বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী। ফলে পরীক্ষার শেষে ইউরিও প্রচার পেয়েছিলেন—দুই বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের দ্বারা পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞান গবেষণাগারে ইউরির অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা প্রমাণিত। পরীক্ষাটি নেওয়া হয়েছিল ১৯৭২-এর ডিসেম্বরে।

কিন্তু বাস্তবিকই কি এই পরীক্ষায় ইউরি পুরোপুরি সফলতা পেয়েছিলেন? বেশিরভাগ পত্র-পত্রিকা ও প্রচার-মাধ্যমগুলো পরীক্ষা সংক্রান্ত খবরগুলো ছাঁটকাট করে যা প্রকাশ করেছে তাতে সত্যির চেয়ে মিথ্যার পরিমাণ ছিল বেশি। অনেক পত্র-পত্রিকাই অবশ্য ছাঁট-কাটের ব্যাপারে দায়ী নয়। তাঁদের লেখক বা সাংবাদিকেরা না খেটে সস্তায় খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে এখানে ওখানে প্রকাশিত বিকৃত খবরকেই টুকে মারতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলেছেন।

১৯৮৬-তে আমাদের ভারতের জনপ্রিয়তম দৈনিক পত্রিকায় ইউরির এই পরীক্ষা নিয়ে একটি বিশাল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে লেখা ছিল, "গেলারকে ইলেকট্রিকাল শিল্ডেড একটা ঘরের মধ্যে রাখা হল। ঘরের বাইরে অনেক দূর এস আর আই-এর পরীক্ষকগণ কতকগুলো ছবি আঁকলেন। গেলার মনঃসংযোগ

করে ক্লেয়ারভয়েন্সেস কিংবা টেলিপ্যাথির সাহায্যে ছবিগুলো কাগজে আঁকলেন...” বাস্তব ঘটনার দিকে এবার চোখ ফেরানো যাক। পরীক্ষা চলে সাত দিন ধরে। ১০০টা ড্রইং বা ছবি এঁকে খামে বন্ধ করা হয়। গেলারকে রাখা হয় ইলেকট্রিক্যাল শিল্ডেড ঘরে। পরীক্ষকরা অন্য একটা ঘরে খামগুলো একটা একটা করে খুলে ভেতরের ছবিগুলো বাইরে রাখতে থাকেন। শিপিকে ছবিগুলো দেখানো হতে থাকে। শিপির মধ্যে দিয়েই নাকি ইউরির ছবি দেখা হয়ে যাচ্ছিল। ইউরি ৭ দিনে ১০০ ছবির মধ্যে মাত্র ১৩টি ছবি গ্রহণ করেন। পরে তার মধ্যেও তিনটি ছবিকে বাতিল করে দেন বা “Passed” বলে জানিয়ে দেন। খামে ১০টি কী ছবি ছিল তা বোঝাতে ইউরি ৬৫টির মতো ছবি আঁকেন। তার মধ্যে একটি মাত্র ছবির ক্ষেত্রে তিনি প্রায় পুরোপুরি সাফল্য পেয়েছিলেন।

প্রথমে যে খামটি ইউরি বেছেছিলেন, তাতে ছিল ‘ফায়ার ক্র্যাকার’-এর ছবি। ইউরি, প্রথম দফায় তিনটি ছবি আঁকলেন। ১। ড্রাম, ২। মানুষের মাথা, ৩। জিরাফের মাথা। দ্বিতীয় দফায় আঁকলেন ৯টি ছবি। সাপ, জিরাফ, কলম, দোয়াত, চশমা, নিব, ড্রাম-বাজনা ইত্যাদি। অর্থাৎ ফায়ার ক্র্যাকার ছাড়া অনেক কিছুই।

চিত্র–১

দ্বিতীয় খামটিতে ছিল আঙুরগুচ্ছ। ইউরির ছবিতেও আঙুরগুচ্ছ। এমনকি আঙুরের সংখ্যা পর্যন্ত ঠিক। তবু বলা যায়—ইউরি যথেষ্ট সফল। তবে আঙুরগুচ্ছের বিন্যাস ঠিক ছিল না। গুচ্ছের বোঁটার ছবি ঠিক আঁকতে পারেননি।

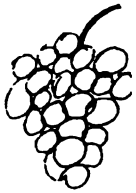

লক্ষ্য-২

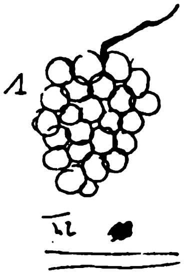

প্রতিক্রিয়া

চিত্র—২

তৃতীয় খামে ছিল 'DEVIL'-এর ছবি। তিন দফায় গোটা তিরিশেক ছবি এঁকেও ইউরি DEVIL-কে ধরতে পারেননি।

লক্ষ্য-৩

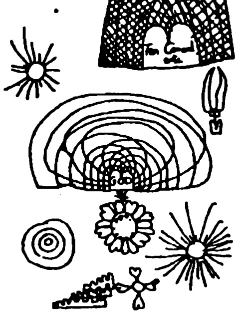

প্রতিক্রিয়া

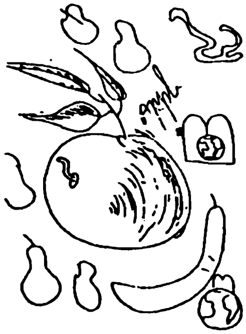

প্রতিক্রিয়া

প্রতিক্রিয়া

চিত্র—৩

৪র্থ ছবিতে সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র, শনি ছাড়া আরও তিনটি গ্রহ ছিল। ইউরি আঁকলেন সূর্য, অনেক গ্রহ, ধূমকেতু, রকেট, ছায়াপথ ইত্যাদি। অর্থাৎ পুরোপুরি মিলল না।

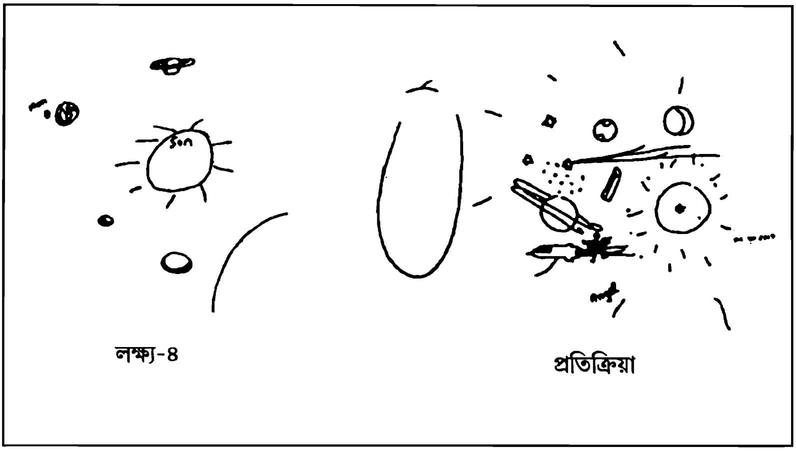

চিত্র–৪

৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম খামের ছবিগুলো ইউরি 'Passed' বলে জানিয়ে দেন। ৮ম খামে ছিল ২ টো উট। ইউরি আঁকলেন একটা ঘোড়া।

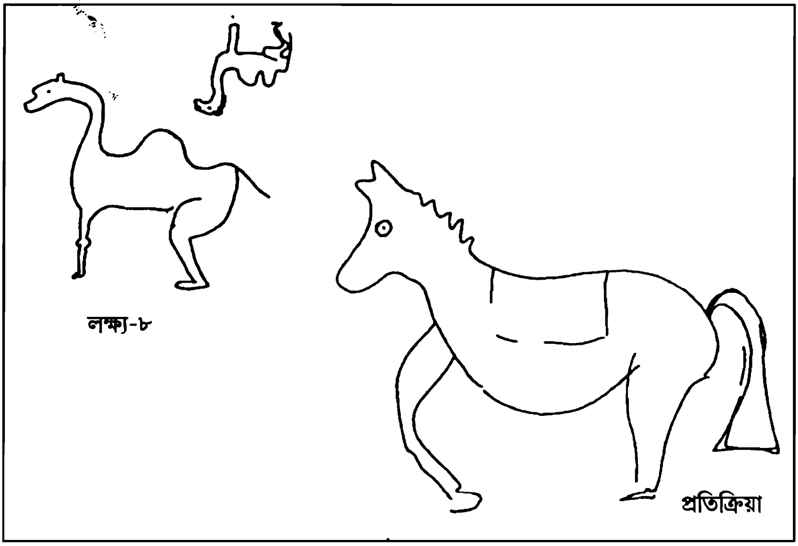

চিত্র–৮

৯ম খামে ছিল বিশাল ব্রিজ, তলায় জাহাজ। ইউরির ছবিটা যে ঠিক কিসের তা বোঝা মুশকিল। কল্পনা বাড়িয়ে ওটাকে সাঁকো বলা যেতে পারে।

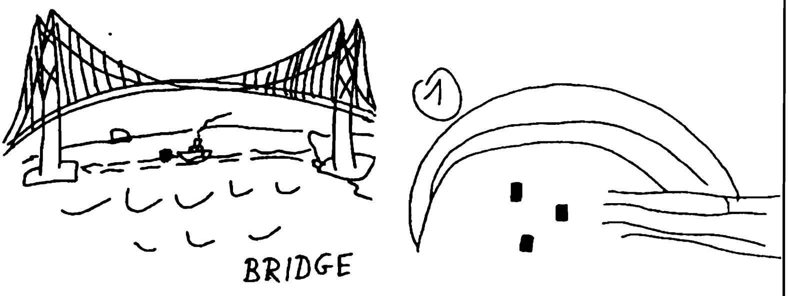

লক্ষ্য-৯ প্রতিক্রিয়া

চিত্র—৯

১০ম ছবিটি ছিল এক জোড়া পাখির, তলায় URI GELLER লেখা, ইউরি একটা পাখি আঁকলেন আর দুটো ইকরি-মিকড়ি।

লক্ষ্য-১০ প্রতিক্রিয়া

চিত্র—১০

১১তম ছবিতে ঘুড়ি ছিল, ইউরি তাঁর আঁকায় বিষয়টা ধরতে পারলেও দুই ঘুড়িতে পার্থক্য ছিল অনেক।

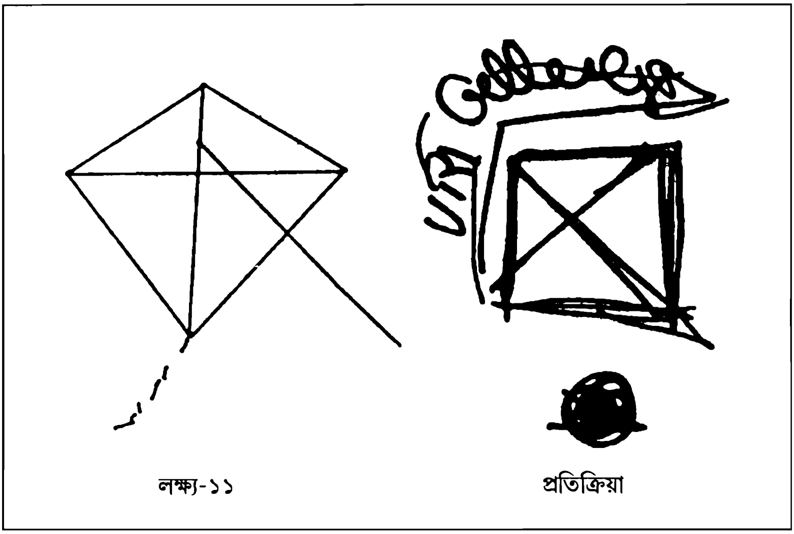

চিত্র-১১

১২ নম্বর খামের গীর্জা আঁকতে গিয়ে ইউরি দু দফায় ১১/১২ ছবি আঁকলেন, কিন্তু তার কোনটির মধ্যেই গীর্জা ছিল না।

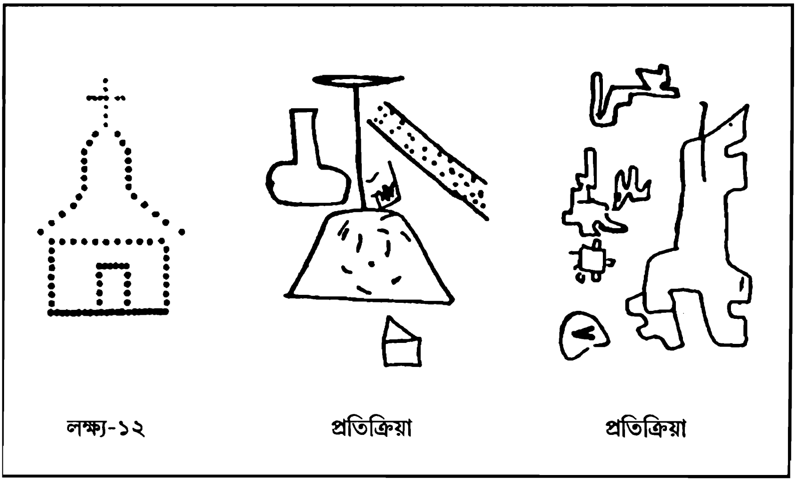

চিত্র-১২

১৩ নম্বর খামটি ছিল তীরবিদ্ধ হৃদয়ের ছবি। ইউরি প্রথম দফায় দেখিয়েছেন ২টি এবং দ্বিতীয় দফায় গোটা চারেক ছবি। যার কোনটিতেই তীরবিদ্ধ হৃদয় ছিল না।

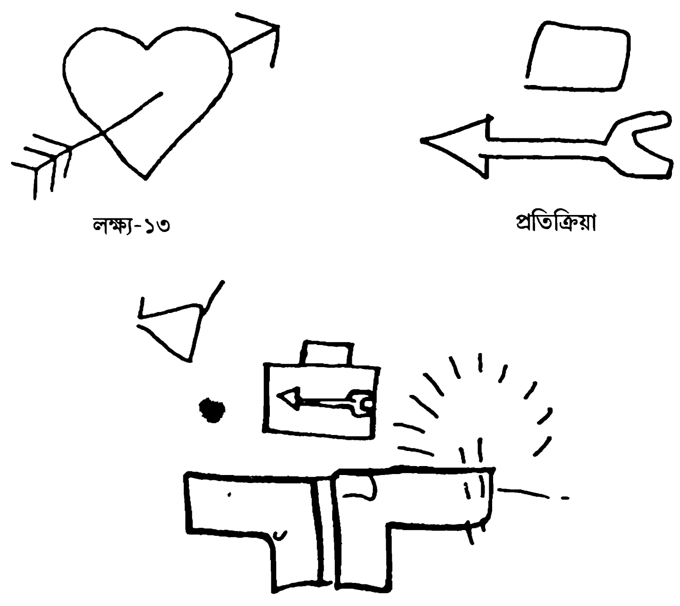

চিত্র–১৩

দীর্ঘ এই পরীক্ষা গ্রহণের পর আমরা দেখলাম ১০০টি ছবির মধ্যে একটি মাত্র খামের ছবি ইউরি প্রায় ঠিক আঁকলেন। পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিখ্যাত গবেষণার, পরীক্ষক হিসেবে বিজ্ঞানী, দর্শক হিসেবে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম প্রতিনিধি ইত্যাদির জন্য বিশাল অর্থব্যয়ের পর যা হলো তাকে গোদা বাংলায় বলে—'পর্বতের মুষিক প্রসব।' সত্যিই ইউরির পরীক্ষার ফল বিস্ময়কর!

একশোটির মধ্যে দশটি খামের ছবি ইউরি ঠিক এঁকেছিলেন, সে তো আগেই বলেছি। বাকি ন'টির মধ্যে একটু দৃষ্টি ফেরানো যাক। ওই ন'টি খামের ছবি শিপির দৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেখে আঁকতে ইউরির প্রায় ৬৪টি ড্রইং-এর সাহায্য নিতে হয়েছিল। কয়েকটি ক্ষেত্রে খামের ছবি ও ইউরির ছবির মধ্যে ছিল একটু-আধটু মিল। গরমিলও কম ছিল না। শিল্পী যদি গেলারকে সংকেত পাঠিয়ে খামের ছবিগুলোর বিষয়ে কোনও তথ্য পাঠিয়ে থাকেন তবে কিছু কিছু ছবির মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। উদাহরণ হিসেবে ধরা গেল শিপি বিভিন্ন সংকেতের সাহায্যে

বোঝালেন— সৌরমণ্ডল, পাখি, ব্রিজ, ঘুড়ি, তীর ইত্যাদি। গেলার সংকেত উদ্ধারে সমর্থ হলেন। এইসব ক্ষেত্রে গেলার নিশ্চয়ই সৌরমণ্ডল, পাখি, ব্রিজ, ঘুড়ি, তীরের ছবিই আঁকবেন। অতএব খামের ও গেলারের ছবির মধ্যে মোটামুটি একটা সাধারণ মিলও খুঁজে পাওয়া যাবে।

কিন্তু বাস্তবিকই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় শিল্পীর দৃষ্টির মধ্য দিয়ে গেলার যদি ছবিগুলি দেখতেই পেতেন, তবে খামের ছবি ও ইউরির ছবির মধ্যে এত বেশি অসংগতি দেখা যেত না।

এই প্রসঙ্গে একটি খবর জানানো খুবই প্রয়োজনীয় বলে মনে করছি। বধিরদের শোনার জন্য একটি ছোট্ট যন্ত্রের পেটেন্ট করানো আছে ইউরির গডফাদার ডঃ পুহারিক-এর নামে। একটি দাঁত তুলে সেই জায়গায় যন্ত্রটি বসানো হয়। যন্ত্রটি বাইরে থেকে পাঠানো তড়িৎ চুম্বকীয় সংকেত ধরে, শ্রবণযোগ্য তরঙ্গে পরিণত করে, দাঁতের প্রান্তভাগের স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কের উদ্দেশ্যে তড়িৎ সংকেত পাঠায়। ফলে কানের সাহায্য ছাড়াই শোনা যায়।

গেলারের এই ধরনের যন্ত্রের সাহায্য নেবার সুযোগ ছিল। শিপিরও সুযোগ ছিল দেহের কোথাও প্রেরকযন্ত্র লুকিয়ে রাখার। তাই গেলার, শিপিসহ তাঁদের সম্ভাব্য প্রতিটি সহযোগিদের ব্যাপক তল্লাশি নেওয়া নিরপেক্ষ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য একান্তই অপরিহার্য ছিল। সাংবাদিকদের কাছ থেকে তল্লাশির প্রস্তাব আসা সত্ত্বেও পরীক্ষা পরিচালন কর্তৃপক্ষ সেই প্রস্তাব সরাসরি বাতিল করে দেন। অতএব বলতেই পারি ইউরির সংকেত গ্রহণের সুযোগ ছিল।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাগুলো দারুণ সোরগোল তুলে জানিয়েছে—ইলেকট্রিকালি শিল্ডের ঘরে কোনওভাবেই কোনও সঙ্কেত পাঠানো সম্ভব ছিল না। তাই তল্লাশি বাতিল হয়েছে। বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলে। S.R.I. রিপোর্ট আমি পড়েছি। তাতে স্পষ্টতই বলা আছে "in certain circumstances, significiant information transmission can take place under shielded conditions." অর্থাৎ সঙ্কেত প্রেরণ সম্ভব ছিল।

'নেচার' পত্রিকায় গেলারের উপর প্রকাশিত এই রিপোর্টটি তৈরি করেছিলেন ডঃ পুটহফ এবং ডঃ টার্গ। লেখাটি প্রকাশের আগে 'নেচার' কর্তৃপক্ষ তিনজন বিজ্ঞানীকে লেখাটি পড়তে দেন এবং মতামত চান। একজন জানান, লেখাটি কিছুতেই প্রকাশ করা উচিত নয়। দ্বিতীয় জন জানান, লেখাটিতে এমন কিছুই পাননি যাতে 'হ্যাঁ' বা 'না' জাতীয় কোনও মন্তব্য করতে পারেন। তৃতীয় জন জানান, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এবং 'নেচার' পত্রিকার তরফ থেকে কোনও দায়িত্ব না নিয়ে প্রবন্ধটি প্রকাশ করা যেতে পারে।

S.R.I. পরীক্ষা গ্রহণের প্রায় দু-বছর পরে 'নেচার' রিপোর্টটি প্রকাশ করে, সঙ্গে ছিল এক দীর্ঘ সম্পাদকীয়। সম্পাদকীয় বক্তব্যে এ কথা স্পষ্টই বলে দেওয়া

ছিল, "Publishing in a scientific journal is not a process of receiving a seal of approval." অর্থাৎ, বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকায় কোনও কিছু প্রকাশিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, স্বীকৃতি পাওয়া গেল।

এর পরেও কি বলা চলে—ইউরির অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা বিজ্ঞানের দরবারে প্রতিষ্ঠিত?

আই আই টি-তে টেলিপ্যাথি দেখালেন দীপক রাও

দীপক রাওয়ের খবরটা প্রথম পাই মে ২০০১-এ। দীপক রাওয়ের নাকি অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা আছে। 'টেলিপ্যাথি' করার ও ধরার ক্ষমতা আছে। "এ সবই দীপকের ফাঁকা দাবি"—এমন বলে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল। কারণ দীপক ইতিমধ্যেই তাঁর শক্তির প্রমাণ দিয়েছেন। তাও আবার যে সে জায়গায় নয়। আই আই টি বোম্বাই (মুম্বাই নয়) ও আই আই টি খড়্গাপুরে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন-গবেষণার ক্রিম দুটি জায়গায়। প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন অধ্যাপক, ছাত্র ও কর্মীরা। চোখের সামনে যা দেখেছেন, তাতে তাঁরা অভিভূত হয়েছেন, আপ্লুত হয়েছেন। দরাজ মনে উল্লসিত প্রশংসা করছেন।

কী অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন—পরে আসছি। তার আগে বরং দীপক-এ আসি। দীপক মুম্বাইবাসী। অত্যন্ত স্মার্ট, ফর্সা, টিপটপ। দীপকের নিজস্ব একটি বিজ্ঞাপন সংস্থা আছে। দীপকের কাজে সহযোগিতা করেন স্ত্রী। ছোটো-খাটো, ফর্সা, সুন্দরী।

দীপকের স্পষ্ট দাবি, তিনি যা দেখান, তা কোনও 'জাদু কা খেল' নয়। নির্ভেজাল অলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োগ। ই.এস.পি বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির অস্তিত্ব যে সত্যিই আছে— এটা প্রমাণ করার ঠিক জায়গা মনে করেই তাঁর আই আই টি পরিভ্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ। কিছু পেশাদার অবিশ্বাসীরা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চান ই.এস.পি-র (Extra-sensory perception) মতো বিষয়কে। এইসব পেশাদার অবিশ্বাসীরা আবার নিজেদের পরিচয় দেন 'যুক্তিবাদী' বলে। কিন্তু মজার কথা হল সাইকোলজির-ই একটি শাখা প্যারাসাইকোলজির চর্চার বিষয়ই হল ই.এস.পি।

এমন কথা শুধু যে দীপক রাও বলেন, তা কিন্তু নয়।

দীপক টেলিপ্যাথির অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিলেন। ঠিক কী কী ঘটিয়েছিলেন, আমি দেখিনি। তবে শুনেছি। আই আই টি খড়্গাপুরের কম্পিউটর সায়েন্স-এর ছাত্র বিকাশ-বাড়ই-এর কাছে ঘটনার বর্ণনা শুনেছি। বিকাশ আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য। তবে ওর বর্ণনাতে কিছু ফাঁক ছিল। অভিজ্ঞতার অভাবে এই ফাঁক। এও ঠিক—অভিজ্ঞতা নিয়ে কেউ জন্মায় না। অলৌকিক বিষয়ে সত্যানুন্ধানের ক্ষেত্রে বিকাশের বিশালভাবে বিকাশ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে—আমার বোধ এ'কথাই বলে।

দীপক রাও ও শ্রীমতী রাওয়ের টেলিপ্যাথি

শ্রী ও শ্রীমতী রাও আই আই টি ক্যাম্পাসে যে টেলিপ্যাথি করে দেখিয়েছিলেন, তা দেখার সুযোগ আমার হয়নি। আমি শুনেছি। এও শুনেছি—শ্রী ও শ্রীমতী 'রাওয়ের প্রোগ্রামের ভিডিও ফোটো তোলা হয়েছিল। তুলেছিল আই আই টি কর্তৃপক্ষ। শ্রীরাও যাওয়ার সময় ভিডিও ক্যাসেটটা নিয়ে যান। বলেন—কপি করে পাঠিয়ে দেবেন। আজ পর্যন্ত পাঠাননি। সম্ভবত বার-বার ক্যাসেটটি দেখে আই আই টি'র কেউ শ্রীরাওয়ের আসল রহস্য ধরে ফেলতে পারেন, এই ভয়ে ক্যাসেট পাঠাননি।

স্টেজে ছিলেন শ্রীমতী রাও। মুখ দর্শকদের দিকে ফেরানো। চোখ বাঁধা। এক হাতে রাইটিং প্যাড, অন্য হাতে পেনসিল।

দর্শকদের মধ্যে একজনকে এগিয়ে আসতে বললেন শ্রীরাও। একজন এলেন। তাঁর হাতে এক টুকরো কাগজ দিয়ে বললেন, ১ থেকে ৯৯-এর মধ্যে যে কোনো সংখ্যা কাগজটায় লিখুন। দেখবেন, আর কেউ যেন না দেখেন।

এগিয়ে আসা দর্শকটি সংখ্যা লিখলেন। শ্রীরাওয়ের নির্দেশমত কাগজটা ভাঁজ করলেন। টেবিলের ওপর রাখলেন। টেবিলটা ছিল স্টেজের এক কোণে।

শ্রীরাও এবার অনুরোধ করলেন, আপনি যে সংখ্যাটা লিখেছেন, সেটা ভাবতে থাকুন। আমি আপনার চিন্তার তরঙ্গ ধরার চেষ্টা করব। আমার চিন্তার তরঙ্গ ধরার চেষ্টা করবেন আমার স্ত্রী। আলো এবং শব্দের যেমন তরঙ্গ আছে, তেমন-ই চিন্তারও তরঙ্গ আছে। এই চিন্তা তরঙ্গকে ধরার নামই 'টেলিপ্যাথি'। আপনারা এখন দেখবেন টেলিপ্যাথির প্র্যাকটিক্যাল ডেমোনস্ট্রেশন।

দু-তিন মিনিট পার হতেই দেখা গেল শ্রীমতী রাও তাঁর রাইটিং প্যাডে খস্‌খস্‌ করে সংখ্যাটা লিখে পেনসিলটা হাত থেকে মঞ্চে ফেলে দিলেন। পেনসিল পড়ার আওয়াজ শুনে শ্রীরাও চমকালেন। একজন দর্শককে ডাকলেন। অনুরোধ করলেন, মঞ্চের টেবিলে রাখা কাগজটা তুলে সংখ্যাটা উচ্চকণ্ঠে পড়তে। সংখ্যাটা পড়লেন। দর্শকরা শুনলেন।

"এই সংখ্যাটাই লিখেছিলেন তো? নাকি কাগজ পালটে গেছে?' শ্রীরাও জিজ্ঞেস করলেন। যিনি লিখেছিলেন তিনি জানালেন, এই সংখ্যাটিই লিখেছিলেন।

যিনি উচ্চকণ্ঠে কাগজের সংখ্যাটি পড়েছিলেন তাঁকে শ্রীরাও অনুরোধ করলেন, "কাইন্ডলি দেখুন তো মিসেস রাও কত লিখেছেন?"

ভদ্রলোক গেলেন। শ্রীমতী রাওয়ের হাত থেকে রাইটিং প্যাডটি নিলেন। সংখ্যাটি জোরে পড়লেন। অবাক কাণ্ড! এই সংখ্যাটিই আমন্ত্রিত দর্শক লিখেছিলেন।

"প্যাডের অন্য পৃষ্ঠাগুলো কাইন্ডলি দেখুন। সেখানে আবার আরও নানা সংখ্যা

লেখা নেই তো?" শ্রীরাও বললেন।

"না। আর কিছুই লেখা নেই। সব পৃষ্ঠাই সাদা।"

উ-ফ্ কী সাংঘাতিক ব্যাপার বলুন তো? ভাবা যায়? শ্রীরাওকে কাজে লাগিয়ে পাক প্রেসিডেন্ট মুশারফের সব চিন্তা ধরে নেবার সুযোগ কী বোকার মতো ছেড়ে দেবেন আডবানি? চলচ্চিত্র উৎসবে অপ্সরাদের দেখে আমাদের সংস্কৃতিবান মন্ত্রীরা কতটা হিজিবিজি নীল-চিন্তায় ব্যস্ত—সে'সব চিন্তা ধরে লিখলে ছাপার জন্য অনেক বিদেশি ট্যাবলয়েট পত্রিকা পাঁচ-দশ লাখ ডলার ইউরো বা পাউন্ড অ্যাডভান্স ধরাবার জন্য হুড়োহুড়ি ফেলে দেবে—গ্যারান্টি। রাতারাতি টেলিপ্যাথির প্রতিষ্ঠা—ভাবা যায়? শ্রীরাও কেন যে এত কিছু ভেবেও এসব ব্যাপারে নিয়ে ভাবেননি, সত্যিই অবাক কাণ্ড! তাঁর টেলিপ্যাথির এমন বিশাল প্রতিভা শতরূপে প্রস্ফুটিত হোক।

জড় পর্দাথের উপর মানসিক শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতাকেও দারুণভাবে ভাঙানো যায়। শত্রুপক্ষের সফেস্টিকেটেড যুদ্ধাস্ত্রগুলো অকেজো করতে তাদের কম্পিউটার ব্যবস্থায় গোলমাল পাকিয়ে দিলেই কেল্লা ফতে। ভাবা যায়—কী অসাধারণ অস্ত্র আমাদের ভারতীয়দের হাতে আছে! শুধু কাশ্মীর কেন, গোটা পৃথিবীকে দখল করার মতো ক্ষমতা আমাদের আছে। অথচ আমরা তা কাজে লাগাচ্ছি না।

যাঁরা সাইকোকাইনেসিস (জড় পর্দাথের উপর মানসিক শক্তি প্রয়োগ) ও টেলিপ্যাথির পক্ষে গল্প বানাব, তাঁরাও কিন্তু কখনই এইসব হিজিবিজিতে বিশ্বাস করেন না। করলে এ'সব শক্তিকে দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে কেন সোচ্চার নন?

যাক গে ও'সব ঢপের বিশ্বাসের কথা। আসুন আমরা যুক্তির আলোয় বিষয়টিকে ফিরে দেখি।

'থট্ ওয়েভ' বা চিন্তার তরঙ্গের বাস্তব অস্তিত্ব নেই। সুতরাং থট্ ওয়েভ ধরা বা টেলিপ্যাথি ব্যাপারটাই স্রেফ টুপি পরানো ব্যাপার। প্রশ্ন উঠতেই পারে—টেলিপ্যাথি যদি লোকঠকানো ব্যাপার-ই হয়, তবে ঘটনাটা ঘটলো কী করে?

☞ কৌশল ঃ আমি নিজের চোখে শ্রী ও শ্রীমতী রাওয়ের ওই টেলিপ্যাথি দেখিনি। বিকাশ বাড়ুইয়ের কাছে যা শুনেছি, তাতে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তাই সুনির্দিষ্টভাবে কৌশলটি বলতে পারছি না। তবে সম্ভাব্য কৌশল এখানে তুলে দিচ্ছি। এ'ভাবে অবশ্যই একই ঘটনা ঘটানো যাবে।

শ্রীমতী রাও যে হাতে রাইটিং প্যাড ধরেছিলেন, সেই হাতের বুড়ো আঙুলের নখের খাঁজে আটকানো ছিল একটা 'নেইল-রাইটার'। জাদুর সাজ-সরঞ্জাম যাঁরা বিক্রি করেন, তাঁদের কাছে খোঁজ করলেই 'নেইল-রাইটার' পাবেন। নখের খাঁজে

ঢুকিয়ে দিলে সুন্দরভাবে আটকে থাকে। বাইরে দেখা দেখা যায় না। 'নেইল-রাইটার'-এ থাকে একটা ছোট্ট হোল্ডার। দৈর্ঘে দু থেকে তিন মিলিমিটার। হোল্ডারে গুঁজে দিতে হয় সরু পেনসিল-সীস। এই সীস 'নেইল-রাইটার'-এর সঙ্গে পাওয়া যায়। আলাদা কিনতে চাইলে তাও মিলবে।

শ্রীমতী রাও প্যাডে পেনসিল দিয়ে লেখার ভান করেছিলেন। আসলে কিছুই লেখেননি। তারপর পেনসিলটা ফেলে দিলেন। দর্শকরা ভাবলেন—উনি লিখলেন এবং তারপর পেনসিল ফেলে দিলেন। সংখ্যাটি উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হওয়ার পর বাঁ হাতে ধরা রাইটিং প্যাডের পৃষ্ঠায় বাঁ হাতের আঙুল নাড়িয়ে লিখে ফেললেন সংখ্যাটি। বুড়ো আঙুলের খাঁজের 'নেইল-রাইটার' দিয়েই যে লিখলেন, এটা এতক্ষণ আপনারা সব্বাই বুঝেগেছেন।

শেষে শ্রী ও শ্রীমতী রাওয়ের কাছে একটি বিনীত চ্যালেঞ্জ—আমার মুখোমুখি হবেন নাকি আপনাদের টেলিপ্যাথি ক্ষমতা নিয়ে?

ডঃ নীলাঞ্জনা সান্যাল-কে বিনীত অনুরোধ—প্যারাসাইকোলজির অস্তিত্ব প্রমাণ করতে আমার ও আমাদের সমিতির চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করুন। হাতে কলমে প্রমাণ দেওয়ার সুযোগ থাকতে 'মুখে' কেন?

তবু প্রমাণ করা যায় টেলিপ্যাথি আছে

টেলিপ্যাথি যে সত্যি আছে তারই এক উদাহরণ দিয়েছিলাম আমার অগ্রজপ্রতিম এক বিখ্যাত ডাক্তারের কাছে। তাঁকে বলেছিলাম, "দেখুন, আমরা টেলিপ্যাথির অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। অথচ পরামনোবিদরা বলেন—একজন যদি কোনও কিছু গভীরভাবে ভাবতে থাকেন এবং আর একজন যদি তাঁর সেই ভাবনার হদিস পেতে গভীরভাবে মনঃসংযোগ করেন, চিন্তার হদিস পাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব। আসুন, আমরা পরামনোবিজ্ঞানীদের কথাটা এক-কথায় বাতিল না করে এই বিষয়ে একটা পরীক্ষা করি।"

—"কী ভাবে করবে?" শ্রদ্ধেয় ডাক্তার বললেন।

—"এক কাজ করি। সূর্যের রশ্মির তো সাতটা রঙ, বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল আমি এগুলোর মধ্যেই একটা রঙ ভাবছি। আপনিও গভীরভাবে মনঃসংযোগ করে অনুভব করার চেষ্টা করুন তো, আমি কোন রঙ ভাবছি?"

—"তার মানে তুমি বলছ, আমি গভীরভাবে চিন্তা করলে তুমি কি ভাবছ, তা ধরে ফেলতে পারব?"

—"আমি আদৌ তা-বলিনি। আমি বলেছি—পরামনোবিদ্‌রা এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। আমরা খুব সিরিয়াসলি এটা নিয়ে পরীক্ষা চালাতে চাই। দেখতে চাই এর মধ্যে কোনও সত্য আছে কিনা?" আমি বললাম।

—"কিন্তু আমাদের দু'জনের মধ্যে যদি একজন মিথ্যে বলি, তাহলেই তো রঙ মিলে যাবে। অতএব রঙ মিললেই প্রমাণ হবে না টেলিপ্যাথি আছে।"

আমি বললাম, "বেশ তো, যে রঙটা ভাবব তার নাম একটুকরো কাগজে লিখে পকেটে রেখে দিচ্ছি। আপনি একাগ্রভাবে চিন্তা করার পর যে রঙটা অনুভব করবেন সেই রঙটার নাম বলবেন। আমি পকেট থেকে কাগজটা বের করব। একই কথা লেখা থাকলে টেলিপ্যাথি নিয়ে আরও কিছু পরীক্ষা চালানো যাবে।"

একটুকরো কাগজে রঙের নাম লিখে বুক পকেটে রেখে দুজনে এবার চোখ বুজে মনঃসংযোগের চেষ্টা করতে লাগলাম। একসময় শ্রদ্ধেয় ডাক্তার বললেন, "হলদে।"

বললাম, "ঠিক বলেছেন, হলদেই ভেবেছিলাম।" পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বার করলাম। লেখা রয়েছে "হলদে।"

পরীক্ষার ফল দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন প্রবীণ ডাক্তার। আরও কয়েকবার আমরা পরীক্ষা চালালাম। প্রতিবারই আমি সূর্যের সাতটা রঙের কোনও একটা রঙ কাগজে লিখে পকেটে রাখছি এবং প্রতিবারই উনি কিছুক্ষণ চিন্তার পর সেই রঙটারই উল্লেখ করছেন। যখন ডাক্তারবাবু সিদ্ধান্তে এলেন যে—টেলিপ্যাথির অস্তিত্ব বাস্তবে রয়েছে, ঠিক তখনই আমি মুখ খুললাম। বললাম, "আমাকে ক্ষমা করবেন। প্রতিবারই আপনাকে আমি ঠকিয়েছি।"

এবার কিন্তু ডাক্তারবাবু আমার কথায় বিশ্বাস করলেন না। স্পষ্টতই বললেন—আমি অলৌকিকের বিরোধিতা করতে চাই বলেই টেলিপ্যাথির এই সফল পরীক্ষাকে এখন বুজরুকি বলে বাতিল করতে চাইছি।

শেষ পর্যন্ত আমার কৌশলটা ওঁর কাছে ফাঁস করতে হলো।

টেলিপ্যাথির এই পরীক্ষা শুরু করার আগেই আমার পকেটে ছ'টুকরো কাগজে বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ ও কমলা এই ছ'টি রঙ লিখে টুকরো কাগজগুলো ভাঁজ করে পর পর সাজিয়ে বুকপকেটে রেখে দিয়েছিলো। শেষ কাগজের টুকরো, যেটা ডাক্তারবাবুর সামনে নিলাম, সেটায় লিখেছিলাম লাল। ভাঁজ করে পকেটে রাখলাম। এবার আমার পকেটে সাতটি রঙই লেখা হয়েছে। ডাক্তারবাবু হলুদ বলতে আমি পকেটে আঙুল ঢুকিয়ে পরপর সাজানো অনুসারে হলুদ লেখাটা বার করে এনেছিলাম।

পরের বার হলুদ লেখাটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার একটা কাগজের টুকরোতে রঙের নাম লিখে যখন পকেটে ঢুকিয়েছিলাম, তখন 'হলুদ' লিখেছিলাম। সাতটি রঙের নামই পকেটে রাখতে হবে তো। আর রাখার সময় হলুদ-এর খোপেই কাগজটা রেখেছিলাম।

•

অনেকেই বিশ্বাস করেন তাঁদের মধ্যেও মাঝেমাঝে স্বতস্ফূর্তভাবে টেলিপ্যাথির

ক্ষমতা প্রকাশিত হয়।

আমার এক অগ্রজপ্রতিম শুভানুধ্যায়ী একবার বিশেষ কাজে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। সেখানে থাকাকালীন হঠাৎ তাঁর ছেলের কথা ভেবে মনটা অস্থির হলো। ট্রাঙ্ককলে কলকাতার বাড়িতে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পারলেন না। তার দিন দু'য়েক পর কলকাতার বাড়ির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে সমর্থ হলেন। খবর পেলেন, ছেলেটি অসুস্থ।

বিদেশ-বিভুঁই-এ গিয়ে সন্তান ও পরিবার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যে কোনও মানুষের যে কোনও সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়াও কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। ফলে বিদেশে গিয়ে সন্তানকে নিয়ে চিন্তা এবং সন্তানের অসুস্থতার মধ্যে কোনও অলৌকিক কিছু আমি দেখতে পাইনি। এটা ঠিক, এই ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ছিল কম; কিন্তু এই কম সম্ভাবনার ঘটনাই সেদিন ঘটেছিল।

আমার শ্রদ্ধেয় এই ব্যক্তিটির জীবনে এই ধরনের চিন্তার সঙ্গে ঘটনার মিল ঘটেছে বার দু'য়েক। মেলেনি কত বার? হিসেব নেই। স্বভাবতই না মেলার সংখ্যাই ছিল অনেক বেশি। তবু না মেলা ঘটনাগুলো ভুলে গিয়ে উনি মাঝে-মাঝে ভাবেন, সেই মিলে যাওয়া ঘটনা দুটো বোধহয় টেলিপ্যাথি। আমরা যুক্তিবাদীরা একে বলি নেহাতই 'চান্স।' না মিলতে মিলতে হঠাৎ মিলে যাওয়া ঘটনা। একটা লুডোর ছক্কাতে ছ'টা তল বা পিঠ রয়েছে। ছটা গোল দাগ আছে একটা পিঠে, আর পাঁচটা পিঠে আছে এক, দুই, তিন, চার ও পাঁচ। বেশ কয়েকবার ছক্কা চালতে চালতে একবার নিশ্চয়ই ছক্কা পড়বে তা সে প্রথম বারেও পড়তে পারে, দশম বারেও পড়তে পারে। তেমনি আপনি বিভিন্ন সম্ভাব্য ঘটনার কথা চিন্তা করতে থাকলে এক আধ-বার অবশ্যই মিলবে।

অধ্যায় : বারো

Precognition (ভবিষ্যৎ দৃষ্টি)

বিজ্ঞান বিশ্বাস করে, যে ঘটনা আদৌ ঘটেনি তা কোনওভাবেই দেখা সম্ভব নয়, অনুমান করা যেতে পারে মাত্র এবং সেই অনুমান যেমন ভুল হতে পারে তেমনি ঠিকও হতে পারে।

পরামনোবিজ্ঞানীরা বলেন, প্রিকগনিশন (Precognition) শক্তির সাহায্যে ভবিষ্যতের অনেক ঘটনাকে দেখা যায়। ঠিকুজি-কোষ্ঠী, কপাল বা কান থেকে মানুষের ভবিষ্যৎ গণনার সঙ্গে প্রিকগ্‌নিশন্‌ শক্তির সাহায্যে ভবিষ্যতের ঘটনা দেখতে পাওয়ার মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য আছে।

জ্যোতিষীরা যে ভাবে ভবিষ্যত বলে, তার মধ্যে 'গণনা' বা 'Calculation' না থাক, একটা 'কমনসেন্স' বা যুক্তিবুদ্ধি থাকে। প্রিকগনিশন শক্তির অধিকারী বা 'ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা' কোনও কিছু গণনা বা 'Calculation' করে বলেন না। সাধারণজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বলেন না। তাঁরা ভবিষ্যতে যে ঘটনা ঘটবে সেটা নাকি বিশেষ অনুভূতি বা ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়ের ফলে স্পষ্টই দেখতে পান।

দেশের কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির কবে মৃত্যু ঘটবে, কোনও লোক কবে একটা বিশেষ ধরনের বিপদে পড়বে, কোন একটা বিশেষ দিনে কোন একটা বিশেষ রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটবে, কোন দিন নায়াগ্রা জলপ্রপাত ভেঙে পড়বে, কোন দিন মেক্সিকো সিটিতে ভয়াবহ ভূমিকম্প ঘটবে ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনাই 'প্রিকগনিশন' শক্তির অধিকারীরা অনুভব করতে পারেন।

আমার প্রিয় লেখক সত্যজিৎ রায়-এর শঙ্কু কাহিনিতে নকুড়বাবু এমনি এক চরিত্র, যাঁর প্রিকগনিশন শক্তি রয়েছে। গল্পে লেখকের কলমের আঁচড়ে যা সম্ভব, বাস্তবে তা কিন্তু মোটেই সম্ভব নয়। বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত এই ধরনের কোনও শক্তির পরিচয় পায়নি, পরামনোবিজ্ঞানীরাও হাজির করতে পারেননি এই ধরনের কোনও শক্তিধর লোককে।

আব্রাহাম লিংকন না কী নিজের মৃত্যু স্বপ্নে দেখেছিলেন

আব্রাহাম লিংকন সম্বন্ধে একটি প্রচলিত কাহিনি আছে। তিনি একবার স্বপ্ন দেখলেন—একটি কফিন ঘিরে বিশাল ভিড়। কালো পোশাক পরা বহু অভিজাত

পুরুষ ও নারীর ভিড়ে সাদা ফুলে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে কফিনটা। কার কফিন? কফিনের ভেতরটাও দেখতে পেলেন লিংকন। কফিনের ভেতরে শায়িত রয়েছে তাঁরই মৃতদেহ।

যেদিন লিংকন স্বপ্নটা দেখেন, তার পরদিনই আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিলেন লিংকন।

লিংকনের এই স্বপ্নের বিবরণ পাওয়া যায় তাঁরই ডায়েরি থেকে। এইটুকু শোনার পর অনেকেরই মনে হতে পারে লিংকন অন্তত একবারের জন্য ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার ক্ষমতা পেয়েছিলেন। অন্তত পরামনোবিজ্ঞানীরা তো তাই বলেন।

না ব্যাপারটার মধ্যে আদৌ সামান্যতম অলৌকিকত্ব বা অতীন্দ্রিয় কিছুই নেই। স্বপ্ন নিয়ে সামান্য দু-একটা কথা বললে বিষয়টা বুঝতে আশা করি অসুবিধে হবে না।

মানুষের স্বপ্নে অনেক সময়েই তার চিন্তা-ভাবনা প্রতিফলিত হয়। আর চিন্তা-ভাবনা সবসময় যে সচেতনভাবে এসে হাজির হয় তাও নয়। অনেক সময় পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন অবস্থার ছাপও এসে পড়ে মানুষের অবচেতন মনে। এই চেতন বা অবচেতন মনের ভাবই বহুক্ষেত্রে স্বপ্নে অগভীর ঘুমের মধ্যে হানা দেয়। গভীর ঘুমে মানুষের স্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা খুবই কম, প্রায় নেই বললেই চলে। গভীর ঘুমে যদিও বা স্বপ্ন দেখা দেয় তবু, সে-স্বপ্ন সাধারণত আমাদের মনে থাকে না।

শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনও কোনও গল্পের প্লট পেয়েছিলেন স্বপ্নে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী কেকুলে কার্বনের গঠন-কাঠামোর রূপটি স্বপ্নেই প্রথম দেখেছিলেন। অনেক কবি স্বপ্নে কবিতা পান। কোলরিজ তো একটা পুরো কবিতাই স্বপ্নে দেখে লিখে ফেলেন। কেউ স্বপ্নে একটা জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান খুঁজে পান। আর কেউ-বা স্বপ্নে পান ঈশ্বরের দর্শন, ঈশ্বরের মন্ত্র বা ঈশ্বরের আদেশ।

লক্ষ্য করলেই দেখবেন,

একজন কবি কিন্তু কোনদিনই তাঁর অজানা এক জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান নিয়ে স্বপ্ন দেখবেন না। একজন কাব্যরসে বঞ্চিত লোক স্বপ্নে কোনদিনই কাব্যগুণ সম্পন্ন কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারবেন না।

নিরীশ্বরবাদী কখন-ই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ পান না। আব্রাহাম লিংকন যে কঠিন ও অগ্নিময় পরিস্থিতির মধ্যে দেশ শাসন করছিলেন, তাতে তাঁর খুন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল সব সময়ই। আর সেটা লিংকনেরও মোটেই অজানা ছিল না। এই অবস্থায় লিংকনের নিজের মৃত্যু নিয়ে স্বপ্ন দেখা এবং সেটা বাস্তবে ঘটে যাওয়ার মধ্যে অতীন্দ্রিয়তা আসছে কোথা থেকে? এই প্রসঙ্গে এ-টুকুও জানিয়ে রাখি, নিজের মৃত্যু নিয়ে লিংকন এর আগেও বেশ কয়েকবার স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু মরেছেন ওই একবারই।

ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার রায় সত্যজিৎ রায়ের বেলায় মেলেনি

১৯৮৫-র ২৩ জুলাই, 'আনন্দমেলা'র দপ্তরে গল্প করছিলাম আমি, শ্যামলকান্তি দাশ ও রতনতনু ঘাটী। শ্যামল বললেন—আজ ভোর রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছেন। অদ্ভুত জীবন্ত স্বপ্ন, সত্যজিৎ রায় মারা গেলেন। কলকাতার প্রতিটি পত্রিকায় বিশাল বিশাল হরফে হেড-লাইন দিয়ে অনেক ছবির সঙ্গে গোটা পত্রিকাটাই প্রায় সত্যজিৎবাবুর খবরে ঠাসা। ২০ হাজার শোকার্ত লোকের বিশাল শব-মিছিল বেরুল 'বিশপ লেফ্রয়' রোডের বাড়ি থেকে। কেওড়াতলায় পোড়ানো হলো মরদেহ।

শ্যামল আরও জানালেন, ওঁর দেখা স্বপ্নগুলো আশ্চর্যজনকভাবে সত্যি হয়। অনেকবার অনেকের মৃত্যু নিয়ে স্বপ্ন দেখার পর লক্ষ্য করেছেন, দু'একদিনের মধ্যেই তাঁদের মৃত্যু ঘটে। আমার লেখক বন্ধুটিকে বললাম, "দেখাই যাক, তোমার এবারের স্বপ্ন সত্যি হয় কিনা!" কিন্তু, সত্যি হলেও কী এটাকে তোমার ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়ার শক্তি বলে মেনে নেওয়া যাবে? সত্যজিৎবাবুর অসুস্থতার খবর কারোরই অজানা নয়। তাঁর যথেষ্ট বয়েসও হয়েছে। এই ক্ষেত্রে তাঁকে নিয়ে এই ধরনের স্বপ্ন দেখা তোমরা মতো একজন শিল্প-সাহিত্যের প্রেমিকের পক্ষে কোনই অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। তুমি আগের কিছু স্বপ্নের ক্ষেত্রেও সে-গুলিকে সত্যি হতে দেখেছ, কিন্তু যতগুলো স্বপ্ন আজ পর্যন্ত দেখেছ, তার মধ্যে কতগুলো সত্যি হয়েছে লিখে রেখে হিসেব করে দেখেছ কী?

শ্যামলের সঙ্গে আলোচনা হলেও শ্যামল আমার যুক্তিগুলোকে সম্ভবত মেনে নিতে পারেননি। ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবারের স্বপ্নটাও সত্যি হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়নি। তারপরও বছর দশেক বেঁচে ছিলেন।

নায়াগ্রা জলপ্রপাত ভেঙে পড়ার ভবিষ্যদ্বাণী

বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই একটা ভবিষ্যদ্বাণী যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। ব্রিজওয়াটার-এর প্যাট সেন্ট জন ভবিষ্যদ্বাণী করেন ১৯৭৯-এর ২২ জুলাই স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা ৫৬ মিনিটে নায়াগ্রা জলপ্রপাত ভেঙে পড়বে। সংবাদটিকে গুরুত্ব দিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার তরফ থেকে সাংবাদিক ও ফোটোগ্রাফাররা এসে হাজির হয়েছিলেন। ঘটনাকে সেলুলয়েডে বন্দি করতে হাজির ছিল বিভিন্ন টিভি কোম্পানি। ভবিষ্যদ্বাণীর খবরটি টেলিভিশন মারফত প্রচারিত হওয়ায় শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বিভিন্ন শ্রেণির লোকের মধ্যেই যথেষ্ট ঔৎসুক্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল।

ঘটনার দিন বিকেলের আগেই নায়াগ্রা নদীর জেটিতে এসে হাজির হলেন 'দি হিউম্যানিস্ট' পত্রিকার সম্পাদক পল কুরৎজ। তারপর এঁরা যা করলেন তা দেখে উপস্থিত হাজার-হাজার দর্শক, সাংবাদিক ও টিভি-র লোকেরা হতভম্ব। পল কুরৎজ

এবং কিছু মানুষ উঠলেন স্টিমারে। ভয়ঙ্কর মুহূর্তে কী ওঁরা 'মেড অফ দ্যা মিস্ট' স্টিমারে চেপে নায়াগ্রা নদীতে ভ্রমণ করতে চান। এ তো চূড়ান্ত পাগলামো! নায়াগ্রা জলপ্রপাত ভাঙলে নায়াগ্রা নদীর অবস্থা যে কী হবে তা কী বুঝতে পারছেন না, একজন বুদ্ধিজীবী দুঁদে সম্পাদক কুরুৎজ!

কুরুৎজ-এর এই কাণ্ড-কারখানার ছবিও উঠলো। এক সাংবাদিক তো কুরুৎজ-কে স্টিমারে ওঠার আগেই জিজ্ঞেসই করে ফেললেন, "আপনার এই ধরনের হঠকারী ও বিপজ্জনক সিদ্ধান্তের কারণ কী?"

কুরুৎজ উত্তর দিয়েছিলেন, "সিদ্ধান্তটা হঠকারী নয়, বরং বলতে পারেন যুক্তিবাদী সিদ্ধান্ত। আর বিপজ্জনক বলছেন? কিছুক্ষণ পরই বুঝতে পারবেন, আপনার এই কথাগুলো কত ভুল।"

কুরুৎজ-এর সিদ্ধান্ত এবং যুক্তিবাদী বিচার শক্তি শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছিল। সেন্ট জনের ভবিষ্যদ্বাণী কয়েক ঘন্টার মধ্যে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল।

আমার এক পরিচিত তরুণ এবং আমার এককালের সহকর্মী, নাম ধরে নেওয়া যাক রঞ্জন, একবার তাঁর দুর্বলতম মুহূর্তে আমাকে বলল তাঁর স্ত্রীর চরিত্রে একটু গণ্ডগোল আছে। মাত্র বছর তিনেক হলো বিয়ে হয়েছে। একটি দেড় বছরের ছোট্ট সুন্দর মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে সংসার। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, "এই ধারণার পিছনে কী কারণ রয়েছে?"

রঞ্জন বলল, "সেদিন অফিসে কাজ করছি, হঠাৎ আমার ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় আমাকে জানিয়ে দিল বাড়িতে আমার স্ত্রী কোনও পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে গল্প-সল্প করছে। শরীর খারাপ লাগার অজুহাতে আমার কাজ পাশের টেবিলের বন্ধুর ওপর চাপিয়ে বাড়ি চলে গেলাম। বাড়ি গিয়ে দেখি আমার স্ত্রীর দূর-সম্পর্কের এক ভাই এসেছে। ওরা দুটিতে গল্প-সল্প করছে।"

রঞ্জনের বিয়ে হয়েছিল ওর চেয়ে যথেষ্ট অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়ের সঙ্গে। বিয়ের আগে রঞ্জনের একটি মেয়ের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিয়ের পরেও তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। এইজন্যে নিজের মনের মধ্যে একটা পাপবোধ জন্মেছিল। অবচেতন মনে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিত, বউও নিশ্চয়ই ধোয়া তুলসীপাতা নয়, হয়ত আমার মতোই লুকিয়ে-চুরিয়ে প্রেম-ট্রেম করে। এর আগেও কয়েকবার রঞ্জন অসময়ে অফিস থেকে বাড়ি ফিরে পরীক্ষা করতে চেয়েছে। শেষদিন স্ত্রীকে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে গল্প করতে দেখে মনের ভেতরে এক ধরনের সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছে—আমার স্ত্রীর চরিত্রও তবে আমারই মতো একটু গোলমেলে।

ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়ের সাড়া পেয়ে বেশ কয়েকবার বাড়ি গিয়ে ব্যর্থতার পর একবার রঞ্জনের সফলতা (?) সত্যিই ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়ের প্রমাণ কি? ভবিষ্যৎ দৃষ্টির প্রমাণ কি?

আমি তখন স্কুলে পড়ি। দিদিমা এলেন আমাদের খড়গপুরের রেল-কোয়ার্টারে কিছু দিনের জন্যে বেড়াতে। ফর্সা, ছোট-খাটো চেহারা। রাতে পড়াশুনোর পাঠ চুকলে আমরা ভাই-বোনেরা দিদিমার কাছে গোল হয়ে বসে গল্প শুনতাম। দিবানিদ্রার অভ্যেস ছিল দিদিমার। একদিন দুপুরে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে আঁৎকে উঠলেন তিনি। স্বপ্ন দেখেছিলেন, একজন দীর্ঘদেহী লোক দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দিদিমা বার-বারই লোকটিকে প্রশ্ন করলেন, "কে তুমি? কী চাই?" লোকটা কোনও উত্তর দেয়নি। লোকটার মুখটাও ভালোমতো দেখতে পাননি দিদিমা।

সেদিন রাতেই বাবা কলকাতা থেকে খবর আনলেন আমার মামীমার কাকা পূর্ণচন্দ্র দাশ (ত্রিকোণ পার্কে যাঁর একটি মূর্তি ও কলকাতায় যাঁর নামে একটি রাস্তা আছে) খুন হয়েছেন। দিদিমা খবর শুনে কাঁদলেন। বললেন, "ওঁর আত্মাই আমাকে দেখা দিয়ে গেল।" বাড়ির বড়রা বললেন, "কত দূরের ঘটনা এখান থেকেই উনি বুঝতে পেরেছিলেন। একেই বলে টেলিপ্যাথি।"

কিন্তু, দিদিমা কখন পূর্ণ দাশকে দেখলেন? কখনই বা পূর্ণ দাশের মৃত্যু বুঝতে পারলেন? স্বপ্নে দেখলেন, একজন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাবার কাছে পূর্ণ দাশের মৃত্যুর খবর শোনার পর সকলেই যা হোক একটা জোড়াতালি দেওয়া যুক্তি খাড়া করে দুটি ঘটনাকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে গোটা ব্যাপারটায় একটা অলৌকিক চেহারা দিতে চাইলেন। আসলে সকলেই সুযোগ পেলে একটা অলৌকিক কিছু দেখতে চান।

এমনি করে, একান্তভাবে অলৌকিক কিছু দেখতে চাওয়ার ইচ্ছে বা নিজেকে ভবিষ্যৎ অধিকারী বলে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করার জন্যেই অনেক সময় মানুষ জোড়াতালি দিয়ে চিন্তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার মিল খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে।

অধ্যায় : তেরো

Clairvoyance (অতীন্দ্রিয় অনুভূতি)

পরামনোবিদ্‌দের মতে ক্লেয়ারভয়ান্স clairvoyance শক্তির সাহায্যে বহু দূরের ঘটনা দেখা ও শোনা সম্ভব। (বোঝার সুবিধের জন্য উদাহরণ স্বরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করছি।) আমাদের কলকাতার এক প্রবীণ সাংবাদিক এক বাঙালি তান্ত্রিকের পরম বিশ্বাসী ভক্ত। যে সময়ের ঘটনা বলছি তান্ত্রিকবাবা তখন বেঁচে। সাংবাদিক ভদ্রলোক বিদেশে একবার অসুস্থ হয়ে কয়েকদিন হাসপাতালে ছিলেন। ফিরে এসে ঘটনাটা তান্ত্রিকবাবাকে বলতে তিনি বলেছিলেন, "ওরে, সে আমি দেখেছি। তোর ঘরে যে নার্স মেয়েটি ফুল রেখে যেত, সে বড় ভালো রে।"

তান্ত্রিকবাবা ওই এক কথাতে বাজিমাত করে দিয়েছিলেন। প্রবীণ সাংবাদিক সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করে ফেললেন তান্ত্রিকবাবার অতীন্দ্রিয় শক্তি (Clairvoyance) আছে।

অনেক সভ্যদেশের হাসপাতালের কেবিনে ফুলদানে ফুল থাকে, এটুকু জানা থাকলেই যে এই ধরনের কথা বলা যায় অন্ধ-বিশ্বাসীকে তা কে বোঝাবে?

সাধু-সন্ন্যাসীর অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি

স্টেট ব্যাঙ্ক কলকাতা মেইন ব্রাঞ্চের এক ডেপুটি ম্যানেজার পারিবারিক শান্তির আশায় বিখ্যাত তান্ত্রিক পাগলাবাবা (বারাণসী)-র দ্বারস্থ হন। তাঁর মতে এই তান্ত্রিক যে কোনও কিছু অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দ্বারা দেখতে পান। ধরুন, একজন কেউ জিজ্ঞেস করল, "বলুন তো আমার বারান্দার টবে কী ফুলের গাছ লাগিয়েছি?" অথবা, "আমার স্ত্রীকে কেমন দেখতে বলুন তো?" অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্যে তান্ত্রিক প্রশ্নকর্তার বাগানের ফুলের টব বা তাঁর স্ত্রীকে দেখতে পেতেন এবং লিখে ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে দিতেন। ডেপুটি ম্যানেজারের এই দেখাকে আমি অবিশ্বাস করিনি। কারণ বর্তমানে পশ্চিমবাংলাতেই পাঁচজন তান্ত্রিকের খোঁজ পেয়েছি, যাঁরা এই ধরনের নানারকম প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। প্রশ্নগুলো অনেক সময় অদ্ভুত ধরনেরও হতে পারে, যেমন, "বলুন তো আমার বাড়িতে ক'টা বেড়াল আছে?" বা "আমার পড়ার ঘরে কী ধরনের ফ্যান আছে দেখতে পাচ্ছেন? টেবিল ফ্যান না সিলিং ফ্যান?"

এইসব তান্ত্রিক বা ক্লেয়ারভয়ান্স (অতীন্দ্রিয় অনুভূতি) ক্ষমতার অধিকারীদের নানারকম ছাপানো প্রচারপত্র বা জীবনীর বইতে তাঁদের গুণগ্রাহীদের তালিকায় যেসব বিখ্যাত বিজ্ঞানী, ডাক্তার লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের নাম দেখেছি, তাতে সত্যিই চমকে গিয়েছি। কৌশলের সাহায্যে এই খেলা আমিও সফলভাবে দেখাতে সক্ষম। জানলে আপনিও পারবেন। এও জানি কৌশল ব্যবহারের রাস্তা বন্ধ করে দিলে এইসব অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির অধিকারীরা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হবেন।

১৯৮৫-র ১৮ এপ্রিল আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের বিজ্ঞান বিভাগের একটি বিশেষ বেতার অনুষ্ঠানে আমি এমনি অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির অধিকারী বলে বহুল প্রচারিত পাগলাবাবার (বারাণসী) মুখোমুখি হয়েছিলাম। পাগলাবাবা আকাশবাণী ভবনে ঢুকলেন চারটে গাড়িতে জনা পনেরো ভক্ত নিয়ে। আকণ্ঠ পান করে ও পাগলামী করে একটা 'তান্ত্রিক' মার্কা ইমেজ তৈরি করে ফেললেন। আকাশবাণীর প্রচুরকর্মী জুটে গেলেন। এক একজন এক একটা প্রশ্ন করছিলেন। বিজ্ঞান বিভাগের প্রযোজকের রুমে জমিয়ে বসে বাবা লিখে উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঠিকঠাক উত্তর পেয়ে প্রত্যেকেই অবাক। পাগলাবাবা দাবি করলেন—এসব কথোপকথন রেকর্ড করা হোক। আমি বললাম, যা হবে স্টুডিওতে। এই মাছের বাজারে নয়। স্টুডিওতে (রেকর্ডিং রুমে) তাঁকে লিখে উত্তর দিতে দিইনি। উত্তর দিতে হয়েছিল মুখে মুখে। আমার তরফ থেকে প্রশ্ন করার জন্যে হাজির করেছিলাম চিত্র-সাংবাদিক কল্যাণ চক্রবর্তী, প্রকাশক ময়ূখ বসু ও একাধারে চ্যাটার্ড ইঞ্জিনিয়ার ও প্রকাশক রঞ্জন সেনগুপ্তকে।

কল্যাণ প্রশ্ন করেছিলেন, "আমার সঙ্গের ক্যামেরাটার ক'টা ছবি তোলা হয়েছে।"

—"১৬ থেকে ১৭টা।" পাগলাবাবা বলেছিলেন।

ক্যামেরা ইন্ডিকেটারে দেখা গেল ছবি তোলা হয়েছে ৩০টা।

ময়ূখ জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আমার মানিব্যাগে কত টাকা আছে?"

—"৭৭টাকা।"

ব্যাগ খুলে দেখা গেল ২৭০টাকা।

রঞ্জন জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আমার সিগারেটের প্যাকেটে ক'টা সিগারেট আছে।"

—"৭টা।"

সিগারেটের প্যাকেট খুলে দেখা গেল ৯টা সিগারেট রয়েছে।

'অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির অধিকারী' তিনবারে তিনবারই ফেল করলেন। কেন বলুন তো? কারণ ওই একটিই, তাঁকে লিখে উত্তর দিতে দিইনি।

লিখে উত্তর দেওয়ার সময় সম্ভাব্য সব উত্তর লিখে রেখে তারপর প্রশ্নকর্তার

কাছ থেকে উত্তরটা জেনে নিয়ে কাগজ ভাঁজ করে আঙুলের কারসাজিতে আসল উত্তরটি ছাড়া বাকি সব উত্তরই ঢেকে দেওয়া হয়। ফলে প্রশ্নকর্তা দেখতে পান খাতাতে সঠিক উত্তরই লিখে রেখেছেন অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির অধিকারী সাধকবাবাজি।

লিখে উত্তর দেওয়ার বিষয় নিয়ে আগেই দীর্ঘ আলোচনা করেছি। তাই এখানে সংক্ষেপে সারলাম। এই খেলাই ঠিকমতো দেখাতে পারলে যাঁরা দেখেন তাঁরা প্রত্যেকেই অবাক হয়ে যান। এই বিস্ময় আমি দেখেছি প্রতিষ্ঠিত চোখেই। যাঁদের দেখিয়ে অবাক করেছিলাম তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, কলকাতা পুলিশের ডি. সি. হেডকোয়ার্টার সুবিমল দাশগুপ্ত, ডাঃ আবীরলাল মুখোপাধ্যায়, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ রণধীর বসু, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্যামসুন্দর দে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিনের দুই অধ্যাপক ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল ও ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য, আকাশবাণী কলকাতার বিজ্ঞান বিভাগের ডঃ অমিত চক্রবর্তী ও ডঃ সুভাষ সান্যাল, প্রাইস ওয়াটার-এর চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট কামাখ্যাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, কবি সাধনা মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক শেখর বসু, রঞ্জন ভাদুড়ী, শ্যামলকান্তি দাশ এবং আরও অনেকেই। সুতরাং এই জাদু-কা-খেল ঠিক মতো পরিবেশে দেখিয়ে এই সব অতীন্দ্রিয়বাবারা যে বিখ্যাত বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সাহিত্যিকদের সার্টিফিকেট পাবেন তাতে আর আশ্চর্যের কী!

ইউরি গেলারের 'থট রিডিং'-এর অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা

ইউরি গেলারের গড-ফাদার পুহারিক প্রথম ইউরির যে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, সেটি ছিল থট রিডিং। পুহারিক-কে ইউরি ১ থেকে ১০-এর মধ্যে যে কোনও একটি সংখ্যা ভাবতে বলেছিলেন। পুহারিক ভেবেছিলেন। ইউরি একটা রাইটিং-প্যাডে একটা সংখ্যা লিখে কলমটি নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "বলো, কত ভেবেছ?"

পুহারিক উত্তর দিতেই তাঁর চোখের সামনে রাইটিং-প্যাডটা মেলে ধরেছিলেন ইউরি। সেই সংখ্যাটিতেই লেখা রয়েছে।

ঠিক এই খেলাই আগরতলার প্রেস কনফারেন্সে (২৮.২.৮৬) দেখাই সংখ্যাটা ভাবতে বলেছিলাম ১ থেকে ১০-র মধ্যে।

ইউরি গেলারের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি

অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির জন্য বিশ্বের সবচেয়ে নামি-দামি ব্যক্তিটি হলেন ইউরি গেলার। গেলার হলেন পরামনোবিজ্ঞানীদের মাথার মণি। গেলারের গড-ফাদার ডক্টর অ্যানড্রিজা পুহারিক-এর ব্যবস্থাপনায় অনেক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে গেলার তাঁর এই ক্লেয়ারভয়ান্স বা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি প্রমাণ করেছেন। একটা মোটা খামের

ভেতরে একটা ছবি রেখে খামটা সীল বন্ধ করে গেলারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। দেখা গেছে গেলার প্রতিবারই ভেতরের ছবির সঠিক বর্ণনা দিয়েছেন।

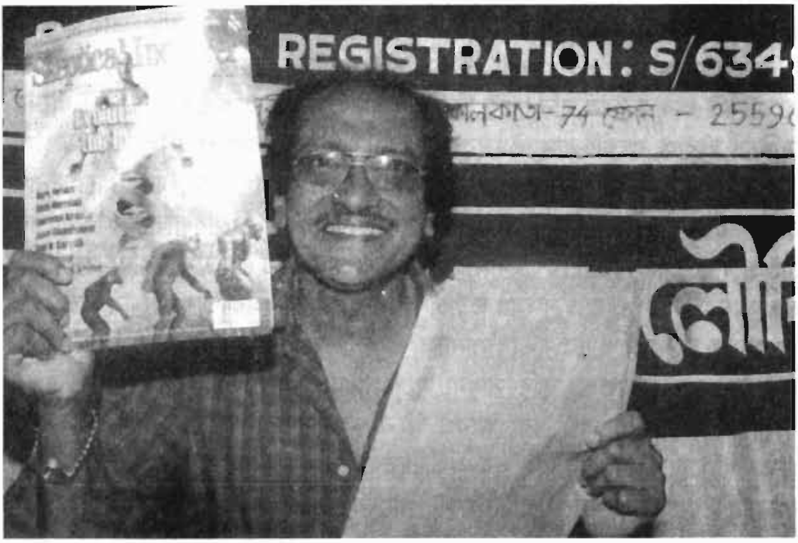

খামে হাত না ছুঁয়েই ভিতরে কি আছে, বলে দিচ্ছে লেখক

খামটিকে এমন পুরু রাখা হয়েছিল যাতে তীব্র আলোর সামনে খামটিকে ধরলেও ছবিটা ফুটে না ওঠে।

গেলারের পদ্ধতিতেই আমি একইভাবে আমার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির (?) প্রমাণ রাখতে পেরেছি একাধিকবার। চমকে যাওয়ার মতোই ঘটনা। সবিনয়ে স্বীকার করছি আমার কোনও অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা নেই, কারণ যে জিনিসের অস্তিত্বই নেই, তা আমারই বা থাকবে কী করে? আমি যে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি দেখাই তার পেছনে অবশ্যই রয়েছে কৌশল। দর্শকদের দৃষ্টির আড়ালে সীল করা খামটা ডুবিয়ে নিই অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল বা রিফাইন্ড স্পিরিটে। সামান্য সময়ের জন্য খামটা স্বচ্ছ হয়ে যায়, অতএব ভেতরের ছবিটা একটুক্ষণের জন্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দর্শকদের চোখের আড়ালে চোখ বুলিয়ে নিই খামের ওপরে। তারপর একটু সময় কাটিয়ে যখন ছবির বর্ণনা দিই তখন অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল বা রিফাইন্ড স্পিরিট উবে গিয়ে খাম আবার অস্বচ্ছ হয়ে যায়।

অধ্যায় : চোদ্দ

Psycho-kanesis বা Pk (মানসিক শক্তি)

বিজ্ঞানের পরিচিত শক্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ শক্তি, চৌম্বক শক্তি, শব্দ শক্তি ইত্যাদি। মানসিক শক্তি বা চিন্তা শক্তির খোঁজ বিজ্ঞানের জানা নেই। চিন্তা হলো মস্তিষ্কের স্নায়ুক্রিয়ার ফল। অর্থাৎ চিন্তার দ্বারা মানুষের মানসিক এবং শারীরিক কিছু পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। কিন্তু চিন্তার দ্বারা এমন কোনও শক্তি সৃষ্টি সম্ভব নয় যার সাহায্যে টেবিলে শুইয়ে রাখা একটি সিগারেটকেও দাঁড় করানো যেতে পারে। মানসিক শক্তির সাহায্যে একটি চামচকে বাঁকিয়ে ফেলা বা একটি গাড়িকে শূন্যে কিছুক্ষণের জন্যে তুলে রাখা অথবা কোনও ট্রেনকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া ইত্যাদি অসম্ভব। এইসব ঘটাতে প্রয়োজন কৌশলে অন্য ধরনের শক্তি প্রয়োগ কৌশলে কোনও ঘটনা ঘটিয়ে মানসিক শক্তি হিসেবে তাকে হাজির করার চেষ্টা পরামনোবিদরা বহুবারই করেছেন। পরামনোবিজ্ঞানীরা যা পারেননি, তা হলো সত্যিকারের মানসিক শক্তির কোনও প্রমাণ হাজির করতে।

মানসিক চিন্তার ফলে যে দেহের নানা ধরনের পরিবর্তন ও অনুভূতি হয়। সে-বিষয়ে আগে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। অতিরিক্ত চিন্তা বা টেনশনের ফলে রক্তচাপ কমতে পারে বাড়তে পারে, মাথার চাঁদি উত্তপ্ত হতে পারে, হজমে গোলমাল হতে পারে, অনিদ্রা হতে পারে, আলসার হতে পারে, দাঁতে ব্যথা হতে পারে, এমনি হতে পারের তালিকা আরও দিতে থাকলে বিরাট হয়ে যাবে, তাই থামছি। হতে পারে অনেক কিছুই, কিন্তু তা সবই চিন্তাকারীর শরীরকে ঘিরে। কোনও জড় পদার্থকে চিন্তা শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

মানসিক শক্তিতে রেলগাড়ি থামানো

মানসিক শক্তি দিয়ে েল রোখার কাহিনি অনেকের কাছেই বোধহয় নতুন নয়। বিভিন্ন পরিচিত, অপরিচিত সাধু-সন্ন্যাসী-পীরদের ঘিরে এই ধরনের কিছু কাহিনি প্রচলিত রয়েছে।

প্রখ্যাত তান্ত্রিক, 'সিদ্ধপুরুষ', আদ্যামার ভক্ত, আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা অন্নদাঠাকুরের শ্যালক শ্রীপরেশ চক্রবর্তী। সালটা ১৯৯০। শ্রী চক্রবর্তী আমাকে জানালেন, একবার তান্ত্রিক ও আদ্যামার পরমভক্ত, সিদ্ধপুরুষ শ্রীসুদীনকুমার মিত্র

তাঁর মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে একটা ট্রেনকে স্টেশনে আটকে রেখেছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল এই ধরনের : সুদীনকুমার মিত্র কোথায় যেন যাবেন বলে ট্রেন ধরতে শিয়ালদহ যাচ্ছিলেন। পথে গাড়ির ভিড়ে তাঁর গাড়ি যায় আটকে। জ্যামে আটকে পড়ে শ্রীমিত্রের সঙ্গীরা উদ্বিগ্নভাবে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে যাচ্ছে। স্টেশনে যখন গাড়ি পৌঁছল তার কিছু আগেই ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তবে, সুদীনকুমার মিত্রের ইচ্ছেয় তাঁর সঙ্গীরা মালপত্র নিয়ে হাজির হলেন প্লাটফর্মে। অবাক কাণ্ড! ট্রেন তখনও দাঁড়িয়ে আছে!

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, "ট্রেনটা এমনিতেও তো লেট থাকতে পারতো? আপনি

শ্রীপরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

কী করে ধরে নিলেন ট্রেন থাকার কারণ সুদীন মিত্রের ইচ্ছাশক্তি?

"আমাদের অনেকেরই বোধহয় এই ধরনের দেরি করে স্টেশনে পৌঁছেও ট্রেন

পাওয়ার অভিজ্ঞতা অল্প-বিস্তর আছে। আমাদের দেশে ট্রেন সময় মেনে চলে না, সুতরাং এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটা আদৌ অলৌকিক বা অসম্ভব পর্যায়ে পড়ে না।”

আমার মন্তব্যে শ্রীপরেশ চক্রবর্তী বলেছিলেন, তিনিই তাঁর অতীন্দ্রিয় শক্তির পরিচয় দিতে পারেন চলন্ত ট্রেন আটকে দিয়ে।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, “চলন্ত ট্রেন আটকাতে হবে না, আমি একটা সাইকেল চালাব। আপনি আপনার অতীন্দ্রিয় শক্তিতে সাইকেলটা থামাতে পারবেন?”

—“না, সাইকেল নয়, ট্রেন থামিয়েই তোমাদের আমি দেখাব।” শ্রীচক্রবর্তী বলছিলেন। আমি বলেছিলাম, “আপনি যে পদ্ধতিতে ট্রেন থামাবেন, আমিও সেই পদ্ধতিতেই ট্রেন থামাব। কারণ, জানেনই তো, আমার একটা বিশ্রী অভ্যেস আছে, কেউ অলৌকিক কিছু দেখালে আমিও সেটা দেখাবার চেষ্টা করি।”

না; আজ পর্যন্ত পরেশ চক্রবর্তী ট্রেন বা সাইকেল কোনটারই গতি ইচ্ছাশক্তিতে রুদ্ধ করে দেখাননি। তবে আমি কিন্তু একবার ছোট্ট একটা কৌশলে ট্রেন থামিয়ে অলৌকিক বিশ্বাসী বন্ধুদের চমকে দিয়েছিলাম। কৌশলটা হলো, পরীক্ষক বন্ধুদের অপরিচিত আমার এক বন্ধু ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট থেকে একটা সুটকেশ বাইরে ফেলে দিয়ে চেন টেনেছিল।

আর একবার কলকাতার বুকে আমার ইচ্ছাশক্তিতে মোটর গাড়ি থামিয়ে বন্ধুদের বিস্মিত করছিলাম, কেউ বুঝতেই পারেননি, চালকের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া ছিল।

খড়গপুরের সেই পীর

এবার যে ঘটনাটার কথা বলছি, সেটা ঘটেছিল খড়্গপুর স্টেশনে। তখন আমি নেহাতই বালক। ইন্দার কৃষ্ণলাল শিক্ষানিকেতনে পড়ি। রাম নবমীতে ট্রাফিক সেটেলমেন্টের লাগোয়া ‘বড়া লাইট কা নীচে’ জি. ভি. রাওয়ের ম্যাজিক দেখি। ক্লাশে টিচার শুভেন্দু রায়ের কাছে গল্প শুনি, শোষক আর শোষিতদের। পাঁচ ভাই- বোনের সংসারে বেড়ে উঠছি আগাছার মতোই। খেলা বলতে ছিল সুশীল রায়চৌধুরীর ওখানে বক্সিং শেখা। আর নেশা বলতে অলৌকিক শক্তির খোঁজে সাধুসন্ত-পীরদের পেছনে দৌড়নো। তখন এই সব অলৌকিক-বাবাদের ভিড়ও থাকত বটে খড়্গাপুরে। জানি না এখন কেমন। গুরুজি বাবাজি আর পীরদের রমরমা এবং অন্ধ সংস্কারে পাকখাওয়া মানুষের ভিড়ে বহু জাতি, বহু ভাষা-ভাষীদের শহর খড়্গাপুর সব-সময় যেন ভাবাবেগে ভেসে যেত। কখনও শুনতাম কাকে না কি মা শীতলা ভর করেছে, কখনও শুনতাম পাড়ার কোন মহিলা মা মনসার আশীর্বাদ পেয়ে স্বপ্নে পাওয়া ওষুধ দিচ্ছে। কখনও বা কারও বাড়ির গুরুদেব শূন্যে হাত ঘুরিয়ে পেঁড়া এনে আমাকে

খাইয়েছেন। ওই বয়েসেই আমিও শূন্যে হাত ঘুরিয়ে পেঁড়া এনে বন্ধুদের খাওয়াতাম। পনেরোই আগস্ট বন্ধুরা মিলে ত্রিপল টাঙিয়ে মঞ্চে ম্যাজিক দেখাতাম। ম্যাজিক দেখে কেউ কেউ মেডেল দেওয়ার মিথ্যে প্রতিশ্রুতিও ঘোষণা করতেন স্টেজে। এমনি একটা সময় হঠাৎই এক পিরের অলৌকিক ঘটনা গোটা খড়্গপুর নাড়িয়ে দিল। ঘটনাটা নিজের চোখে দেখিনি, শুনেছিলাম।

এক পির ট্রেনে উঠেছিলেন টিকিট ছাড়াই। পরনে বহু রঙিন তালিতে রঙচঙে আলখাল্লা আর গলায় নানা ধরনের পাথর ও পুঁতির মালা। মাথা ভর্তি বড় বড় চুল আর মুখ ভর্তি কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান টিকিট চেকার বিনা-টিকিটের ফকিরটিকে পাকড়াও করে নামিয়ে দিলেন। ফকির রাগে ফুঁসতে লাগলেন। বিড়বিড় করে কী সব বলে শূন্যে হাত তুলে ট্রেনের ইঞ্জিন লক্ষ্য করে অদৃশ্য কিছু একটা ছুঁড়ে মারতে লাগলেন।

খড়্গপুর খুবই বড় জংশন স্টেশন। ট্রেন এলে প্লাটফর্মের ভিড় যেন উপচে পড়ে। ভিড়ের একাংশ ফকিরের অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা দেখে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল।

ট্রেন ছাড়ার ঘন্টি পড়ল, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান গার্ড সবুজ ফ্ল্যাগ নাড়াতে নাড়াতে হুইসিল বাজাল। ইঞ্জিন সিটি দিল, কিন্তু আশ্চর্য, ট্রেন নড়ল না। ইঞ্জিন ঘন ঘন সিটি বাজায় কিন্তু ট্রেন আর এগোয় না। গার্ড সাহেব ব্যাপার দেখতে নিজেই এগিয়ে এলেন ড্রাইভারের কাছে। দেখলেন, ড্রাইভার খুটখাট করে ইঞ্জিনের মেশিন-পত্তর নাড়াচাড়া করছে, সাহায্য করছে খালাসি। গার্ড সাহেব হিন্দিতেই প্রশ্ন করলেন, "কী হলো? ইঞ্জিন বিগড়েছে?"

খড়্গপুরের দক্ষিণ ভারতীয় ড্রাইভার উত্তর দিলেন, "ইঞ্জিন তো ঠিকই আছে, কিন্তু গাড়ি চলছে না।"

লোকো-শেড থেকে মিস্ত্রি এলেন, কিন্তু কিছুতেই ইঞ্জিন থামার রহস্য খুঁজে পাওয়া গেল না।

কয়েক মুহূর্তে গোটা স্টেশন চত্বরে রটে গেল ফকির সাহেব ট্রেন আটকে দিয়েছেন। অন্য প্লাটফর্ম থেকেও লোক আসছে এই অলৌকিক ঘটনা ও ফকিরকে দেখতে। খবরটা ড্রাইভার ও খালাসির কানেও গেছে। তাঁরাই শেষ পর্যন্ত ফকিরের কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইলেন। ফকির একটি শর্তে রাজি হলেন তাঁর ইচ্ছাশক্তিতে তুলে নিতে, সেই টিকিট-চেকারকে এসে ক্ষমা চাইতে হবে।

জনতার চাপে এবং ফকিরের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান টিকিট-চেকার সুড়সুড় করে এসে ক্ষমা চেয়ে ফকিরকে ট্রেনে বসিয়ে দিলেন। ফকির প্রসন্ন হলেন। এবার গাড়ি চলল। ঘটনাটি জনপ্রিয়তা পেল। কিছুদিন সর্বত্রই ওই আলোচনা। আমি কিন্তু অন্য কথা ভেবেছিলাম সেদিন। ড্রাইভার ফকিরের চেনা লোক নন তো? সেই সঙ্গে লোকো-শেডের মিস্ত্রি! যেমনটি ম্যাজিক দেখাবার সময় আমার বন্ধুরাও দর্শক সেজে বসে থাকে।

স্টীমার বন্ধ করেছিলেন পি. সি. সরকার

জাদুকর দীপক রায়ের একটা লেখায় একবার পড়েছিলাম জাদু সম্রাট পি. সি. সরকার একবার স্টিমার বন্ধ করেছিলেন। শ্রীসরকার কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে স্টিমারে গোয়ালন্দ আসছিলেন নারায়ণগঞ্জ থেকে। তখন তিনি জাদুচর্চার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তত নাম ছড়ায়নি।

রেলিং-এর ধারে ডেকে বসে শ্রীসরকার তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে নানা রকমের হাত সাফাইয়ের খেলা দেখাতে মেতে উঠলেন। ম্যাজিক দেখতে ডেকে ভিড় জমে উঠল, একটুক্ষণের মধ্যেই। শ্রীসরকারের হাতের কৌশলে সকলেই অবাক, ঘন-ঘন হাততালি পড়ছে। এরই মধ্যে একজন দর্শক ফুট কাটলেন, "এ আর কী এমন দেখালেন? এসব হাতসাফাই তো রাস্তার বেদেরাও দেখায়। অন্য কিছু দেখান না।"

"সব কিছু কী আর সব জায়গায় দেখানো যায়? তারও একটা পরিবেশ আছে! এখানে এই পরিবেশে দেখনো সম্ভব এমন কোনও কিছু দেখাতে বললে নিশ্চয়ই দেখাব।"

"বেশ তো, আমরা যে স্টিমারে যাচ্ছি, সেটাকেই এই মাঝনদীতে বন্ধ করে দিন না। দেখি আপনার কেরামতি।"

শ্রীসরকার কিন্তু এতে দমলেন না। বললেন, "যোগের সাহায্যে মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে এটা অবশ্য করা সম্ভব। আমি একবার কুম্ভক যোগ করে চেষ্টা করে দেখতে পারি। তবে পারব কি না জানি না। আপনারা কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আমার মনসংযোগে সাহায্য করুন।

সমস্ত দর্শক রুদ্ধশ্বাসে শ্রীসরকারের যোগের প্রয়োগ দেখার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। পি. সি. সরকার চোখ বুজে বসলেন যোগে। তারপরে যা ঘটে গেল বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা মেলা ভার। স্টিমারের গতি কমল। তারপর পুরোপুরি থেমে গেল। সারেঙ, খালাসিদের মধ্যে হইচই পড়ে গেল, মাঝনদীতে স্টিমার থামল কেন?

ইতিমধ্যে সারা স্টিমারে খবর ছড়িয়ে পড়েছে, এক জাদুকর যোগের শক্তিতে স্টিমার চলা বন্ধ করে দিয়েছেন।

সারেঙের অনুরোধে পি. সি. সরকার আবার স্টিমার চলার আদেশ দিতেই, বাধ্য ছেলের মতোই স্টিমার আবার চলতে শুরু করল।

পি. সি. সরকারের এই অতীন্দ্রিয় শক্তি দেখে দর্শকদের চক্ষু চড়কগাছ হলেও, তাঁর এই ক্ষমতার চাবিকাঠিটি ছিল সারেঙের সহযোগিতা। জাদুকর আগেই স্টিমারে উঠে নিজের পরিচয় দিয়ে সারেঙের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিয়েছিলেন। যাত্রীদের সঙ্গে একটু মজা করতে জাদুকরের সঙ্গে সারেঙও রাজি হয়ে গিয়েছিল। কী ধরনের ইশারা পেলে স্টিমার থামবে এবং কী ধরনের ইশারা পেলে স্টিমার ফের চালু

হবে, সব দু'জনে মিলে ঠিক হয়ে গেল। তারপর জাদুকরেরই এক নিজের লোক জাদুকরকে উসকে দিয়ে মাঝনদীতে স্টিমার বন্ধ করে কেরামতি দেখাতে বলেছিলেন।

সাধুজির স্টিমার খাওয়া

গল্পটা শুনেছিলাম শ্রদ্ধেয় অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক বনফুলের মুখে। তিনি আবার এটা শুনেছিলেন শরৎচন্দ্রের মুখে।

শরৎচন্দ্র তখন স্কুলে পড়েন। সেই সময় ভাগলপুরের আজমপুর ঘাটে এলেন এক আশ্চর্য সাধু। অসাধারণ নাকি তাঁর ক্ষমতা। পরনে গেরুয়া, মাথায় জটা, সারা গায়ে ছাইমাখা, ভাগলপুরময় দ্রুত খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। কয়েক দিনের মধ্যেই আজমপুরের ঘাট দর্শনার্থীদের ভিড়ে জমজমাট হয়ে উঠল।

শোনা গেল, সাধুজি অনেকের দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে দিচ্ছেন, শূন্য থেকে খাবার বের করছেন, ঝোলা থেকে বের করছেন অসময়ের আম। সাধুজির কাণ্ডকারখানা দেখে অনেকেই টপাটপ দীক্ষাও নিয়ে নিচ্ছিলেন।

একদিন সাধুজির গঙ্গাপুজো করার ইচ্ছে হলো। তাঁর ইচ্ছের কথা শিষ্যদের বলতেই শিষ্যরা পুজোর সব উপকরণ নিয়ে হাজির হলো আজমপুর ঘাটে। সাধুজির নির্দেশে গঙ্গাতীরে পবিত্র জলের ধারে সাজানো হলো ফল, ফুল, বাতাসা, পেঁড়া।

বেলা বারোটার সময় সাধুজি সবে পুজোয় বসবেন, এমন সময় একটা দারুণ কাণ্ড ঘটে গেল। কার কোম্পানির একটা বিরাট স্টিমার তখন রোজই ঐ সময় আজমপুর ঘাটের পাশ দিয়ে প্রচণ্ড গর্জনে বিরাট বিরাট ঢেউ তুলে যেত। এ-দিন সেই প্রচণ্ড ঢেউগুলো এসে হঠাৎই আছড়ে পড়ল গঙ্গামায়ের পুজোর নৈবেদ্যর ওপর। মুহূর্তে নৈবেদ্য ভেসে গেল গঙ্গায়।

সাধুজি গেলেন খেপে—এত বড় স্পর্ধা। আমার গঙ্গামায়ের পুজো নষ্ট করা—ঠিক আছে কাল তুই ব্যাটা স্টিমার পালাবি কোথায়? এদিক দিয়েই তো যেতে হবে, তখন তোকে আস্ত গিলে খাব। হ্যাঁ, আজ আমি আমার এই সমস্ত ভক্তদের সামনে প্রতিজ্ঞা করছি, কাল সত্যিই তোকে গিলে খাব।

একজন শিষ্যের কাছে গুরুজির প্রতিজ্ঞাটা বোধহয় বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। সে জিজ্ঞেস করল, "গুরুজি, এ যে জাহাজের মতো পেল্লাই স্টিমার, খাবেন কী করে?"

গুরুজি এ-হেন সন্দেহে গর্জে উঠলেন, "কালকেই তা দেখতে পাবি বেটা। আমার প্রতিজ্ঞার কোনও নড়চড় হবে না।"

পুজো দেখতে আসা ভক্ত শিষ্যেরা পরম ভক্তিতে চেঁচিয়ে উঠল, "গুরুজি কী জয়।"

দেখতে দেখতে গুরজির স্টিমার গেলার প্রতিজ্ঞার খবরটা ছড়িয়ে পড়ল ভাগলপুর ও তার আশেপাশে। পরদিন সকাল থেকেই আজমপুর গঙ্গার ঘাটে

মেলা বসে গেল। বেলাও বাড়ে, লোকও বাড়ে।

সাধুজি ঘাটের কাছে ধুনি জ্বেলে গভীর ধ্যানে মগ্ন। বেলা বারোটা যখন বাজে-বাজে, তখন জনতা চিৎকার করে উঠল, "স্টিমার আসছে, স্টিমার আসছে।"

সাধুজির ধ্যান ভাঙল এবার। চোখ মেলে তাকালেন। গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে চললেন গঙ্গার দিকে। কোমর জলে নেমে থামলেন সাধুজি। তারপর বাজখাঁই গলায় চেঁচালেন, "আয় বেটা জাহাজ, আজ তোকে গিলে খাব।"

সাধুজি যত চেঁচান, দর্শকদের সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বুক টিপ্‌টিপ্‌ করে। কী বিরাট অঘটন ঘটে যাচ্ছে— ভাবতে গিয়ে আর থই পান না।

প্রচণ্ড গর্জন তুলে স্টিমার এসে পড়ল। স্টিমারের ঢেউ আছড়ে পড়ল ঘাটে। সাধুজি হাঁ করে আবার যেই স্টীমারের দিকে এগোচ্ছেন, অমনি জনা-কয়েক শিষ্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাধুজিকে ঘিরে কেঁদে পড়ল, "গুরুজি, জাহাজের কয়েক'শ নিরীহ যাত্রীদের আপনি বাঁচান। ওরা তো কোনও অপরাধ করেনি। জাহাজের দোষে ওদের কেন প্রাণ নেবেন?"

শিষ্যদের কান্নাভেজা অনুরোধে গুরুজির মন নরম হলো। ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "তোদের জন্যেই জাহাজটা বেঁচে গেল।"

এ-ক্ষেত্রেও কিন্তু সাধুজির অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা প্রমাণিত হলো না তাঁর শিষ্যদের জন্যে। অথবা এ-ও বলা যায়, গুরুজির বুজরুকি ধরা পড়ল না তাঁরই শিষ্যদের অভিনয়ে।

লিফ্‌ট ও কেব্‌ল-কার দাঁড় করিয়েছিলেন ইউরি গেলার

অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার নানা চমক দেখিয়ে ইউরি গেলার ইউরোপের দেশগুলোতে যথেষ্ট হুলুস্থূল ফেলে দিয়েছিলেন। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা দেখাতে জার্মান থেকেই প্রস্তাব এল। যিনি প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন তিনি ব্যবসা ভালোই বোঝেন। পাবলিসিটির জন্য বিস্তর খরচ করলেন। ইউরি মিউনিখে পা দিতেই সেখানকার পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশনের সাংবাদিকেরা ছেঁকে ধরলেন তাঁকে। কয়েক দিন ধরে ইউরি, কয়েক জায়গায় চামচ ভাঙা, চামচ বাঁকানোর ঘটনা ঘটালেন, দেখালেন থট রিডিং-এর খেলা। কয়েকদিন পরে ম্যানেজার গেলারকে নতুন ধরনের শক্তি প্রয়োগের জন্য হাজির করলেন। পাহাড়ের গা থেকে রোপওয়ে ধরে এগিয়ে আসা কেবল-কার দাঁড় করিয়ে দিলেন গেলার। তারপর একটা ডিপার্টমেন্টাল সেন্টারের লিফ্‌টকে থামিয়ে দিলেন। প্রচারের বন্যায় ভেসে চললেন গেলার। তারই মাঝে কয়েকজন গেলারের এই ক্ষমতায় সন্দেহ প্রকাশ করলেন। কয়েকজন তাঁদের মোটরকার ও মোটরবাইক আটকাবার জন্য চ্যালেঞ্জ জানালেন। 'অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী' ইউরি বোকা নন। আল-টপকা চ্যালেঞ্জকে গ্রাহ্যই করলেন না। তাতে ইউরির ক্ষতি যত হয়েছে, লাভ হয়েছে তার চেয়ে বেশি। কারণ, চ্যালেঞ্জ জেতা ইউরির পক্ষে সম্ভব ছিল না।

মানসিক শক্তি দিয়ে গেলারের চামচ বাঁকানো

পরামনোবিজ্ঞানীদের কাছে ইউরি গেলার বিশ্বের শ্রেষ্ঠতর মানসিক শক্তির অধিকারী। গেলারের সাইকো-কিনেসিস (Psycho-kinesis) বা মানসিক শক্তির তথাকথিত পরীক্ষা আমেরিকা, ইংলন্ড ও ইউরোপে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। একাধিকবার সাইকো-কিনেসিস শক্তির দ্বারা একটা টেবিলের ওপর সোজা দাঁড় করানো ছুরি বা চামচকে টেবিলের অপরপ্রান্তে বসে না ছুঁয়েই বাঁকিয়ে দিয়েছেন গেলার। আবার, কখনও বা দু-আঙুলের চাপে চামচ বা ছুরিকে ভেঙে ফেলেছেন অতি অবহেলে।

এই ধরনের ঘটনা ঘটার পেছনে পরামনোবিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা হলো—মানুষের শক্তিকে এমন একটা পর্যায়ে উন্নত করা সম্ভব, যখন শরীরের বাইরের কোনও বস্তুর প্রভাবিত করা সম্ভব। গেলার মানসিক শক্তিকে বস্তুর উপর প্রয়োগসক্ষম একজন ব্যক্তি।

ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠিত চিত্র-শিল্পী শক্তি বর্মন বছর উনিশ-কুড়ি আগে কলকাতায় এসেছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে ইউরি গেলারের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা নিয়ে একাধিকবার দীর্ঘ আলোচনা হয় আমার। পরে ফ্রান্স থেকে ইউরি গেলারের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার ওপর আমি একটি ভিডিও ক্যাসেট সংগ্রহ করি। তাতে লক্ষ্য করেছিলাম, টেবিলের একপ্রান্তে টেবিল না ছুঁয়ে বসেন ইউরি গেলার। টেবিলের ওপর অপর প্রান্তে একটা ছোট বেদী বা স্ট্যাণ্ড রাখা হয়। মিউজিয়ামে ছোটখাট মূর্তিগুলো যে ধরনের বেদীর ওপর রাখা হয় এও সেই ধরনেরই বেদী। বেদীর মাঝখানে লম্বা একটা ছিদ্র বা খাঁজ থাকে, যে ছিদ্র বা খাঁজে একটা চামচের তলার দিকটা ঢুকিয়ে সেটা খাড়া রাখা যায়। তার উপরে তীব্র আলো ফেলা হয়। এই আলোগুলো এমনভাবে সাজানো হয়, যাতে গেলারের চোখে প্রতিফলিত হয়ে মনঃসংযোগে বাধার সৃষ্টি না করে। চামচের ওপরে খুব কাছ থেকে এবং চারপাশ থেকে তীব্র আলো রিফ্লেক্টারে প্রতিফলিত করে ফেলা হয়।

গভীরভাবে মনঃসংযোগ করে মানসিক শক্তিকে অপর প্রান্তের চামচে প্রয়োগ করতে থাকেন গেলার। দীর্ঘ সময় কেটে যায়, ঘন্টার কাঁটা ঘোরে। একসময় দেখা যায় চামচটা বেঁকছে। একটু একটু করে চামচের হাতলটা বেঁকে যাচ্ছে।

ধাতু বাঁকার আসল রহস্য

১৯৭৮-এর ১৬ এপ্রিল 'সানডে' পত্রিকায় জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়ার)-এর একটা সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল। সাক্ষাৎকারটিতে জাদুকর বলেছিলেন, ইউরি গেলারের চামচ বাঁকানোর মূলে রয়েছে দৃষ্টি-বিভ্রম (Optical illusion)। অবশ্য, এই দৃষ্টিবিভ্রম ঠিক কেমনভাবে ঘটানো হয়ে থাকে তার উল্লেখ ছিল না। স্বভাবতই

অতীন্দ্রিয় শক্তিতে বিশ্বাসী অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন—ইউরি গেলারকে কেউ একজন ভণ্ড বললেই তিনি ভণ্ড হয়ে যাবেন না। হয় শ্রীসরকার একটা চামচ বাঁকিয়ে দেখান, অথবা কৌশলটা জানান, যাতে যে কেউ পরীক্ষা করে তাঁর সত্যতার প্রমাণ পেতে পারে।

আমি অবশ্য যে ভিডিও ক্যাসেট দেখেছি, তাতে কিন্তু এটা স্পষ্টতই বোঝা গিয়েছিল, ইউরির চামচ বাঁকানোর পিছনে Optical illusion-এর কোনও ব্যাপারই ছিল না। কারণ, দর্শকরা বাঁকানো চামচটি হাতে ধরে পরীক্ষা করছিলেন। অর্থাৎ, চামচটি বাস্তবিকই বেঁকেছিল। দৃষ্টি বিভ্রম সৃষ্টি করে সোজা চামচকে বাঁকা দেখাবার চেষ্টা করেননি ইউরি।

ইউরির চামচ বাঁকানোর ক্যাসেট দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওর মানসিক শক্তির গোপন রহস্য আমরা কাছে গোপন থাকেনি। তবে অবাক হয়েছি এই ভেবে—কত সাধারণ একটা বিজ্ঞানের সূত্রকে কাজে লাগিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞান পেশার মানুষদেরও ঠকিয়ে আসছিলেন।

আমি এখন যে নিয়মে চামচ বাঁকানোর কথা বলছি, তাতে দৃষ্টিবিভ্রমের ব্যাপার নেই। একটা টেবিলের একপ্রান্তে থাকব আমি, অন্যপ্রান্তে একটা বেদির মতো

জেমস র‍্যাণ্ডি

স্ট্যাণ্ডের ওপরে দাঁড় করানো থাকবে একটা ছুরি বা চামচ। টেবিল কোনওভাবে স্পর্শ না করেই আমি বসব। টেবিলে কোনও কৌশল নেই। সেটা থাকবে অতি সাদা-মাটা। ঠিক মতো মনঃসংযোগের জন্যে ছুরি বা চামচের ওপর তীব্র আলো

ফেলা হবে, এতে দর্শকদেরও দেখতে সুবিধা হবে। আলো আমার বা দর্শকদের চোখকে যাতে পীড়া না দেয়, তাই আলোগুলো ছুরি বা চামচের ওপর খুব কাছ থেকে ফেলা হবে। অর্থাৎ, ইউরি গেলারের কায়দাতেই দেখবে।

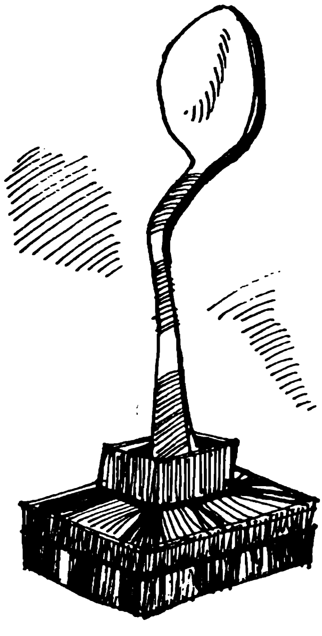

গেলার চামচ বাঁকিয়েছেন

একসময় দেখবেন, ছুরি বা চামচটা বেঁকে গেছে। নিজের হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, সত্যিই বেঁকেছে, আলোর সাহায্যে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানো হয়নি।

এখানে কৌশলটা কিন্তু টেবিল, রঙিন আলোর কারসাজিতে নেই, রয়েছে এই ছুরি বা চামচেতে। ছুরির ফলা বা চামচের হাতলটা তৈরি করতে হবে দুটো ভিন্ন-ভিন্ন ধাতুর পাতলা পাত জুড়ে। ধরুন, লোহা ও তামার দুটো পাতলা পাত জুড়ে তৈরি করালেন। এবার দুটো জোড়া দেওয়া পাত যেন দেখা না যায় তাই প্রয়োজন গ্যালভানাইজ করে নেওয়া অর্থাৎ একটা নিকেল কোটিং দিয়ে নেওয়া।

চামচ বাঁকাবার এই কৌশল আমি জানাবার পর পৃথিবী জুড়ের হই-হই পড়ে যায়। পৃথিবীর বহু দেশের টিভি এই কৌশলটি দেখায় এবং সঙ্গে দেখায় গেলারের বুজরুকি যে ধরেছে, সেই আমাকে। প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার তুষার তালুকদার অস্ট্রেলিয়ার জায়েন্ট স্ক্রিনে ইউরির বুজরুকি ফাঁস ও আমাকে দেখে ফোনে অভিনন্দন জানান।

তীব্র আলোর খুব কাছে চামচ বা ছুরিটা দাঁড় করিয়ে রাখলে এতগুলো আলোর তাপ উত্তপ্ত করবে। উত্তাপে বস্তুমাত্রেই প্রসারিত হয়। ছুরির ফলার বা চামচের হাতলের লোহার পাত এবং তামার পাত প্রসারিত-হতে থাকবে। একই তাপে ভিন্ন-ভিন্ন পদার্থের প্রসারণ ভিন্ন-ভিন্ন রকমের। তামার প্রসারণ ক্ষমতা লোহার চেয়ে বেশি। অতএব লোহার পাতের সঙ্গে জুড়ে-থাকা তামার পাত লোহার আগে বাড়াতে গিয়ে লোহার পাতকে বাঁকিয়ে দেয়, ফলে ছুরি ধনুকের মতো বেঁকে যায় বা হ্যাণ্ডেল ও মাথার জোড়ার কাছটা মুচড়ে যায়।

'নিউ সায়েন্টিস্ট'-এর পরীক্ষায় ইউরি এলেন না

'নিউ সাইন্টিস্ট' পত্রিকার ১৯৭৪-এর ১৭ অক্টোবরের সংখ্যা থেকে জানতে পারি, পত্রিকাটির তরফ থেকে ইউরি গেলারের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দাবির সত্যতা

পরীক্ষার জন্য চেষ্টা চালানো হয়েছিল। একটি সৎ, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক পত্রিকা হিসেবে গেলারের প্রচারের গড্ডলিকা প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে জনসাধারণের মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পত্রিকার বিক্রি বাড়াতে চায়নি। আবার, 'গেলারের অতীন্দ্রিয় স্রেফ বুজরুকি', শুধু এ কথাটা বলেই ব্যাপারটা উড়িয়েও দিতে চায়নি। পত্রিকাটির তরফ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছিল ইউরির সঙ্গে। এই ধরনের পরীক্ষায় সহযোগিতা করতে রাজি হলেন ইউরি। পরীক্ষার দিন স্থান সবই ঠিক হয়ে গেল। পরীক্ষার দিন ইউরি এলেন না। বললেন, "আমি বিজ্ঞানীদের সামনে বহু কঠিন পরীক্ষায় সফল হয়েছি। নতুন করে পরীক্ষায় নামার কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না।"

'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ কিন্তু আশা ছাড়লেন না। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে এবার ইউরি গেলারকে পরীক্ষায় হাজির হতে রাজি করালেন। কিন্তু এবারেও এলেন না ইউরি। পরিবর্তে জানালেন, তিনি একটা ভয় দেখানো চিঠি পেয়েছেন, যাতে বলা হয়েছে, এই পরীক্ষায় অংশ নিলে ইউরিকে খতম করা হবে। তাই বাধ্য হয়েই তিনি মত পরিবর্তন করেছেন।

এক ঝলকে ইউরি

ইউরি গেলারের এই ক্ষমতার উৎস হিসেবে ডঃ পুহারিক যে গল্প তাঁর বিখ্যাত 'ইউরি' বইটিতে লিখেছেন। তাতে বলা হয়েছে—ইউরির বয়েস যখন তিন বছর সেই সময় চকচকে মুখের একটা অদ্ভুত মূর্তি এসে হাজির হয় ইউরির মুখোমুখি। মূর্তিটার মাথা থেকে একটা তীব্র রশ্মি এসে পড়ে ইউরির মাথায়। ইউরি জ্ঞান হারান। তারপর থেকেই ইউরি নানা-রকম অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। ওই অদ্ভুত মূর্তি না কি অন্য কোন মহাকাশের অধিবাসী।

ইউরি গেলার তাঁর নিজের আত্মজীবনী 'মাই স্টোরি'-তে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা পাওয়ার যে গল্প বলেছেন, তা কিন্তু পুহারিকের গল্পের সঙ্গে মেলে না। 'মাই স্টোরি'-তে আছে ওর সামনে এসে হাজির হয়েছিল বাটির মতো একটি বস্তু। তারই আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল, সেই সঙ্গে অনুভব করেছিলেন একটা ধাক্কা। ইউরিও অবশ্য বলেছেন, তার এই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা পেয়েছেন অন্য গ্রহবাসীর কাছ থেকে।

ডক্টর অ্যানড্রিজা পুহারিকের সঙ্গে ইউরির প্রথম সাক্ষাৎ ১৯৭১-এ এক নাচগানের আসরে। নানা ধরনের নাচগানের পর ছিল ইউরির ম্যাজিক। ইউরি তখন পঁচিশ বছরের ঝক্‌ঝকে তরুণ। ইউরির কথা-বার্তা শো-ম্যানশিপে মুগ্ধ হলেন পুহারিক। তারপরই ঘটে গেল ইউরি গেলার ও কোটিপতি বিজ্ঞানী অ্যানড্রিজা পুহারিকের মণি-কাঞ্চন যোগ। পুহারিকের অর্থ, প্রচার ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইউরিকে রাতারাতি প্রতিষ্ঠিত করল অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাবান হিসেবে।

অধ্যায় : পনের

কিছু ভারতীয় আধ্যাত্মবাদীদের অলৌকিক ক্ষমতা

যোগ-সমাধিতে নাড়ি বন্ধ

আমরা শৈশব থেকেই শুনে আসছি, আমাদের দেশের মুনি-ঋষিরা যোগ সাধনার দ্বারা সমাধিতে যেতেন। নির্বিকল্প সমাধি তাঁদের অধিগত ছিল। নির্বিকল্প সমাধিতে নাড়ির গতি স্তব্ধ হয়ে যেত। অর্থাৎ, দেহ থাকতো, কিন্তু দেহে প্রাণ থাকতো না। এই অবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন ঘটে বলে হিন্দু উপাসনা ধর্মগ্রন্থে বলা আছে। দেহের বাইরে বেরিয়ে আত্মা যে শুধু পরমাত্মাতেই মিলিত হতো, তেমনটি নয়। নিজের দেহের ভিতরে প্রবেশ করে দেখেছেন, 'ষঠচক্র' বা ছটি চক্রকে। এই ছটি চক্র রয়েছে গুহ্যে, লিঙ্গমূলে, নাভিতে, হৃদয়ে, কণ্ঠে ও দুই ভ্রূর মাঝখানে। মস্তিষ্কে আছে সহস্র পাপড়ির-পদ্ম-কুঁড়ি। কুঁড়ির ওপর ফণা মেলে রয়েছে একটি সাপ; যার লেজ গেছে গুহ্য পর্যন্ত। এই পদ্মের বীজে আছেন ব্রহ্মস্বরূপ শিব। এ'সব-ই আমরা জেনেছি সেইসব মহান যোগীদের কাছ থেকে, যাঁরা যোগ বলে নিজেদের নাড়ির স্পন্দন বন্ধ করতে পারতেন। তারপর মুক্ত আত্মা যেখানে খুশি যেতে পারতেন। ব্রহ্মলোক থেকে গ্রহ-নক্ষত্র সর্বত্র বিচরণ করতেন।

আজকাল দু-পাতা বিজ্ঞান পড়ে কেউ কেউ মুনি-ঋষি-যোগীদের যোগ ক্ষমতাকেও অস্বীকার করতে চান।

গত শতকের সাতের দশকে মহর্ষি মহেশ যোগী ভারতীয় যোগকে আবার বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করেন। পাশ্চাত্যের শিক্ষিত হাজার হাজার মানুষ তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি যোগ বলে নিজের নাড়ির স্পন্দন বন্ধ করে বিশ্বকে চমকে দিয়েছিলেন। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন মুনি-ঋষিদের যোগশক্তি আদৌ গল্প-কথা ছিল না।

ওপরের এই কথাগুলো আমরা বলি 'অলৌকিক নয়, লৌকিক অনুষ্ঠানে'। তারপর বলি :—

"আপনাদের সামনে এবার হাজির করছি মহর্ষি মহেশ যোগীর শিষ্য

যোগীরাজ...কে। তিনি আপনাদের সামনে একইভাবে নাড়ি বন্ধ করে দেখাবেন। আপনাদের কাছে অনুরোধ, একদম চুপ করে থাকুন, যাতে উনি মনঃসংযোগ করে যোগ সমাধিতে যেতে পারেন।

"একটিও কথা নয়। আপনারা নিজের চোখে দেখুন এই মহান ঘটনা। আপনাদেরও শেখাবো, কী করে নাড়ির স্পন্দন বন্ধ করবেন।

"আপনাদের মধ্যে কোনও ডাক্তার থাকলে উঠে আসুন মঞ্চে। অথবা এমন কেউ উঠে আসুন, যিনি নাড়ি দেখতে পারেন। নাড়ি দেখা খুব সোজা। বুড়ো আঙুলের তলায় কব্জির উপর তর্জনি আর মধ্যমা আঙুল দুটি হালকা করে চেপে ধরুন। আঙুল দুটিতে নাড়ির স্পন্দন অনুভব করতে পারবেন। মিনিটে যতবার হার্ট ধক্-ধক্ করবে, ততবারই নাড়িও একই ছন্দে ধক্-ধক্ করবে। আগেকার দিনের ডাক্তার বা কবিরাজরা আগেই রোগীর নাড়ি টিপতেন। নাড়ির গতি মিনিটে তিরিশ বা তার নীচে হলে বলতেন—আমার আর কিছু করার নেই। ভগবানকে ডাকুন।

"হ্যাঁ দেখুন। নাড়ি চলছে তো? মিনিটে ষাটের বেশি গতিতে চলছে তো? বাঃ, বহুত খুব। এবার নাড়ি থেকে আঙুল সরান। হ্যাঁ ঠিক আছে। পাশে-ই দাঁড়ান।

"এ'বার আপনার সব্বাই যোগীরাজের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। একদম চু-প্।

"দেখুন আস্তে আস্তে যোগীরাজ চেয়ারে বসেই যোগ-সমাধিতে চলে যাচ্ছেন। যোগীরাজ চোখ বুজে, গভীর সমাধিতে চলে যাচ্ছেন।

"চার মিনিট হয়ে গেছে। দেখি, এখন নাড়ির গতি কেমন? বন্ধ হয়ে গেছে। নাড়ির স্পন্দন পাচ্ছি না। আপনি এগিয়ে আসুন তো। আগে তো দেখেছিলেন পালস্ বিট্ নরমাল। এ'বার দেখুন তো?

"কী বলছেন? নেই? কর্ডলেসটা আপনার কাছে ধরছি। পাবলিককে বলুন যা দেখলেন।

"বাঃ সুন্দর। আবার আপনাকে একটু কষ্ট দেবো। আবার একটু সরে আসুন। যোগীরাজের পাশে চুপটি করে দাঁড়ান। হ্যাঁ, একদম ঠিকঠাক।

"যোগীরাজ, আবার আপনি সমাধি ভেঙে স্বাভাবিক হয়ে আমাদের মধ্যে চলে আসুন। প্লিজ, একটুও গোলমাল নয়। আপনার একটু অসহযোগিতার জন্য যোগীরাজ নির্বিকল্প সমাধি থেকে ফিরতে না পারার মানে জানেন? মৃত্যু। হ্যাঁ, মৃত্যু।

"হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি, নাড়ি ধীরে-ধীরে চলতে শুরু করেছে। এবার আর একবার কষ্ট করে পরীক্ষা করুন। দেখুন। কি, নাড়ির স্পন্দন অনুভব করতে পারছেন? উনি পারছেন। ওঁর কাছ থেকেই আপনারা বরং শুনুন।"

হ্যাঁ, মোটামুটি এ'ভাবেই বলি আমাদের সমিতির অনুষ্ঠানে পালস্ বিট্ বন্ধ করে দেখাবার সময়।

কীভাবে বন্ধ করি? দুটি মাঝারি আলু অথবা দুটি রুমাল শক্ত করে পুঁটলি

করে দু'বগলের তলায় রাখুন। এবার হাত দুটো বুকের পাশে চেপে রাখুন। এই চাপে বগলের তলার অ্যাক্সিলারি ধমনীতে চাপ পড়বে। বাহুতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। কব্জির রেডিয়াল ধমনীতে রক্ত চলাচল স্বভাবতই বন্ধ হবে। অর্থাৎ নাড়ির স্পন্দন বন্ধ হবে।

এই হলো যোগ সমাধিতে নাড়ি বন্ধ করার মোদ্দা কৌশল।

স্বাস্থ্যবান কোনও মানুষ বগলের পেশি ফুলিয়ে হাত দুটি চেপে অ্যাক্সিলারি ধমনীর রক্ত চলাচল বন্ধ করতে পারেন।

দুটি ক্ষেত্রেই দীর্ঘ সময়ের জন্য নাড়ি বন্ধ রাখা সম্ভব নয়। দু'হাতের রক্ত চলাচল দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ রাখলে তা হাতের বিপদ ঘটাবে।

বালক ব্রহ্মচারীর মৃত্যুর পর 'নির্বিকল্প সমাধি'র বুজরুকি ফাঁস করতে সুখচর আশ্রমে যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা নাড়ি বন্ধ করে দেখাচ্ছেন ০৫.০৬.১৯৯৩

যুক্তিবাদী আন্দোলনের শুরুতে নাড়ির গতি স্তব্ধ করে দেখাতাম আমি। আজ দেখান আমাদের সমিতির কয়েক'শ সদস্য-সদস্যা। দেখান আরও অনেক বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মী। শুরু থেকে লক্ষ্য করেছি, আমি যখন নাড়ি বন্ধ করতাম, তখন সাধারণ মানুষরা তেমন অবাক হতেন না। অবাক হতেন বড় বড় চিকিৎসকরা। কারণ সাধারণ মানুষরা ভাবেন যোগ যাঁরা জানেন, তারা নাড়ি বন্ধ করতে-ই পারেন। এর মধ্যে অবাক হওয়ার মতো কিছু নেই। নতুন কিছুও নয়।

চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীদের কাছে যখন দেখিয়েছি, তখন তাঁদের বিস্ময়ের ঘোর লেগে যেত। কারণ, নাড়ির স্পন্দন বন্ধ করে একজন মানুষের স্বাভাবিক ভাবে

SCIENCE AND RATIONALISTS' ASSOCIATION OF INDIA.

(BHARATIYA BIGYAN O YUKTIBADI SAMITI)

Central office : 72/8, DEBINIBAS ROAD, CALCUTTA-700 074. INDIA. PHONE : 57-0101

Maidan Tent : Opp. SOUTH GATE, EDEN GARDENS, CALCUTTA-700 021. PHONE : 28-0102

ADVISERS :
Dr. Abirlal Mukherjee
Dr. Amit Chakraborty
Dr. Anadinath Dawn
Dr. Arun Kr. Sil
Dr. Binayak Dutta Roy
Dr. Dhirendranath Ganguly
Dr. Dilip Bose
Dr. Dipak Chanda
Jugalkanti Roy
Dr. Jyotirmoy Dutta
Mohiuddin Ahmed
Narayan Chowdhury
Pathik Guha
Dr. Santosh Sarkar
Dr. Sunil Kr. Lahiri
Sankar Chakraborty
Tridib Kr. Chatterjee
PRESIDENT :
Dr. Bishnu Mukherjee
VICE-PRESIDENT :
Dr. Aparajita Bose
Mihir Sengupta
Dr. Shyamal Roy Chowdhury
SECRETARY :
Prabir Ghosh
JOINT SECRETARY :
Manish Maitra
Dr. Samit Ghosh
ASST. SECRETARY :
Chandan Bhattacharjee
Salil Biswas
TREASURER :
Asish Bhattacharya
CONVENER
LEGAL CELL :
Pulak Sen
PUBLIC RELATION :
Kalyan Chakraborty
CULTURAL :
Kuntal Mukherjee
INFORMATION
Raghunath Mukherjee
STUDY CIRCLE :
Manoj Ghosh
WORKSHOP :
Tanmay Adhikary

আমি, চিত্তরঞ্জন দেবনাথ ওরফে [illegible]
[illegible] 3/1A, Kalighat Rd, cal-25
হাল, [illegible] কেয়ার, 15 [illegible] St,
cal-9, গত ২/২/৮৯ ভারতীয়
বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক
প্রবীর ঘোষের কাছে এই চ্যালেঞ্জ
দিয়ে জানিয়েছিলাম যে, আমি ২৪
ঘন্টা বিনা অক্সিজেনে থাকব। চ্যালেঞ্জে
৫ হাজার টাকা জমা দেব, প্রবীর-
বাবুকে জানিয়েছিলাম উনি দেবেন
৫০ হাজার টাকা। চ্যালেঞ্জার [illegible] দেন।
প্রবীরবাবু চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন।
প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রবীরবাবুর কাছে
আমি। নির্দিষ্ট বেশী ক্ষণ ধরে
বিনা অক্সিজেনে থাকতে পারিনি।
এই টাকার পরিমাণ প্রবীর বাবুর
কাছে ঠিক হার মেনেছি, প্রবীর
বাবুকে কথা দিচ্ছি আর কোনদিন
ঐ বিষয়ে প্রতারণা করব না

চিত্তরঞ্জন দেব

বেঁচে থাকা মানুষের শারীরবৃত্তিতে অসম্ভব ব্যাপার। যখন কৌশলে নাড়ির স্পন্দন বন্ধ করেছি তখন তা দেখে ভয়ংকর রকম অবাক হয়েছেন ডাঃ আবিরলাল মুখার্জি, ডাঃ প্রসেনজিৎ কোনার, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল প্রমুখ বহু বিশিষ্ট চিকিৎসক।

সাধারণ মানুষদের মধ্যে একটা ধাক্কা দিতে-ই একসময় থেকে নাড়ি বন্ধ করার আগে মুনি-ঋষিদের যোগে নাড়ি বন্ধের গল্প বলা শুরু করি। দেখলাম, মানুষ হতবাক হয়ে দেখেছে নাড়ি বন্ধের ঘটনা।

আমরা একদিকে অলৌকিকত্বের বিরুদ্ধে প্রচার করেছি, আর একদিকে মুনি-ঋষিদের যোগ বিষয়ে 'মিথ' ভেঙেছি।

জলের তলায় বারো ঘণ্টা

১৯৮৩ সালের ২৪জুন 'সত্যযুগ' পত্রিকা এবং ২৫ জুন 'যুগান্তর' পত্রিকা একটা দারুণ চাঞ্চল্যকর খবর ছাপল—জলের তলায় বারো ঘণ্টা। খবরের বিবরণে জানা গেল কৃষ্ণনগর ষষ্ঠীতলার ২১ বছরের তরুণ প্রদীপ রায় কোনও যান্ত্রিক সাহায্য ছাড়া জলের তলায় একনাগাড়ে বারো ঘণ্টা থাকতে পারে। অবশ্যই একটা বিশ্ব রেকর্ড, কারণ জলের তলায় থাকার আগেকার বিশ্ব রেকর্ড ক্যালিফোর্নিয়ার রবার্ট ফস্টারের। তিনি কোনও কিছু যান্ত্রিক সাহায্য ছাড়া ১৩ মিনিট ১৫ সেকেণ্ডের মতো জলের তলায় ছিলেন।

প্রদীপ রায় জানিয়েছিলেন—বছর সাতেক আগে আগরতলায় দাদার কাছে থাকার সময় জলে ঝাঁপাতে গিয়ে বুকে আঘাত পান। তারপর থেকেই তাঁর এই অলৌকিক ক্ষমতা এসে গেছে। মাছের মতোই জলের তলায় থাকতে আর অসুবিধে হয় না।

প্রদীপ রায় পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে দেখালেন নিজের অলৌকিক ক্ষমতার সপক্ষে একগাদা সার্টিফিকেট। এগুলো নাকি দিয়েছেন পশ্চিম দিনাজপুরের জেলাশাসক, কাটোয়ার মহকুমা শাসক এবং আরও অনেক হোমরা-চোমরা।

সমস্ত ঘটনা শুনে এবং নথিপত্র দেখে সুভাষ চক্রবর্তী ঠিক করলেন প্রদীপ রায়ের অলৌকিক ক্ষমতার পরীক্ষা নেবেন। পরীক্ষার দিন ঠিক হলো ১৬ জুলাই। ১৬ জুলাই সরকারি পরীক্ষকদের চোখকে যাতে প্রদীপবাবু ফাঁকি না দিতে পারেন, তার জন্যে এই পরীক্ষা ব্যবস্থাকে সহযোগিতা করার জন্য বেসরকারিভাবে নিজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমি প্রস্তুত হই। আমাকে সহযোগিতার করার জন্যে আমার দুই বন্ধুকেও তৈরি রাখি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রদীপ রায় ১৬ জুলাই-এর পরীক্ষায় হাজির হননি। পরিবর্তে ১৫ জুলাই প্রদীপবাবুর পক্ষ থেকে জানানো হয় ১৬ জুলাই প্রদীপ রায়ের জন্মদিন, অতএব সেই দিনের পরীক্ষায় হাজির হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

জানি না পরবর্তীকালে 'সত্যযুগ ও 'যুগান্তর'-এ প্রকাশিত খবরটি নিজের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অকাট্য প্রমাণ হিসেবে কত জায়গায় হাজির করেছিলেন প্রদীপ রায়।

জলপরী (পুং) রূপরাজ

১৯৮৯-এর ফেব্রুয়ারি। শীত-শীত সন্ধ্যা। কয়েকজন তরুণ বন্ধুর সঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় কথায় ব্যস্ত হলাম। কলিংবেল বাজল। সমিতির এক সদস্য উঠে গেলেন। এসে জানালেন, "আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে চাইছেন। খবু নাকি জরুরী প্রয়োজন।" বললাম, 'দেখছই তো প্রচণ্ড ব্যস্ত আছি। রবিবার সকাল ১০ টায় আসতে বলো।" সদস্যটি কথা বলে আবার ফিরে এলেন, 'বলছেন, এর আগেও একদিন এসেছিলেন। আপনার দেখা পাননি। খুবই প্রয়োজন। দু-চার মিনিটের বেশি সময় নেবেন না জানালেন।" নিয়ে আসতে বললাম।

আগন্তুক ঘরে ঢুকলে তাঁর দিকে একঝলক তাকালাম। মাঝারি উচ্চতার স্বাস্থ্যবান যুবক। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। মুখে স্বল্প দাড়ি-গোঁফ। পরনে চকোলেট রঙের ট্রাউজার, হালকা রঙের হাফ হাতার বুশ সার্ট ও চটি। শিশুর সারল্যে আমাকে জানালেন, আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চান। তবে একটি শর্ত আছে। আমাকে ৫০ হাজার টাকার পরিমাণটা বাড়াতে হবে।

বিস্মিত হলাম। বাড়াতে হবে মানে? ইচ্ছে করলেই টাকার পুঁজি বাড়ানো যায় না কি? অথবা আমাকে কি দস্তুরমতো আমির ঠাউরেছেন?

বললাম, "দেখুন ভাই, অনেক কষ্টে ৫০ হাজার টাকা জমিয়েছি। আপনি চাইলেই বাড়াই কী করে বলুন?

আমার উত্তরটা যে তরুণটির কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি তা তরুণটির পরবর্তী কথায় বুঝতে অসুবিধে হলো না।

বললাম, "দেখুন, আপনার নামটাই জানা হল না। আপনার কি ক্ষমতা দেখাবেন, তাও বললেন না। শুধু টাকার পরিমাণ বাড়াতে অনুরোধ করছেন। জানেনতো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হলে আপনাকেও জমা রাখতে হবে পাঁচ হাজার টাকা?"

ছড়িয়ে হাসলেন। "অবশ্যই জানি। আপনি রাজি হলে আগামী রবিবার ৫ ফেব্রুয়ারিই আমার তরফের মানতের টাকা পেয়ে যাবেন। কিন্তু আপনার তরফে টাকাটা বাড়াতে হবে। আমি যা দেখাব, তা সাঁইবাবার বিভূতি বা সোনার টাকা করার মতো বুজরুকি নয়, ডাইনি ঈপ্সিতার মত মিথ্যে প্রচারের ঢাক পেটানো নয় বা পারমিতা, শকুন্তলাদেবী, অসিত চক্রবর্তী, নরেন্দ্র মাহাতোর মতো জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলে প্রমাণ করার আহাম্মুকি নয়। আমি জানি এঁরা প্রত্যেকেই আপনার কাছে পরাজিত বা পলাতক। এঁরা প্রত্যেকেই প্রচারের ফানুস, তাই প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রমাণ রাখতে পারেননি, ফেঁসে গেছেন। প্রচারের আড়ালে

বিজ্ঞানের বাইরেও অলৌকিক বলে যে কিছু আছে, সেটা আপনার মত একজন যুক্তিবাদীকে অন্তত একবারের জন্য দেখানো প্রয়োজন বলে মনে করি। অনুভব করেছি, এখন আপনাকে থামানো প্রয়োজন, আপনাকে বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।"

তরুণটির কাব্যময় কথাগুলো আমাকে শুধুমাত্র ক্লান্তই করছিল। বললাম, "দু-চার মিনিট কিন্তু আমরা অনেকক্ষণ আগেই পার হয়ে এসেছি। আপনার অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ রাখতে আপনি ঠিক কি দেখাবেন যদি দয়া করে সে কথায় আসেন তো বাধিত হই।"

"আমি বিনা অক্সিজেনে থাকতে পারি।"

"এ আর নতুন কী? আজকাল অলৌকিক বিরোধী বিভিন্ন প্রদর্শনীতে বহু ছেলে-মেয়েই কবরের তলায় দু-চার ঘণ্টা কাটিয়ে বহাল তবিয়তে বেরিয়ে আসছেন। কবরের ভেতরের অক্সিজেনে যতক্ষণ থাকা সম্ভব ততক্ষণ অথবা বাইরে থেকে গোপনে অক্সিজেনের সবরবরাহ চালু রেখে বহুক্ষণ থাকা সম্ভব। কিন্তু সে সবই কৌশলের ব্যাপার। আপনিও কি ওই ধরনের কিছু করে থাকেন? তাই যদি হয়, তবে আর জমানতের টাকা খোয়াবেন কেন? আমারও সময় নষ্ট করাবেন কেন?"

তরুণটি এ-বার উত্তেজিত হলেন। 'আপনি পুরো ব্যাপারটাকেই হালকাভাবে নিতে চাইছেন। আমি কোনও বুজরুক বা প্রতারক নই। বিনা অক্সিজেন চব্বিশ ঘণ্টা আপনার সামনে থেকে দেখাব।'

জিজ্ঞেস করলাম, "আগে কখনও দেখিয়েছেন?"

"অবশ্যই এবং জেলাশাসক, এম. এল, এ. অধ্যাপক থেকে শুরু করে বহু বিদগ্ধ মানুষই আমার এই অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেছেন।"

"তাঁদের সামনে আপনি পরীক্ষা দিলেন কেমন করে?" আমি তখন রীতিমতো বিস্মিত।

"জলের তলায় ডুবে থাকলে তো একজন মানুষের পক্ষে কৌশল ছাড়া দশ-বারো ঘণ্টা থাকা সম্ভব হয়, আমি সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে দেখিয়েছি।"

তরুণের কথায় একটা কাজ হলো। বললাম, "বেশ, আমি আপনার অনুরোধ মত আমার দেয় টাকার পরিমাণ সাধ্যমতো বাড়াবার চেষ্টা করব। আপনি আপনার আইনজ্ঞ ও জমানতের টাকা নিয়ে আগামী রবিবার আসুন। আবার একটা কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। আমি আমাদের সমিতি আইনজ্ঞের উপদেশ মতো আপনাকে দিয়ে লিখিয়ে নেব, অলৌকিক ক্ষমতার পরীক্ষা দিতে গিয়ে আপনি মারা পড়লে দায়ী নই। আমি আপনার সেইসব বিদগ্ধ দর্শক নই। একটু মোটা মাথার মানুষ। প্যাঁচ-ঘোঁচ তেমন বুঝি না, কাউকে কোনও প্যাঁচ কষতেও দিই না। তেমন কিছু প্যাঁচোয়া পরিকল্পনা থাকলে আপনি বেঘোরে মারা পড়বেন, এটা মনে রেখেই আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবো।"

"সে লিখে দেব। আর হ্যাঁ, আমার নাম জানতে চাইছেন না? রূপরাজ। রূপরাজ ঘোষ। ঠিক আছে আর আপনাকে বিরক্ত করব না। রবিবারই দেখা হবে।"

এই মুহূর্তে আমার মাথায় যে চিন্তাটা ঢুকল তা হলো, রূপরাজের অক্সিজেন গ্রহণের কৌশলটা কী হতে পারে? অক্সিজেন ছাড়া যোগের সাহায্যে বেঁচে থাকা গল্প-গাছাতেই সম্ভব, বাস্তবে নয়। অতএব?

রূপরাজকে অনুরোধ করলাম, "কিছু মনে না করলে আমাদের সামনে অক্সিজেন ছাড়া দশ মিনিট থেকে দেখাবেন?"

রূপরাজ জিজ্ঞেস করলেন, "পরীক্ষা করবেন কেমন করে?"

"কেন, স্রেফ আপনার নাক-মুখ টিপে রেখে।"

রূপরাজ সোফায় বসলেন। আমি ওর নাক-মুখ আমার হাতের তালু ও আঙুলের সাহায্যে চাপা দিলাম। দেওয়ালের ব্যাটারিচালিত ঘড়ির লাল সেকেণ্ডের কাঁটা ঘুরতে শুরু করল এক-দুই-দশ—কুড়ি...তিরিশ...পঞ্চাশ...ষাট...। না, আমার উৎকণ্ঠাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন রূপরাজ। দমবন্ধ ইঁদুরের মতো বারকয়েক হাঁস-ফাঁস করে এক ঝটকায় আমার হাত সরিয়ে দিলেন।

"সে কি রূপরাজবাবু; চব্বিশ ঘণ্টার কথা বলে মাত্র এক মিনিটেই মাত হয়ে গেলেন? এই ক্ষমতা নিয়ে আপনি আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে এসেছিলেন।"

রূপরাজ মুহূর্তের জন্য কিছুটা বিভ্রান্ত ছিলেন। সেটা কাটিয়ে উঠে বললেন, "ঠিক আছে আমি পারিনি হেরে গেছি, আপনার চ্যালেঞ্জ আর গ্রহণ করতে আসছি না, হলো তো?"

"হলো আর কোথায়? এই কথাগুলোই যে আপনাকে লিখে দিতে হবে ভাই। নতুবা আবার কোথায় গিয়ে যে আপনি প্রতারণা করবেন তার ঠিক কি?"

"ক্ষমা তো চেয়ে নিয়েছি। পরাজয় মেনে নিয়েছি। আবার কি, আপনার অনেক দামি সময়ের কিছুটা নষ্ট করলাম বলে দুঃখিত।" উঠে দাঁড়ালেন রূপরাজ। "দরজাটা খুলে দিন।"

"না লিখে দিলে তো আপনাকে ছাড়ছি না।"

ঘরের মধ্যে খাঁচা-বন্দী বাঘের মতো পায়চারি করতে করতে রূপরাজ বললেন, 'বেশ তো, ধরে রেখে দিন যতক্ষণ খুশি যতদিন খুশি।"

"আপনি আমার সহজ সরল শর্তে রাজি না হলে কিন্তু আখেরে আপনাকেই পস্তাতে হবে। আপনার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে প্রতারণার অভিযোগ আনতে বাধ্য হব।"

"অভিযোগ শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারবেন তো?" রূপরাজ-এর কথায় ব্যঙ্গের সুর।

অতি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, "তা পারব বই কি। আপনাদের মতো বিখ্যাতদের সঙ্গে সাক্ষাতের বিশেষ মুহূর্তগুলো ধরে রাখার জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়েছে। এই যে আপনি এলেন, কথা বললেন, এ-সবই ক্যামেরা ও টেপে বন্দি করে রেখেছি।"

"তাই না কি? বাঃ বাঃ, আপনার তো সব মর্ডান অটোমেটিক ব্যবস্থা দেখছি।" আমার কথাগুলোকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টার মধ্য দিয়ে রূপরাজ টেনশন মুক্ত হতে চাইলেন।

হাত বাড়ালাম। একটা সুইচ টিপতে যে কণ্ঠস্বর ঘরে ভেসে বেড়াতে লাগল সেটা রূপরাজের। সামান্য শব্দের কি শক্তি তা টের পেলাম। রূপরাজের চেহারা পালটে গেল। সোফায় ধপাস করে বসে পড়ে পায়ের তলার কার্পেটে পা ঘষতে ঘষতে পাগলের মতো মুঠো করে করে নিজের চুল টানতে লাগলেন। সেই সঙ্গে গোঙানো কান্না, "আমি ক্ষমা চাইছি। সত্যিই ভুল হয়ে গেছে।" তারপর হঠাৎ উঠে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে আমার পায়ের পাতা দুটি সবল দুটি হাতে ধরে নিজের মাথাটা বার-বার ঠুকতে লাগলেন। "আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি আপনাকে বুঝতে পারিনি। বুঝলে কখনও আসতাম না। আপনি দয়া করে আমার সম্বন্ধে কোনও পত্রিকায় কিছু লিখবেন না। লিখলে বরবাদ হয়ে যাবে। আমার এতদিনের সম্মান শেষ হয়ে যাবে। মুখ দেখাতে পারব না। কথা দিচ্ছি, আর কোনওদিন কোথাও বিনা অক্সিজেনে থাকার ঘটনা ঘটিয়ে দেখাব না।"

বললাম, "এই মুখের কথাগুলোই আপনাকে লিখে নিতে হবে। আপনাকে ক্ষমা করার কোনও প্রশ্নই আসে না। এর আগে বহুজনকে ঠকিয়েছেন, আমাকে ঠকাতেই এসেছিলেন। আপনার কৌশল আমি ধরতে না পারলে, আপনার কাছে আমি হেরে গেলে আপনি কি আমাকে কোনও দয়া দেখাতেন? কোনও প্রতারকই তা দেখায় না। আপনি আমাকে শুধু আর্থিক ও মানসিকভাবেই বিপর্যস্ত করতেন না, আমাদের দেশে সদ্য গড়ে উঠতে শুরু করা কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনকেও এক ধাক্কায় অনেকটা পিছিয়ে দিতেন।"

অনেক টাল-বাহানার পর রূপরাজ লিখে দিলেন একটি অঙ্গীকার পত্র। তাতে এও লিখলেন, "প্রবীরবাবুর কাছে আমি এক মিনিটের বেশি বিনা অক্সিজেনে থাকতে পারিনি। টাকার পরিবর্তে প্রবীরবাবুর পায়ে হাত দিয়ে মার্জনা চেয়েছি। প্রবীরবাবুকে কথা দিচ্ছি, আর কোনদিন এই ধরনের প্রতারণা করব না।"

সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করলেন বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক ও মুর্শিদাবাদ বিজ্ঞান পরিষদের সম্পাদক ডঃ মিহিরকুমার দত্ত ও সিঁথি অঞ্চলের জনৈক বিজ্ঞান কর্মী বিশ্বজিৎ ঘোষ।

রূপরাজকে বললাম, "চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে এসে হেরে গেলেন। তবু আপনার পাঁচ হাজার টাকা বেঁচে গেল। পরিবর্তে বিদায় নেবার আগে আমাদের একটু আনন্দ দিয়ে যান। তিনবার কান ধরে ওঠ-বস করুন।"

বিখ্যাত ব্যক্তির কান ধরে ওঠ-বস করার মত একটা রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হওয়ার লোভ সামলাতে না পেরে সীমা (স্ত্রী) ও পিনাকী গুটি গুটি পায়ে বসবার ঘরে হাজির হলো।

হ্যাঁ। শেষ পর্যন্ত তিনবার কান ধরে ওঠ-বস করার পরেই রূপরাজ ওরফে বিশ্বরূপ ওরফে প্রদীপ ঈপ্সিতা, শকুন্তলাদেবী, সাঁইবার, পারমিতা, পাগলাবাবাদের দলেই নাম লিখিয়ে বিদায় নিলেন। 'প্রবীর' বিজয় হলো না।

শরীর থেকে বিদ্যুৎ

১৯৮৫ সালের ২৫ মে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি 'অলৌকিক' খবর প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত পুরো খবরটাই আপনাদের আগ্রহ মেটাবার জন্য তুলে দিচ্ছি।

অলৌকিক

● *নয়াদিল্লি ২৪মে—জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র তাঁর শরীর থেকে বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণ করতে পারেন। "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিষয়ে গবেষণারত এই ছাত্রের নাম সত্যপ্রকাশ। তার শরীরে উৎপন্ন বিদ্যুৎ দিয়ে তিনি ৬০ থেকে ২০০ ওয়াটের ইলেকট্রিক বালব জ্বালাতে পারেন। অবশ্যই অতি মৃদু আলো। এমনকি মাথা দিয়েও ওই বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারেন তিনি। ২৮ বছরের সত্যপ্রকাশ তাঁর এই বিস্ময়কর ক্ষমতাটি লোকের সামনে দেখানোর আগে মিনিট দুই ঘরবন্দী থাকেন। প্রাণায়াম ধরনের ব্যায়াম করেন এবং ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তখনই তার ওই 'শক্তি সঞ্চয়' ঘটে। সত্যপ্রকাশ বলেছেন, বাতাস আর্দ্র না হলে এবং ঝোড়ো বাতাস না থাকলেই এই ক্ষমতা দেখাতে তাঁর সুবিধা হয়। ৪৮ ঘণ্টা অনশন করে থাকতে পারলে আরও ভালো। বছর দুয়েক আগে সত্যপ্রকাশ হঠাৎ একদিন এই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন। তিনি তখন হস্টেলে প্রাণায়াম ব্যায়াম করছিলেন। হঠাৎ বোধ করেন যে, তাঁর শরীর থেকে বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণ হচ্ছে। —পি. টি. আই*

পি. টি. আই-এর দেওয়া এবং আনন্দবাজারে প্রকাশিত খবরটা ওপর ভিত্তি করে আমি সত্যপ্রকাশকে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানায় চিঠি দিই ২৭.৫.১৯৮৫ তে। তাতে লিখেছিলাম—"*পত্রিকায় আপনার অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা আপনার শরীরে বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারেন এবং সেই তৈরির বিদ্যুৎ দিয়ে মৃদু আলো জ্বালাতেও সক্ষম। আমি একজন যুক্তিবাদী এবং আপনার অলৌকিক ক্ষমতার দাবির বিষয়ে অনুসন্ধানে আগ্রহী। আশা করি আমার এই সত্যানুসন্ধানে আপনি সহযোগিতা করবেন। আপনার সুবিধামতো একটা তারিখ দিলে আমি সেই তারিখে দিল্লি গিয়ে একটি নিরপেক্ষ স্থানে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আপনার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার পরীক্ষা নিতে পারি। অনুগ্রহ করে তারিখটা এমনভাবে ফেলবেন যাতে আপনার চিঠি পাওয়ার পর আমি একমাসের মতো হাতে সময় পাই।*

আমাদের পশ্চিমবাংলার শহর, শহরতলা ও গ্রামে-গঞ্জে বিভিন্ন পূজো উপলক্ষে বসা মেলাতে বিদ্যুৎ-কন্যার প্রদর্শনীয় হয়। একটি মেয়ের শরীরে বাল্ব ছুঁইয়ে আলো জ্বালানো হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপক বেশি পয়সা রোজগারের জন্য বিদ্যুৎ-কন্যাকে অলৌকিক ক্ষমতাধারী বলে প্রচার করলেও প্রতিটি ক্ষেত্রেই এঁরা বিজ্ঞান এবং বিদ্যুৎ-এর ধর্মকে কৌশল হিসেবে কাজে লাগিয়ে আলো জ্বালান। এই ধরনের বিদ্যুৎ তৈরিকে জাদু হিসেবে কৈশোরে দেখিয়েছি। তাই আপনাদের দাবির খবরটা পড়ে খবরের সত্যতা সম্বন্ধে আপনার কাছ থেকে জানতে একান্তভাবে আগ্রহী। আমার সন্দেহ হচ্ছে, আপনার গৃহীত একটা সাধারণ বৈদ্যুতিক কৌশলকে বোঝার ভুলে প্রচার মাধ্যমগুলো এইভাবে প্রচার করেছে। এই বিষয়ে প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়াকে আপনি একটি চিঠি দিয়ে ভুল ভাঙিয়ে দিলে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন একটি দেশের বহু লোকের মধ্যে গড়ে ওঠা আপনার সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণার অবসান হবে।

আপনি যদি সত্যিই এই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করেন, তবে সেইক্ষেত্রে আপনার দাবিকে আরো জোরাল করার জন্য আমাকে পরীক্ষা করতে দেওয়ার সুযোগ দিন।"

চিঠির উত্তর আজ পর্যন্ত পাইনি।

পত্রিকায় 'অলৌকিক' খবরটি প্রকাশিত হওয়ার পর আমাদের সমিতি বহু শত অনুষ্ঠানে শরীর থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করে দেখিয়েছে। নাটকীয়তা সৃষ্টি করিতে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যুৎ তৈরি করেছি কোনও দর্শকের শরীর থেকে। আমরাও কিন্তু বালব জ্বেলে থাকি সত্যপ্রকাশের মতোই গোপন ব্যাটারি সাহায্যে।

ভূ-সমাধি

১৯৭৩ সালে ভারতের একটি চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সংক্রান্ত পত্রিকায় ডাঃ কোঠারি, ডাঃ গুপ্ত প্রমুখ তিনজন ডাক্তারের একটি পরীক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে বলা হয়, একজন যোগীকে মাটির নীচে ছোট একটি আধারে ৮০ দিন রেখে দেওয়া হয়েছিল। যোগী সমাধিস্থ অবস্থায় ৮০ দিন শ্বাস না নিয়েও বেঁচে ছিলেন। সমাধিস্থ যোগীর হৃৎপিণ্ড কেমন কাজ করে দেখার জন্য ডাক্তাররা যোগীর হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে E.C.G যোগাযোগ ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয় দিনেই দেখা যায় E.C.G কাজ করবে না অথচ হৃৎপিণ্ড কাজ করে যাবে। চোখের আড়ালে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে শুধুমাত্র বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে অতীন্দ্রিয় বলা যায় কী?

এই একই পরীক্ষাকে বিজ্ঞানগ্রাহ্য করতে হলে যোগীকে আগা-গোড়া প্রতিটি তল কাচের তৈরি একটি ঘরে রাখতে হবে, যেখানে সকলে প্রতি মুহূর্তে যোগীকে দেখতে পাবে। কাঁচের ঘরে একটি মাত্র ছিদ্র থাকবে, যেটা দিয়ে ঘরকে বায়ুশূন্য

করা হবে। এই অবস্থায় E.C.G গ্রহণের ব্যবস্থা রাখলে যোগীর কোনও কৌশল গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।

কোনও অতীন্দ্রিয় পরীক্ষা গ্রহণের সময় প্রতিযোগিকে সম্ভাব্য সমস্ত কৌশল গ্রহণের সুযোগ থেকে দূরে রাখতে হবে। যেখানে সুযোগ গ্রহণের অবকাশ রয়েছে সেখানে পরীক্ষাটিকে কখনই যুক্তিগ্রাহ্য ও বিজ্ঞানগ্রাহ্য বলা যাবে না।

আমার কথায় আপনারা অনেকেই আপত্তি তুলতে পারেন। জানি, আপনাদের অনেকেই বলবেন—আপনি নিজের চোখে কোনও সন্ন্যাসী বা যোগীকে মাটির নীচে মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়ে শীর্ষাসনে থাকতে দেখেছেন। অনেক এও দেখেছেন, বড় গর্ত খুঁড়ে গর্তের ভেতর পদ্মাসনে বসে থাকেন যোগী বা সন্ন্যাসী। তারপর তার সারা শরীরটাকেই মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। এই অবস্থায় তাঁরা বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে দেন। হ্যাঁ, আপনারা যা দেখেছেন আমিও তা দেখেছি। ঘটনাটা দেখলে যেমন যোগের অলৌকিক ফল বলে মনে হয়, বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু আদৌ তা নয়। ভূ-সমাধির আগে সন্ন্যাসী বা যোগী মহারাজ তাঁর মাথাটা একটা পাতলা কাপড়ে ঢেকে নেন, যাতে চোখে মুখে বা নাকে মাটি ঢুকে না যায়। ভূ-সমাধির গর্তটা বেশ কিছুটা বড় করা হয় এবং ওপর থেকে আলগা মাটি ঢেলে শরীর বা মাথাটার ভূ-সমাধি ঘটানো হয়। আলগা মাটির ফাঁক দিয়ে অনায়াসেই বায়ু চলাচল করে এবং নাক পাতলা কাপড়ের ছাঁকনি ভেদ করে এই বায়ুর সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালিয়ে যায়। দীর্ঘ অধ্যবসায় ও অনুশীলনের ফলে শরীরে অক্সিজেনের প্রয়োজন কমিয়ে দেওয়া সম্ভব। এই অনুশীলনকেই সাধু-সন্ন্যাসী যোগীরা যোগের অলৌকিক শক্তি বলে প্রচার লেগে পড়েন।

কলকাতার রাজভবনের কাছে একটি যোগীকে দেখেছিলাম যে ভূ-সমাধির গর্তে বায়ু আসার জন্য একটি নলের ব্যবস্থা রেখেছিল। নলটা মাটির তলা দিয়ে গিয়েছিল দূরে বসে থাকা তারই কয়েকজন সঙ্গীর ঝোলায়। ভূ-সমাধির মাটি ভালো করে পিটিয়ে বন্ধ করা ছিল বলেই আমি বায়ু-নলের উপস্থিতি অনুমান করতে পারি। যোগীবাবার সহকারী যেখানে বসেছিল সেখানটা পরীক্ষা করতেই কৌশল বেরিয়ে পড়ে। উপস্থিত দর্শকদের প্রচণ্ড গালাগাল শুনতে শুনতে দু'জনেই দ্রুত তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালিয়ে যায়।

জাদু জগতের বিস্ময় জাদুকর হ্যারি হুডিনিকে (harry Houndini) একবার কফিনে পুরে ৬ ফুট মাটির নীচে পুঁতে রাখা হয়েছিল। ৬০ মিনিট পরে কফিনটি ওপরে তোলা হয় এবং দেখা যায় হুডিনি জীবিত।

১৯২৮ সালে এক ফরাসি সাংবাদিককে কফিনে পুরে জলের তলায় নামিয়ে দেওয়া হয়। ৮৫ মিনিট পরে কফিনটি তুলে দেখা যায় সাংবাদিকটি সম্পূর্ণ সুস্থ।

বিদেশী প্রচার মাধ্যমের সামনে ভূ-সমাধি করে দেখাচ্ছেন যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য

এই দুটি ক্ষেত্রেই কোনও অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দাবি তোলা হয়নি।

১৯৮৬-র জানুয়ারিতে এই বইটির প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতির বিভিন্ন শাখা ও সহযোগী সংস্থার উদ্যোগে হাজারের ওপর 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিরোনামের অনুষ্ঠানে ভূ-সমাধি করে দেখানো হয়েছে। বিজ্ঞানকর্মীরা মাটির নীচে থেকেছে ৩ ঘন্টা থেকে ৮ ঘন্টা পর্যন্ত নেহাতই খেলার মেজাজে, অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দাবিকে নস্যাৎ করে।

অধ্যায় : ষোলো

ভাববাদ বনাম যুক্তিবাদ বা বস্তুবাদ

দর্শনের ইতিহাসে মূল দ্বন্দ্ব ভাববাদ বা বিশ্বাসবাদ বনাম বস্তুবাদ বা যুক্তিবাদ। ভাববাদের সঙ্গে যুক্তিবাদের দ্বন্দ্বই অন্ধ-বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির লড়াই।

ভাববাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত বিশ্বাসবাদ, শাস্ত্র-বিশ্বাস, ধর্ম-বিশ্বাস, গুরু-বিশ্বাস, আধ্যাত্মবাদ। 'শাস্ত্র' বলতে শুধু বেদ-উপনিষদ নামে 'শ্রুতি' নয়, 'ধর্মশাস্ত্র' (প্রাচীন আইন গ্রন্থ) নামে 'স্মৃতি'ও। ভাববাদীদের কাছে শাস্ত্রবাক্যই প্রমাণ।

বস্তুবাদ বা যুক্তিবাদে এমন অন্ধ-বিশ্বাসের কোনও স্থান নেই। যুক্তিবাদ সিদ্ধান্তে পৌঁছোয় যুক্তির পথ ধরে, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পথ ধরে।

ভাববাদী মনুর বিধান হলো, বেদকে 'শ্রুতি' এবং 'ধর্মশাস্ত্রকে' স্মৃতি বলে মানবে। বেদ ও ধর্মশাস্ত্রই হলো হিন্দু ধর্মের মূল। এ-নিয়ে কোনও বিতর্ক করা চলবে না। কোনও তার্কিক দ্বিজ যদি তর্কবিদ্যার সাহায্য নিয়ে 'শ্রুতি ও স্মৃতি'র অবমাননা করে তাহলে সাধু ব্যক্তিরা তাকে সমাজ থেকে বের করে দেবে। বেদ-নিন্দুকেরা নাস্তিক। (২/১০-১৬)

'মনুর বিধান' যে বলা হলো, সেই মনু কে? হিন্দু ভাববাদীদের বিশ্বাস মনু কোনও রমণীর গর্ভজাত নন, ব্রহ্মা তাঁর দেহ থেকে তৈরি করলেন একটি নারী—নাম শতরূপা ও মনুকে শতরূপার সঙ্গে ব্যভিচারের ফলে মনুর জন্ম। পরে মনু তাঁর মাতা শতরূপাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। মনু ব্রহ্মার দেহ থেকে উদ্ভুত, এই হেতু তাঁর আর এক নাম 'স্বয়ম্ভূ' মনু। মনু'র স্ত্রী শতরূপা থেকে ছেলে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, কন্যা আকুতি, দেবহুতি ও প্রসূতির জন্ম। এঁদের ছেলে-মেয়েদের থেকেই না কি মানুষ বা মানবজাতির এই আদি মনু স্বয়ম্ভুর মনুর পর আরও ১৩ জন মনু সৃষ্টি করেন ব্রহ্মা। তাঁরা হলেন (১) স্বরোচিষ (২) উত্তম, (৩) তামস, (৪) রৈবতঃ, (৫) চক্ষুস, (৬) বৈবস্বত, (৭) সাবর্ণি, (৮) রোচ্য, (৯) ভৌত্যঃ (১০) মেরুসবর্ণি, (১১) ঋভু, (১২) ঋতুধামা ও (১৩) বিষ্ককসেন।

এই চোদ্দজন মনু-ই হিন্দু-ধর্মশাস্ত্র বা হিন্দু-ধর্মীয় আইনের সৃষ্টা। এই ধর্মীয় আইন 'মনু সংহিতা' রচনা করেন। 'মনু সংহিতা' বেদ পরবর্তীকালে রচিত এবং কয়েকশো বছর ধরে রচিত। আইনকর্তা মনুরা এমন শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিলেন। যার প্রধান শর্ত হলো 'অন্ধ শাস্ত্র-বিশ্বাস'। শ্রমিক ও শোষিতদের অভ্যুত্থান সম্ভাবনা রোধ করতে এবং তাদেরকে দাবিয়ে রাখতে মনু তৈরি করেছিলেন বিশেষ দর্শন—মতাদর্শগত শক্তি।

মনুও কিন্তু যুক্তিবাদীদের যুক্তিতর্কের আক্রমণের কথা ভেবে শঙ্কিত ছিলেন। যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ব্যাপকতা পেলে, সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা পেলে, প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ভিতই টলে যেতে পারে—যে সমাজব্যবস্থায় একদল শুধুই খাটবে আর একদল ভোগ করবে সেই খাটনির ফল।

মুক্তচিন্তার বিরোধী 'মনু সংহিতা'

সাধারণ মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে রামায়ণ মহাভারতের মতো মহাকাব্যেও ঢুকে পড়েছে অনেক কাহিনি, অনেক নীতিকথা। রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডের দিকে তাকান। রামচন্দ্র তখন চিত্রকূটে। ভরত এলেন। রামচন্দ্র ভরতকে রাজ্য-পরিচালন বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে একসময় বলেছেন,

ক্বচিন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।।

অর্থাৎ, "আশা করি তুমি লোকায়তিক (যুক্তিবাদী) ব্রাহ্মণদের সেবা করছ না। ওরা অনর্থ ঘটাতে খুবই পটু।"

মহাভারতের শান্তিপর্ব। এক ধনী বণিক রথে যাওয়ার সময় এক ব্রাহ্মণকে ধাক্কা মারে। ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ অপমান জ্বালা ভুলতে আত্মহত্যার কথা চিন্তা করে। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের আত্মহত্যার মধ্যে সর্বনাশের সংকেত দেখতে পেয়ে শেয়াল সেজে হাজির হলেন। ব্রাহ্মণকে পশুজীবনের বহু কষ্টের কথা বলে মানব জীবনের জয়গান গাইলেন। জানালেন, অনেক জন্মের পূণ্যের ফল সঞ্চয় করে এই মানবজন্ম পাওয়া। এমন মহার্ঘতম মানবজীবন, বিশেষত শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মলাভের পরেও কেউ কী পারে সে-জীবনকে ধ্বংস করতে? অভিমানে আত্মহত্যা করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। শেয়াল আরও জানালেন, নিজেও আগের জন্মে ব্রাহ্মণ হয়েই জন্মেছিলেন। কিন্তু সে-জন্মে চূড়ান্ত মুর্খের মতো এক মহাপাতকের কাজ করেছিলেন বলেই আজ এই শিয়াল-জন্ম।

চূড়ান্ত মূর্খের মতো মহাপাতকের কাজটা কী? এ-বারই বেরিয়ে এলো নীতিকথা—

অহমাসং পণ্ডিতকো হৈতুকো বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যাম্ অনুরক্তো নিরর্থিকাম্।।

হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সংসৎসু হেতুমৎ।
আক্রোষ্টা চ অভিবক্তা চ ব্রহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজান্।।
নাস্তিকঃ সর্বশঙ্কী চ মূর্খঃ পণ্ডিতমানিকঃ।
তস্য ইয়ং ফলনিবৃত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ।।

(শান্তিপর্ব ১৮০/৪৭-৪৯)

অর্থাৎ, আমি ছিলাম বেদ-সমালোচক যুক্তিবাদী পণ্ডিত। নিরর্থক তর্কবিদ্যায় ছিলাম অনুরক্ত। বিচারসভায় ছিলাম যুক্তিবাদের প্রবক্তা। যুক্তির সাহায্যে দ্বিজদের ব্রহ্মবিদ্যার বিরুদ্ধে আক্রোশ মেটাতাম। ছিলাম জিজ্ঞাসু মনের নাস্তিক, অর্থাৎ কি না পণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খ। হে ব্রাহ্মণ, তারই ফলস্বরূপ আমার এই শিয়ালজন্ম।

মুক্তমণের বিরোধী তর্কবিদ্যা কেন ভাববাদী দর্শনের গৌরব

অনেকের মতেই এই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, ভাববাদ যদি যুক্তিবাদের অর্থাৎ জিজ্ঞাসু মনের বিরোধীই হবে, তবে কেন তর্কবিদ্যা অর্থাৎ ন্যায়দর্শন ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে প্রধান গৌরব বলে স্বীকৃতি পেল? দেশের শাসকশ্রেণী বা আইনকর্তারা যদি যুক্তি-তর্কের এত তীব্র বিরোধীরই হবেন তবে তর্কবিদ্যা এতদূর এগোলে কি করে?

বিষয়টা পরিষ্কার না করলে বিভ্রান্তি থাকাই স্বাভাবিক। ভাববাদীরা যুক্তি-তর্কের লড়াইকে পরিষ্কার দুটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। (১) বেদ ও ধর্মশাস্ত্রের অভ্রান্ততায় পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখেও যেখানে যুক্তি-তর্কের কূট কচকচালি চালিয়ে যাওয়া যায়। (২) যুক্তি-তর্ক যেখানে প্রমাণ ছাড়া কোনও কিছুকেই অভ্রান্ত বলে মানতে নারাজ—এমনকি তা বেদ এবং ধর্মশাস্ত্র হলেও।

ধর্মশাস্ত্রকার তর্কশাস্ত্রকে প্রশংসা করেছেন। তবে সে তর্ককে এগোতে হবে অবশ্যই বেদের অভ্রান্ততাকে মেনে নিয়ে। বেদের প্রামাণ্যকে শিরোধার্য করে নানা জটিল প্রশ্ন তুলে তর্ক চালিয়ে গেলে সাধারণের মধ্যে বেদভক্তি ও ধর্মবিশ্বাস আরও প্রবল হবে—মনু যারা বেদের অভ্রান্ততাকে অস্বীকার করে, প্রমাণ ছাড় কিছু জানতে নারাজ—তাদের সমাজ থেকে বহিষ্কার করবে।

ভারতবর্ষে ভাববাদী দর্শনের প্রথম সুস্পষ্ট স্বাক্ষর দেখতে পাই আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে 'উপনিষদ্' সাহিত্যে।

চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন বা বস্তুবাদী দর্শনের সূচনা কবে হয়েছিল সঠিক বলা সম্ভব নয়। আনুমানিক অষ্টম শতকে রচিত বৌদ্ধ দার্শনিক কমল শীলের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'পঞ্জিকা'তে বস্তুবাদী চার্বাক দর্শনের উল্লেখ রয়েছে দেখতে পাই।

কমল শীলের গুরু শান্ত রক্ষিত নিজের মতে সমর্থনে 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামে একটি দর্শনগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচনায় দেখতে পাই বস্তুবাদী দর্শনটিকে তিনি 'চার্বাক' না বলে 'লোকায়ত' বলে বর্ণনা করেছিলেন।

শান্ত রক্ষিত থেকে শঙ্করাচার্য পর্যন্ত বেশ কয়েকজন বিখ্যাত ভাববাদী

দার্শনিকের রচনায় লোকায়ত বা চার্বাক নামের বস্তুবাদী দর্শনের উল্লেখ দেখতে পাই। সে-সময় ভারতীয় দর্শনের প্রথা অনুসারে পরমত খণ্ডন করে নিজের মত স্থাপন করা হতো। পরমত হিসেবেই এইসব ভাববাদী দার্শনিকেরা চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনের বিভিন্ন মতের উল্লেখ করেছেন। আর সেই উল্লেখ থেকেই আমরা চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনের বিভিন্ন মতের উল্লেখ করেছেন। আর সেই উল্লেখ থেকেই আমরা চার্বাক দর্শন বিষয়ে কিছু তথ্য জানতে পারি। চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন ছিল সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দর্শন যা ছড়া হিসেবে প্রচলিত ছিল মানুষের মুখে মুখে। অলিখিত এই ছড়াই লোকগাথার রূপ পেয়েছিল।

ভারতের ভাববাদ ও বস্তুবাদ দর্শনে ইতিহাস স্পষ্টতই এ-কথাই বলে—দুই দর্শনের মধ্যে বিতর্কটা প্রধানত 'আত্মা'কে নিয়ে।

আধ্যাত্মবাদ ও যুক্তিবাদের চোখে আত্মা

'আধ্যত্মবাদ' শব্দের অর্থ—'আত্মা সংক্রান্ত মতবাদ'। আধ্যত্মবাদী বা ভাববাদীরা বিশ্বাস করেন—আত্মা দেহাতিরিক্ত কিছু। আত্মা অমর। আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। আত্মা চিরকাল ছিল, আছে, থাকবে। আত্মার দেহ নেই। আত্মাকে আগুন পোড়াতে পারে না। তলোয়ার কাটতে পারে না। জল ভেজাতে পারে না।

যুক্তিবাদীরা মনে করেন—'আত্মা' দেহের-ই ধর্ম। তাই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও বিনাশ ঘটে।

যুক্তিবাদীরা এমনটা কোন যুক্তিতে মনে করেন? কারণ আধ্যত্মবাদীরা 'আত্মা'র সংজ্ঞা বলতে বলেছেন—চিন্তা, চেতনা, মন বা চৈতন্য-ই আত্মা। আধ্যত্মবাদীরা মনকে দেহাতিরিক্ত কিছু বলে মনে করেন।

'আত্মা অবিনশ্বর' এই ভুল বিশ্বাস থেকেই এসেছে পূর্বজন্মের কর্মফল, জাতিস্মর ও প্ল্যানচেট-এর কল্পনা।

'জাতিস্মর' তত্ত্বকে আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে পরামনোবিদ্যা বা parapasychology। পরামনোবিজ্ঞানীরা বরাবরই প্রমাণ করতে চেয়েছেন, কোনও কোনও মানুষ তার পূর্বজন্মের স্মৃতিকে উদ্ধার করতে সক্ষম। কিছু কিছু পরমনোবিজ্ঞানী আরও এক ধাপ এগিয়ে এসে বলেছেন—কোনও ব্যক্তিকে সম্মোহন করে তার পূর্বজন্মের স্মৃতি উদ্ধার করা সম্ভব।

জাতিস্মর নিয়ে আলোচনার আগে 'আত্মা' নিয়ে আলোচনা সেরে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। কারণ পরামনোবিদ্যা আত্মার পুনর্জন্ম থেকেই জাতিস্মরকে আমদানি করেছে। আর, আত্মা অবিনশ্বর এ ধারণা থেকেই এসেছে আত্মার পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদ।

প্রায় ধর্মেই আত্মার অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে।

বিভিন্ন ধর্মে আত্মার সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের বিশ্বাস রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মের ধারণার মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও প্রত্যেক ধর্মই কিন্তু আত্মা বিষয়ে তাদের ধারণাকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করে।

মানুষের মৃত্যুর পর বিদেহী আত্মার কী পরিণতি হয়, তা নিয়েও বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাস বিভিন্ন ধরনের।

হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীরা মনে করে 'আত্মা' ও 'প্রাণ' এক নয়। 'আত্মা' হলো 'মন'। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ শেষ হয়ে যায়। আত্মা বা মন শেষ হয় না। আত্মা 'অজ' অর্থাৎ জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত।

প্রাচীন আর্য বা হিন্দুরা একটি মাত্র স্বর্গে বিশ্বাসী ছিলেন। এই স্বর্গের নাম ছিল 'ব্রহ্মলোক' অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মার রাজ্য। প্রাচীন হিন্দুরা বিশ্বাস করতেন, মৃত্যুর পর আত্মা ব্রহ্মলোকে যায়। পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মে এলো কর্মফল। বলা হলো, যারা ইহলোকে ভাল কাজ করবে, তারা তাদের ভালো কর্মফল শেষ না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মলোকে থাকবে। তারপর আবার ফিরে এসে জন্ম নেবে পৃথিবীতে পূর্বজন্মের কর্মফল অনুসারে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, চন্দ্রলোকেই পিতৃপুরুষদের আত্মারা থাকে। চাঁদ থেকেই প্রাণের বীজ ঝরে পড়ে পৃথিবীর বুকে।

হিন্দুরা গোড়ার দিকে নরক বিশ্বাস করতেন না। পরে, ভয়ের দ্বারা গোষ্ঠীজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু নীতি মেনে চলতে বাধ্য করার জন্য সৃষ্টি হলো নরকের।

প্রাচীন যুগের শোষক ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ সমাজ অর্থাৎ শাসক ও পুরোহিত সম্প্রদায় শোষণ ও ঐশ্বর্যভোগের লালসায় জন্মান্তরবাদের সঙ্গে যুক্ত করল কর্মফলকে। কৃষক ও দাস সম্প্রদায়কে জন্মান্তর ও কর্মফলের আফিং খাইয়ে প্রতিবাদহীন করে রাখা হলো। প্রতিটি অত্যাচার, অন্যায় ও দারিদ্র্যতাকে আগের জন্মের কর্মফল হিসেবে একবার বিশ্বাস করাতে পারলে আর পায় কে?

বর্ণাশ্রম সৃষ্টি করে ধর্মের নামে বলা হলো, আপনি এই জন্মে সৎভাবে নিজস্ব কাজ করুন, মৃত্যুর পর এবং পরজন্মে এর ফল পাবেন। আপনি শূদ্র? আপনার নিজস্ব কাজ উচ্চ-সম্প্রদায়ের সেবা করা।

ভারতবর্ষে দাস প্রথা ছিল, কিন্তু কর্মফলের আফিং-এর নেশায় দাস বিদ্রোহ হয়নি।

ভারতের প্রাচীন আয়ুর্বেদে বলা আছে—মৃত্যুর পর মানুষ পঞ্চভূতে বিলীন হয়। মৃত্যুতেই সব শেষ। আয়ুর্বেদের এই মতকে

মানলে জন্মান্তর বাদকে অস্বীকার করতে হয়। উচ্চবর্ণের মানুষ বৈদ্যদের তাই অচ্ছুত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

বেদান্তের অনুগামীরা মনে করেন, কোনও আত্মাই অনন্তকাল ধরে বা চিরকালের জন্য স্বর্গে বা নরকে বাস করে না। একসময়ে তাদের স্বর্গ ও নরক ভোগের কাল ফুরোবে, তখন আবার জন্ম নিতে হবে পৃথিবীতে।

বেদান্তের মতে আত্মার জন্ম নেই, আত্মা শাশ্বত অমর। আত্মা তবে কোথা থেকে কীভাবে এলো? না, উত্তর নেই।

প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করতেন প্রত্যেক মানুষের ভেতরেই হাত, পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে আর একটা ছোট্ট মানুষ বাস করে। সেটিই হলো 'দ্বিতীয় সত্তা' বা আত্মা। তাঁরা এও মনে করতেন যে, শরীরের কোনও অঙ্গহানি হলে আত্মারও অঙ্গহানি হবে।

প্রাচীন যুগে পারসিকরা বিশ্বাস করতেন মৃত্যুর পর পুণ্যাত্মারা স্বর্গে গিয়ে স্বর্গদূত হয়। তাঁরা এও বিশ্বাস করতেন যে বিদেহী আত্মাদেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে।

খ্রিস্টধর্মালম্বীরা আত্মার অনন্ত জীবনে বিশ্বাসী। সৎ আত্মাকে অনন্তকাল বা চিরকালের জন্য ভোগ করে মুখ এবং অসৎ-আত্মা অনন্তকালের জন্য ভোগ করে দুঃখ। খ্রিস্টধর্মীয়রা বিশ্বাস করেন, যিশু আত্মাকে অমরত্ব দান করেছেন। যিশুর জন্মের আগে মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও মৃত্যু হতো।

মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন, যাঁরা আল্লার আদেশ মেনে চলেন তাঁদের আত্মা স্থান পায় 'বেহেস্ত'-বা স্বর্গে। যারা আল্লার আদেশ মান্য করেন না তাদের আত্মার স্থান হয় 'দোজখ'-এ বা নরকে। বেহেস্তে আছে গাছের ছায়া, বয়ে চলেছে টলটলে জলের নদী, দুধের নদী, মধুর নদী, সুরার নদী। স্বর্গের সুন্দরী হুরি বা পরির পুণ্যাত্মাদের পেয়ালা পূর্ণ করে দেয় সুরায়।

আমেরিকার নিগ্রোদের মধ্যে স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণা, সেখানে রয়েছে শিকার করার মতো দারুণ সুন্দর জায়গা। মৃত্যুর পর আত্মার মহানন্দে সেখানে শিকার করে।

ইহুদিরা বিশ্বাস করেন, জেহোবা থেকেই মানুষের আত্মা বা প্রাণবায়ু এসেছে, এবং মৃত্যুর পর এই প্রাণবায়ু ফিরে যায় জেহোবা'রই কাছে।

বৌদ্ধধর্ম প্রথমে আত্মার অস্তিত্ব ও পুনর্জন্মকে অস্বীকার করেছিলেন। বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ-দার্শনিকরা আত্মার নিত্যতাকে মেনে নেননি। পরবর্তীকালে জাতক কাহিনি পুনর্জন্মবাদকে নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তার কারণ ছিল বৌদ্ধধর্মের ওপর হিন্দুধর্মের প্রভাব।

আত্মা নিয়ে যত ধর্ম তত এমনকি এও দেখতে পাই একই ধর্মে বিভিন্ন সময়ে আত্মা ও স্বর্গ, নরক নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ধারণা

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা 'নিজেদের ধারণা-ই একমাত্র ঠিক' বলে আঁকড়ে ধরে বসে রয়েছেন। আত্মা নিয়ে নিজের ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মের ধারণা যে ভুল, তা প্রমাণ করতেও প্রত্যেকে যথেষ্ট সচেতন। আত্মা নিয়ে নানা ধর্মমতের নানা রকমের ধারণার ঠেলায় ও নিজেদের ধর্মের ধারণাটাই সত্য বলে জাহির করার গুঁতোগুঁতিতে পরামনোবিজ্ঞানীরা বেশ কিছুটা অস্বস্তিকর অবস্থায় রয়েছেন। কারণ, হিন্দু আধ্যাত্মিক ধর্মচেতনাকে পুঁজি করে পরাবিদ্যা বিদেহী আত্মাকে প্ল্যানচেটে নিয়ে আসার ভেল্কি দেখায়। সেইসঙ্গে ভেসে যায় পুনর্জন্মের গোটা তত্ত্বটাই।

আমাদের ভারতের পরামনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের নাম-ডাকই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি। ডঃ বন্দোপাধ্যায়ের কথায়, "বিজ্ঞান সাধনা ও আধ্যাত্মিক ধর্মচেতনার যে সহজাত সংঘাত ধারাবাহিক কাল থেকে চলে আসছে তারই যোগসূত্র বা মিলনের সেতুবন্ধ সন্ধানে পরামনোবিদ্যার বিভিন্ন গবেষণার উৎপত্তি। বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদের এই মৌলিক ব্যুৎপত্তিগত সংঘাতে ফলশ্রুতি হিসেবে কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তি ধর্মতত্ত্বের বিজ্ঞানগ্রাহ্য ব্যাখ্যার খোঁজে অনুশীলন করেছন।" (যুগান্তর ১০.৩.১৯৫৮)

ওই একই প্রবন্ধে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছেন, 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আধ্যাত্মিক শক্তি আছে কি নেই এই মূল প্রশ্নের ওপরই ধর্মের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল।"

ঈশ্বরবিদ্যা বা Theosophy বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন প্রকারের অন্ধবিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ধর্মের সঙ্গে অলৌকিক বিশ্বাস পুরোপুরি জড়িয়ে রয়েছে। ধর্মগ্রন্থগুলোর সত্য বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন।

ঈশ্বরবিদ্যা এক ধরনের সামাজিক চেতনা বা বিশ্বাস। এই চেতনা বা বিশ্বাসের স্রষ্টা মানুষ স্বয়ং। অর্থাৎ, সোজা কথায়—ঈশ্বর মানুষেরই সৃষ্টি। ঈশ্বর কোনও দিনই মানুষকে সৃষ্টি করেনি।

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মতত্ত্বের বিজ্ঞানগ্রাহ্য ব্যাখার খোঁজ কতখানি পেয়েছেন জানি না। তবে আজ পর্যন্ত তিনি যে-সব ব্যাখ্যা হাজির করেছেন তার কোনটিই বিজ্ঞানগ্রাহ্য হয়নি।

আত্মার বাস্তব অস্তিত্ব থাকলে তার উৎপত্তি, উপাদান, গঠন বা চেহারা এবং মৃত্যুর পর বিদেহী আত্মার কী হয় এই মূল বিষয়গুলো নিয়ে আত্মার বিশ্বাসী ধর্মগুরুরা নিশ্চয়ই একই মত পোষণ করতেন, আত্মার ব্যাখ্যায় ধর্মে-ধর্মে এমন 'বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ির' হাল হতো না। কার বিশ্বাস ছেড়ে আপনি কার বিশ্বাস মানবেন? শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো পরামনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য জাতিস্মর তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার তাগিদে হিন্দু ধর্মতত্ত্বকেই মেনে নেবেন, কারণ, প্রধান ধর্মগুলোর মধ্যে একমাত্র হিন্দুধর্মই পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। অতএব অন্য সব

ধর্ম-বিশ্বাসকে মিথ্যে বলে হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাসকেই অভ্রান্ত বলা ছাড়া পরামনোবিজ্ঞানীদের আর উপায় কী?

বিদেহী আত্মার পুনর্জন্ম নিয়ে ধর্মগুলোরে মধ্যে বিরোধ আরও বেশি। বিশ্বে প্রধান ধর্মমত হিন্দু মুসলিম ও খ্রিস্টান। হিন্দু ধর্ম আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। মুসলিম ধর্ম ও খ্রিস্ট ধর্ম আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে না। আর, প্রত্যেকটি ধর্ম তাদের বিশ্বাসকেই অভ্রান্ত বলে মনে করে।

হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে— যেমন দিন হয় রাত আসে, যেমন সুখ যায় ও দুঃখ আসে, তেমনি জন্ম হয় মৃত্যু আসে, আবার জন্ম হয় আবার আসে মৃত্যু। প্রতিটি মানুষের আত্মার ক্ষেত্রেই (তা সে যে ধর্মেই বিশ্বাসী হোক না কেন) এমনিভাবে অনন্তকাল ধরে চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে আত্মার জন্ম—মৃত্যুর খেলা।

মুসলিম ধর্মে বলা হয়েছে—মৃত্যুর পর আত্ম বেহেস্ত-এ (স্বর্গে) বা দোজখ-এ (নরকে) সুখ বা দুঃখ ভোগ করবে আল্লার শেষ বিচারের দিন (কেয়ামত) পর্যন্ত। সহস্র বছর ধরে যত মানুষ মারা গেছে, সব ধর্মের সব মানুষের বিদেহী আত্মারই পুনরুত্থান হবে শেষ বিচারের দিনটিতে। হিন্দুদের বিশ্বাস মতো আত্মার পুনরুজ্জীবনে বা আত্মার জন্ম—মৃত্যুর চক্রাকারে আবর্তনের মতবাদকে ইসলাম ধর্মের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি।

খ্রিস্টধর্মীয়রা বিশ্বাস করেন—বিশ্বের যে কোনও ধর্মের প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই মৃত্যুর পর বিদেহী আত্মা পাপ বা পুণ্য ফল হিসেবে ভোগ করে অনন্ত দুঃখ বা অনন্ত সুখ। এখানে অনন্ত মানে, সীমাহীন, যার শেষ নেই। খ্রিস্টধর্মও হিন্দুদের আত্মার পুনর্জন্মের তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে অবিশ্বাস করেছে। **প্রাচীনপন্থী গোঁড়া খ্রিস্টান মনে করেন, অমরত্ব ও নিত্যতা আত্মার স্বভাব ও ধর্ম নয়। তাঁরা মনে করেন, অমরতাকে লাভ করা যায় ভালো কাজ ও যিশুর প্রতি বিশ্বাসের পুরস্কার স্বরূপ। অর্থাৎ, মোদ্দা কথায় তাঁরা মনে করেন, বেশির ভাগ মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের আত্মারও মৃত্যু ঘটে।**

আত্মা, পরলোক ও জন্মান্তর বিষয়ে স্বামী অভেদানন্দ

আত্মা, পরলোক, প্ল্যানচেট, মিডিয়াম ও জন্মান্তর নিয়ে ভারতের জনপ্রিয়তম বইটি নিঃসন্দেহে স্বামী অভেদানন্দের **'Life beyond Death'** এবং এই বইটিরই বাংলা অনুবাদ **'মরণের পারে'**। জন্মান্তরে বিশ্বাসীদের কাছে অভেদানন্দের বই দুটি গীতা, বাইবেল ও কোরাণের মতোই অভ্রান্ত। 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' জাতীয় বহু সেমিনার অথবা আলোচনাচক্রে যোগ দিয়ে শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রশ্ন

পেয়েছি—(১) স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'মরণের পারে'-তে আত্মার অস্তিত্বের কথা বলেছেন, তাঁর বক্তব্য কী তবে মিথ্যে? (২) 'মরণের পারে'-তে আত্মার যে ছবিগুলো প্রকাশিত হয়েছে তা কী তবে মিথ্যে? (৩) স্বামী অভেদানন্দ তাঁর বইতে এক রকম যন্ত্রের কথা বলেছেন, যার সাহায্যে আত্মার ওজন নেওয়াও সম্ভব হয়েছে এরপরও কি বিজ্ঞান আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে? (৪) মৃত্যুর পর দেহ থেকে বেরিয়ে আসা কুয়াশার মতো আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন তাঁরা এই পদার্থটির নাম দিয়েছেন, 'এক্টোপ্লাজম' বা 'সূক্ষ্ম-বহিঃসত্তা'। বিজ্ঞান যেখানে আত্মার অস্তিত্বকে বা 'এক্টোপ্লাজম'কে স্বীকার করে নিচ্ছে, সেখানে আপনি আত্মার অস্তিত্বকে না মানার পিছনে কী যুক্তি দেবেন?

অহরহ এই ধরনের বহু প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং হচ্ছে আমাকে। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর বইতে ঠিক কী বলেছেন, তাঁর মতামত কতখানি বিজ্ঞানগ্রাহ্য, এবং 'বিজ্ঞান মেনে নিয়েছে' বলে স্বামী অভেদানন্দ যা দাবি করেছেন, তা কতখানি

সত্যি—এ বিষয়ে আলোকপাত করা খুবই প্রয়োজন, কারণ, (১) দীর্ঘ বছর ধরে বই দুটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। (২) লক্ষ লক্ষ পাঠক-পাঠিকা স্বামী

অভেদানন্দের ধারণাকেই সত্যি ও বিজ্ঞানগ্রাহ্য বলে মনে করে আসছেন।

আসুন, আমরা খোলা মনে যুক্তিবাদী মন নিয়ে দেখি 'মরণের পারে' বইটিতে আত্মার বিষয়ে কী কী বলা হয়েছে এবং সেগুলো কতটা যুক্তিসঙ্গত।

স্বামী অভেদানন্দের 'মরণের পারে' বইটির ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ হয়েছে, বৈশাখ ১৩৯২ বঙ্গাব্দে। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্ত মঠ। প্রথম পাতাতেই লেখা হয়েছে— **মরণের পারে (বৈজ্ঞানিক আলোচনা)**

বৈজ্ঞানিক আলোচনামূলক এই অমূল্য গ্রন্থটির ২৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—বিশেষ এক ধরনের সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যে যন্ত্রটির সাহায্যে মৃত্যুর পর দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়া বাষ্পতুল্য আত্মা বা মনকে ওজন করা সম্ভব। দেখা গেছে আত্মার "ওজন প্রায় অর্ধেক আউন্স বা এক আউন্সের তিনভাগ"।

আত্মার ওজন নেওয়ার যন্ত্র যদি আবিষ্কৃত হয়েই থাকে, তাহলে তো ল্যাঠাই চুকে যায়। এর পরেও আত্মার অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করে কোন বিজ্ঞানমনস্ক? কোন যুক্তিবাদী?

বিজ্ঞান কিন্তু এমন কোনও যন্ত্রের অস্তিত্বের কথা আজও জানে না। স্বামী অভেদানন্দও জানাননি যন্ত্রটির নাম। এই বিষয়ে পরামনোবিজ্ঞানীরাও রা কাড়েননি। অথচ বাস্তবিকই এমন জব্বর আবিষ্কারের খবর শোনার পর আমার অন্তত

জানতে ইচ্ছে করে আত্মা অর্থাৎ মনের ওজন মাপা সূক্ষ্ম যন্ত্রটির নাম, তার আবিষ্কারকের নাম, কত সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল, আবিষ্কারক কোন্ দেশের লোক ইত্যাদি বহু প্রশ্নের উত্তর। কিন্তু উত্তর কে দেবেন? কোনও পরামনোবিজ্ঞানী না, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ?

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ডাহা মিথ্যে ছেপে দিয়ে খালাস। তাদের উত্তর দেওয়ার দায় নেই। আমি ওদের চিঠি দিয়েও উত্তর পাইনি। আপনারাও চিঠি দিয়ে দেখতে পারেন—কোনও উত্তর আসবে না।

স্বামী অভেদানন্দের ধারণায় আত্মার রূপ বায়বীয় বা কুয়াশার মতো বাষ্পীয়। তিনি বলেছেন, "মরণের সময় দেহ থেকে যে একপ্রকার সূক্ষ্ম-বাষ্পীয় পদার্থ নির্গত হয়ে যায় তা জ্যোতিষ্মান। ঐ জ্যোতিষ্মান পদার্থটির ফোটোগ্রাফ বা ছবি তোলা হয়েছে এবং সূক্ষ্মদর্শীরা মরণের সময় দেহ থেকে ওটিকে বার হয়ে যেতেও দেখেছেন। তখন সারা দেহটি এক বিভাময় কুয়াশার পরিমণ্ডলে আচ্ছন্ন হয়।" (পৃঃ ২৮)

মরণের সময় প্রতিটি দেহ থেকেই যখন কুয়াশার মতো আত্মা বেরিয়ে এসে মৃতদেহটিকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তখন সকলেই কেন এই আত্মাকে দেখতে পায়

না? উত্তরে অবশ্য স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, সূক্ষ্মদর্শীরা দেখতে পান। অর্থাৎ আমরা সাধারণেরা সূক্ষ্মদর্শী নই, তাই দেখতে পাই না।

স্বামী অভেদানন্দ আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, "আত্মা যখন মরণের পর দেহ ছেড়ে যায় তখন তার ফোটোগ্রাফ বা আলোকচিত্র নেওয়া যায়।" (পৃষ্ঠা—২৮)

কুয়াশার মতো আত্মার ফোটোগ্রাফ কি সাধারণ ক্যামেরাতেই নেওয়া যায়? আর তা যদি না হয়, তবে অসাধারণ ক্যামেরাটার নাম কী? অবশ্য বইটা আগাগোড়া পড়ে এবং বইয়ের প্রকাশকাল দেখে আমার মনে হয়েছে তিনি খুব বেশি হলে তখনকার দিনের একটু ভালো ধরনের ক্যামেরার কথা বলেছেন। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার একটু ভালো ধরনের ক্যামেরার লেন্স এমন কিছু শক্তিশালী ছিল না। ফলে ক্যামেরার লেন্সে যে কুয়াশাময় আত্মা ধরা পড়ে, তা সাধারণের দৃষ্টি ধরা পড়ে না—এ একেবারে-ই অসম্ভব।

ক্যামেরায় আত্মার ছবি তোলার গপ্পো আড্ডায় বলা চলে কিন্তু বিজ্ঞানের দরবারে প্রমাণ হিসেবে হাজির করা যায় না। আর, এই সত্যটা পরামনোবিজ্ঞানীরা বেশ ভালোই বোঝেন।

কুয়াশাময় আত্মার কথা বলতে গিয়ে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, "একটি মেয়ের ঘটনা আমার মনে আছে—কয়েক বছর আগে লস্ এঞ্জেলস্-এ তার ভাই মারা যায়। এ'কথাটি আমি অবশ্য শুনেছি তার মার কাছ থেকে। ভাই যখন মারা যাচ্ছে মেয়েটি তখন মৃত্যুশয্যায় বসে। সে বলে উঠল তার মাকে, 'মা, মা দেখ—ভাইয়ের দেহটার চারদিকে কেমন একটি কুয়াশাময় জিনিস? কী ওটা?' মা কিন্তু তার কিছুই দেখতে পেল না।"

ছোট মেয়েটি কুয়াশার মতো যে জিনিসট দেখেছিল, সেটা যে আত্মা, তাই বা কী করে স্বামী অভেদানন্দ ধরে নিলেন? স্বামীজি এও বলেছেন, মৃতের মা কিন্তু ওই কুয়াশা দেখেনি। মেয়েটি সত্যিই যদি ওই ধরনের কিছু দেখে থাকে তবে তা visual hallucination (অলীক স্পর্শানুভূতি)। Illusion ও hallucination নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি বলে আবার দীর্ঘ আলোচনায় গেলাম না।

এর পরেও কেউ যদি বলেন, স্বামী অভেদানন্দের আত্মার দর্শন ও আত্মার স্পর্শ পাওয়ার ব্যাপারটা illusion বা hallucianation ছিল না, তবে আমাকে একান্ত বাধ্য হয়ে অপ্রিয় সত্যি কথাটাই উচ্চারণ করতে হবে— এই ধরনের ঘটনার পেছনে আর দুটি মাত্র কারণ থাকতে পারে; (১) কেউ স্বামীজিকে ঠকিয়ে কৌশলের সাহায্যে কুয়াশায় আত্মা দেখিয়েছে। (২) স্বামীজি আমাদের সঙ্গে বাজে রসিকতা করে গপ্পো লিখেছেন।

আত্মার কুয়াশাময় রূপের প্রমাণস্বরূপ স্বামী অভেদানন্দ এক্স-রে ছবির কথাও বলেছেন। তাঁর কথায়, "আমার দেহের কোন অংশ যদি বা রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে

পরীক্ষা করে দেখি, দেখব—হাতের বা দেহের অংশটি কুয়াশাময় পদার্থকণা পরিপূর্ণ, চারিদিকে যেন তার ঝুলছে। সুতরাং যে দেহকে আমরা জড় পদার্থ বলি আসলে সেটা জড় নয়, তা মেঘের বা কুয়াশার মতো এক পদার্থ বিশেষ।" (পৃষ্ঠা—৩২)

এখানেও কিন্তু স্বামী অভেদানন্দ বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মগুলোকে, না জেনেই অনেক কিছু লিখে ফেলে গোল পাকিয়েছেন। শরীরের হাড়, মাংস, পেশী ইত্যাদির ঘনত্বের বিভিন্নতার জন্য এক্স-রের ছবিতে সাদা-কালো রঙের গভীরতারও বিভিন্নতা দেখা যায়। আর, এই রঙের গভীরতার বিভিন্নতাকেই 'মেঘের মতো কুয়াশার মতো এক পদার্থ বিশেষ' বলে ভুল করেছেন স্বামীজি।

স্বামী অভেদানন্দের সুরে সুর মিলিয়ে ভারতের আত্মায় বিশ্বাসীরা আত্মাকে বায়বীয় বা কুয়াশার মতো কিছু ভাবলেই বিশ্বের অন্যান্য দেশের আত্মায় বিশ্বাসীরা কিন্তু আত্মাকে বায়বীয় বলে মেনে নিতে রাজি নয়। মালয়ের বহু মানুষের বিশ্বাস আত্মার রঙ রক্তের মতোই লাল, আয়তনে ভুট্টার দানার মতো। প্রশান্ত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অনেকের ধারণা আত্মা তরল। অস্ট্রেলিয়ার অনেকেই মনে করেন আত্মা থাকেন বুকের ভেতর হৃদয়ের গভীরে, আয়তনে। অবশ্যই খুব ছোট্ট। অনেক জাপানীর ধারণা—আত্মার রঙ কালো।

একবার ভাবুনতো, আত্মার চেহারাটা কেমন, তাই নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশবাসীর বিভিন্ন মত। অথচ স্বামী অভেদানন্দই এক জায়গায় বলেছেন, "আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সত্য কখনও দু'রকম বা বিচিত্র রকমের হয় না, সত্য চিরকালই এক ও অখণ্ড।" (পৃষ্ঠা—৩১)

তবে কেন আত্মার গঠন নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের সত্য বিভিন্ন ধরনের? কেন এক ও অখণ্ড নয়? বুঝতে অসুবিধে হয় না, এই বিশ্বাসগুলো যার যার ধর্মের নিজস্ব বিশ্বাস। এই সব বিশ্বাসের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই।

স্বামী অভেদানন্দ জানিয়েছেন—বিজ্ঞানীরা এই কুয়াশার মতো আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন, এবং ঐ "বস্তুটির নাম দিয়েছেন 'এক্টোপ্লাজম' বা সূক্ষ্ম -বহিঃসত্তা। একটি বাষ্পময় বস্তু এবং এর কোন একটি নির্দিষ্ট আকার নেই। একে দেখতে একখণ্ড ছোট মেঘের মতো, কিন্তু যে-কোন একটি মূর্তি বা আকার এ নিতে পারে না।" (পৃষ্ঠা—২৮-২৯)

দুটো কথা স্পষ্ট করে বলে নিই (১) বিজ্ঞান কুয়াশার মতো আত্মার অস্তিত্বকে আদৌ স্বীকার করেনি। (২) বিজ্ঞান এই অস্তিত্বহীন কুয়াশার মতো আত্মাকে 'এক্টোপ্লাজম' নামে অভিহিত করেনি।' 'এক্টোপ্লাজম' (Ectoplasm) বলতে

বিজ্ঞানীরা কোষ-এর (cell-এর) বাইরের দিকের অংশকে বোঝান। এমন করে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপিয়ে নিজের মতকে বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রচার করার অপচেষ্টাকে নিশ্চয়ই একে সৎ প্রচেষ্টাও বলা চলে না।

স্বামীজির কথামতো আত্মা যদি কুয়াশার মতো বাষ্পময় বস্তুই হয়, তবেতো খাদ্যে বিষক্রিয়ায় একই বাড়িতে বা একই পাড়ার অনেকে মারা গেলে চারিদিকে কুয়াশাময় হয়ে যাওয়া উচিত। কোনও ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টের পর সেখানে মৃত শরীরগুলো ঘিরে থাকা উচিত ঘন কুয়াশা, যা মানুষের চোখেও ধরা পড়বে। ধরা পড়বে ক্যামেরার লেন্সে। কিন্তু, হায়, বাস্তবে এর কোনটাই ঘটে না।

স্বামী অভেদানন্দ মত প্রকাশ করেছেন যে, এই কুয়াশার মতো বাষ্পময় আত্মাই আমাদের মন। তাঁর ভাষায়, "আত্মা বা মন মস্তিষ্কের বহির্ভূত পদার্থ, মস্তিষ্কজাত নয়।" (পৃষ্ঠা—৯৮)

তিনি আরও বলেছেন, "মন মস্তিষ্ক হতে ভিন্ন কোন বস্তু, মস্তিষ্ক একটি যন্ত্রবিশেষ যাকে ব্যবহার্য করে তোলে বা কাজে লাগায় আত্মা, মন কিংবা অন্যকিছু বস্তু—যাই বল না কেন।" (পৃষ্ঠা—৯৭)

তিনি এও বলেছেন—মস্তিষ্ক অস্ত্রোপচার করে 'মন' বা 'আত্মা' নামের কোনও জিনিস খুঁজে না পেলেই তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। যখন তুমি বলবে, "আত্মা বলে কোন জিনিসই নেই, আর এটি বলা মানেই তুমি আর একটা মন বা আত্মার অস্তিত্বকে মেনে নিলে; কেননা তুমি যা জানছ 'মনের বা আত্মার সত্তা নেই'—তাও জানছ মন দিয়ে"—"যদি বলো যে মনের বা আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই" তবে সেটা হবে কেমন—যেমন এখনি যদি বলো যে তোমার জিহ্বা নেই। আমি কথা কইছি জিহ্বা ব্যবহার করে অথচ যদি বলো যে জিহ্বা নেই, তাহলে সেটাতে অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে। (পৃষ্ঠা —এগারো)

'মরণের পারে' গ্রন্থটির ভূমিকায় স্বামী প্রজ্ঞানন্দও মনকেই আত্মা বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর ধারণায় 'ইহলোক—স্থূল ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে, আর পরলোক—সূক্ষ্ম মনের ও মানসিক সংস্কারের রাজ্যে।"

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ আরও বলেছেন, "মরণের পারে' এক রহস্যময় দেশ—যে দেশে সূর্য নাই, চন্দ্র নাই, নক্ষত্র নাই, যে দেশে স্থূল নাই, কেবলই সূক্ষ্ম-ভাবনা ও সূক্ষ্ম -চিন্তার রাজ্য। এই চিন্তার রাজ্যকেই মনোরাজ্য বা স্বপ্নরাজ্য বলে।"...মনের সেখানে বিলাস—চলা, বসা, খাওয়া, দেওয়া-নেওয়া, এই সমস্ত পরলোকবাসী জীবাত্ম ভোগ করে মনে তাই মনেরই সেটি রাজ্য, মনেরই সেটি লোক।"

(পৃষ্ঠা এগারো)

স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানন্দের এই কথাগুলো থেকে যে কটা জিনিস স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে, তা হলো— (১) আত্মাই মন, মনই আত্মা। (২) মন মস্তিষ্কের বহির্ভূত পদার্থ, মস্তিষ্ক জাত নয়। (৩) মনের অস্তিত্ব স্বীকার করা মানেই আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করা। (৪) পরলোকবাসী আত্মাদের মস্তিষ্ক বলে কোনও পদার্থ না থাকলেও, তারা পরলোকজরাজ্যে সূক্ষ্ম-ভাবনা ও সূক্ষ্ম-চিন্তা করে।

দুই স্বামীজির লেখা পড়ে বুঝতে অসুবিধে হয় না, 'মন' বিষয়ে তাঁদের প্রাথমিক জ্ঞানটুকু নেই। সবার সব বিষয়ে জ্ঞান থাকা কখনই সম্ভব নয়, এই সত্যকে মেনে নিয়েও বলতে বাধ্য হচ্ছি—'বৈজ্ঞানিক আলোচনা'র লেবেল এঁটে সাধারণের সামনে এই ধরনের ভুল ও অসত্য কথা লেখা খুবই অন্যায়।

'মন' বিষয়ে আলোচনা করার আগে দুই স্বামীজি যে কোনও চিকিৎসকে জিজ্ঞেস করলেই বা মনোবিজ্ঞানের বই পড়লেই জানতে পারতেন—মন কোনও 'জিনিস' নয়, মন বা চিন্তা হলো মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফল। তাই মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করলেও মনকে দেখতে পাওয়া যায় না। তবে দেখতে পাওয়া যায় মস্তিষ্কের কোষগুলোকে, যাদের সংখ্যা দশ লক্ষ কোটি।

'মন' বা 'চিন্তা' যেহেতু মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষগুলোর ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফল, অতএব মনকে 'মস্তিষ্ক বহির্ভূত পদার্থ' বা 'মস্তিষ্কজাত নয়' বললে তা হবে চূড়ান্ত মুর্খতা।

মনের অস্তিত্বকে বিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা কখনই অস্বীকার করছেন না। কিন্তু মনের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া মানেই অমর আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া বলে যদি স্বামীজি দু'জন মনে করে থাকেন, তবে তা হবে তাঁদেরই অজ্ঞতার পরিচয়। কারণ, বিজ্ঞান মনের অস্তিত্ব বলতে একটা কুয়াশার মতো বাষ্পময় কোন পদার্থকে বোঝে না।

স্বামীজিদের ধারণা মতো আত্মার চিন্তা-ভাবনার ক্ষমতা আছে। অথচ, বিজ্ঞানের সাহায্যে বা সাধারণ যুক্তিতে এর ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ ছাড়া চিন্তা বা মনের অস্তিত্ব অসম্ভব এবং অবাস্তব, কারণ চিন্তা বা মনের উৎপত্তি মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষগুলোর ক্রিয়ারই ফল। এ-শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, পোকা-মাকড়, পিঁপড়ে বা আরশোলা, সবার চিন্তা বা মনের ক্ষেত্রেই রয়েছে স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া। প্রাণীদের মধ্যে মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের কাজ সবেচেয় উন্নত, তাই তার চিন্তা ক্ষমতাও সবচেয়ে বেশি। মস্তিষ্ক, স্নায়ুকোষহীন যে বাষ্পময় আত্মার ধারণা স্বামীজিরা করেছেন, সেই আত্মা যুক্তিগতভাবে কখনই চিন্তা করতে সক্ষম হতে পারে না। এই ধরনের ধারণা একান্তই অবৈজ্ঞানিক, অলীক ও যুক্তিহীন।

বিদেহী আত্মা কীভাবে আবার দেহ ধারণ করে সে বিষয়ে স্বামী অভেদানন্দ যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা' করেছেন তা আপনাদের অবগতির জন্য তুলে দিচ্ছি। 'মন' বা 'আত্মা' "আকাশের মধ্যে দিয়ে বায়ুতে প্রবেশ করে, বায়ু থেকে মেঘ, সেখান থেকে বৃষ্টির বিন্দুর সঙ্গে তারা পড়ে ধরণীতে, তারপর কোন খাদ্যের সঙ্গে মানবদেহে প্রবেশ করে আবার তারা জন্ম নেয়।" (পৃষ্ঠা—৩৮)

তিনি স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছেন, "পিতামাতা এই দেহ গঠনের সহায়ক মাত্র, তাছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের সাহায্যেই প্রাকৃতিক নিয়মকে রক্ষা করে দেহ গঠনে সমর্থ হয় সূক্ষ্মশরীর। পিতামাতা আত্মাকে সৃষ্টি করেন না। তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যতক্ষণ পর্যন্ত না আত্মা পিতামাতার অভ্যন্তরে আবির্ভূত হয় এবং প্রাণীবীজটিকে লালন করে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের জন্ম অসম্ভাব্যই থাকে।"
(পৃষ্ঠা—৬২)

স্বামী অভেদানন্দ মানুষের জন্ম সম্বন্ধে যে ধারণা তাঁর অন্ধভক্ত পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন, তা হলো, (১) বিদেহী আত্মা আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে এবং খাদ্যের সঙ্গে মানব দেহে প্রবেশ করে, (২) একজোড়া সুস্থ-সবল ও জন্মদানে সক্ষম নারী-পুরুষ ও তাদের দেহ মিলনের সাহায্যে কখনই কোনও নতুন মানুষের জন্ম দিতে পারে না। নতুন মানুষটি জন্ম নেবে কিনা তা সম্পূর্ণই নির্ভর করে বিদেহী আত্মার ইচ্ছের ওপর। বিদেহী আত্মা পুরুষের অভ্যন্তর থেকে নারীর অভ্যন্তরে আবির্ভূত হলে, তবেই সম্ভব এক নতুন মানুষের জন্ম।

ঠিক এই ধরনের বিশ্বাস নিয়েই এককালে ভারতের নারী পুরুষের পরিবার পরিকল্পনার চেষ্টা না করে গাদা গাদা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, এবং আর্থিক চিন্তায় ভাগ্যকে দোষ দিয়ে বলেছেন, "কী করব, সবই ভগবানের হাত।"

আজকের অধিকাংশ ভারতবাসীই বুঝতে পেরেছেন, "সন্তানের জন্মের পেছনে ভগবানের হাত থাকে না। থাকে নিজেদের সক্ষম সঙ্গম ও জন্ম দেবার ক্ষমতা।

বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে মানুষের জন্ম একটা জৈবিক ব্যাপার। একজন নারী ও একজন পুরুষের দৈহিক মিলনে পুরুষের শুক্রকীট নারীর ডিম্বাণুবাহী নালিকার মধ্যে প্রবেশ করে, সাঁতার কেটে জরায়ুর মধ্যে ঢুকে ওভামের সঙ্গে মিলিত গর্ভসঞ্চার হয়, অর্থাৎ সৃষ্টি হয় ভ্রূণের। জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণ ধীরেধীরে লালিত-পালিত হয়ে অবশেষে পৃথিবীর আলো দেখে মানব-শিশু রূপে।

ভ্রূণের মধ্যে স্বামীজি কথিত আত্মা কখন ঢোকে? কী ভাবে ঢোকে? আত্মা কী তবে শুক্রক্রীটের মধ্য দিয়ে নারীর জরায়ুতে সঞ্চারিত হয়? স্বামীজি আত্মার ওজন বলেছেন "প্রায় আর্ধেক আউন্স বা এক আউন্সের তিন ভাগ।

'এক আউন্সের তিন ভাগ' কথাটা নিয়ে একটু গোলমালে পড়েছি। 'মরণের পারে' বইটির আগের 'মুদ্রণগুলোতে 'তিনভাগ' কথাটারই উল্লেখ পেলাম। স্বামী অভেদানন্দ সম্ভবত এক আউন্সের চার ভাগের তিন ভাগ বলতে চেয়েছিলেন।

৩/৪ আউন্স বা ১/২ আউন্স ওজনের একটা আত্মা কী শুক্রকীট বা ডিম্বাণুতে থাকতে পারে? একজন সুস্থ সবল পুরুষ সঙ্গমের সময় ১০০ মিলিয়ন বা ৪০০ মিলিয়ন পর্যন্ত শুক্রকীট গর্ভস্থানে নিক্ষেপ করে। এক মিলিয়ন হলো দশ লক্ষ। অর্থাৎ একজন পুরুষ প্রতিবার বীর্যপাতে ১০ কোটি থেকে ৪০ কোটি শুক্রকীট নারী গর্ভে নিক্ষেপ করে। সুতরাং একটা শুক্রকীটের মধ্যে ৩/৪ আউন্স থেকে

এককোষী থেকে ক্রমবিকাশ

এককোষী প্রাণী বা অ্যামিবা

↓

মাছের পূর্বপুরুষ

↓

উভচর প্রাণী (ব্যাঙ ইত্যাদি)

↓

সরীসৃপ

↓ পাখির পূর্বপুরুষ ↓ ডাইনোসর

↓

স্তন্যপায়ী

↓ জলচর ↓ স্থলচর ↓ খেচর

স্থলচর ↓

প্রাইমেট

↓ বন-মানুষ ↓ প্রাচীন-মানুষ ↓ বানর

প্রাচীন-মানুষ ↓

অস্ত্রালোপিতেক (১০ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ বছর আগে)

ড্রাইওপিতেক (১ কোটি থেকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ বছর আগে)

অস্ত্রালোপিতেক ↓

নিয়নডার্থাল (১ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ বছর আগে)

পিতেকানথ্রোপ (৫ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ বছর আগে)

নিয়নডার্থাল ↓

উন্নততর মানুষ

১/২ আউন্স ওজনের আত্মা উপস্থিতি একটা সোনামুখি ছুঁচের ফুটোর মধ্য দিয়ে একটা হাতি গলে যাওয়ার চেয়েও অবাস্তব কল্পনা।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, আত্মাকে ঈশ্বর বা অপর কোন দেবতা সৃষ্টি করেন, হিন্দুরা একথা মানেন না, এই আত্মা আজ অর্থাৎ জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত। (পৃষ্ঠা ১৮)

বেদান্তে আছে আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। নিত্য, শাশ্বত।

৪৭০ কোটি বছর আগে জ্বলন্ত সূর্যের একটি অংশ যখন কোন শক্তিশালী নক্ষত্রের আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হয় তখন এই সব মানুষের মনগুলো কোথায় ছিল? অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থ, জৈব পদার্থ থেকে এককোষী প্রাণী অ্যামিবা সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর জৈব বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এককোষী প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্র, যাকে স্বামী অভেদানন্দ বলতে চেয়েছেন মন বা আত্মা। ক্রমবিবর্তনের দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে জটিলতম স্নায়ুবিশিষ্ট মানুষ।

প্রোকারিয়টস নামের জীবাণুবিশেষ প্রাণী সৃষ্টির আগে পৃথিবীতে প্রাণেরই অস্তিত্ব ছিল না, তখন মন বা আত্মারা সব কোথায় ছিল?

বিজ্ঞান আজ প্রমাণ করেছে জড় থেকেই জীবের সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীর বিশেষ ভৌত অবস্থায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার জটিল সংশ্লেষের মধ্য দিয়ে। এই প্রাণের পেছনে কোনও মন বা আত্মার অস্তিত্ব ছিল না। প্রাণী সৃষ্টির পর কোটি বছর কেটে গেছে। বিভিন্ন প্রাণীদের বিবর্তনের পথ ধরে মাত্র ২৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার বছর আগে মানুষ এলো পৃথিবীর বুকে।

৩০ হাজার বছরেরও আগে মানুষের আত্মারা কোথায় ছিল? জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ হলো? কেন আত্মারা কীটপতঙ্গ হলো? পূর্বজন্মের কোন কর্মফলে এমন হলো?

পূর্বজন্ম পূর্বজন্ম করে পিছোতে থাকলে যে প্রাণীতে আত্মার প্রথম জন্মটি হয়েছিল, সেটি কবে হয়েছিল? হলে নিশ্চয়ই এককোষী রূপেই জন্ম হয়েছিল। এককোষী প্রাণীর জন্ম হয়েছিল কোন জন্মের কর্মফলে?

না, এর কোনটারই উত্তর পাবেন না, কারণ, উত্তর দেওয়ার কিছুই নেই।

**বিজ্ঞান বলে, পৃথিবী হোক বা অন্য কোন নক্ষত্রের গ্রহেই হোক,
যেখানেই প্রাণী থাকবে সেখানেই এই প্রাণের পেছনে
থাকবে কিছু রাসায়নিক প্রক্রিয়া,
কোনও আত্মা নয়।**

স্বামী অভেদানন্দ বা বেদান্ত মানুষের আত্মাকে 'অজ' অর্থাৎ জন্মহীন বলে। আদি বাইবেলে বলা হয়েছে ঈশ্বর পৃথিবীরই উপকরণ দিয়ে তাঁর নিজের অনুকরণে

মানুষকে সৃষ্টি করে নাকে ফুঁ দিয়ে প্রাণ সঞ্চার করেন। অর্থাৎ আত্মার জন্ম দেন। বিভিন্ন ধর্ম আত্মার জন্ম নিয়েও বিভিন্ন ধারণা গড়ে তুলেছে।

আত্মা ও পুনর্জন্ম বিষয়ে সব ধর্মমতই নিজের বিশ্বাসকেই 'একমাত্র সাচ্চা' বলে ছাপ মারতে চায়। আপনি এই বিষয়ে কোন ধর্মমতকে বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করবেন? এবং কেন গ্রহণ করবেন? আপনি একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বী, একমাত্র এই যোগ্যতার গুণেই কী আপনার ধর্মের সব ধারণা আপনার কাছে অভ্রান্ত হয়ে যাবে?

মোট প্রাণী ও মানুষের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। হাজার হাজার বছরে এই যে বিশাল প্রাণী সংখ্যার বৃদ্ধির এর অর্থ কী এই নয় যে, আত্মারাও জন্মাচ্ছে বলেই বৃদ্ধি পাচ্ছে?

আত্মা কী নিজেদের ভাগ করতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, "না, তা পারে না।"

আত্মা না জন্মালে, না, বাড়লে প্রাণী বাড়ছে কি করে? উত্তর নেই।

স্বামী অভেদানন্দ একটি মারাত্মক বিপজ্জনক কথা বলেছেন, "আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করলে মানুষের শিক্ষাদীক্ষা চরিত্রগঠনে প্রভৃতি আর দরকারি বলে অনুভূত হবে না।"

তিনি এমন অদ্ভুত তথ্যটি আবিষ্কার করলেন কীভাবে? বিশ্বের প্রতিটি বিজ্ঞানমনস্ক বিজ্ঞান, প্রতিটি যুক্তিবাদী মানুষ আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। তাঁরা শিক্ষা দীক্ষায় বা চরিত্রগঠনে আত্মা-বিশ্বাসীদের চেয়ে পিছিয়ে আছেন?

ভেজালের কারবারি, চোর, ডাকাত, খুনে, ধর্ষণকারী—এদের ওপর সমীক্ষা চালালেই দেখতে পাবেন, এদের শতকরা প্রায় ১০০ ভাগই আত্মার অস্তিত্বে এবং হিন্দু হলে পরজন্মেও বিশ্বাস করে। কিন্তু এই ধর্মীয় ধারণা কি তাদের পাপ কাজ থেকে দূরে রাখতে পেরেছে?

আত্মার অস্তিত্বের স্বীকার বা অস্বীকারের ওপর শিক্ষাদীক্ষা বা চরিত্রগঠন নির্ভর করে না। নির্ভর করে সেই দেশের আর্থ-সামাজিক (Socio-economic) এবং সমাজ-সাংস্কৃতিক (Socio-cultural) পরিবেশের ওপর।

স্বামী অভেদানন্দ আরও বলেছেন, "অজ্ঞ শ্রেণির লোকেরা এখনো বিশ্বাস করে না যে, আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে এবং দেহ ব্যতীত তার অস্তিত্ব থাকতে পারে।" (পৃষ্ঠা—৮০)

স্বামী অভেদানন্দ কি বলতে চান, বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা ও যুক্তিকে বিসর্জন দিয়ে তাঁর কথাকেই অন্ধ-বিশ্বাসে পরম সত্য বলে মেনে নেওয়াটাই বিজ্ঞতার লক্ষণ?

স্বামী বিবেকানন্দের চোখে আত্মা

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, "আত্মা নামক একটি সত্য বস্তু আছে এবং তা দেহ থেকে ভিন্ন ও অমর।"

(বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র অখণ্ড বাংলা সংস্করণ—প্রকাশক নবপত্র। পৃষ্ঠা—২৫৪)

চৈতন্য, আত্মা ও ঈশ্বর প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ আরও বলেছেন, "কিন্তু ঈশ্বর চৈতন্য-স্বরূপ'। তাই প্রকৃত ভাব ও বিশ্বাস নিয়েই ঈশ্বরের উপাসনা করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো চৈতন্য কোথায় থাকেন? গাছে? মেঘে? না, অন্য কোথাও? 'আমাদের ঈশ্বর'—এই কথার অর্থই বা কি? এর উত্তর—"আপনিই চৈতন্য। এই মৌলিক বিশ্বাসটিকে কখনই ত্যাগ করবেন না। আমি চৈতন্যস্বরূপ। আর এই বিশ্বাসই হলো যোগের সমস্ত কৌশল। এবং ধ্যান-প্রণালী হলো—আত্মার মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার উপায়।" (ঐ বইয়ে, পৃষ্ঠা—৫৩৫)

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "কোন অণু-পরমাণুর দ্বারা গঠিত নয় বলে আত্মা অবিনশ্বর...আত্মা কোন রূপ উপাদানের সমবায়ে গঠিত নয়,"

(ঐ বইয়ে, পৃষ্ঠা ২৬২—২৬৩)

স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপন করলে স্বামী অভেদানন্দসহ বিভিন্ন ধর্মমতের আত্মার রূপ ধারণ বা দেহ গঠন নিয়ে ধারণাটাই বাতিল করতে হয়।

স্বামীবিবেকানন্দ আবার অভেদানন্দের 'মনই আত্মা' কথাটাকে মানতে নারাজ। তাঁর কথায়, চৈতন্য বা চেতনাই আত্মা। চৈতন্য বা চেতনা মন থেকে পৃথক কিছু। মনের সূক্ষ্ম শরীর আছে। (ঐ বইয়ে, পৃষ্ঠা—১৬২)

এখানেও দেখতে পাচ্ছি অভেদানন্দের সঙ্গে বিবেকানন্দের বিশ্বাসের লড়াই। অথচ দুজনেই নাকি আবার বেদান্তে বিশ্বাসী। পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞান সিদ্ধান্তে এসেছে মন, চিন্তা, চৈতন্য ইত্যাদি যে নামেই ডাকি, এসবই মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফল—সে বিষয়ে আগেই আলোচনা করেছি।

এর আগে 'মন' নিয়ে যে কথাটা বলা হয়নি সে-কথাটাই বলি। "মন জড়ে রূপান্তরিত হয়, আবার জড়ও মনে রূপান্তরিত হয়, এটা শুধু কম্পনের তারতম্য।

"একটি ইস্পাতের পাত গড়ে, তাকে কম্পিত করতে পারে এ রকম একটা শক্তি এতে প্রয়োগ কর। তারপর কী ঘটবে? যদি একটি অন্ধকার ঘরে এই পরীক্ষাটি করা হয়, তবে প্রথম তুমি শুনতে পাবে একটি শব্দ—একটি গুনগুন শব্দ। শক্তিপ্রবাহ বর্ধিত করো, দেখবে ইস্পাতের পাতটি আলোকময় হয়ে উঠেছে। শক্তি আরও বাড়িয়ে দাও, ইস্পাতটি একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। ইস্পাতটি মনে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।"

এই কথাগুলো মেনে নিতে পারছেন না? একটা ইস্পাতের পাত নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেই তো পারেন। মনে রূপান্তরিত হয়েছে কি না কি করে বুঝবেন? কেন, ই. ই. জি মেশিনের সাহায্যে।

পরীক্ষায় ইস্পাতের পাতটি আলোকময় হচ্ছে না? অদৃশ্য হচ্ছে না? উলটো-পালটা বিজ্ঞানীবিরোধী আষাঢ়ে গল্প ফেঁদেছি বলছেন? আমাকে এই জন্য ধিক্কার দেবেন না কি? একটু থামুন। শুনুন এমন একটা তথ্যের বা তত্ত্বের জন্য প্রশংসা বা নিন্দা কোনও কিছুই আমার প্রাপ্য নয়, প্রাপ্য বিবেকানন্দের। বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র উল্লিখিত বইটির ২৬৪ পৃষ্ঠায় বিবেকানন্দের বক্তব্য হিসেবেই এমন সব উদ্ভট কথা লেখা রয়েছে।

আত্মা নিয়ে আরও কিছু বিশিষ্ট ভাববাদীর মত

১৯৮৬ সালে 'উদ্বোধন কার্যালয়' একটি বই প্রকাশ করে—মন ও তার নিয়ন্ত্রণ। লেখক—স্বামী বুধানন্দ, অনুবাদক স্বামী ঈশাত্মনন্দ। বইটিতে বেদান্ত মতে মন কী সে বিষয়ে কিছু আলোচনা রয়েছে। ১৩ পৃষ্ঠা রয়েছে, "মনের পিছনেই থাকে আত্মা, যা মানুষের যথার্থ স্বরূপ। শরীর এবং মন দুই জড়, আত্মাই অচতন্যস্বরূপ।"

স্বামী বুধানন্দের শরীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতারই ফলশ্রুতি এ ধরনের অবৈজ্ঞানিক অন্ধ বিশ্বাসজড়িত বক্তব্য। 'মন' যে জড় বস্তু নয় এবং মন ও চৈতন্য যে কোন পৃথক কিছু নয়, এ বিষয়ে নতুন করে আর আলোচনায় গেলাম না, কারণ আগেই এ নিয়ে বিজ্ঞান কী বলে, আলোচনা করেছি।

এ'বার যে বইটি নিয়ে আলোচনা করব, তার নাম 'সত্য দর্শন', প্রকাশক বারাণসীর 'কলিকানন্দ বেদান্ত আশ্রম'। লেখক পরমহংস পরিব্রাজকচার্য শ্রীমৎ কালিকানন্দ স্বামী ১০৯ পৃষ্ঠায় 'মনস্তত্ত্ব' শিরোনামের আলোচনায় বলেছেন, "তোমরা যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পঞ্চেন্দ্রিয় যোগে জগৎকে প্রত্যক্ষ কর, বাস্তবপক্ষে কিন্তু কেবল শরীরের এই বহিস্থ পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারাই তোমাদের বহির্জগৎ প্রত্যক্ষ করার কার্য শেষ হয় না। এই বাহিরের পঞ্চেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় নহে, উহা কেবল বাহিরের বিষয়কে ভিতরে লইয়া যাইবার যন্ত্রবিশেষ মাত্র; প্রকৃত ইন্দ্রিয় মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুকেন্দ্রেই বিদ্যমান। মনে কর, আমি একটি শব্দ শুনিতেছি; এখানে বাহিরের কর্ণ শব্দটিকে গ্রহণ করিয়া মস্তিষ্কই ইন্দ্রিয়ে পৌঁছাইল, তৎপর এই ইন্দ্রিয় উহা বহন করিয়া লইয়া গিয়ে বুদ্ধির নিকট পৌঁছাইল। এই মনও কেবল বাহক মাত্র, মন ঐ শব্দকে আরও ভিতরে বহন করিয়া লইয়া গিয়া বুদ্ধির নিকট পৌঁছাইল। তখন বুদ্ধি উহার সম্বন্ধে নিশ্চয় করে যে, উহা কিসের শব্দ এবং উহা ভাল কি মন্দ। এই বুদ্ধির আবার আরও ভিতরে লইয়া গিয়া সর্বসাক্ষীস্বরূপ, সকলের প্রভু আত্মার নিকট উহাকে সমর্পণ করিল। তখন পুনরায় যে যে ক্রমে উহা ভিতরে গিয়াছিল, সেই সেই ক্রমে আবার বহির্যন্ত্রে আসিল,—প্রথম বুদ্ধিতে,

তারপর মনে, তারপর মস্তিষ্ক-কেন্দ্রে তৎপর বহির্যন্ত্র কর্ণে।"

১১০ পৃষ্ঠায় কালিকানন্দ স্বামী বলেছেন, মন ও বুদ্ধির সূক্ষ্ম শরীর আছে।

গ্রন্থটির ১১৮ পৃষ্ঠায় লেখক আবার বলছেন, আত্মাই চিত্ত।

অর্থাৎ মোদ্দা কথায় কালিকানন্দ স্বামীর মনে হয়েছে মন, বুদ্ধি, চিত্ত বা চেতনা সবই ভিন্ন ভিন্ন বস্তু এবং চিত্ত বা চেতনাই আত্মা। মন ও বুদ্ধির সূক্ষ্ম শরীরও রয়েছে। স্বামীজির এই অদ্ভুত বিশ্বাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই।

শঙ্করাচার্যও চৈতন্য নামের লক্ষ্মণটি দেহাতিরিক্ত আত্মা বলে ঘোষণা করেছিলেন।

আত্মার শান্তিতে শ্রাদ্ধ

প্রাণীর জীবন্ত শরীরে অসংখ্য জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে যে শক্তির সৃষ্টি হয় সেই শক্তিই শরীরের প্রাণ-শক্তি, শরীরকে কর্মচঞ্চল রাখার শক্তি।

মৃত্যু ঘটলে শরীরের রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াগুলো বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয় শক্তির সরবরাহ। মৃত্যু পুরোপুরি একটি জৈবিক প্রক্রিয়া। মৃত্যুর পর আত্মাকে ধরে নিয়ে যেতে যমদূতেরা হাজির হয় না। যদিও অনেক হিন্দুর মধ্যেই এই ধারণা রয়েছে যে—

যম আত্মার পূর্বজন্মের কর্মফল বিচার করে স্বর্গে বা নরকে পাঠায়। সেখানে আত্মা সুখ বা শাস্তি ভোগ করে। শাস্তির মধ্যে আছে গরম তেলে ভাজা, দিয়ে কাটা ইত্যাদি। তাহলে, আত্মাকে ভাজা যায় না কাটা যায় না—হিন্দু বিশ্বাসের কী হবে?

বহু প্রাচীন যুগ থেকে একধরনের সুবিধাভোগীরা তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রচার করেছিল—তুমি এই জন্মে ত্যাগ স্বীকার কর, রাজাকে মান্য কর, পুরোহিতকে শ্রদ্ধা কর—মৃত্যুর পর তোমার আত্মার স্থান হবে স্বর্গে। এর অন্যথায় পতিত হবে নরকে। নরক ভোগের পরে তোমার আত্মা পৃথিবীতে ফিরে এসে আবার জন্ম নেবে, ভোগ করবে পূর্বজন্মের কর্মফল। কিন্তু, আজ পর্যন্ত কেউই স্বর্গে মৃতের আত্মাকে সুখ ভোগ করতে দেখেনি, দেখেনি আত্মাকে নরকের যন্ত্রণা ভোগ করতে। হাজার হাজার বছর ধরে আত্মা, পূর্বজন্মের কর্মফল, স্বর্গ নরক এইসব নিয়ে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তা একান্তভাবেই বিশ্বাসের ব্যাপার মাত্র। বাস্তবে স্বর্গ, নরক এবং আত্মা কোনওটারই অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি কারণ অস্তিত্ব নেই।

বিভিন্ন ধর্মে মানুষের মৃত্যুর পর তার অস্তিত্বহীন আত্মার তৃপ্তি, মুক্তি, পরলোকযাত্রার পাথেয় দেওয়ার জন্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের নিয়ম-কানুন ও সংস্কার। বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে মৃতদেহকে জ্বালানো হয়, কফিনে শুইয়ে কবর দেওয়া হয়, মৃতদেহকে বসিয়ে কবর দেওয়া হয়, খাল, নদী বা সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে সলিল সমাধি দেওয়া হয়, এমনকি মৃতদেহকে গাছে ঝুলিয়েও রাখা হয়।

পরলোকের পাথেয় হিসেবে অনেক সময় মৃতের সঙ্গে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও কবর বা সমাধিতে দিয়ে দেওয়া হয়। মিশর, চীন, গ্রীস ও ভারতের কবরের সঙ্গে পাথেয় হিসেবে বহু নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস ও মূল্যবান অলংকার রত্ন প্রভৃতি দেওয়ার প্রচলন বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল এবং আছে, মিশরের ফারাও পরিবারের মৃতের সঙ্গে কবর দেওয়া হতো জীবন্ত দাস-দাসীদের। বৈষ্ণবরা মৃতের সমাধির সঙ্গে ভিক্ষের ঝুলিও দিয়ে দেন।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে রয়েছে অশৌচ পালনের আচরণবিধি। হিন্দু পরিবারে কেউ মারা গেলে, জ্ঞাতি-আত্মীয়দের অশৌচ পালন করার বিধি রয়েছে, এই সময় নিরামিষ খেতে হয়, বাড়িতে পূজো, বিয়ে বা ওই জাতীয় কোনও শুভকাজ করা যায় না, চামড়ার জুতো পরা, চুল-দাড়ি-গোঁফ কাটাও নিষিদ্ধ বলে মানা হয়। এই নিয়ম মানা হয় শ্রাদ্ধের দিন পর্যন্ত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের বর্ণাশ্রম অনুযায়ী মৃত্যুর কতদিন পর শ্রাদ্ধের কাজ কর্ম, আত্মাকে পিণ্ডিদান ইত্যাদি হবে, তা ঠিক করা আছে। মৃতের শ্রাদ্ধের কাজ যে করবে (ছেলে থাকলে অবশ্যই ছেলে) তাকে আরও অনেক নিয়ম-কানুন মানতে হয়। অশৌচ চলাকালীন সেলাইহীন এককাপড়ে থাকতে হয়। নিজে হাতে মাটির মালসায় ভাতে-ভাত রান্না করে খেতে হয়, যাকে বলা হয় হবিষ্যান্ন। জুতো পরা চলবে না। রোদ-বৃষ্টি যাই হোক ছাতা নেওয়া চলবে না। চুল-দাড়ি-গোঁফ ছাঁটা চলবে না। গায়ে মাথায় তেল-দেওয়া বা সাবান দেওয়া অবশ্যই চলবে না। যৌনসঙ্গম নিষিদ্ধ। তারপর তো রয়েছে আত্মার শ্রাদ্ধ-শান্তির নাম করে পুরোহিতকে মৃতব্যক্তির প্রিয় জিনিসপত্র দান, ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়-বন্ধুদের ভূরিভোজে আপ্যায়ন ইত্যাদি।

শ্রাদ্ধের কাজ যিনি করবেন তিনি বেচারা তেল, সাবানহীন রুক্ষ চুল ও এক মুখ অপরিচ্ছন্ন গোঁফ-দাড়ি নিয়ে, খালি গায়ে একটা নোংরা কাপড় পরে, খালি পায়ে এবং নিজের রান্না নিজে করে প্রায়শই অফিসের কাজে যোগ দিতে পারেন না। ফলে নষ্ট হয় বেশ কিছু প্রয়োজনীয় শ্রমদিবস। গরিবদের অনেক সময় ভিটে-মাটি বেচে শ্রাদ্ধ-শান্তির খরচ যোগাতে হয়। অস্তিত্বহীন আত্মার নামে এই যে জঘন্য কুসংস্কার ও অর্থহীন খরচ যুগযুগ ধরে চলে আসছে আজও আমাদের সমাজ কিন্তু তার বাইরে বেরিয়ে আসতে পারছে না। 'পাছে লোকে কিছু বলে' এই তাড়নায় আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী অনেকেও এই কুসংস্কারের কাছে মাথা নোয়াচ্ছেন। যাঁরা এই সব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে রুখে দাঁড়ান, তাঁদের বিরুদ্ধে একদল লোক-কুবাক্য প্রয়োগ করতে পারেন বটে, কিন্তু, একই সঙ্গে আর একদল লোকের চোখে শ্রদ্ধার আসনও পাতা হয়ে যায়। কারণ, কথায় ও কাজে যাঁরা এক, তাঁদের শ্রদ্ধা জানাবার মতো লোক আজও আছেন।

আমার বাবা মারা যান ১৯৮৫-র ২৬ মে। আমিই বাবার একমাত্র ছেলে। আমার বোন—চার। একমাত্র ছেলে হওয়ার সুবাদে হিন্দুধর্মের বিধিমতো বাবার পরলোকগত

আত্মার (?) সদগতি ও শান্তির জন্য পারলৌকিক কাজকর্মের পূর্ণ দায়িত্ব আমারই ওপর বর্তানোর কথা।

যেহেতু আত্মার কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই, আত্মা শুধু অবাস্তব কল্পনা মাত্র, তাই লোকাচার, প্রচলিত সংস্কার ও চক্ষুলজ্জার কাছে নতজানু হবার কোনও ইচ্ছেই আমার ছিল না। বিনিময়ে মর্মান্তিক মূল্য দিতে হবে জেনেও মনে মনে উচ্চারণ করেছিলাম বীরসিংহের দুঃসাহসী বীর সন্তান বিদ্যাসাগরের কথা, "আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।"

মা, বোন, কিছু আত্মীয় ও কিছু প্রতিবেশীর মতামতকে, কুসংস্কারকে মূল্য না দেওয়ায়, দেখেছি তাঁরা কেমনভাবে আমাকে ত্যাগ করেছেন, দেখেছি কুসংস্কারগ্রস্তদের শত্রুতা কত মিথ্যাচারে নামতে পারে, সেইসঙ্গে দেখেছি সমাজের বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে কেমনভাবে বর্ষিত হয় সমর্থন, অভিনন্দন ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার অজস্র কুসুম। এতগুলো মানুষের ভালোবাসা, এইতো আমার জীবনের পাথেয়।

আত্মা প্রসঙ্গে চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন

প্রাচীন বস্তুবাদী দর্শনটির নামটা নিয়ে একটু আলোচনা স্বল্প পরিসরে সেরে নিলে বোধহয় অনেকের কিছুটা কৌতূহলও মেটানো যাবে এবং আত্মা প্রসঙ্গে যে দর্শনের মতামতের সঙ্গে পরিচিত করাতে চাইছি, তার বিষয়েও কিছু বলা হবে।

'চার্বাক' কথাটি কোথা থেকে এলো? অনেক দার্শনিকের মতে 'চারু-বাক', থেকে চার্বাক কথাটা এসেছে। মানুষের স্বাভাবিক ভোগ প্রবৃত্তির কথা মাথায় রেখে যে দর্শন 'চারু' বা সুন্দর কথার জাল বুনে 'ইহ জগতেই সব কিছুর শেষ, মৃত্যুর পরে অন্য কোন জগৎ বলে কিছুই নেই,' বলে মানুষের চিত্ত আকর্ষণ করেছে, সেই দর্শনই চারু-বাক্ বা চার্বাক দর্শন।

অন্য মতে 'চর্ব' (অর্থাৎ চর্বণ) করে যে—এই অর্থে চার্বাক্ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধরনের ব্যাখ্যা তারা বলতে চান—চর্ব-চোষ্য খানা-পিনার মধ্যেই জীবনের চরমতম সার্থকতা যে দর্শন খুঁজে পায় সেই দর্শনই চার্বাক দর্শন।

ব্যাকরণ মানতে গেলে দুটো মতকেই বাতিল করতে হয়। 'চারু-বাক', থেকে 'চারুবাক', অথবা 'চার্বাক্' বা 'চার্বাক-এর 'ক'-এ হসন্ত বাত দেওয়া হয়েছে।

আবার 'চর্বণ করে যে' সে 'চার্বাক'- নয় 'চার্বাক', অর্থাৎ 'র্ব'-এ আ-কার হবে না।

পালি সাহিত্যে বিষয়ে সুপণ্ডিত রসি ডেভিডস্ (Rhys Dabinds)-এর ধারণায়—মহাভারতের এক কুচরিত্র রাক্ষস চার্বাক। এই নাম থেকেই পরবর্তী সময়ে ভাববাদীরা বস্তুবাদী দর্শনটির নাম রাখেন চার্বাক দর্শন। মহাভারত আছে—চার্বাক ছিল দুরাত্মা দুর্যোধনের বন্ধু আর এক দুরাত্মা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-বিজয়ী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশধারী চার্বাক জ্ঞাতিঘাতী হিসেবে ধিক্কার জানিয়ে আত্মঘাতী

হতে প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ তাঁদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় চার্বাক-এর আসল পরিচয় জেনে ফেলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করেন।

প্রাচীন ভাববাদীরা বস্তুবাদী দর্শনটির প্রতি সাধারণ মানুষের অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা সৃষ্টির জন্যই এমন এক ঘৃণ্য রাক্ষস চরিত্রের নামে দর্শনটির নাম রেখেছিলেন।

সে যুগের কিছু ভাববাদীরা চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনকে দেবগুরু বৃহস্পতি প্রণীত বলে উল্লেখ করেছেন। পুরাণে আছে—অসুরদের পরাক্রমে বিধ্বস্ত দেবকুলকে রক্ষা করতে এক কৌশল অবলম্বন করলেন বৃহস্পতি। অসুরদের ধ্বংসের জন্য, অধঃপাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ভ্রান্ত-দর্শন রচনা করলেন। তারপর অসুরের ছদ্মবেশে অসুরদের মধ্যে বস্তুবাদী দর্শনটি প্রচার করলেন। ফলে নীতিভ্রষ্ট, ভ্রান্ত অসুররা দেবতাদের কাছে পরাজিত হলো।

এখানেও দেখতে পাই—বস্তুবাদী দর্শনই অসুরদের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল, প্রচারের মধ্য দিয়ে বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি আতঙ্ক এবং বিদ্বেষ সৃষ্টির স্পষ্ট চেষ্টা।

শঙ্করাচার্য প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিকেরা বস্তুবাদী দর্শনটিকে 'লোকায়ত' নামে অবহিত করার কারণ হিসাবে জানিয়েছেন—দর্শনটি ইতর লোকের দর্শন, তাই 'লোকায়ত' দর্শন।

এখানে ভাববাদী দার্শনিকদের লোকায়ত দর্শনের প্রতি অশ্রদ্ধা স্পষ্ট।

অনেক পাঠক-পাঠিকাদের মনেই এ-চিন্তা নিশ্চয়ই উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে—চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনে কী এমন কথা বলা হয়েছে, যা অবহেলায় পাশে সরিয়ে দেওয়ার সাধ্য সে যুগের রথী-মহারথী দার্শনিকদের ছিল না। ফলে ভাববাদী রথী-মহারথীরা বস্তুবাদী দর্শনটিকে লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ আক্রমণ হেনেছেন। এবং সাধারণ মানুষদের দর্শনটি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে নানাভাবে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন।

চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনে আত্মার বিষয়ে এমন কিছু যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল যেগুলি ইতরজন বা সাধারণের কাছেও গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল। যুক্তিবাদী এই দর্শনে আত্মা বা চৈতন্যকে দেহধর্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই বক্তব্যই ভাববাদী দার্শনিকদের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বস্তুবাদী চার্বাক দর্শনের সুদীর্ঘ লড়াই চলেছিল শুধুমাত্র আত্মা 'অমর' কি 'মরণশীল'—এই নিয়ে।

লোকায়ত দর্শন মতে—কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য প্রমাণের প্রয়োজন। একান্ত বিশ্বাস-নির্ভর অনুমানের সাহায্যে সিদ্ধান্ত পৌঁছানো সম্ভব নয়। অনুমান-নির্ভর, একান্ত বিশ্বাস-নির্ভর অমর আত্মা, ইহলোক, পরলোক ইত্যাদি ধারণাগুলো লোক ঠকানোর জন্য একদল ধূর্ত লোকের সৃষ্টি।

প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণই শ্রেষ্ঠ বলে চার্বাক দর্শন মনে করলেও তাঁরা প্রত্যক্ষ-অনুগামী জ্ঞানকেও মর্যাদা দিয়েছিলেন। অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রতিটি অনুমানের মূল শর্ত অবশ্যই হবে 'পূর্ব প্রত্যক্ষ' অর্থাৎ প্রত্যক্ষের ওপর

নির্ভর করে অনুমান। যেমন ধোঁয়া দেখলে আগুনের অনুমান, গর্ভ দেখে অতীত মৈথুনের অনুমান ইত্যাদি। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অনুমান কখনই হতে পারে না।

ভাববাদীদের চোখে প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ-অনুগামী জ্ঞানের গুরুত্ব ছিল সামান্য অথবা অবান্তর। তাঁরা অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন, 'ঋষি' নামধারী ধর্মগুরুদের মুখের কথাকে, ধর্মগুরুদের অন্ধ-বিশ্বাসকে—যার ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল আধ্যাত্মবিদ্যা।

আজও যাঁরা বলেন, "বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম এবং অধ্যাত্মবাদের কোন দ্বন্দ্ব নেই, বরং অধ্যাত্মতত্ত্বই 'পরম বিজ্ঞান', তাঁরা এটা ভুলে যান—প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান ছাড়া প্রকৃত বিজ্ঞানের প্রথম ধাপটিতে পা রাখাই সম্ভব নয়।

লোকায়ত দর্শন প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ-অনুগামী জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে দ্বিধাহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন—চৈতন্য দেহেরই গুণ বা দেহেরই ধর্ম। দেহ ধ্বংস হওয়ার পর চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অস্তিত্ব অজ্ঞান ও ধূর্তদের কল্পনা মাত্র।

লোকায়ত দর্শনের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে শঙ্করাচার্য যে যুক্তি রেখেছিলেন তা হলো—লোকায়ত দর্শনের মতে দেহের মূল উপাদান জল, মাটি, আগুন, বায়ু ইত্যাদি ভূত-পদার্থ। এই প্রতিটিভূত-পদার্থই জড় বা অচেতন পদার্থ। তাহলে এই অচেতন পদার্থে গড়া মানুষের মধ্যে চেতনা আসছে কোথা থেকে? আসছে নিশ্চয়ই এই সব অচেতন পদার্থের বাইরে থেকেই। অতএব স্বীকার করে নেওয়া উচিত—চৈতন্য বা আত্মা দেহের অতিরিক্ত একটা কিছু। আত্মা বিষয়ে অন্যান্য বহু ভাববাদী দার্শনিকেরা যে-সব তর্কের ঝড় তুলেছেন, তাঁদের অনেকের বক্তব্যেই শঙ্কারাচার্যের এই যুক্তির সুর লক্ষ্য করা যায়। তাঁরাও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন—জড় বা অচেতন পদার্থের গড়া দেহ তো সরল যুক্তিতে অচেতনই হবার কথা। তবে মানুষের চৈতন্য আসছে কোথা থেকে?

লোকায়ত দর্শন এই যুক্তির বিরুদ্ধে পালটা যুক্তিও হাজির করেছেন—মদ তৈরির উপকরণগুলোতে আলাদা করে বা মিলিত অবস্থায় কোন মদশক্তি নেই। কিন্তু সেই উপকরণগুলোকেই এক ধরনের বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মিলন ঘটানোর পর সম্পূর্ণ নতুন এক গুণ পাওয়া যাচ্ছে, যাকে বলছি মদ। আত্মা বা চৈতন্যও একই জাতীয় ঘটনা।

লোকায়তিকদের চৈতন্যের সঙ্গে মদশক্তির তুলনা নিয়ে কোন বিপক্ষ দার্শনিকই কূটতর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেননি। তবে, তাঁরা দৃষ্টান্ত হিসেবে এনেছেন মৃতদেহের তুলনা। চৈতন্য যদি দেহেরই লক্ষণ বা ধর্ম হয়, তবে মৃতদেহেও তো চৈতন্য থাকার কথা, থাকে না কেন? মৃতদেহও দেহ।

লোকায়ত দর্শনের আত্মা বা অচৈতন্যতত্ত্বের বিরুদ্ধে ভাববাদীদের এটাই সবচেয়ে জোরালতম যুক্তি।

· চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন-এর বিপক্ষে জোরাল কোন যুক্তির হাজির করতে পারেনি। প্রাচীনকালের পটভূমিতে শারিরবিদ্যার অনগ্রসরতার যুগে এই ধরনের যুক্তির কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না। আজ বিজ্ঞানের তথা শরীর বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক কিছু জেনেছি, পরবর্তীকালে নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছুই জানব। যেটুকু জেনেছি, তারই ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি দেহ ও মৃতদেহের ধর্ম সমান নয়। চিন্তা, চেতনা বা চৈতন্য মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের ক্রিয়া।

মৃতদেহের ক্ষেত্রে মৃতদেহেরই অংশ মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষেরও যেহেতু মৃত্যু ঘটে, তাই স্নায়ুকোণে ক্রিয়াও ঘটে না, ফলে মৃতদেহের ক্ষেত্রে চৈতন্য বা চিন্তা থাকে অনুপস্থিত।

লোকায়ত দর্শনে আত্মা, পরলোক এবং পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ে এমন অনেক কথা বলা হয়েছে, যেগুলোর তীক্ষ্ণতা এ যুগের যুক্তিবাদীদেরও ঈর্ষা জাগাবার মতো। দু-একটা উদাহরণ হিসেবে তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। যদিও নিশ্চিতভাবে জানি আমার অক্ষম বাংলা তর্জমায় মূল শ্লোকগুলোর রস অনেকটাই শুকিয়ে যাবে।

উদাহরণ ১ : ব্রাহ্মণ জীবিকা হেতু করেছেন শ্রাদ্ধাদি বিহিত
এ-ছাড়া কিছুই নয় জেনো গো নিশ্চিত।।

উদাহরণ ২ : যদি, শ্রাদ্ধকর্মে হয় মৃতের তৃপ্তির কারণ।
তবে, নেভা প্রদীপে দিলে তেল উচিত জ্বলন।।

উদাহরণ ৩ : পৃথিবী ছেড়ে যে পঞ্চভূতে
তার পাথেয় (খাদ্যবস্তু) ঘরে দেওয়া বৃথা।।
যেমন ঘর ছেড়ে যে গ্রামান্তরে
তার পাথেয় ঘরে দেওয়া বৃথা॥

উদাহরণ ৪ : চৈতন্যরূপ আত্মার পাকযন্ত্র কোথা?
তবে তো পিণ্ডদান নেহাতই বৃথা।।

উদাহরণ ৫ : যদি, জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে
বলি দিলে পশু যায় স্বর্গে।
তবে, পিতাকে পাঠাতে স্বর্গে
ধরে-বেঁধে বলি দাও যজ্ঞে।।

উদাহরণ ৬ : ভণ্ডরা পশুর মাংস খেতে চান।
তাই তাঁরা দিয়েছেন বলির বিধান॥

আত্মা, পরলোক ইত্যাদি নিয়ে ভাববাদীদের সঙ্গে বস্তুবাদীদের চিন্তারও মতের এই যে পার্থক্য, এটা নিছক দুটি মতের পার্থক্য নয়। এটা মতাদর্শগত পার্থক্য, মতাদর্শগত সংগ্রাম, সাংস্কৃতিক সংগ্রাম।

অধ্যায় : সতেরো

জাতিস্মররা হয় মানসিক রোগী, নয় প্রতারক

ছোটবেলা থেকেই হিন্দুরা পুরাণের গল্প, রামায়ণ-মহাভারতের গল্প, অবতারদের গল্প একনাগাড়ে শুনতে শুনতে ও পড়তে পড়তে একসময় বিশ্বাস করতে শুরু করি আত্মা অমর। মৃত্যুতেই সবকিছু শেষ হয়ে যায় না। আমরা আবার জন্মাই। আমাদের মধ্যেই কেউ কেউ পূর্বজন্মের স্মৃতি উদ্ধার করতে পারে। এদেরকেই বলি জাতিস্মর।

মুসলিম বা খ্রিস্টান ধর্ম যেহেতু পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে না, তাই তারা ছোটবেলা থেকেই এমন এক পরিবেশে মানুষ হয়, যেখানে পুনর্জন্মের কোনও স্থান নেই। সুতরাং বড় হয়ে ওঠার পর তাদের কাছে পুনর্জন্ম এক অবাস্তব চিন্তা।

পরামনোবিজ্ঞানীরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন। পূনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদ দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্ধ-বিশ্বাসের ওপর।

কিছু পরামনোবিজ্ঞানী দাবি করেন, তাঁরা সম্মোহন করে সম্মোহিত ব্যক্তির স্মৃতিকে পিছোতে পিছোতে শূন্য বয়স এবং জন্মলগ্ন অতিক্রম করে তার পূর্বজন্মের দিনগুলোতেও নিয়ে যেতে পারেন।

মনোবিজ্ঞান মনে করে কোনও একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে সম্মোহন করে তার হারিয়ে যাওয়া শৈশবের কিছু স্মৃতিকে আবার উদ্ধার করা সম্ভব। কারণ সম্মোহিত ব্যক্তির বেশ কিছু শৈশব স্মৃতি মস্তিষ্ক কোষে সঞ্চিত থাকে। যে-ভাবে স্মৃতি সঞ্চিত থাকে কম্পিউটারে। কম্পিউটারকে ঠিকমতো চালিয়ে যেমন সঞ্চিত স্মৃতি উদ্ধার করা সম্ভব, ঠিক তেমনি করেই সম্মোহনের সাহায্যে মানুযের অতীতের কিছু সঞ্চিত অথচ চাপা পড়ে থাকা স্মৃতিকে উদ্ধার করা সম্ভব।

মনোবিজ্ঞান সম্মোহনের সাহায্যে অতীত স্মৃতি উদ্ধারের তত্ত্বকে মেনে নিয়েছে। কিন্তু পূর্বজন্মের স্মৃতি উদ্ধারের তত্ত্বকে কখনই মেনে নেয়নি।

পরামনোবিজ্ঞানীদের কথামতো আত্মার শরীরও নেই, মস্তিষ্কও নেই। মস্তিষ্ক না থাকলে মস্তিষ্ক কোষও নেই। মস্তিষ্ক কোষ না থাকলে স্মৃতি জমা থাকার প্রশ্ন নেই। পূর্বজন্মের স্মৃতি উদ্ধারেরও প্রশ্ন নেই।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি, প্রমাণিত হবেও না। আত্মার অস্তিত্বই যখন নেই, তখন আত্মার পুনর্জন্ম আসছে কোথা থেকে?

ধরা গেল, কোনও ব্যক্তিকে সম্মোহিত করে তার মধ্যে যদি এই ধারণা সঞ্চারিত করা যায় যে, তিনি গতজন্মে রামবাবু ছিলেন। একুশ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন শ্যামাসুন্দরীকে। থাকতেন শ্যামপুকুরে। দুই ছেলে ও এক মেয়ের নাম ছিল যথাক্রমে হলধর, গুণধর ও লক্ষ্মী। চাকরি করতেন কলকাতা পুলিশে। একবার হাত ভেঙেছিল, আর একবার নাক। লক্ষ্মীর জন্মের পর একটা প্রমোশন পেয়েছিলেন একান্ন বছর বয়সে। প্রাণ গিয়েছিল ডাকাতের গুলিতে।

এইবার কিছু সাক্ষী-সাবুদের সামনে লোকটিকে আবার সম্মোহিত করে তার গত জন্মের বিষয় জানতে চাইলে তিনি মস্তিষ্কে সঞ্চারিত রামবাবুর কথাই বলে যাবেন।

ধরে নিলাম সম্মোহন করতে জানেন। তিনি যদি জাতিস্মরতা প্রমাণে জন্য কোনও মৃত ব্যক্তির বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে কোনও সম্মোহিত ব্যক্তির মস্তিষ্কে 'সাজেশন' পাঠিয়ে তথ্যগুলো সঞ্চারিত করলেন। পরবর্তীকালে লোকটিকে সম্মোহিত করে সঞ্চারিত তথ্যগুলোতেই আবার বলিয়ে নিতেই পারেন। সুতরাং, এখানে একটা বিরাট ফাঁকির সুযোগ থেকেই যাচ্ছে। সম্মোহনের সাহায্যে একজনকে জাতিস্মর বলে হাজির করার ফাঁকি।

সাধারণত দু-ধরনের জাতিস্মর দেখা যায়। **এক** : মানসিক রোগী। **দুই** : প্রতারক। সম্মোহন করে একজনের মস্তিষ্কে কোনও মৃতব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন ঘটনার তথ্যাদি ঢুকিয়ে না দিলেও দেখা যায় কিছু কিছু মানুষ হঠাৎ দাবি করেন, তাঁর পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। পরীক্ষা চালালে দেখা যাবে তথাকথিত পূর্বজন্মের মানুষটির জীবনের অনেক তথ্যই সত্য। এর কারণ ভূতে পাওয়া বা ঈশ্বরের ভরের মতই জাতিস্মর একটা মানসিক রোগমাত্র। সাধারণভাবে জাতিস্মরের দাবিদার মানসিক রোগীর অল্পবয়স্ক, কল্পনাপ্রবণ এবং আবেগপ্রবণ। এঁদের মস্তিষ্ককোষের স্থিতিস্থাপকতা বা সহনশীলতা এবং যুক্তি দিয়ে বিচার করার ক্ষমতা কম। সামাজিক, পারিবারিক ও পরিবেশগত কারণে পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। কোনও একজনের মৃত্যু ঘটনা তাঁদের বিশেষভাবে নাড়া দেয়। ঐ মৃতব্যক্তি ও তার বাড়ি, পরিবেশ, পরিবার, শৈশব, কর্মক্ষেত্র, পোশাক, মুদ্রাদোষ ইত্যাদি বিষয়ে একনাগাড়ে ভাবতে থাকলে, বিশেষ কিছু মস্তিষ্ককোষ বারবার উত্তেজিত হতে থাকে। এর ফলে অনেকসময় মস্তিষ্ককোষে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। তখন সে বিশ্বাস করে ফেলে আমিই ওই মৃত ব্যক্তি ছিলাম। এই সময় তথাকথিত জাতিস্মরের মা-বাবা যদি ভ্রান্ত ধারণার শিকার না হয়ে মনোরোগ চিকিৎসকের সাহায্য নেন, তবে রোগী তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে।

আবার অনেকসময় সন্তানকে বিখ্যাত করার তাগিদে অথবা কোনও ধনীর সম্পত্তির লোভে কিংবা ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছায় প্রমাণ করতে চান তাঁদের সন্তান বাস্তবিকই জাতিস্মর। বিখ্যাত হবার জন্য মা-বাবাই মৃতের তথ্য জেনে সন্তানকে সমস্ত তথ্য দিয়ে তাকে জাতিস্মরের ভূমিকায় অভিনয় করান।

অধ্যায় : আঠারো

জাতিস্মর তদন্ত ১ : দোলনচাঁপা

ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়ান স্টিভেনসন তাঁর 'কেসেস অব দ্য রিইকারনেশন টাইপ' বইটির প্রথম খণ্ডে একটি বাঙালি মেয়ে দোলনচাঁপা মিত্র অনেকখানি জায়গা দখল করে রয়েছে। স্বামী লোকেশ্বরানন্দের 'লাইফ আফটার ডেথ' বইটিতেও রয়েছে দোলনচাঁপার উল্লেখ। ইতিপূর্বে দোলানচাঁপার জাতিস্মর ক্ষমতার কথা প্রকাশিত হয়েছে ভারতের জনপ্রিয় একটি দৈনিক পত্রিকাসহ আরও বেশ কিছু পত্র-পত্রিকায়। ভারতবিখ্যাত পরামনোবিজ্ঞানী হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দোলানচাঁপার বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। দোলানচাঁপার জাতিস্মর হয়ে ওঠা নিয়ে আমিও দীর্ঘ অনুসন্ধান চালাই।

দোলনের জন্ম ১৯৬৭ সালের ৭ আগস্ট। বাবা মানিক মিত্র নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন-এর গ্রামসেবক ট্রেনিং সেন্টারের লেকচারার।' ১৯৭১-এর গ্রীষ্মের এক দুপুরে মা কণিকাদেবী দোলনর মুখ থেকে প্রথম জানতে পারেন, দোলন নাকি আগের জন্মে বর্ধমান শহরের এক ধনী পরিবারে বুল্টি নামের একটি ছেলে ছিল। মা ছিলেন সুন্দরী। নিজেদের মন্দির ছিল। বিরাট করে পুজো হতো। বাড়িতে ময়ূর ছিল, হরিণ ছিল। কলেজে পড়তে একবার অসুখ করে। মাথার পেছনে ব্যথা হতো। কলকাতার হাসপাতালে বহুদিন ছিল। ডাক্তাররা রোগ ধরতে পারেননি। ওই রোগই বুল্টি মারা যায়।

১৯৭১-এ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর নির্দেশে মানিকবাবু ও কণিকাদেবী দোলনকে নিয়ে বর্ধমানে যান। শহর ঘুরেও দোলন বুল্টির বাড়ি খুঁজে বের করতে পারেনি। ফিরে আসার পর দোলন নিজের মাথার পেছনে ব্যথা অনুভব করতে থাকে। ১৯৭২-এর ' ৩০ মার্চ দোলনের দ্বিতীয়বার বর্ধমান যাত্রা। এবার দোলনকে একটি অন্নপূর্ণা মন্দিরের কাছে নিয়ে যেতে সে চিৎকার করে ওঠে, মা, মা, এই সেই মন্দির। কাছের বিশাল বাড়িটিকে দেখিয়ে জানায়, এটাই বুল্টিদের বাড়ি। দোলন ও তার মা-বাবার দাবি, দোলন বুল্টিদের বাড়ির দেওয়ালে ঝোলানো গ্রুপ ছবি থেকে বুল্টির বাবাকে চিনিয়ে দিয়েছিল। বুল্টির মা, ছোটভাই শিশির ও ছোট বোন রীতাকে চিনিয়ে দিয়েছিল। বুল্টি নামে সত্যি ওই পরিবারের একটি ছেলে

মাথার যন্ত্রণার চিকিৎসা করাতে গিয়ে মারা যায়।

দোলনচাঁপার বিষয়ে আমি একটি দীর্ঘ অনুসন্ধান চালাই। এর আগে ইয়ান স্টিভেনসেন ও ডঃ হেমেন্দ্রনাথ যে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন তাতে বুল্টিদের পরিবারের তরফ থেকে তাঁরা না কি কোনও সহযোগিতা পাননি। আমি অবশ্য বুল্টিদের পরিবারের কাছ থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছি। ফলে দোলনের দাবির যথার্থতা পরীক্ষা করার সুযোগ আমার পক্ষে ছিল বেশি। দোলনের অনেক দাবি কাঁটায় কাঁটায় ঠিক বলে যাঁরা সাক্ষ্য নিয়েছিলাম তাঁরা সকলেই একমত দোলন খাঁটি জাতিস্মর দোলনদের অনেক দাবিকেই এককথায় নাকচ করে দিয়েছেন বুল্টির বাবা অনাথ দে, ভাই শিশির দে এবং কাকা অনিল দে। নাকচ করে দেওয়া দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বুল্টির বাবা ভাই ও মাকে চিনিয়ে দেওয়ার ঘটনা।

বালিকা দোলন

এর পরেও অনেকের কাছেই যে-সব প্রশ্ন সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয় তা হল দোলন বুল্টিদের বাড়ি চিনল কী করে? বাড়িতে বুল্টি নামের কোনও ছেলে যে

ছিল এবং মাথা ব্যথার একটা অসুখে মারা যায় তা জানল কী করে? দোলনের মাথায় ব্যথা হতো কেন? বাড়ির সামনের মন্দিরের হদিসই বা জানল কী করে?

দোলনের মা ও বাবা কণিকাদেবী এবং মানিকবাবু আমাকে জানিয়েছিলেন, দোলনকে নিয়ে প্রথম বর্ধমান যাত্রার আগে তাঁরা কোনও দিন বর্ধমান যাননি। অনাথবাবু অর্থাৎ বুল্টিদের পরিবারের কারুর সঙ্গেই মানিকবাবুদের পরিবারের পরিচয় ছিল না। অতএব কেউ যদি বলেন—দোলন কারও কাছ থেকে বুল্টির কথা শুনেছিল এবং বুল্টির কাহিনি তাকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল। ফলে বুল্টির কথা ভাবতে ভাবতে মস্তিষ্ককোষের কাজকর্মে বিশৃঙ্খলতার জন্য দোলন নিজেকে বুল্টি বলে ভাবতে শুরু করেছিল। মনোবিজ্ঞানের এই যুক্তি দোলনের ক্ষেত্রে খাটে না বলে মানিক মিত্রের বিশ্বাস।

বুল্টি ও তার পরিবারের বিভিন্ন ঘটনা দোলনের শোনার সম্ভাবনা ছিল কিনা, এটাই দোলনের জাতিস্মরতার দাবির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। আমি এ-ক্ষেত্রে অন্তত পাঁচটি পরিবারের নাম হাজির করছি যাঁরা দোলন ও বুল্টি উভয় পরিবারেরই পরিচিত।

(১) নীলাচল সামন্ত। মানিক মিত্রের বন্ধু। বুল্টির ঠাকুরদার পরিচিত। (২) স্বপ্না সামন্ত নীলাচল সামন্তর স্ত্রী। স্বপ্নাদেবীর বোন বুল্টির আত্মীয়ার বন্ধু। (৩) শশাঙ্ক ঘোষ। মানিকবাবুর বন্ধু। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষক। দে পরিবারের বিষয়ে জানতেন। (৪) ডাঃ হেমাঙ্গ চক্রবর্তী। নরেন্দ্রপুরের বাসিন্দা। মানিকবাবুদের সঙ্গে হেমাঙ্গবাবুদের পারিবারিক সখ্যতা ছিল। হেমাঙ্গবাবু ছিলেন বুল্টির বাবার বন্ধু। হেমাঙ্গবাবুর ছেলে ছিল বুল্টির বন্ধু। দোলনেরও পরিচিত (৫) রাজেন্দ্র চক্রবর্তী। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। মানিকবাবুর পারিবারিক বন্ধু। বুল্টিদের জানতেন। (৬) কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিকবাবুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বর্ধমানের মানুষ। দে পরিবারের অনেক কিছুই জানতেন।

এঁদের মধ্যে কেউ কোনও দিন দোলনের উপস্থিতিতে বুল্টির বিষয়ে কোনও কিছুই বলেননি, এমন নিশ্চিত হওয়ার মতো কোনও তথ্য আমার হাতে নেই। দোলনের মাথায় ব্যথা হওয়ার কারণের পেছনেও অপার্থিব কিছু নেই। কিছু মানুষ বিশেষ গঠন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এঁরা আবেগপ্রবণ, মস্তিষ্ককোষের সহনশীলতা এঁদের কম। বিশেষ আবেগপ্রবণতার জন্য অনেক সময় এঁরা নিজেদের অজান্তে স্বনির্দেশ পাঠিয়ে অন্যের ব্যথা নিজের শরীরে অনুভব করেন। মানসিক চিকিৎসকদের কাছে এই ধরনের বহু ঘটনার বিবরণ পাওয়া যাবে। দোলন অ আ ক খ থেকেই পড়াশুনো শুরু করেছিল। দোলন বাস্তবিকই জাতিস্মর হলে তার পূর্বজন্মের অন্যান্য স্মৃতির মধ্যে লেখা-পড়ার স্মৃতিও উজ্জ্বল থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। একজন মানসিক বিশৃঙ্খলার জন্য নিজেকে অন্য কেউ ভেবে তার ব্যবহার অনুকরণ করতে পারে।

কিন্তু তার জ্ঞান প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। দোলনের ক্ষেত্রেও এমনটাই ঘটেছিল। দোলন বুল্টিদের বাড়ি চিনিয়ে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তারমধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা ছিল না। দোলনকে যে মন্দিরের সামনে দাঁড় করানো হয়েছিল, তার আশে-পাশে বুল্টিদের বাড়িই সবচেয়ে বড়।

জাতিস্মরতা বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষার কোনও বিষয়ই নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, যার কোনও বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিই নেই, তখন তা নিয়ে গবেষণা করব কেন? তবু আমি করেছিলাম এবং ভবিষ্যতেও করব। অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, সাধারণ মানুষদের অন্ধ বিশ্বাসকে ভাঙতে এই ধরনের সত্যানুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

জাতিস্মর তদন্ত ২ : জ্ঞানতিলক

এবার যে ঘটনার কথায় আসছি, তার নায়ক চরিত্রে রয়েছে ইয়ান স্টিভেনসন ও ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নায়িকা শ্রীলঙ্কার ছ-বছরের মেয়ে জ্ঞানতিলক। মেয়েটি নাকি পূর্বজন্মে ছিল তিলকরত্ন। ১৩ বছর ৯ মাস বয়সে তিলকরত্ন মারা যায়। তিলকরত্নের মৃত্যুর ৫ মাস পরে জ্ঞানতিলকের জন্ম। ১৯৬০ সালের নভেম্বর স্টিভেনসন ও ড: বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়েটিকে তার পূর্বজন্মের ওপর ৬১টি প্রশ্ন করেছিলেন। ৪৬টি প্রশ্নের উত্তর ঠিক দিয়েছিল। এবং শুধুমাত্র বেশি সংখ্যায় ঠিক উত্তর দেওয়াকেই জাতিস্মরের অভ্রান্ত প্রমাণ হিসেবে এই দুই পরামনোবিজ্ঞানী গ্রহণ করেছিলেন। জ্ঞানতিলক যেসব প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিয়েছিল তার গুটিকতক নমুনা আপনাদের সামনে হাজির করছি,

(১) আমার বাবা ছিল
(২) আমার মা ছিল।
(৩) সমুদ্র দেখেছি।
(৪) সমুদ্রের রঙ সবুজ ও নীল
(৫) সমুদ্রের ধারে গাছ আছে।
(৬) গাছগুলো নারকোল গাছ।
(৭) সমুদ্রের পাড়ে বালি আছে।
(৮) আমার বোন ছিল।
(৯) ছোটবেলায় বোনকে মেরেছি।
(১০) স্কুলে যেতাম।
(১১) মা ছিলেন ফর্সা।
(১২) পোস্ট অফিসে গিয়েছি।

এমন সব উত্তর জানতে চাওয়ার সার্থকতা কী আমার ঠিক মাথায় ঢুকল না।

পরামনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন, জ্ঞানতিলক সমুদ্র দেখেনি, অথচ সমুদ্রের জলের রঙের সঠিক বর্ণনা দিয়েছে। সমুদ্রের পাড়ে যে নারকেল গাছ তাও বলতে পেরেছে। সমুদ্রকূলে বালির বর্ণনাও সঠিক দিয়েছে। এই সবই বলতে পেরেছে পূর্বজন্মের তিলকরত্নের সমুদ্র দেখার স্মৃতি উদ্ধার করে।

সমুদ্র না দেখলে কী সমুদ্রের বর্ণনা দেওয়া যায় না। নিউ ইয়র্ক না দেখলেও কী নিউ ইয়র্কের বিরাট উঁচু উঁচু বাড়ির বর্ণনা করা অসম্ভব? রবীন্দ্রনাথকে মুখোমুখি না দেখলেও কী তাঁর চেহারা আমাদের অপরিচিত?

একটা চার-পাঁচ বছরের বাচ্চাকে হাতি, বাঘ, ভালুক, ঘোড়া, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, ট্রেন—এইসব নানা ধরনের জিনিসের ছবি দেখিয়ে দেখবেন আপনার বয়স্ক চোখের চেয়েও ওদের চোখ অনেক বেশি ডিটেলস-এর দিকে নজর রাখে। ছোটদের ছবি আঁকতে তার পছন্দমতো রঙের মাঝখানে বসিয়ে দিন, দেখবেন, অনেক সময় ওদের ডিটেলসের কাজ আপনাকে অবাক করে দেবে। একটা ছোট-শিশুকে নদী, পাহাড়, সমুদ্রের রঙচঙে ছবি দেখাবার পর তাকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, সে প্রত্যেকটারই সঠিক বর্ণনা দিয়ে দেবে। জ্ঞানতিলক কোনও দিনই কোনও সমুদ্রের রঙিন ছবি দেখেনি, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

জ্ঞানতিলককে যে অনেক কিছু আগে থেকেই শেখানো হয়েছিল এই ধরনের অনুমান করার মতো অনেক ধারণা আছে।

পরামনোবিজ্ঞানীদ্বয়ের সেরা জাতিস্মর জ্ঞানতিলক কিন্তু তার জাতিস্মর ক্ষমতা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে পারেনি।

জাতিস্মর তদন্ত ৩ : ফ্রান্সিস পুনর্জন্ম

১৯৭৭-এর এপ্রিলে শ্রীলঙ্কার কিছু খবরের কাগজে একটি জাতিস্মরের খবর প্রকাশিত হয়ে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে। খবরে বলা হয়—মা তারা কাছেরীর মৃত কেরানি ফ্রান্সিস কোদিতুয়াক্কু তিন বছর আগে জন্ম নিয়েছে কান্দাগোদার এক পরিবারে। ফ্রান্সিস মারা যান ১৯৭৩-এর ১৬ এপ্রিল ৫২ বছর বয়সে।

কিছু পরামনোবিজ্ঞানী, গবেষক ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শিশুটিকে পরীক্ষা করে জানান—ও সত্যিই জাতিস্মর। ফ্রান্সিসের জীবনের খুঁটিনাটি অনেক ঘটনা ও বর্ণনা করেছে, সেই সঙ্গে চিনিয়েও দিয়েছে পূর্বজন্মের স্ত্রী ও দুই ছেলেকে।

শ্রীলঙ্কার র‍্যাশান্যালিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন শিশুটির জাতিস্মর ক্ষমতা পরীক্ষা করতে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসের বাড়ির সঙ্গে শিশুটি আগেই পরিচিত ছিল। বেশ কয়েকবার ওই বাড়িতে গিয়েছে। ফ্রান্সিসের স্ত্রী ও দুই ছেলেকেও ভালোমতো চেনে। অতএব র‍্যাশান্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা একটু অন্যরকমভাবে

পরীক্ষা নিলেন। তাঁরা ফ্রান্সিসের অফিসের সহকর্মীদের একটি গ্রুপ ছবি সংগ্রহ করে হাজির করলেন ছোট ছেলেটির কাছে। ওই ছবির কোনও সহকর্মীকেই চিনতে পারল না ছেলেটি। ফ্রান্সিসের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন ধর্মদাস। ধর্মদাসের কাছে হাজির করা হলো ছেলেটিকে। না, এবারও চিনতে পারল না। ফ্রান্সিসের জীবনের ওপর ৭০টি প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, ৪টি মাত্র প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছিল ছেলেটি। গোটাটাই যে একটা সাজানো ব্যাপার তা বুঝতে মোটেই অসুবিধে হয় না। কাউকে ঠাকাবার ইচ্ছা থাকলে একজন মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর জেনে নিয়ে সেগুলো একটি বালক-বালিকাকে ভালোমতো শিখিয়ে-পড়িয়ে তার অতীত জীবনের স্মৃতি বলে চালানো মোটেই কঠিন কাজ নয়। আদিম মানুষের অজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল আত্মার, আর শাসক ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের শোষণের সুবিধের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল পূর্বজন্মের কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ।

জাতিস্মর তদন্ত ৪ : সুনীল দত্ত সাক্সেনা

সুনীল দত্ত সাক্সেনা আর এক বিশ্বখ্যাত জাতিস্মর। সুনীলের জাতিস্মর ক্ষমতার কথা প্রথম প্রকাশিত হয় ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় ১৯৬৪'র ৩ জানুয়ারি। সুনীলের জন্ম উত্তরপ্রদেশের ছোট্ট শহর আওনলায় ১৯৫৯-এর ৭ অক্টোবর। ১৯৬৩ সাল থেকে সুনীল নাকি জানাতে থাকে সে আগের জন্মে বুধায়ুন শহরের আদিবাসী ছিল। বুধায়ুন আওনলা থেকে মাত্র ৩৫ কিলোমিটার দূরে। সুনীলের বাবার সম্পর্কে কাকা এস. প্রসাদ বুধায়ুনের বাসিন্দা। তাঁর বাড়িতেই সুনীলকে আনা হয়। এখানে এসে এক এক করে সুনীল অনেক কথাই জানায়। সে ছিল বিশাল ধনী। বিশাল বাড়ি ছিল, ঘোড়া ছিল, মোটর গাড়ি ছিল, ফ্রিজ ছিল, ফ্যাক্টরি ছিল। কলেজ প্রতিষ্ঠা করছিল। কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বন্ধু পাঠকজি। চার বিয়ে। তিন স্ত্রীর মৃত্যুর পর চতুর্থ বিয়ে। দুই ছেলে। একটি নিজের, একটি পোষ্য। চতুর্থ স্ত্রী জলে বিষ মিশিয়ে খাইয়েছিলেন। তাতেই মৃত্যু। আগের জন্মে ছিল কিষেণ।

সুনীলের জাতিস্মর ক্ষমতার খবর বুধায়ুনে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। সাধারণ মানুষের প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল সুনীল। তাঁরা ধরে নিলেন কিষেণ বলতে সুনীল শেঠ শ্রীকৃষ্ণজিকেই বোঝাচ্ছে। শেঠ শ্রীকৃষ্ণজির মৃত্যু সুনীলের জন্মের আগেই। তিনি বুধায়ুনের বিশিষ্ট ধনী। কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অধ্যক্ষ পদে বসিয়েছিলেন বন্ধু পাঠকজিকে। তৃতীয় পত্নীর মৃত্যুর পর ১৯৪৩ সালে শেঠজি বিয়ে করেন যোড়শী সুন্দরী শকুন্তলাদেবীকে। শেঠজির দুই ছেলে। বড় দত্তকপুত্র শ্যামপ্রসাদ, ছোট তৃতীয় পত্নীর পুত্র রামপ্রসাদ। সুনীলের দেওয়া আর অনেক তথ্যই মিলে যাচ্ছে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে সুনীলের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯৬৪-র ডিসেম্বরে দুই পরামনোবিজ্ঞানী ইয়ান স্টিভেনসন এবং পি পাল সুনীলের বিষয়ে অসুসন্ধানে

নামেন। ১৯৭৪-এ অনুসন্ধানে নামলেন আর এক পরামনোবিজ্ঞানী ডঃ এল পি মেহেরোত্রা। অনুসন্ধান শেষে তিনজনের দাবি সুনীল জাতিস্মর। সুনীলের দেওয়া বেশির ভাগ তথ্যই না কি আশ্চর্য রকমের ঠিক। সুনীল না কি শ্রীকৃষ্ণজির পুরনো বন্ধু এবং কর্মচারিদের চিনতে পেরেছিলেন। ইয়ান স্টিভেনসন তো সুনীলকে নিয়ে বই-ও লিখে ফেললেন। পৃথিবীজুড়ে হই-চই পড়ে গেল।

সুনীলকে নিয়ে প্রকাশিত তিন পরামনোবিজ্ঞানীর রিপোর্ট পড়েছি। এই প্রসঙ্গে শকুন্তলাদেবী, রামপ্রসাদ, শ্যামপ্রসাদ, শেঠ শ্রীকৃষ্ণ কলেজের অধ্যক্ষ নরেন্দ্রমোহন পাণ্ডে, ওই কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও শেঠজির বন্ধু এস পি পাঠকের বক্তব্যও জেনেছি। তাঁদের বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে রামপ্রসাদ, শ্যামপ্রসাদসহ শেঠজির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের প্রায় সকলকেই চিনতে ব্যর্থ হয়েছিল সুনীল। সুনীলকে শেঠজির প্রতিষ্ঠিত কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অধ্যক্ষের চেয়ারে বসা নরেন্দ্রমোহন পাণ্ডেকে পাঠকজি বলে সুনীল চিহ্নিত করেছিল। পাঠকজি ছিলেন শেঠজির জীবনদশায় কলেজের অধ্যক্ষ। রামপ্রসাদ সুনীলকে শেঠজির মোটরগাড়ির ও ঘোড়ার রঙ কী ছিল, জিজ্ঞেস করায় সুনীল জানিয়েছিল গাড়ি ও ঘোড়ার রঙ ছিল কালো। শকুন্তলাদেবী এবং রামপ্রসাদের জবানিতে জানতে পারি গাড়ির রঙ ছিল চকোলেট এবং ঘোড়ার রঙ ঘন বাদামী। এঁদের জবানিতে আরও জানা যায় শেঠজি কোনদিনই ফ্রিজ ব্যবহার করেননি।

এরপরেও অনেকের মনেই এ-প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঁকি দিতে পারে, যে-সব তথ্য সুনীল সঠিক দিয়েছিল জাতিস্মর না হলে সেগুলো জানল কি করে? এখানেও আমি লক্ষ্য করেছি শেঠ শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে তথ্যগুলো জানার সমস্তরকম সম্ভাবনাই সুনীলের ছিল। সুনীলের বাবার সম্পর্কে কাকা এস. প্রসাদ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণজির যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ। প্রসাদজির সঙ্গে সুনীলদেরও সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। সুনীলের কাকা জয়নারায়ণ সাক্সেনা ছিলেন ছিলেন রাজ্যের এক মন্ত্রীর পি-এ এবং শ্রীকৃষ্ণজির বিষয়ে তিনি ভালোমতোই ওয়াকিবহাল ছিলেন। সুনীলের বাবা সি এল সাক্সেনা যে স্টোরেজে কাজ করতেন, তার মালিক ছিলেন শেঠ শ্রীকৃষ্ণেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু শিবনারায়ণ দাস। এঁদের কারও কাছ থেকে শেঠজির বিষয় শুনে নিজেকে শেঠজি বলে ভাবতে ভাবতে বিশ্বাস করার সম্ভাবনা সুনীলের ক্ষেত্রে রয়েছে। এটাও অসম্ভব নয় যে শেঠজির বিশাল সম্পত্তিতে ভাগ বসাবার লোভই সুনীলকে পূর্বজন্মের শ্রীকৃষ্ণজি বলে হাজির করা হয়েছিল।

শেঠজির মৃত্যুর পর শকুন্তলাদেবী শেঠজির দত্তক-পুত্র শ্যামাপ্রসাদকে বিয়ে করায় শকুন্তলাদেবী নাবালক রামপ্রসাদের অভিভাবকত্ব হারান এবং সম্পত্তি নিয়ে একটা গোলমাল পাকিয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে সুনীলের পরিবারের তরফ থেকে সুনীলকেই শেঠজি হিসেবে হাজির করে পত্র-পত্রিকায় ও স্থানীয় মহলে এমন একটা

সোরগোল তোলা হয়েছিল যে, স্থানীয় জনগণ সুনীলকে বাস্তবিকই শেঠজি বলে গ্রহণ করেছিলেন।

রামপ্রসাদ এবং পাঠকজি স্পষ্টতই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন সুনীলের এই জাতিস্মরের দাবির পেছনে শেঠজির সম্পত্তি দাবির অভিসন্ধি লুকনো ছিল। অর্থাৎ সুনীলের ক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনাই থেকে যাচ্ছে। হয় সে মানসিক রোগী, অথবা প্রতারক।

জাতিস্মর তদন্ত ৫ : প্রদীপ

প্রদীপের জন্ম ১৯৮৩-তে। এরই মধ্যে বিভিন্ন হিন্দি পত্র-পত্রিকার কল্যাণে প্রদীপ জাতিস্মর হিসেবে যথেষ্ট প্রচার পেয়েছে। প্রদীপের বাড়ি উত্তরপ্রদেশের আলিগড় জেলার সীতামাই গ্রামে। গ্রামের প্রায় সকলেই গরিব ভূমিহীন কৃষক।

প্রদীপরাও এর বাইরে নয়, প্রদীপের বাড়ি বলতে মাটির চার দেওয়ালের ওপর খড়ের চাল।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানতে পারা যায়, প্রদীপ হঠাৎ-ই একদিন বলতে শুরু করল, ওর গত জন্মের নাম ছিল কুল্লো লালা। থাকত মেদু গ্রামে। ব্যবসা করত। যথেষ্ট ধনী ছিল।

প্রদীপের কথায় কেউই মাথা ঘামায়নি। বাচ্চা ছেলের খাম-খেয়ালি বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। মেদু সীতামাই থেকে বারো কিলোমিটার দূরে। মেদুর এক ফলওয়ালা ফেরি করে ফল বিক্রি করত। সীতামাইতেও যেত ফলের পসরা নিয়ে। সেখানে প্রদীপের মুখে কুল্লো লালা ও মেদু গ্রামের কথা শুনে চমকে উঠল। সত্যিই তো মেদু গ্রামে কুল্লো লালা ছিলেন! ১৯৮০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর চম্বলের ডাকাতদের গুলিতে মারা গেছেন। কতই বা বয়স তখন কুল্লোর? বছর বত্রিশ।

ফলওয়ালা প্রদীপের কথা জানাল কুল্লোর দাদা মুন্না লালাকে। মুন্নাও ধনী ব্যবসায়ী। নিজের ধান্দাতেই ব্যস্ত থাকেন। প্রদীপের কথা কানে গেল কুল্লোর স্ত্রী সুধা ও দুই ছেলে রবিকান্ত ও প্রকাশের। প্রধানত সুধা রবি ও প্রকাশের আগ্রহে মুন্না লালা একদিন ফলওয়ালার সঙ্গে সীতামাই গেলেন। প্রদীপের সঙ্গে দেখা করতেই বিস্মিত হলেন। প্রদীপ মুন্নাকে চিনতে পেরেছিল কুল্লোর দাদা বলে। মুন্না প্রদীপকে মেদুতে নিয়ে এলেন।

মেদুতে এসে আরও অনেক চমক দেখাল প্রদীপ। চিনতে পারল স্ত্রী সুধাকে, দুই ছেলে রবিকান্ত ও প্রকাশকে। কুল্লো লালা ফিরে এসেছেন শুনে তাঁর পরিচিতেরা অনেকেই এমন এক বিস্ময়কর ঘটনাকে নিজের চোখে দেখতে ছুটে এলেন। প্রদীপ প্রত্যেককে চিনতে পারল। প্রত্যেক ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক্। প্রদীপ একটা তাক থেকে কিছু টাকা বের করল। যে টাকা মৃত্যুর আগে কুল্লো রেখেছিল। এই টাকার হদিস কুল্লো ও সুধা ছাড়া আর কারোরই জানা ছিল না।

পত্র-পত্রিকায় এই জাতীয় প্রতিবেদন পড়ার পর সাধারণ মানুষ মাত্রেই ধরে নিয়েছিলেন আত্মা যে অমর, পুনর্জন্ম আছে তারই অব্যর্থ প্রমাণ এই প্রদীপ। প্রদীপের জাতিস্মর রহস্যের উন্মোচন করা ছিল যুক্তিবাদীদের কাছে চ্যালেঞ্জ। যুক্তিবাদী এডামারুকু তথ্যানুসন্ধানে হাজির হলেন মেদু গ্রামে। মুন্না লালা তাঁর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, খবরের কাগজের প্রতিবেদনগুলো সত্যি নয়। সম্ভবত রঙ-চঙে গল্প ফেঁদে পাঠকদের আকর্ষণ করার জন্য ওইসব লিখেছে। নতুবা এমনসব মিথ্যে লেখার কারণ কি থাকতে পারে?

মুন্নার কথায় আসল ঘটনা হলো, এক ফলবিক্রেতা প্রায় দিনই এসে ঘ্যান ঘ্যান করত—সীতামাই গ্রামে নাকি কুল্লো আবার জন্ম নিয়েছে প্রদীপ নামে। ও নাকি হলফ করে বলতে পারে প্রদীপই কুল্লো। ফলবিক্রেতার কথায় একটুও বিশ্বাস করিনি, একটুও আমল দেইনি। তবু দিনের পর দিন ও এসেছে। একই কথা বলে গেছে। শেষ পর্যন্ত কুল্লোর স্ত্রী ও ছেলেদের কথায় প্রদীপকে দেখতে গেছি, সঙ্গী হয়েছিল ওই ফলবিক্রেতা।

প্রদীপের বাড়ি গিয়ে এই ফলবিক্রেতা আমাকে দেখিয়ে বলেছিল, আমি কুল্লোর বড় ভাই মুন্না, আমাকে প্রদীপ চিনতে পারছে কিনা?

প্রদীপ বলেছিল, চিনতে পারছে, তারপরই একদৌড়ে খেলতে চলে গিয়েছিল।

প্রশ্ন—প্রদীপকে আপনি মেদুতে নিয়ে আসার পর আপনার কি মনে হয়েছিল ও কুলো?

উত্তর—না মশাই আমি প্রদীপকে আদৌ নিয়ে আসিনি, আমি সীতামাই থেকে ফিরে আসার পর হঠাৎই একদিন প্রদীপকে নিয়ে ওর মা-বাবা ও সেই ফলবিক্রেতা এসে হাজির। সেই সময় ও অবশ্য আমাকে চিনতে পেরেছিল।

প্রশ্ন—ওর পূর্বজন্মের স্ত্রীকে কি চিনতে পেরেছিল?

উত্তর—না। প্রদীপের বাবা প্রদীপকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বলো তো তোমার আগের জন্মের বউয়ের নাম কী?

উত্তরে প্রদীপ জানিয়েছিল—সুধা। ওর মুখে 'সুধা' নামটা শুনে আমাদের পরিবারের সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পরে অবশ্য মনে হয়েছে—প্রদীপকে হয়তো শেখানো হয়েছিল ওর আগের জন্মের স্ত্রীর নাম সুধা। কাছাকাছি গ্রাম। সুতরাং এ-সব বাড়ির খবর কারও জানার ইচ্ছে থাকলে নিশ্চয়ই জেনে নিতে পারে।

মুন্না জানিয়েছেন, প্রদীপের তাক থেকে টাকা বের করার কথাটা একেবারেই গপ্পো কথা।

মুন্না আরও জানালেন, পত্র-পত্রিকায় যেভাবে লেখা হয়েছে প্রদীপ কুল্লোর ছেলেদের ও পরিচিতজনদের চিনতে পেরেছিল, ব্যাপারটা ঠিক তেমনভাবে

ঘটেনি। কুল্লোর পরিচিতজনেরা ও দুই ছেলে প্রদীপকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের অনেকেই প্রশ্ন করছিল—আমাকে চিনতে পারছ?

প্রদীপ একসময় উত্তর দিয়েছিল—তোমাদের প্রত্যেককে আমি চিনতে পারছি।

সুধা জানিয়েছিলেন, প্রদীপ তাঁকে সুধা বলে চিনতে পেরেছিল—কথাটা ঠিক নয়। প্রদীপ জানিয়েছিল তার আগের জন্মের স্ত্রীর নাম সুধা।

প্রশ্ন—আপনি কি প্রদীপকে কোনও প্রশ্ন করেছিলেন?

উত্তর—হ্যাঁ, বিয়ের রাতে আমার স্বামী আমাকে যে আংটিটা দিয়েছিলেন, সেটা দেখিয়ে প্রদীপকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলো তো এটা কবে আমাকে দিয়েছিলে?

প্রশ্ন—কি উত্তর দিল?

উত্তর—আমার আংটিটা দেখে কোনও উত্তর না দিয়ে বলল—পরে বলব। কিন্তু আর বলেনি।

রবিকান্ত ও প্রকাশ জানালেন—তাঁদের দু'জনকে প্রদীপ চিনতে পারেনি। কুল্লোর দুই ছেলের নাম বলেছে। এ তো সামান্য চেষ্টাতেই আগে থেকে জেনে নেওয়া সম্ভব। প্রদীপ আগের জন্মে বাবা ছিল, এমনটা মেনে নিতে দু'জনেরই ঘোরতর আপত্তি আছে।

প্রতিবেদক সীতামাই গ্রামে প্রদীপের বাড়ি হাজির হয়েছিলেন মিথ্যে পরিচয়ে—কুল্লো লালার আত্মীয়।

প্রদীপকে যখন প্রশ্ন করা হলো, "তোমার আগের জন্মের নাম কী ছিল?"

"কুল্লো লালা, তাই নয়?" বলে প্রদীপ ওর মায়ের দিকে তাকাল।

"তোমার আগের জন্মের স্ত্রীর নাম কি ছিল?"

"সুধা বলো সুধা।" মা ও বাবা প্রদীপকে উত্তর যুগিয়ে দিলেন। প্রদীপ বলল, "হ্যাঁ সুধা।"

"যখন তুমি কুল্লো ছিলে তখন কোন কলেজে পড়তে মনে আছে? মথুরা কলেজ, না আলিগড় কলেজে?"

প্রদীপ মায়ের দিকে তাকাল।

প্রতিবেদকের আবার প্রশ্ন—"তুমি আলিগড় কলেজে পড়তে মনে পড়ছে না?"

প্রদীপ উত্তর দিল, "হ্যাঁ মনে পড়েছে। আলিগড় কলেজে পড়তাম।"

বাস্তবে কুল্লো ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছিলেন।

ফেরার সময় প্রতিবেদক ১৯৮৭ সালের মডেলের মারুতিতে উঠতে উঠতে প্রদীপকে বলেছিলেন, "মনে পড়ছে, এই গাড়িটা তুমি আগের জন্মে নিজেই চালাতে?"

প্রদীপ ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, মনে পড়েছে।"

বুঝুন? ১৯৮৭ সালের মডেল ১৯৮০ সালে মৃত কুল্লো চালাতেন?

লালা পরিবারের প্রত্যেকেরই সন্দেহ প্রদীপকে কুল্লো বলে চালাবার পেছনে

প্রদীপের পরিবার ও ফলবিক্রেতার গভীর কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে। সম্ভবত ধনী লালা পরিবারের ধনের লোভই প্রদীপকে কুল্লো সাজাতে চাইছে ওরা।

জাতিস্মর তদন্ত ৬ : কলকাতায় জাতিস্মর

গত শতকের তিনের দশকে কলকাতায় একটি বাঙালি মেয়েকে নিয়ে দস্তুরমত হইচই পড়ে গিয়েছিল। মেয়েটি নাকি জাতিস্মর। পত্র-পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হলো। মেয়েটি জানিয়েছিল, পূর্বজন্মে সে কলকাতা থেকে বহুদূরে একটি অখ্যাত পল্লীগ্রামে থাকত। মৃত্যু হয়েছিল জলে ডুবে। মেয়েটি তার পূর্বজন্মের নাম, বাবার নাম, ও গ্রামের নাম জানিয়েছিল। জলে ডুবে যাওয়ার ঘটনাটির একটা মোটামুটি বিশদ বিবরণ দিয়েছিল। মেয়েটির বাবা-মা স্পষ্টতই জানিয়েছিলেন, তাঁরা কেউ কোনও দিনই ওই গ্রামে যাননি। এমনকি ওই গ্রামের নাম পর্যন্ত শোনেননি। না, মেয়েটি তার পূর্বজন্মের বাবার যে নাম বলেছে তাঁর সঙ্গে কোনও রকম পরিচয় বা যোগাযোগ মেয়েটির পরিবারে সঙ্গে ছিল না। সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার! ওইটুকু মেয়ে কীভাবে বানিয়ে বানিয়ে বলেছে?

সত্য যাচাই করতে কলকাতা থেকে উৎসাহী সাংবাদিক গেলেন গ্রামটির সন্ধানে। আরও অনেক বিস্ময় সাংবাদিকটির জন্য অপেক্ষা করছিল। সত্যিই ওই নামের গ্রাম খুঁজে পেলেন। জানতে পারলেন, মেয়েটি পূর্বজন্মের যে নামটি জানিয়েছিল সেই নামের একটি লোক ওই গ্রামেই থাকত এবং পনেরো বছর আগে মারা যায় জলে ডুবেই। মৃতের বাবার নামও—মেয়েটি যা বলেছিল তাই।

মেয়েটির ক্ষেত্রে এমন ঘটনা কেন ঘটল? যতদূর জানা যায় তাতে প্রায় নিশ্চিতভাবেই সাংবাদিকেরা একথা বলতেই পারেন, বালিকাটির পক্ষে মৃত মানুষটির বিষয়ে এত কিছু জানার সম্ভাবনা ও সুযোগ ছিল না। আর ঘটনাটাও এমন টাটকা নয় যে, পত্রিকায় মৃত্যুর খবরটা পড়ে ছিল।

মনোবিজ্ঞানী বা মনোরোগ চিকিৎসকরা জন্মান্তরকে অস্বীকার করার তাগিদে অবশ্য জোর করে একটা তথ্য হাজির করার চেষ্টা করতে পারেন—মেয়েটি জলে-ডোবা মানুষটির বিষয়ে শুনেছিল এবং দুর্ঘটনার খবরটি তাকে আকর্ষণ করেছিল, ফলে মেয়েটির চিন্তায় ওই মৃত মানুষটি বারবার হানা দিত। বালিকার কল্পনাপ্রবণ, আবেগপ্রবণ মনে স্থিতিস্থাপকতা ও সহনশীলতা কম থাকার দরুন কল্পনাবিলাসী মন একসময় ভাবতে শুরু করে আমিই সেই মৃত মানুষটি। এই ভাবনাই কোনও একসময় বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়। মনোবিজ্ঞানীদের এমন ব্যাখ্যার পেছনে জানার সুযোগ চাই। এক্ষেত্রে যে সুযোগ তো অনুপস্থিত। অতএব?

এই জাতিস্মর রহস্য সন্ধানের জন্য ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু-কে অনুরোধ করেন একটি সংবাদপত্র। ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু ভারতে মনোরোগ চিকিৎসা এবং

মনোসমীক্ষণের অন্যতম পথিকৃৎ। ডাঃ বসু ঘটনাটির কারণ বিশ্লেষণের জন্য বালিকাটিকে পরপর ক'দিন পরীক্ষা ও মনঃসমীক্ষা করেন।

একদিনের ঘটনা ডাঃ বসু মেয়েটিদের বৈঠকখানায় বসে আছেন। হঠাৎই চোখে পড়ল ঐ ঘরের আলমারিতে কতকগুলো পুরনো বাঁধানো সাময়িকী ও পত্রিকার ওপর। আলমারি খোলা। সময় কাটাতে, নিছকই খেয়ালের বশে বাঁধানো সাময়িকীগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন, পাতা উলটাতে লাগলেন। একটা সাময়িকীর একটা পৃষ্ঠায় এসে ডাঃ বসু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ঐ পৃষ্ঠাতেই জনৈক গ্রামীণ সংবাদদাতা একটি জলে ডোবার ঘটনা জানিয়েছেন। গ্রামের নাম, মৃতের নাম ও তার বাবার নাম ও বিস্তৃত ঘটনাটি পাঠ করতে করতে পনের বছরের পুরনো। মেয়েটি যে ডাঃ বসুর মতোই কোনও এক অবসর সময়ে বাঁধানো বইগুলো টেনে নিয়ে পড়তে পড়তে এই ঘটনাও পড়ে ফেলেছিল এতে আর কোনও সন্দেহ নেই। তারপর ঐ ঘটনাটি নিয়ে ক্রমাগত ভাবতে ভাবতে অবচেতন মনে সেই জলে ডোবা মানুষটির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছিল।

ডাঃ বসু মেয়েটিকে ওই পৃষ্ঠাটি দেখানোর পর মেয়েটির স্মৃতি ধীরে ধীরে ফিরে আসে। ও জানায় লেখাটি আগে পড়েছিল। তবে লেখাটি পড়ার কথা ভুলে গিয়েছিল। মনে ছিল শুধু ঘটনাটি। তাই এতদিন অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল বলেছিল— জলে ডোবার ঘটনাটি শোনেনি। মেয়েটি ডাঃ বসুর আকস্মিকভাবে পাওয়া যোগসূত্রের কল্যাণে 'জাতিস্মর' নামক মানসিক রোগী হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যায়।

তবে স্বভাবতই সবসময় এমন আকস্মিক যোগাযোগ অনুসন্ধানীদের নাও জুটতে পারে। এই না জোটার অর্থ এই নয় যে, জাতিস্মরের বাস্তব অস্তিত্ব সম্ভব।

(জাতিস্মর নিয়ে আরও বহু 'কেস-হিস্ট্রি' ও সেসব নিয়ে বিস্তৃত অনুসন্ধান পাবেন 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে।)

অধ্যায় : উনিশ

প্ল্যানচেট (Planchette) বা প্রেত বৈঠক

যে পদ্ধতির সাহায্যে আত্মাকে আহ্বান করে আনা যায় বলে পরামনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, সেই পদ্ধতিকেই ওরা এবং বিদেহী আত্মায় বিশ্বাসীরা বলেন 'প্ল্যানচেট' (Planchette)। আত্মার সঙ্গে যোগাযোগকারী ব্যক্তিকে বলা হয় 'মিডিয়াম (medium)।

বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদীরা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। তাই অস্তিত্বহীন আত্মাকে আনার ব্যাপারে অর্থাৎ প্ল্যানচেটের কার্যকারিতায়ও আদৌ বিশ্বাসী নন। পাশ্চাত্যে একসময় 'প্ল্যানচেট চর্চা' বানিজ্যিকভাবে সফলতা অর্জন করেছিল। প্ল্যানচেট চর্চ্চা ভারতে ততটা জনপ্রিয়তা পায়নি। এদেশে তন্ত্রের রমরমা।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং প্রধানত ইউরোপ ও আমেরিকায় বিদেহী আত্মা আনার জন্য সাধারণত মিডিয়ামের সাহায্য নেওয়া হয়। এদের অনেকেই পেশাদার মিডিয়াম। মিডিয়ামের ওপর বিদেহী আত্মা ভর করে বলে এঁরা দাবি করেন।

মিডিয়াম বনাম জাদুকর

উনিশ শতকের শেষ দিকে প্ল্যানচেট নিয়ে নিউ-ইয়র্ক শহর উত্তাল হয়ে উঠেছিল। প্ল্যানচেটের ঢেউ শেষ পর্যন্ত আছড়ে পড়েছিল আদালত কক্ষে।

কাহিনির নায়িকা সম্ভ্রান্ত শ্রীমতী ডিস-ডেবার একজন অসাধারণ মিডিয়াম, বহু বিখ্যাত আত্মার যোগাযোগ মাধ্যম। প্ল্যানচেটের আসরে রাফায়েল,লিওনাদো-দ্য-ভিঞ্চি প্রমুখ অনেক বিখ্যাত শিল্পীর আত্মাকেই তিনি শুধু নিয়ে আসেননি, তাঁদের আত্মাকে দিয়ে ছবিও আঁকিয়ে নিয়েছেন। শেক্সপিয়ারের আত্মা তাঁর প্রকাশিত রচনার অংশবিশেষ আবৃত্তি করেছেন। শুনিয়েছেন আত্মার রচিত নতুন কবিতা। নিয়ে এসেছেন—অষ্টম-নবম শতাব্দীর দিগ্বিজয়ী সম্রাট শলেমন বা শার্লমেন-এর আত্মাকে। সাদা একটুকরো কাগজকে চার ভাঁজ করে শ্রীমতি ডিস-ডেবারের কপালে ছোঁয়াতেই ঘটে গেছে অলৌকিক ঘটনা। সাদা কাগজ খুলতেই দেখা গেছে, আত্মা এসে লিখে রেখে গেছে। সাদা-পাতার রাইটিং-প্যাড প্ল্যানচেট চক্রে রেখে দেখা গেছে পাতার পর পাতা লেখায় ভর্তি করে গেছে আত্মারা।

নিউ ইয়র্কের ধনকুবের আইন-ব্যবসায়ী লুথার মার্শ তাঁর ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ-এর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর কন্যার বিদেহী আত্মার অনুরোধে শ্রীমতী ডিস-ডেবারকে দানপত্রের দলিল করে অর্পণ করলেন। ওমনি মার্শের নিকট আত্মীয়রা ডিস-ডেবারের বিরুদ্ধে মার্শকে প্রতারণার অভিযোগ আনলেন আদালতে।

ডিস-ডেবার এতে সামান্যতম বিচলিত তো হলেনই না, বরং, এই ঘটনাটিকে প্রচারের বিরাট সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন। স্থানীয় সমস্ত পত্রিকা এমন অসাধারণ মিডিয়ামের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ নিয়ে নানা খবরে পাতা ভরাতে লাগল, সাংবাদিকদের কাছে ডিস-ডেবার ঘোষণা করলেন, তিনি এই মামলায় উকিল ছাড়াও দশজন বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও রাজনীতিবিশারদের আত্মার পরামর্শ নিচ্ছেন। ডিস-ডেবার ঘোষণা করলেন—তিনি আজ পর্যন্ত আত্মাদের এনে যতগুলো ঘটনা ঘটিয়েছেন, তার প্রতিটিই ঘটিয়েছেন নিজের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায়।

আদালতে আরও অনেক ঘটনাই জানা গেল। জানা গেল শ্রীমতী ডিস-ডেবারের প্রথম জীবনে নাম ছিল এডিথা শলেমন। জন্মেছিলেন উনিশ শতকের মাঝামাঝি মার্কিন দেশের কেনটাকি প্রদেশে। বাবা ছিলেন বেপরোয়া ও ছন্নছাড়া। জীবনযাপনের তাগিদে অনেককে নির্বিবাদে ঠকিয়েছেন।

কুড়ি বছর বয়েসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কার্লিমোর শহরে এডিথা নিজেকে হাজির করলেন এক লাস্যময়ী রমণী হিসেবে। প্রচার করলেন, তিনি হলেন ব্যাভেরিয়ার রাজা প্রথম লুই-এর অবৈধ কন্যা। মা ছিলেন বহুবল্লভা নর্তকী লোলা। অমনি হৈ-হৈ পড়ে গেল, স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে এডিথার সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হলো ফলাও করে।

এডিথা বিয়ে করলেন তরুণ যুবক ডাঃ মেসাণ্টকে। বছর ঘুরল না, এডিথা বিধবা হলেন। সেই সময় আমেরিকা ও ইউরোপ জুড়ে সম্মোহন বিদ্যার বেশ রমরমা। এডিথা সম্মোহন বিদ্যা শিখে তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন একটু লাস্য ও একটু কূটবুদ্ধি। পসার জমে উঠতে দেরি হলো না। এমনি সময় অভিজাত বংশের শ্রীডিস-ডেবারের সঙ্গে আলাপ হলো। ডিস-ডেবারকে বিয়ে করে নিজেকেও অভিজাত মহিলা করে তুললেন এডিথা। হলেন শ্রীমতী ডিস-ডেবার।

এমনি সম্মোহন করতে করতেই একদিন সম্মোহনের আসরে শ্রীমতী ডিস-ডেবারের শরীরে বিদেহী আত্মার আবির্ভাব ঘটল। সেদিনের আসরে উপস্থিত ছিলেন নিউ ইয়র্কের সেরা ধনী আইনব্যবসায়ী লুথার মার্শ। বিদেহী আত্মা হিসেবে সেদিন হাজির হয়েছিলেন মার্শেরই মৃত পত্নী। কণ্ঠস্বর না মিললেও, বাচনভঙ্গি যথেষ্ট মিলে গেল, সেইসঙ্গে মিলে গেল কথা বলার সময়কার কয়েকটি মুদ্রাদোষ। শ্রীমতী ডিস-ডেবারের 'মিডিয়াম'-খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল অভিজাত মহলে। নিত্য বসতে লাগল প্ল্যানচেটের আসর। মোটা অর্থের বিনিময়ে প্রিয়জনদের বিদেহী

আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে লাগলেন শ্রীমতী ডিস-ডেবার।

একসময় শ্রীমতী ডিস-ডেবারের আমন্ত্রণে বিখ্যাত শিল্পীদের আত্মারাও হাজির হতে লাগলেন। বিশাল অর্থের বিনিময়ে অতীত দিনের শিল্পীদের বিদেহী আত্মা কয়েক দিনের মধ্যেই এঁকে দিতে লাগলেন ছবি। আরও যে-সব বিখ্যাত বিদেহী আত্মারা প্ল্যানচেট-চক্রে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটিয়েছেন, তা তো আগেই বলেছি।

গণ্ডগোল পাকাল মার্শের মৃত মেয়ের আত্মা এসে বাবাকে তাঁর ম্যাডিসন অ্যাভেনিউ-এর সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিতে বলায়। মেয়ে কীভাবে বলেছিলেন? শ্রীমতি ডেবার একটা সাদা কাগজ চার ভাঁজ করে ধরতেই শোনা গেল খস-খস লেখার আওয়াজ। তারপর কাগজের ভাঁজ খুলতেই দেখা গেল বাবাকে সম্পত্তি দানের আর্জি করেছেন মেয়ে। মার্শও দানপত্র করে দিলেন আদালতেও শ্রীমতী ডিস-ডেবারের নামে প্রতারণার অভিযোগ এলো। অভিযোগ যাঁরা আনলেন, তাঁরা বলতে চাইলেন, শ্রীমতী ডিস-ডেবারের গোটা প্ল্যানচেটের ব্যাপারটার মধ্যেই রয়েছে একটা ফাঁকি। আর, এই ফাঁকি প্রমাণ করতে আদালতে হাজির করা হলো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত জাদুকর কার্ল হার্টজকে (Carl Hertz)।

আদালতে একদিকে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী মিডিয়াম ডিস-ডেবার অন্য দিকে বিখ্যাত জাদুকর কার্ল হার্টজ, সে এক অভাবনীয় ব্যাপার। বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিক ও দর্শকদের ভিড়ে ঠাসা আদালত কক্ষে কার্ল এক টুকরো সাদা কাগজ নিয়ে দেখালেন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা শ্রীমতী ডিস-ডেবার এবং মাননীয় জুরিদের। কাগজটি এবার ডিস-ডেবারের হাতে দিয়ে বললেন ওটা চার ভাঁজ করতে। ডিস-ডেবার আর একবার কাগজটি পরীক্ষা করে চার ভাঁজ করলেন। জাদুকর কার্ল এবার কাগজটি নিয়ে শ্রীমতী ডিস-ডেবারেরই কায়দায় নিজের কপালে বসিয়ে শ্রীমতী ডিস-ডেবারকে বললেন, "কাগজটা এবার আমার কপালে চেপে ধরে থাকুন।" শ্রীমতী ডিস-ডেবার কপালে কাগজটা চেপে ধরলেও কাগজের একটা কোণ ছিঁড়ে চিহ্ন দিয়ে রাখলেন; একসময় জাদুকর কার্ল বললেন, "এবার কাগজটা কপাল থেকে তুলে ভাঁজ খুলুন।"

ভাঁজ খুলতেই চমকে গেলেন শ্রীমতী ডিস-ডেবার, ভেতরে অনেক কিছু লেখা রয়েছে, অবাক হলেন জুরিরা এবং সেইসঙ্গে অবাক হলেন শ্রীমতীর এই খেলা দেখেই এতদিন যাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন, তাঁরাও।

জাদুকর কার্ল এবার একটা রাইটিং-প্যাড দেখালেন, প্যাডের সব পাতাই সাদা। প্যাডটি খবরের কাগজে জড়িয়ে একদিক ধরতে দিলেন এক সাংবাদিককে, আর একদিক ধরলেন নিজে। একটু পরেই খস্‌খস্‌ করে লেখার আওয়াজ পেলেন সাংবাদিক। আওয়াজ থামতে খবরের কাগজ থেকে প্যাডটা বের করতেই দেখা গেল প্যাডের সবগুলো পৃষ্ঠা লেখায় ভরে গেছে।

বিস্মিত জুরিদের ও দর্শকদের যখন কার্ল বললেন—এই দুটো খেলার কোনটাই

আত্মার সাহায্যে ঘটানো হয়নি, ঘটানো হয়েছে কৌশলের সাহায্যে—তখন আদালত কক্ষ বিস্ময়ে হতবাক্।

জাদুকর কার্ল দর্শকদের কৌতূহল মেটাতে নিজের গোপন কৌশলগুলো ফাঁস না করলেও আপনাদের কৌতূহল মেটাতে আমিই ফাঁস করছি—শ্রীমতী চার ভাঁজ করা সাদা কাগজটা কার্লের হাতে দিতেই কপালে ঠেকাবার মুহূর্তে কার্ল তাঁর হাতে লুকিয়ে রাখা লেখায় ভরা চার ভাঁজ করা একটা কাগজের সঙ্গে পালটে নিয়েছিলেন।

রাইটিং-প্যাডও বদলে নিয়েছিলেন ঠিক সময় ও সুযোগ মতো। প্যাডে লেখার খস্‌খস্‌ আওয়াজ তুলেছিলেন নিজের আঙুলের একটা নখকে ছুঁচলো করে মাঝামাঝি ফেড়ে রেখে।

শ্রীমতী ডিস-ডেবারের জেল হয়েছিল। প্রমাণিত হয়েছিল বিখ্যাত আত্মাদের আঁকা ছবিগুলো ছিল জাল।

উনিশ শতকের দুই সেরা মিডিয়া ও দুই জাদুকর

উনিশ শতকে আত্মার মিডিয়াম হিসেবে যাঁরা সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁরা হলেন আইরা ইরাসটাস ড্যাভেনপোর্ট (Ira Erastus Davenport) এবং উইলিয়াম হেনরি ড্যাভেনপোর্ট (William Henry Davenport)। এঁরা দুই ভাই জন্মেছিলেন যথাক্রমে ১৮৩৯ এবং ১৮৪১ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্টের বাফেলো শহরে। ১৮৫৫ সালে জন কোলস (John Coles) নামে এক প্যারাসাইকোলজিস্ট ও প্ল্যানচেট বিশেষজ্ঞ এই দুই ভাইকে নিউইয়র্কে নিয়ে আসেন। অতি দ্রুত জন কোল্‌স-এর সহায়তায় নিউইয়র্ক জয় করলেন ওঁরা। প্ল্যানচেটের আসরগুলোতে দু-ভাইকে দু-পাশে দুটো চেয়ারের সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখতেন দর্শকরা। একটা টেবিলের ওপর রাখা থাকত গীটার, ড্রাম, বিউগল, ব্যাঞ্জো ইত্যাদি। দর্শকরা আত্মাকে আসার সহায়তা করতে আলো নিভিয়ে দিতেই ঘটে যেত অদ্ভুত সব ব্যাপার-স্যাপার। টেবিলের বাজনাগুলো আপনা থেকেই একে-একে বেজে উঠত। আলো জ্বালতেই দেখা যেত শক্ত করে বাঁধা দু-ভাই বসে রয়েছেন দু-দিকের দুই চেয়ারে অতএব এই ঘটনার পেছনে যে ওদের কোনও চতুরতা নেই, সেই বিষয়ে কারওরই কোনও সন্দেহ থাকত না। কখনো কখনো অদৃশ্য আত্মারা নেমে এসে টেবিলে টোকা মেরে আওয়াজ করে বিভিন্ন প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এই সময়ও দু-ভাই টেবিলে থেকে দূরে দুটো চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা থাকতেন।

কিছুদিনের মধ্যেই দু-ভাইয়ের প্ল্যানচেট আরও আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হলো। নিউইয়র্কের গণ্ডি ছাড়িয়ে ঘুরে বেড়ালেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় প্রতিটি শহরে। প্রতি শহরেই ওরা হাজির হতেন খাঁটি প্ল্যানচেট মিডিয়াম হিসেবে। শহরে

পৌঁছেই স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো মারফত শহরবাসীদের কাছে আবেদন রাখতেন—আপনারা শহরবাসীদের মধ্য থেকে বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটি কমিটি করুন, যে কমিটির সদস্যরা আমাদের কাছে থেকে লক্ষ্য রাখবেন যাতে আমরা কোনও কৌশলের সাহায্য গ্রহণ করতে না পারি। তারপরও আমরা আত্মা নামাবো।

প্রতিটি শহরেই তৈরি হয়েছে কমিটি। শেষপর্যন্ত প্রতিটি কমিটিই ড্যাভেনপোর্ট ভাইদের সত্যিকারের প্ল্যানচেট মিডিয়াম হিসেব স্বীকার করে নিয়েছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিজয় শেষ করে দু-ভাই গেলেন কানাডায়। কানাডার প্রতিটি বড় শহরকেই একইভাবে মজালেন। তারপর পাড়ি দিলেন ইংলন্ডে। ১৮৬৪-তে এলেন ইংলন্ডে। ২২ সেপ্টেম্বর বসল এক অভূতপূর্ব প্ল্যানচেটের আসর। প্রধান বক্তা হিসেবে হাজির হলেন প্রখ্যাত ধর্মযাজক ডাঃ জে. বি. ফার্গুসন। সেদিনের আসরে আত্মারা এসে অদ্ভুত সব কাণ্ড-কারখানা ঘটিয়ে গেল। ইংলণ্ডের কাগজগুলোতে প্রকাশিত হলো রোমঞ্চকর ভৌতিক ঘটনার পূর্ণ বিবরণ। সেই সঙ্গে ধর্মযাজক ডাঃ ফার্গুসনের মতামত—এরা দুজনে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন খাঁটি মিডিয়াম। পরলোকগত আত্মাদের নিয়ে আসার ক্ষমতা এদের ঈশ্বরদত্ত।

এমন একটা জব্বর খবরে ইংলণ্ডে হৈ-চৈ পড়ে গেল। এ শহর ও শহর ঘুরে ড্যাভেনপোর্ট ভাইয়েরা এলেন চেলটেনহ্যাম শহরে। সেখানেও দুই ভাই একই ঘোষণা রাখলেন, শহরবাসীদের মধ্য থেকে একটা কমিটি তৈরি করে তাদের মিডিয়াম ক্ষমতার পরীক্ষা নিতে অনুরোধ করলেন।

শহরবাসীরা যে কমিটি গড়লেন তাতে রাখলেন শহরের দুই শখের জাদুকর জন নেভিল ম্যাসকেলিন (John Nevil Maskelyne) এবং জর্জ কুক'কে (George Cooke)। দু'জনেই তখন বয়সে যুবক।

শহরের টাউন হলে প্ল্যানচেটের আসর বসল। হল ভর্তি। মঞ্চের পর্দা উঠতে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন ডাঃ ফার্গুসন। আবেগপ্রবণ গলায় ঘোষণা করলেন, তাঁর ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতার দ্বারা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন উইলিয়াম হেনরি ও আইরা ইরাস্‌টাস-এর রয়েছে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা, যার দ্বারা তারা দু'-ভাই মুহূর্তে নিয়ে আসতে পারেন পরলোকের আত্মাদের।

দু'ভাই মঞ্চে আসার আগে হলের প্রতিটি দরজা ও জানলার পর্দা টেনে দেওয়া হলো, যেন বাইরের আলো না আসে। আহ্বান করা হলো শহরবাসীদের পরীক্ষা-কমিটিকে। কয়েকজন পরীক্ষকের সঙ্গে মঞ্চে উঠলেন ম্যাসকেলিন ও কুক।

মঞ্চে এলেন দু'ভাই। দুজনের পরনেই কালো পোশাক, মঞ্চে নিয়ে আসা হলো আলমারি বা ওয়ার্ডরোবের মতো একটা কাঠের ক্যাবিনেট। ক্যাবিনেটের ভেতরটায় আলমারির মতো কোনও তাক নেই। তবে দরজা রয়েছে। ক্যাবিনেটের ভেতরে পাতা হলো একটা লম্বা বেঞ্চ। বেঞ্চের দু'প্রান্তে দু'ভাইকে বসিয়ে পরীক্ষকরা তাদের শক্ত করে বেঁধে ফেললেন। বেঞ্চের মাঝখানে, দু'ভাইয়ের থেকে যথেষ্ট দূরে

রাখা হলো শিঙা, ঘণ্টা, বেহালা, গীটার ইত্যাদি। ক্যাবিনেটের দরজা ভেজিয়ে দেওয়া হলো। নিভিয়ে দেওয়া হলো স্টেজের আলো, সারা হল জুড়ে অন্ধকার নেমে আসতেই বেজে উঠল ঘণ্টা, শিঙা, বেহালা ও গীটার। তারপর আওয়াজ পাওয়া গেল ক্যাবিনেটের দরজা খোলার। বাদ্যযন্ত্রগুলো এক এক করে ছিটকে এসে পড়ল স্টেজের ওপরে।

আলো জ্বালতেই দেখা গেল দু-ভাই একইভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় বেঞ্চের দু-কোণে বসে রয়েছেন। ওরা এমনভাবে বাঁধা যে, সামান্য নড়াচড়ারও উপায় নেই। হাতের নাগালের বাইরে রাখা বাদ্যযন্ত্রগুলো তবে বাজাল কে? কে-ই বা দরজা খুলে ওগুলোকে ছুঁড়ে ফেলল? হলের প্রতিটি দর্শক মুগ্ধ, বিস্মিত, শিহরিত। এমন অসাধারণ খাঁটি আত্মার খেলা অচিন্ত্যনীয়। দুই ভাই সত্যিই অনবদ্য 'মিডিয়াম'। একটু ভুল বলেছি, বিস্মিত ও শিহরিত হয়েছিলেন দুজন দর্শক ছাড়া আর সব দর্শকই। এই দুজন হলেন শহরের শখের জাদুকর ম্যাস্‌কেলিন ও কুক। ম্যাস্‌কেলিন স্টেজে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, "গোটা ব্যাপারটাই বুজরুকি। দুই-ভাই এতক্ষণ আপনাদের যা দেখালেন, সেটা কিছু কৌশল ও অভ্যাসের ফল, এর সঙ্গে বিদেহী আত্মার কোনও সম্পর্ক নেই।"

ম্যাসকেলিন-এর ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করলেন শ্রদ্ধেয় ধর্মযাজক ডাঃ ফার্গুসন ও দুই মিডিয়ামের ম্যানেজার। তাঁরা বললেন, "যদি কৌশলেরই ব্যাপার হয়ে থাকে, আপনিও এমনি ঘটিয়ে দেখান না।"

ঠিক কথা। অনেক দর্শকই সমর্থন করলেন কথাগুলো।

ম্যাসকেলিন একটুও ঘাবড়ে তো গেলেনই না, বরং দীপ্ত কণ্ঠে আবারও ঘোষণা করলেন, "দেখুন, এই খেলা দেখাতে গেলে কৌশল ছাড়া অনুশীলনেরও প্রয়োজন। আপনাদের কথা দিচ্ছি আজ থেকে তিন মাসের মধ্যে এদের সবগুলো ভৌতিক খেলাই ভূত ছাড়া করে দেখাব।"

ম্যাসকেলিন যদিও তিন মাস সময় নিয়েছিলেন, কিন্তু দু'মাসের ভেতরই চেলটেনহ্যাম শহরবাসীদের সামনে হাজির হলেন ভূতহীন ভূতুড়ে খেলা দেখাতে। গোটা শহর প্ল্যাকার্ডে ছেয়ে গেল—ড্যাভেনপোর্ট ভাইদের চেয়েও অদ্ভুত কাণ্ড অন্ধকারের বদলে আলোতে ঘটিয়ে দেখাবেন এই শহরেরই দুই জাদুকর ম্যাস্‌কেলিন ও কুক।

ড্যাভোনপোর্ট ভাইদের খেলাগুলো আরও সুন্দর করে পরিবেশন করলেন এই দুই তরুণ জাদুকর। এমনকী দর্শকদের মধ্যে থেকে একজনকে ডেকে এনে ক্যাবিনেটের মধ্যে বসালেন। দর্শকটির চোখ বেঁধে দেওয়া হলো কাপড় দিয়ে আর হাতদুটি বেঁধে দেওয়া হলো দু'পাশে বসে থাকা ম্যাসকেলিন ও কুকের উরুর সঙ্গে। জাদুকর দুজন অবশ্য আগের মতোই আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা ছিলেন। ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ করতেই শুরু হয়ে গেল বাজনা বাজা। একসময় ক্যাবিনেটের দরজা আপনা

থেকেই গেল খুলে। দেখা গেল উৎসাহী দর্শকটি ও জাদুকর দুজন আগের মতোই বাঁধা রয়েছেন।

এই অদ্ভুত খেলা দেখিয়েই তাদের খেলা শেষ করলেন না দুই জাদুকর। আগের বাঁধনের ওপর আবার নতুন করে দড়ি বেঁধে গালা দিয়ে শীলমোহর করে দিলেন দর্শকরা। দুই জাদুকরের চার হাতের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলো শুকনো ময়দা। এবার আপাতগ্রাহ্য কোনও কৌশল করার সুযোগ রইল না দু'জনের। কিন্তু কী আশ্চর্য! ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ হতেই ক্যাবিনেটে রাখা বাজনাগুলো বাজতে শুরু করল। বাজনা থামতেই দরজা বন্ধ হতেই ক্যাবিনেটে রাখা বাজনাগুলো বাজতে শুরু করল। বাজনা থামতেই দরজা খুলে গেল, দুই জাদুকর আগের মতোই বসে আছেন। বাঁধনের শীলমোহর অটুট। চার হাতের চাপানো ময়দার একটুও তলায় পড়ে নেই।

ঐ অবস্থাতেই জাদুকরদের কথামতো ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। একটু পরেই জাদুকর দু'জন বন্ধনমুক্ত অবস্থায় ক্যাবিনেটের বাইরে বেরিয়ে এলেন। চার হাতে ময়দা ঠিক তেমনই হাতেই রয়েছে।

সম্পূর্ণ হতভম্ব দর্শকদের সামনে আরও বিষ্ময় অপেক্ষা করছিল। এবার স্টেজে আনা হলো একটা কাঠের বাক্স। স্টেজে এসে দর্শকরা বাক্সটাকে ভালোমতো পরীক্ষা করলেন। বাক্সটার ভেতরে ঢুকে কোনোমতে হাত-পা গুটিয়ে বসলেন ম্যাস্‌কেলিন। ডালা বন্ধ করে তালা এঁটে দেওয়া হলো। তালাবন্ধ বাক্সটি দড়ি দিয়ে বেঁধে শীলমোহর করে দেওয়া হলো। শীলমোহর করা বাক্সটি ঢুকিয়ে দেওয়া হলো ক্যাবিনেটের মধ্যে। ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ করতেই বেজে উঠলো ভেতরে রাখা ঘণ্টা। এক সময় ক্যাবিনেটের দরজা গেল খুলে। দেখা গেল, ম্যাসকেলিন বসে রয়েছেন বাক্সের বাইরে। ম্যাস্‌কেলিনের অনুরোধে দর্শকরা এসে বাক্সটা পরীক্ষা করলেন। ডালার তালা তেমনই বন্ধ রয়েছে, অটুট রয়েছে বাঁধন আর শীলমোহর।

রাতের আঁধারে যে খেলা দেখিয়েছিলেন ড্যাভেনপোর্ট ভাইয়েরা, তার চেয়েও অনেক বেশি গা-ছম-ছম, লোমখাড়া করা অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটিয়ে একদিনে শহরবাসীদের বিস্ময়ে পাগল করে ফেললেন, দুই শৌখিন জাদুকর।

পরবর্তীকালে এই দুই জাদুকর বিভিন্ন শহরে ঘুরে তাঁদের অদ্ভুত জাদুর খেলাগুলো দেখিয়েছেন। তবে প্রতিটি প্রদর্শনীর আগেই দর্শকদের সামনে বিনীতভাবে নিবেদন করেছেন—বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আত্মার মিডিয়াম সেজে ঠক্‌বাজেরা যে-সব বুজরুকির আশ্রয় নিচ্ছেন ও লোক ঠকাবার খেলা দেখাচ্ছেন, সেগুলোই এখন আপনাদের সামনে কোনও ভূতের সাহায্য ছাড়াই করে দেখাচ্ছি।

অলৌকিক বিশ্বাসে কোনও কিছু দেখার যে রোমাঞ্চ ড্যাভেনপোর্ট ভাইদের 'অলৌকিক' প্রদর্শনীতে ছিল, ম্যাসকেলিন ও কুকদের খেলায় তা ছিল না। এই দুজন তো বলেই দিচ্ছেন, তাঁরা মিডিয়াম নন, লৌকিক কৌশলের সাহায্যে

খেলাগুলো দেখাচ্ছেন। কৌশলগুলো ধরতে না পারলেও পুরো ব্যাপারটাই ধাপ্পা, অতএব অলৌকিক মিডিয়ামদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দুই জাদুকরকে বছর দুয়েকের মধ্যে পিছু হঠতে হলো। মিডিয়ামদের অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা দেখতে ভিড় বাড়তে লাগলেও দুই জাদুকরের ভূতহীন ভূতুড়ে খেলায় দর্শক কমতে লাগল।

বুজরুকির বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম তাদের প্রচণ্ড বিপদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। একটুর জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন এই দুই জাদুকর ও ম্যাস্কেলিনের নবপরিণীতা বধূ।

লন্ডনের বিখ্যাত 'কৃস্টাল প্যালেস' থিয়েটারে কয়েক সপ্তাহব্যাপী জাদুর খেলা দেখাবার চুক্তিতে সই করলেন ম্যাসকেলিন। কৃষ্টাল প্যালেসে প্রদর্শনীর আগে একটা মফঃস্বল শহরে জাদু প্রদর্শনী চলছিল। সেই শহরের গির্জার পাদ্রী ওদের জাদুর খেলা দেখে ঘোষণা করলেন—ওরা শয়তান। মানুষ কখনও এমন অলৌকিক খেলা দেখাতে পারে না।

খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। দু'দিন পরেই জাদু প্রদর্শনী শুরু হবার মুখে আক্রান্ত হলো থিয়েটার হল। বিশাল ক্ষিপ্ত জনতাকে সঙ্গে নিয়ে ওই পাদ্রী সাহেবও হাজির ছিলেন দুই শয়তান নিধন করতে। সেদিন থিয়েটার হলের ম্যানেজার দুই জাদুকর ও নববধূকে ছদ্মবেশে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন বলেই বিশ্ব পেয়েছিল দুই মহান জাদুকরকে, বিশেষত : ম্যাসকেলিনকে, পৃথিবীর জাদুচর্চার ইতিহাসে যাঁর অসামান্য অবদান আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

প্ল্যানচেটের ওপর আঘাত হেনেছিল যে বই

ভৌতিক-চক্রের পেশাদার মিডিয়ামরা সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছিল ১৮৯১ সালে মিডিয়ামদের তাবৎ কৌশলের ওপর একটি বই প্রকাশিত হওয়ায়। বিশ্বের ভৌতিক-চক্রের মিডিয়ামদের ইতিহাসে এত বড় আঘাত আর সম্ভবত হয়নি। লেখক হিসেবে কোনও নামের পরিবর্তে ছদ্মনাম ব্যবহৃত হয়েছিল—'জনৈক মিডিয়াম প্রণীত'। বইটির নাম—Revelations of a Spirit Medium, or Spiritualistic Mysteries Exposed-A Detailed Explanation of the Methods used by Fraudulent Mediums-by a Medium।

বইটির নাম বাংলায় অনুবাদ করলে এইরকম দাঁড়াবে—"এক ভৌতিক মিডিয়ামের গোপন রহস্য উদ্ঘাটন, অথবা ভৌতিক রহস্য ফাঁস—প্রতারক মিডিয়ামদের ব্যবহৃত কৌশলগুলোর বিস্তৃত ব্যাখ্যা।—জনৈক মিডিয়ামের লেখা।"

বইটিতে ভৌতিক মিডিয়ামদের সমস্ত রকম আত্মা আনার কৌশল নিয়েই আলোচনা করা হয়েছিল এবং অবশ্যই তার সঙ্গে ছিল প্রতিটি কৌশলেরই ব্যাখ্যা। বিদেহী আত্মা নামিয়ে বোর্ডে, শ্লেটে বা কাগজে লেখানো, বিভিন্ন প্রশ্নের লিখিত উত্তর পাওয়া, টেবিলের ওপর টোকা মেরে আওয়াজ করে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া,

টেবিল, চেয়ার বা অন্য কোনও কিছুকে শূন্যে তুলে দেওয়া, দূর থেকে ভেসে আসা আত্মার কণ্ঠস্বর ইত্যাদি মিডিয়ামদের ভৌতিক (?) কাণ্ড-কারখানা গুপ্ত কৌশলের সঙ্গে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল কী করে যে কোনও রকম বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নানা রকম বাজনা বাজিয়ে আবার বাঁধনের ভিতর ফিরে যেতে হয়।

বইটি প্রকাশিত হতেই পেশাদার লোক-ঠকানো মিডিয়ামদের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। তারা উদ্ধারের উপায় হিসেবে বিভিন্ন বইয়ের দোকান থেকে ও প্রকাশকের কাছ থেকে যতগুলো বই পেল সব কিনে পুড়িয়ে ফেলল। তবে, এই বই যেমন একদিকে পেশাদার মিডিয়ামদের আঘাত হেনেছিল, তেমনি, অন্যদিকে বইটি পড়ে কিছু কিছু লোক নিজেরাই মিডিয়াম বনে লোক ঠকানোর ব্যবসায় নেমে গিয়েছিল।

ধোঁকাবাজ মিডিয়ামদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী এক চরিত্র বিশ্বের সর্বকালের এক সেরা জাদুকর হ্যারি হুডিনিও (Harry Houdini) কিন্তু একসময় ওই বইটি পড়ে বন্ধনমুক্তি এবং আত্মা আনার নানারকম কৌশল রপ্ত করে তাঁর স্ত্রী বিয়াট্রিস-এর সহযোগিতায় দারুণ মিডিয়ামের ব্যবসা ফেঁদেছিলেন। পরবর্তী জীবনে হুডিনি অবশ্য মৃতের আত্মীয়দের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের সঙ্গে মৃত আত্মার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার নাম করে অর্থ লুটবার এই চেষ্টাকে অতি ঘৃণ্য বলে মনে করেন এই অতি লাভজনক এই খেলা তিনি যে শুধু দেখানোই বন্ধ রেখেছিলেন। মিডিয়ামদের বুজরুকির বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি জয়যুক্ত হয়েছিলেন।

আঠারো বছর বয়েসে হুডিনির বাবা মারা গেলেন। সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ল তাঁরই ঘাড়ে। হুডিনি তখন সদ্য মিডিয়াম রহস্যের বইটি পড়েছেন। ছোট ভাই থিয়োডোরকে নিয়ে জাদু দেখিয়ে রোজগারে নেমে পড়লেন। জাদু কোম্পানির নাম দিলেন 'হুডিনি ব্রাদার্স'। জাদুর খেলা হিসেবে হাজির করতে লাগলেন বন্ধনমুক্তির খেলা। ছোট ভাইয়ের হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে একটা বাক্সের ভেতর ঢুকিয়ে বাক্সটা তালা বন্ধ করে দেওয়া হতো। হ্যারি হুডিনি বাক্সটার সামনে একটা পর্দা টেনে দিয়ে মুখটুকু শুধু পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে রেখে গুনতেন "এক—দুই—তিন—" মুহূর্তের জন্যে মুখটাকে নিয়ে যেতেন পর্দার আড়ালে, পরমুহূর্তে পর্দার ফাঁক দিয়ে যে মাথাটা বেরিয়ে আসত সেটা থিয়োডোরের মাথা। থিয়োডোর ঝটতি পর্দা সরিয়ে ফেলতেন। কিন্তু হ্যারি হুডিনি তো কোথাও নেই! দর্শকরা এসে বাক্সের তালা খুলতেই দেখতে পেতেন বাক্সের ভেতর দড়িবাঁধা জোড়া হাতদুটি নিয়ে শুয়ে রয়েছেন হ্যারি।

উনিশ বছর বয়েসে হ্যারি বিয়ে করলেন বিয়াট্রিস রাহনার'কে। বিয়াট্রিসদের স্কুলে ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে দু'জনের আলাপ। সেই আলাপই গাঢ়তর হয়ে

বিয়েতে পরিণত হলো। বিয়াট্রিস রাহনার হলেন, 'বেসি হুডিনি'।

এবার নতুন জুটি তৈরি হলো—হ্যারি ও বেসি। পেট চালাবার তাগিদে হ্যারি ও বেসি পানশালাগুলোতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জাদুর খেলা দেখিয়ে খদ্দেরদের মনোরঞ্জন করতেন। পরে হুডিনি দম্পতি সার্কাসে যোগ দিলেন। সার্কাসে খেলা দেখাতে বেশিদিন ভালো লাগল না। এই সময় মাথায় এলো নতুন ফন্দি, বিদেহী আত্মার ভর হওয়া মিডিয়াম হলে কেমন হয়? হ্যারি ও বেসি দু'জনেরই স্মরণশক্তি ও বুদ্ধি ছিল প্রখর, অভিনয় দক্ষতা ছিল অসাধারণ। ছোট ছোট শহর ও শহরতলিতে এবার হুডিনি দম্পতি হাজির হলেন 'সাইকিক' বা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী এবং আত্মার মিডিয়াম হিসেবে।

হ্যারি আগে থেকেই সেই সেই শহরের সমাধিক্ষেত্র ঘুরে সমাধিস্তম্ভের লেখাগুলো পড়ে শহরের মৃত লোকদের সম্বন্ধে খবর জোগাড় করতেন, সেই সঙ্গে ক্যানভাসার সেজে পানশালা, বিভিন্ন আড্ডা ও বাড়ি বাড়ি ঘুরে সংগ্রহ করতেন আরও নানা রকমের খবর। অনেক সময় অর্থের বিনিময়ে স্থানীয় লোকদেরও নিয়োগ করতেন। এরা বিভিন্ন পরিবারের নানা খবর যোগাড় করে দিত, সেই সঙ্গে প্রচার করে বেড়াত, প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সে হুডিনি দম্পতির কী কী অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করা এবং আবার বাঁধনের মধ্যে ফিরে যাওয়ার নানা পদ্ধতির প্রয়োগে হ্যারি ও বেসি আগেই ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অতএব আত্মায় ভর হওয়া মিডিয়াম হিসেবে বেসি যখন শহর আগন্তুক হয়েও বিভিন্ন পরিবারের অনেক গোপন খবর বলে যেতেন, অথবা শহরের বিভিন্ন মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে নানারকম তথ্য হাজির করতেন তখন প্রত্যেকেই এ-গুলোকে বিদেহী আত্মার কাজ বলেই বিশ্বাস করতেন। এরই সঙ্গে হ্যারি যখন চেয়ারে সঙ্গে হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেও নানারকম ভৌতিক কাণ্ড ঘটিয়ে দেখাতেন, তখন বিস্মিত, শিহরিত ও ধর্মপ্রাণ মানুষগুলো তাঁদের লোকান্তরিত প্রিয়জনদের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য এঁদের কৃপাপ্রার্থী হতেন। অর্থের বিনিময়ে কৃপা করতেন হুডিনি দম্পতি। পরবর্তীকালে হুডিনি দম্পতি এই লোক-ঠকানো মিডিয়ামের অভিনয় ছেড়ে দিয়ে পেশাদার মিডিয়ামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন, তা তো আগেই বলেছি।

বন্ধনমুক্তির খেলায় নতুন নতুন কৌশল আছে জানা সত্ত্বেও দর্শকদের বিস্ময়ের সমা থাকত না।

দুটি ঘটনার উল্লেখ করে হ্যারি হুডিনির বন্ধনমুক্তির কৌশলগত ক্ষমতার পরিচয় রাখছি। সেইসঙ্গে এও বলে রাখি, হ্যারি কিন্তু তাঁর জীবনে এই ধরনের বন্ধনমুক্তির খেলা দেখিয়েছেন বহুবার, বহু বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে।

১৮৯৮ সালে শিকাগো শহরে পুলিশ বিভাগকে চ্যালেঞ্জ জানালেন হ্যারি

হুডিনি—“আমাকে বন্ধ রাখার মতো কয়েদখানা শিকাগো শহরে তৈরি হয়নি।”

খবরটা পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হতেই শিকাগো পুলিশ গ্রহণ করল সেই চ্যালঞ্জ। একগাদা সাংবাদিকের সামনে হ্যারি হুডিনির শরীর, পোশাক তন্ন-তন্ন করে খানা-তল্লাশি করে হাত-পা বেঁধে পুরে দেওয়া হলো জেলের সেরা সেলটিতে।

১৯০০ সালের কথা। সে সময় লন্ডনের ‘আলহামরা’ থিয়েটার হল যে কোনও শিল্পীর কাছেই মক্কা-মদিনা-কাশী-জেরুজালেম। আলহামরা থিয়েটার হলের কর্মকর্তা ডাণ্ডাস স্লেটার-এর সঙ্গে দেখা করলেন হ্যারি, দু-সপ্তাহের জন্য ওই হলে জাদু দেখাবার সুযোগ চাইলেন। স্লেটার বললেন, “তোমার ওই বাঁধন থেকে বেরিয়ে আসার খেলাগুলোর যা বর্ণনা দিলে, তার ওপর আমার তেমন আস্থা নেই। তুমি যদি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের হাতকড়া থেকে নিজের হাত-দুটো মুক্ত করতে পারো, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে দু-সপ্তাহের জন্য হল ছেড়ে দেব।”

স্লেটারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন হ্যারি। দুজনে গেলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সুপারিনটেন্ডেন্ট মেলভিন-এর কাছে। স্লেটারের মতো নামী-দামী লোককে আসতে দেখে এবং আসার কারণ শুনে মেলভিন হ্যারি হুডিনিকে বললেন, “আমার হাতকড়ার মুখোমুখি হয়ে তুমি বড়ই ভুল করেছ। এ তোমার জাদু দেখাবার হাতকড়া নয়। তাছাড়া চাবিটা থাকবে আমার কাছে।”

হ্যারি হাসলেন। বললেন, “দেখাই যাক না, এতেও জাদু দেখাতে পারি কিনা!

মেলভিন এবার হ্যারির দুটো হাত একটা থামের দুপাশ দিয়ে নিয়ে এসে হাতকড়া আটকে দিয়ে স্লেটারকে বললেন, “ও এখানে থাক, চলুন আমরা বরং একটু ঘুরে আসি। ফিরে এসে ওকে মুক্ত করা যাবে।”

মেলভিন ও স্লেটার কয়েক পা এগোতেই দেখলেন, তাঁদের পাশে এসে হাজির হয়েছেন হয়েছেন হ্যারি হুডিনি।

এরপরে কী হয়েছিল নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে হচ্ছে? ফল হয়েছিল এই, হ্যারি একদিকে যেমন ‘আলহামরা’ হলে দু-সপ্তাহের জন্য জাদু দেখাবার সুযোগ পেলেন আর একদিকে তেমনি পেলেন অসামান্য প্রচার—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের হাতকড়াও হার মেনেছে মার্কিন মুল্লুকের তরুণ জাদুকর হ্যারি হুডিনির কাছে। ঘটনাটা আরও একটু গড়িয়ে ছিল। দু সপ্তাহের বদলে জনতার দাবিতে একনাগাড়ে ছ'মাস আলহামরাতেই খেলা দেখাতে বাধ্য হলেন হুডিনি দম্পতি।

ওই অবস্থাতেই জেলের সেল ভেদ করে বেরিয়ে এলেন হুডিনি।

পেশাদার মিডিয়ামদের লোক ঠকানোর মূল কৌশল হলো অন্ধকার বা চোখের আড়ালের সুযোগ নিয়ে দর্শকদের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে দ্রুত কিছু ভৌতিক ঘটনা ঘটানো ও আবার আগের বাঁধনের মধ্যে ফিরে আসা।

স্বামী অভেদানন্দ ও প্রেত-বৈঠক

একটা প্ল্যানচেটের আসরে বা প্রেত-বৈঠকের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। প্রেত-বৈঠকটি বসেছিল 'পাশ্চাত্যে'র একটি দেশে, দেশটির নাম উল্লেখ করেননি স্বামী অভেদানন্দ। সেখানে তিনি অনুভব করেছেন, "অন্তত প্রেতাত্মাদের কুড়িটা হাত আমার পিঠের ওপর, অর্থাৎ কুড়িটা বিদেহীর হাত আমার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করছে। কেউকেউ আমার জামার কলার কিংবা পকেট ধরে টানছে, অথবা একইসঙ্গে অনেকগুলো হাত আমার পিঠে দিয়েছে। এ'সব আমি স্পষ্টভাবে অনুভব করেছি। তারপর একজন আত্মা হয়ত আমায় জিজ্ঞাসা করল : 'আপনি কি মনে করেন, যে, মিডিয়ামই এইসব ব্যাপার করছে? প্রেত-বৈঠকের ঘরটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা ছিল, যদিও ঘরের কোণে কাঠের বাক্সে ঢাকা একটা আলো মিটিমিট করে জ্বলছিল। আবার সেই একই গলার শব্দ এলো : "আপনি মিডিয়ামের গায়ে স্পর্শ করাল। আমি স্পর্শ করে দেখলাম মিডিয়ামের সমস্ত দেহটা একেবারে শক্ত মড়ার মতো অর্ধশায়িত·অবস্থায় রয়েছে। তার হাত দুটো শক্ত করে ফিতে দিয়ে বাঁধা ছিল।" (মরণের পারে' পৃষ্ঠা—১৩৯-১৪০)

'ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা' একটা ঘরে একগাদা প্রেত-বিশ্বাসী মানুষ নিজেরাই প্রেতের অভিনয় করলে স্বামী অভেদানন্দের মতো প্রেতলোকে বিশ্বাসী যে এগুলোকে প্রেতদেরই কাজ বলে ধরে নেবেন এতে আর আশ্চর্য কী?

একজন হাত বেঁধে রাখা লোকই যখন বহু নিরপেক্ষ লোককে কৌশলের সাহায্যে ধোঁকা দিতে পারেন, তখন বহুজনে মিলে একজনকে ধোঁকা দেওয়াটা কোনও সমস্যাই নয়।

•

স্বামী অভেদানন্দের সামনে আত্মা লিখল শ্লেটে

ঘটনাস্থল নিউ ইয়র্ক। কাল—১৮৯৯ সালের ৫ আগস্ট। সকাল ১০ টা। প্ল্যানচেটের আসর। মিডিয়াম মিস্টার কিলার। মুখোমুখি দু'টি চেয়ারে অভেদানন্দ ও কিলার। মাঝখানে একটা ছোট টেবিল। কিলার দুটি শ্লেট বার করলেন। অভেদানন্দ নিজের হাতে শ্লেট দুটির দু-পিঠই মুছে দিলেন। কিলার এবার একটা শ্লেটের ওপর আর একটা শ্লেট রেখে তার ওপর রাখলেন একটা চক। অভেদানন্দকে অনুরোধ করলেন, যাঁর আত্মাকে আনতে চান, তাঁর নাম এক টুকরো কাগজে লিখে শ্লেটের ওপর রাখতে। অভেদানন্দ লিখলেন, স্বামী যোগানন্দজির নাম। এবার কিলার একটা রুমাল দিয়ে আলগা করে জড়ালেন শ্লেট দুটো। রুমালের আড়ালে ঢাকা পড়ল চক্ ও কাগজের টুকরোটা। কিলার ও অভেদানন্দ দু-হাত দিয়ে শ্লেট ছুঁয়ে রেখে টেবিল থেকে কিছুটা উঁচুতে তুলে রাখলেন শ্লেট জোড়াকে। কিলার বললেন, আপনি যাঁকে চান তাঁকে হয়ত আনতে পারব না। তবু চেষ্টা

করছি। একসময় শ্লেটে চক্ দিয়ে লেখার খস-খস শব্দ শোনা গেল। কিলার বললেন, চকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন? অভেদানন্দ বললেন, হ্যাঁ। তারপরই

ফাঁকা শ্লেটে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর উড়ে এল

একসময় রুমাল সরিয়ে শ্লেট খুলতেই দেখা গেল শ্লেট লেখায় ভর্তি। সঙ্গে যোগানন্দজির নাম। অভেদানন্দ বিস্ময়ে বাক্যহারা। পরে জেনেছিলেন শ্লেটে গ্রীক ভাষাও লেখা হয়েছে। গ্রীক লেখা এলো কি করে? যোগেন তো গ্রীক জানতেন না? বিস্মৃত অভেদানন্দের প্রশ্নের উত্তরে কিলার জানালেন অন্য কোনও আত্মা লিখে গেছে। কিলারের কথায় অবিশ্বাস করার মতো কিছুই পাননি অভেদানন্দ।

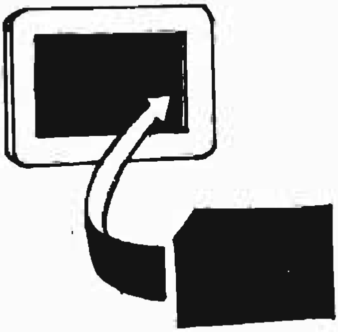

অনেক 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠানে শ্রোতা-দর্শকরা স্বামী অভেদানন্দের এই প্ল্যানচেট অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে ব্যাখ্যা চেয়েছেন। মুখের কথায় বোঝানোর চেয়ে হাতে-কলমে দেখালে যে শ্রোতা-দর্শকদের বুঝতে সুবিধে হবে ভেবে মাথায় বিষয়টা বেশি ভালোমতো ঢুকবে। স্বামী অভেদানন্দের পদ্ধতিতেই দর্শকদের নির্বাচিত তথাকথিত আত্মাকে এনে শূন্য শ্লেট লেখায় ভরিয়েছি, নাম লিখিয়েছি।

প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্লেট ধরার সঙ্গী হয়েছেন দর্শকদেরই একজন। হ্যাঁ, শ্লেটে লেখার খস-খস আওয়াজও শুনেছেন। শূন্য শ্লেটে দাবিমতো আত্মার স্বাক্ষর দেখে প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রোতা-দর্শকরা অভেদানন্দর মতোই বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়েছেন। তবে পার্থক্যটুকু এই, অভেদানন্দ বিস্মিত হয়েছিলেন আত্মাকে লিখতে দেখে, আর দর্শকরা বিস্মিত হয়েছেন, এমন অসাধারণ ঘটনাও সামান্য লৌকিক কৌশলের সাহায্যেই করা সম্ভব জেনে।

এমন একটা অসাধারণ প্ল্যানচেট করার জন্য প্রয়োজন একটি শ্লেট। টিনের শ্লেট হলেই ভাল হয়। ফ্রেমে আটকানো কালো টিনটার মাপের দু-পিঠ কালো একটা টিনের সীট। টিন-সীটের একটা কোণা ছবির মতো করে কেটে রাখুন। এক টুকরো চক। একটা রুমাল বা খাম। যিনি আত্মা আনবেন, তাঁর হাতের একটা আঙুলের নখ রাখতে হবে একটু বড়। নখটা সামান্য ফাড়া থাকলে আরও ভাল হয়।

শ্লেটে আগে থেকেই একজন সম্ভাব্য আত্মার নাম চক দিয়ে লিখে রাখতে হবে। আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশ অনুসারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা গান্ধী, কার্ল মার্কস, লেনিন বা অন্য কারও নাম স্বাক্ষর করে রাখি। এ-বার লেখার ওপর চাপিয়ে রাখি কালো টিনের সীট। লেখাটা সীটের তলায় চাপা পড়ে যায়। দর্শকরা দেখেন শ্লেটের পরিষ্কার দুটি দিক। এরপর শ্লেটটা চাপিয়ে রাখি অন্য একটা শ্লেটের ওপর। এমনভাবে চাপাই, আলগা টিনের সীটটা তলার শ্লেটের ওপরে গিয়ে পড়ে। এ-বার ওপরের শ্লেটটা তুললেই দর্শকরা দেখতে পান, আত্মার লেখা। খস-খস আওয়াজটা করি ফাড়া নখ শ্লেটে ঘষে।

যা লিখেছি যে নাম যদি দর্শকরা না চান? শত শত অনুষ্ঠানে শ্লেট-লিখন দেখিয়েছি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখেছি আমার লেখা নামটি দর্শকদের মধ্যে কেউ না কেউ চেয়েছেন। প্রয়োজনে লটারি করে নাম নির্বাচন করেছি। কাগজের টুকরোয় দর্শকরাই নাম লিখেছেন, পাত্রে নাম লেখা কাগজ ফেলে নিজেরাই লটারি করে নাম তুলেছেন। এটুকু দর্শকরা বুঝতে পারেননি হাতের কৌশলে তাঁদের কাগজগুলো পালটে গিয়ে আমারই লেখা কতকগুলো কাগজের টুকরো সেখানে এসে গেছে। ফলে, আমার নির্বাচিত নামই তুলতে বাধ্য হয়েছেন দর্শক।

স্বামী অভেদানন্দ যে যোগানন্দেরই নাম লিখবেন সেটা কিলার জানলেন কি করে? এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই অনেকের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। উত্তরে জানাই—অভেদানন্দ ও কিলার এই প্ল্যানচেটে বসার আগের দিন অর্থাৎ ৪ আগস্ট আর এক প্ল্যানচেটের আসরেও অভেদানন্দ তাঁর গুরুভাই যোগানন্দর আত্মাকে আনতে অনুরোধ করেছিলেন। যোগানন্দের নাম শ্লেটে লিখে রেখেও কিলার ঝুঁকি নিতে চাননি বলেই অভেদানন্দকে বলেছিলেন—আপনি যাকে চান তাঁকে হয়ত আনতে পারব না।

বন্ধনমুক্তির খেলায় ভারতীয় জাদুকর

ভারতের দুই বিখ্যাত জাদুকর গণপতি (চক্রবর্তী) এবং রাজা বোসও বিভিন্ন ধরনের বন্ধনমুক্তির খেলায় ছিলেন প্রবাদপুরুষ। ১৯৩১ সালে কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত এক জাদু-সম্মেলনে বন্ধমুক্তির খেলা দেখিয়ে এই দুই জাদুকর দর্শকদের বিস্মিত, বিমূঢ় করেছিলেন।

অনুষ্ঠানে গণপতি হাজির করলেন একটি কাঠের বাক্স ও একটি তালা। বাক্স ও তালাটি পরীক্ষা করে যখন দর্শকরা নিশ্চিত হলেন যে, এই দুটির কোনওটিতেই কোনও কৌশল নেই, তখন গণপতিকে বাক্সে ঢুকিয়ে ডালায় তালা বন্ধ করে, বাক্সটাকে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছিল, তারপর বাক্সটা ঢেকে দেওয়া হয়েছিল একটা চাদর দিয়ে, অথচ গণপতি অতি দ্রুত বাক্স থেকে বেরিয়ে এসে চাদর ঠেলে, দর্শকদের সামনে হাজির হয়ে আবার ঢুকে গিয়েছিলেন বাক্সে। দড়ি-দড়া আর তালা খুলতে দেখা গেল গণপতি রয়েছেন বাক্সের ভেতরে।

সেদিন রাজা বোস যা দেখিয়েছিলেন, তা আরও বিস্ময়কর। স্টেজে হাজির করা হলো একটা পিপে। পিপের ওপরে ছিল একটা ডালা। সঙ্গে হাজির করা হয়েছিল একটা তালাও। পিপে আর তালা পরীক্ষা করতে অনুরোধ করা হলো দর্শকদের। দর্শকরা পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর জাদুকর রাজা বোস তাঁর এক সহকারীকে পিপেতে ঢুকিয়ে দিলেন। দর্শকরা ডালা বন্ধ করে তালা এঁটে চাবি নিজেদের কাছেই রাখলেন। রাজা বোস এবার ডালার ওপর উঠে বসে একটা চাদর দিয়ে নিজেকে ঢেকে দিয়েই মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে চাদরটা ফেলে দিলেন। কী আশ্চর্য! এ তো রাজা বোস নন, এ যে পিপের ভেতরে বন্ধ করে রাখা সেই লোকটি! রাজা বোস তবে কোথায়? পিপের তালা খুললেন দর্শকরা। সেখানে অপেক্ষা করছিল আরও কিছু বিস্ময়। রাজা বোস বসে রয়েছেন পিপের মধ্যে!

বিশ্বখ্যাত জাদুকর পি. সি. সরকারের হাত-পা রেললাইনের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল। ট্রেন তাঁর শরীরের ওপর দিয়ে চলে যাওয়ার মুহূর্তে তিনি নিজেকে লোহার শেকলের বাঁধন থেকে মুক্ত করেছিলেন। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৩১-৩২ সালে চীনে, ট্রেনটা ছিল সাংহাই এক্সপ্রেস।

এ-যুগের অনেক জাদুকরই এখন নানা ধরনের বন্ধনমুক্তির বা 'escape'-এর খেলা দেখিয়ে থাকেন। এই আনন্দ দেওয়ার কৌশলগুলোই অসৎ লোকদের হাতে যুগযুগ ধরে লোক ঠাকাবার কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং যতদিন মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত-বিশ্বাস ও অন্ধ-বিশ্বাস থাকবে, ততদিন এই লোক-ঠকানোর ব্যবসাও চলতেই থাকবে।

হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে বস্তা-বন্দী ও তারপর বাক্স-বন্দী করার পর মুহূর্তে নিজেকে মুক্ত করার খেলা অনেক জাদুকরই অতীতে দেখিয়েছেন এবং বর্তমানেও দেখিয়ে থাকেন। হাতে হাতকড়ি পরিয়ে বস্তা-বন্দী করে বস্তার মুখ বেঁধে তারপর

বাক্সে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দিতে দর্শকদের লাগে সাধারণ পাঁচ থেকে দশ মিনিট। অথচ বাক্সটা তিরিশ সেকেণ্ডের মতন অস্বচ্ছ মশারিতে বা চাদরে আড়াল করলেই জাদুকর সমস্ত বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে মশারি বা চাদর ঠেলে মুখ বের করেন। বিস্ময়কর এই ঘটনা দেখার পর দর্শকরা অনেক সময় জাদুকরকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বা পিশাচ-সিদ্ধ বলে মনে করেন। এমনই এক ধারণা প্রবলতর

বন্ধনমুক্তির সেরা যাদুকর হ্যারি হুডিনি

হয়েছিল জাদুকর গণপতি চক্রবর্তীকে ঘিরে। এই ধরনের বন্ধন মুক্তির খেলায় অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে বহু জাদুকরই দর্শকদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অদ্ভুত সব যুক্তিহীন ধারণা। কেউ বা মনে করেন—ব্যাপারটা পুরোপুরি গণ-সম্মোহন, আবার কেউবা ভাবেন—ওদের একটা অলৌকিক ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে।

বাস্তবে এই ধরনের প্রতিটি বন্ধন মুক্তিই ঘটানো হয়ে থাকে নেহাতই লৌকিক কৌশলের সাহায্যে।

দর্শকদের একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে, হাতকড়ি বা পায়ের বেড়ি খোলার চাবি ব্যাঙ্ক-লকারের মতনই আর দ্বিতীয় হয় না। না, তা নয়। সব হাতকড়ি আর পায়ের বেড়ির চাবি একই। দু'জোড়া কিনলেই হাতে চলে আসে একটা অতিরিক্ত চাবি। এই অতিরিক্ত চাবিই জাদুকর নিজের হাতকড়ি খুলতে কাজে লাগান।

যে বস্তায় বন্ধ করা হয়, সেই বস্তার তলায় এমন ধরনের সেলাই দেওয়া থাকে যাতে বস্তা-বন্দী জাদুকর বস্তার ভেতরে হাত বুলোলেই সেলাই চটপট খুলে যায়।

জাদুকরের পোশাকের আড়ালে থাকে একট মুখ-বাঁধা বস্তা। সেলাই-খোলা বস্তাটি পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে নিয়ে বাক্সে ফেলে রাখেন মুখ-বাঁধা বস্তাটা।

এবার বাকি শুধু কাঠের সিন্ধুক থেকে বেরিয়ে আসা। এতটা শোনার পর বুদ্ধিমান পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন বাক্সে কোনও একটা গোপন দরজা থাকে, তবে সাধারণ চোখে এই দরজার অস্তিত্ব বোঝা বা খোলা সম্ভব হয় না।

দেখলেন তো, এতক্ষণ বিখ্যাত সব জাদুকরদের যে-সব খেলাগুলোর কথা শুনে বিস্মিত হয়ে ভাবছিলেন, সত্যিই কী এগুলো লৌকিক কৌশলে করা সম্ভব? সেগুলোরই মূল কৌশলটা কত সোজা। এই কৌশলই একটু অদল-বদল করে বিভিন্ন জাদুকররা বন্ধন-মুক্তির খেলা দেখান, আর ঠকবাজেরা লোক ঠকায়।

রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেট-চর্চা

আমাকে মাঝে-মধ্যে বহু পরিচিতজনের কাছেই একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখায় উল্লেখ পাই, তিনি প্ল্যানচেটের সাহায্যে তাঁর প্রিয়জনের বিদেহী আত্মাদের নিয়ে এসেছিলেন। বিদেহী আত্মারা লিখিত উত্তরও রেখে গেছেন। এরপরও কী বলবেন? রবীন্দ্রনাথের সব কথা মিথ্যে?

রবীন্দ্রনাথ বাঙালি তথা ভারতীয়দের কাছে অতি স্পর্শকাতর বিষয়। তবু এই সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রায় ক্ষেত্রেই বাঙালিরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যতটা গর্ব করেন ততটা রবীন্দ্রনাথকে জানার, তাঁর রচনা পড়ার চেষ্টা করেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছে অনেকটাই গান, গীতি-নাট্য ও বইয়ের তাকের শোভা বর্ধনে আবদ্ধ। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা বিষয়ে এই ধরনের প্রশ্ন তোলেন, তাঁরা নিজেরা যদি রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেট করার বিষয়ে কিছুটা পড়াশুনো করে নিতেন তবে ঠিক এই ধরনের প্রশ্ন আদৌ করতেন না।

রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চার পেছনে ছিল অজানাকে জানার কৌতূহল। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে অন্ধ-বিশ্বাসী ছিলেন না। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা রবীন্দ্র-জীবনী গ্রন্থ থেকে জানতে পারি—"রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্ল্যানচেট লইয়া বহুবার পরীক্ষা করিয়াছেন। কখনও কৌতুকছলে, কখনও কৌতূহলবশে।"

১৯২৯ সালের (রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৬৮ অতিক্রান্ত) পুজোর ছুটির শেষভাগে শান্তিনিকেতনে এলেন মোহিতচন্দ্র সেনের মেয়ে উমা সেন বা বুলা। পরে উমাদেবী শিশিরকুমার গুপ্তের সঙ্গে বিবাহসূত্রে গুপ্তা হন। উমাদেবী বা বুলা

রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেট চর্চার মিডিয়াম উমা

ছিলেন শিক্ষিতা ও সাহিত্যরসে আপ্লুতা। উমা গুপ্তার লেখা দুটি কবিতার বইও আছে, 'ঘুমের আগে' ও 'বাতায়ন'।

রবীন্দ্রনাথ জানতে পারলেন 'বুলা'র মধ্যে রয়েছে মিডিয়াম হওয়ার অতীন্দ্রিয়

শক্তি। রবীন্দ্রনাথের অশেষ আগ্রহে বসল প্ল্যানচেট-চক্র, নভেম্বর ৪, ৫, ৬, ৮, ২৮ ও ২৯ এবং ১৬ ডিসেম্বর। প্ল্যানচেট-চক্রে মিডিয়াম বুলা ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে অন্যান্যদের সঙ্গে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, অলোকেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, ডঃ অমিয় চক্রবর্তী এবং প্রশান্ত মহলানবিশ।

শেষবয়সে রবীন্দ্রনাথ উমাদেবী বা বুলাকে পেয়ে পরলোকের তথ্যানুসন্ধানে যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছিলেন। ৬, ২৮, ২৯ নভেম্বর এবং ১৬ ডিসেম্বর প্ল্যানচেটের পুরো বিবরণ লিপিবদ্ধ করা রয়েছে ৪, ৫ ও ৮ নভেম্বরের প্ল্যানচেটের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের লেখা বিভিন্ন চিঠি-পত্র থেকে।

প্ল্যানচেট-চক্রগুলোতে উমাদেবীর ওপর বিদেহী আত্মার ভর হতেই উমাদেবী লিখতে শুরু করতেন। প্রায় সবসময়ই প্রশ্নকর্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

উমাদেবীর কাছ থেকে বিদেহী আত্মাদের লিখিত উত্তর (?) পেয়েও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বিদেহী আত্মার আবির্ভাব বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন না। উমাদেবীকে মিডিয়াম করার পর ৬ নভেম্বর, ১৯২৯ রানী মহলানবিশকে একটি চিঠি লেখেন। যাতে লিখেছিলেন, "উত্তরগুলো শুনে মনে হয় যেন সে-ই (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিদেহী আত্মা) কথা কইছে। কিন্তু এসব বিষয়ে খুব পাকা প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার প্রধান কারণ মন তো সম্পূর্ণ নির্বিকার। তার যা ধারণা হয়, সে ধারণার হেতু সবসময় বাইরে থাকে না, তার নিজের প্রকৃতির মধ্যেই থাকে।"

প্ল্যানচেট প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীকে যা বলেচিলেন, তারই কিছু পাই 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইতে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই তো (বুলা) কী রকম করে সব লিখত বল তো? আশ্চর্য নয় তার ব্যাপারটা? ... ও (বুলা) কেন মিছে কথা বলবে? কী লাভ ওর এ ছলনা করে?"

মনোবিজ্ঞান কিন্তু বলে—অপরের চোখে নিজেকে বিশিষ্ট করে তোলার তাগিদেও মানুষ ছলনার আশ্রয় নেয়, মিথ্যাচারী হয়, বড়দের, বিখ্যাতদের মিথ্যাচার কী আমরা কোনও দিন দেখিনি? উমাদেবীর ক্ষেত্রে এমনটা হতে পারে, না-ও হতে পারে। উমাদেবী যদি ছলনার আশ্রয় না নিয়ে থাকেন, তবে মিডিয়াম হিসেবে তাঁর হাত দিয়ে লেখাগুলো কী করে এলো? এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই অনেকের মনে জাগতে পারে। এই বিষয়ে উত্তরও খুবই স্বচ্ছ এবং সরল, সম্মোহন ও স্ব-সম্মোহন নিয়ে যে আলোচনা আগে করেছি সেটুকু থেকেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, উমাদেবীর ক্ষেত্রে বিদেহী আত্মার প্রতি অন্ধ-বিশ্বাস ও তীব্র অনুভূতিপ্রবণতা তাঁকে আংশিকভাবে সম্মোহিত করেছিল। বিদেহী আত্মা তাঁর ওপরে ভর করেছে এই বিশ্বাসের দ্বারা নিজেকেই নিজে সম্মোহিত করে উত্তর লিখে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "খুব শক্ত সবল জোরাল মানুষ বোধহয় ভাল মিডিয়াম হয় না।" (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ : মৈত্রেয়ী দেবী)

একজন ভালো মিডিয়াম হওয়া প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ লিখছেন, "কোন

লোক যদি তার নিজের কর্তৃত্ব মনের ওপর রেখে দেয় তবে ভালো একজন মিডিয়াম হওয়া তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।" (মরণের পারে, পৃষ্ঠা-১৪২)

স্বামী অভেদানন্দ এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, "মনে রাখা উচিত যে, মিডিয়াম হবার ভাবটি হলো একজন মানুষের দেহ ও মনের স্থির তন্দ্রাবিষ্ট অবস্থা।" (মরণের পারে, পৃষ্ঠা—১৩৬)

মিডিয়াম অবস্থায় উমাদেবী এমন কোনও উত্তর লিখে রাখতে সক্ষম হননি যার দ্বারা অভ্রান্তভাবে বিদেহী-আত্মার আগমন প্রমাণিত হয়। বরং দেখতে পাই বিভিন্ন আত্মা উমাদেবীকে দিয়ে লেখালেও সব আত্মারই হাতের লেখা ছিল একই রকম।

একবার সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের বিদেহী আত্মা এলেন উমাদেবীর পেনসিলে। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বন্ধু শ্রীশচীন্দ্র মজুমদারের ছেলে সন্তোষচন্দ্র। আমেরিকায় গিয়েছিলেন কৃষিবিদ্যা পড়তে। ফিরে এসে শান্তিনিকেতনের কাজে নিজেকে নিয়োগ করেন। মৃত্যুর সময় ছিলেন শ্রীনিকেতনের সচিব। মারা যান ১৯২৬ সালে।

সন্তোষচন্দ্রের বিদেহী আত্মাকে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেছিলেন :

রবীন্দ্রনাথ—তুমি ওখানে কোন কাজে প্রবৃত্ত আছ?

সন্তোষচন্দ্র—আমি একটা বাগান তদারকি করি। কিন্তু সে পৃথিবীর ফুলবাগান নয়।

রবীন্দ্রনাথ—এখানে যেমন গাছপালা থাকে, সে কি সেইরকম?

সন্তোষচন্দ্র—একটি গাছের আত্মার একটি বিশেষ ফুল ক্রমেই শুকিয়ে উঠছে। ঠিক বুঝতে পারছিনে।

২৮ নভেম্বর প্ল্যানচেটে এলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মা। মণিলাল অবনীন্দ্রনাথের জামাতা। সাহিত্যে, অভিনয়ে, সঙ্গীতে যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছিলেন। ১৯২৯ সালেই মারা যান।

মণিলালের বিদেহী আত্মাকে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন :

—আমি একটা কথা বুঝতে পারিনি সন্তোষের। সেখানে বাগান আবার কী? বুঝতে পারছি না।

মণিলাল উত্তর দিয়েছিলেন—গাছের কী আত্মা নেই? আছে।

রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেট-চক্রে গাছ-পালা, শাক-সব্জি, ঘাস, খড় সবেরই বিদেহী আত্মার অস্তিত্বের খবর আমরা পাই, যে আশ্চর্য খবরটা স্বামী অভেদানন্দের আত্মারা একবারের জন্যেও উচ্চারণ করেনি।

বিদেহী আত্মা রবীন্দ্রনাথকে তাদের দেহের আকারের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছে—"কারও বা ঝড়ের হাওয়ার মতো কারও বা ফুরফুরে হাওয়া।"

আত্মা বিষয়ে স্বামী অভেদানন্দের 'কুয়াশার মতো' বর্ণনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'হাওয়ার মতো' বর্ণনা মেলে না। বিদেহী আত্মার অস্তিত্ব থাকলে দু'জনের বক্তব্যে মিলটুকু নিশ্চয়ই প্রথম সত্ত্ব হতো।

আমার দেখা প্ল্যানচেট

বছর কয়েক আগের কথা। কলকাতার এক বিখ্যাত কলেজের বিজ্ঞান বিষয়ের এক অধ্যাপক বন্ধু একদিন কথায় কথায় বললেন, তিনি নিজেই কয়েকবার প্ল্যানচেটের সাহায্যে বিদেহী আত্মাকে এনেছেন। তাঁর বাড়িতে এ-রকম একটি প্ল্যানচেট-চক্রে উপস্থিত থাকার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। বন্ধুর আমন্ত্রণ উপেক্ষা না করে তাঁর এক প্ল্যানচেট-চক্রে হাজির হলাম।

সেদিনের ওই চক্রে অধ্যাপক বন্ধু সমেত আমরা পাঁচজন হাজির ছিলাম। খাওয়ার টেবিল ঘিরে পাঁচটা চেয়ারে বসলাম আমরা পাঁচজন। টেবিলের মাঝখানে রাখা হলো একটা বড় সাদা কাগজ। কাগজটার ওপর বসানো হলো ছোট্ট তিনকোনা প্ল্যানচেট-টেবিল, এক কোনা থেকে আর এক কোনার দুরত্ব হবে ৬ ইঞ্চির মতো। প্ল্যানচেট-টেবিলটার তিনটে পায়ার বদলে দু'দিকে লাগানো রয়েছে দু'টো লোহার গুলি বা বল-বেয়ারিং, একদিকে একটা বোর্ড-পিন, লোহার গুলি লাগানোর কারণ, টেবিলটা যাতে সামান্য ঠেলায় যে কোনও দিকে সাবলীল গতিতে যেতে পারে। সম্ভবত এককালে বোর্ড-পিনের জায়গাতেও একটা লোহার গুলিই ঢাকনা সমেত বসানো ছিল, গুলিটা কোনও কারণে খসে পড়ায় বোর্ড-পিনটা তার প্রক্সি দিচ্ছে। যেদিকে বোর্ড-পিনের পায়া, সেদিকের টেবিলের কোণে রয়েছে একটা ছোট ফুটো। ওই ফুটোর ভেতরে গুঁজে দেওয়া হলো একটা পেনসিল। পেনসিলের ডগাটা রইল কাগজ স্পর্শ করে।

ঘরে ধূপ জ্বালা হলো। আমাকে দর্শক হিসেবে রেখে চারজনে বসলেন বিদেহী আত্মার আহ্বানে। আমি আবেগপ্রবণ নই বলেই আমাকে মিডিয়ামের অনুপযুক্ত বলে রাখা হয়েছিল দর্শক হিসেবে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর একটা ছবি এনে রাখা হলো মিডিয়ামদের সামনে। মিডিয়ামরা ছবিটার দিকে তাকিয়ে একমনে চিন্তা করতে লাগলেন, সেইসঙ্গে প্রতেকের ডান হাতের তর্জনী ছুঁয়ে রইল, প্ল্যানচেটের টেবিল।

কিছুক্ষণ পরে প্ল্যানচেটের টেবিলে নড়ে-চড়ে উঠল। অধ্যাপক বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে?"

উত্তরে বাংলায় লেখা হলো—জগদীশচন্দ্র বসু।

প্রশ্ন—পরলোকে উদ্ভিদের আত্মা আছে কি?

উত্তর—না।

প্রশ্ন—কেন যাননি? উৎসাহ নেই?

উত্তর—আমি চলি।

এবার যে ছবিটা হাজির করলাম, সেটা আমার মায়ের। ছবিটা টেবিলে রাখতে আমার অধ্যাপক বন্ধু বললেন, "ইনি কে?"

—"আমার মা।"

—"নাম?"

—"সুহাসিনী ঘোষ।"

আবার প্ল্যানচেট-চক্র বসল। কিছুক্ষণ কেটে যেতেই পেনসিলটা গতি পেল। আমি প্রশ্ন করলাম, "আপনি কে?"

—"তোর মা।"

"নাম?"

"সুহাসিনী ঘোষ।"

"এখন কেমন আছ? ওখানে কষ্ট হয়?"

"না। এ দুঃখ-কষ্টের ঊর্ধ্বে এক জগৎ।"

"আমি দেহাতীত আত্মার অস্তিত্বে এতদিন অবিশ্বাস করে এসেছি। তুমি যে সত্যিই আবার মা, তার প্রমাণ কী?"

—"এখনি প্রমাণ করতে পারিস, তুই আমার ছেলে? আমি যাই।"

চক্র ভাঙতেই অধ্যাপক বন্ধুটি বললেন, "আমরা কোনও চাতুরির আশ্রয় নিয়েছিলাম বলে কি তোমার ধারণা?"

"না, লোক ঠাকানোর চেষ্টা তোমরা করনি ঠিক, কিন্তু, তোমাদের মধ্যে কারও একজনের চিন্তাশক্তির তীব্রতা তারই অজ্ঞাতে পেনসিলটাকে ঠেলে লেখাচ্ছিল, " বললাম, আমি।

বন্ধুটি কিছুটা উত্তেজিত হলেন, বললেন, "তুমি তো নিজেকে একজন র‍্যাশানালিস্ট বল। কোন যুক্তিতে এই লেখাগুলোকে আমাদেরই কারও অবচেতন মনের প্রতিফলন বলে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাও তা একটু বলবে?"

আমি এবার মিহি সুরে আসল সত্যটি প্রকাশ করলাম, "ওই যে ছবিটি দেখছ, ওটি আমার মায়ের, নাম সুহাসিনী। কিন্তু তাঁর বিদেহী আত্মাকে টেনে আনতেই আমি নিশ্চিত হলাম, এই প্ল্যানচেটের পেছনে লোক ঠকানোর কোনও ব্যাপার না থাকলে, গোটাটাই ঘটছে অবচেতন মন থেকে। কারণ আমার মা জীবিত।"

আপনাদের অবগতির জন্য জানাই সেদিনের প্রেত-চক্রে উপস্থিত সকলেই প্ল্যানচেটের অস্তিত্বে বিশ্বাস হারিয়েছেন।

কয়েক মাস আগে আমার পরিচিত মিস্টার সিনহার (নামটা ঠিক মনে নেই) আহ্বানে তাঁরই এক বন্ধুর ভবানীপুরের বাড়িতে প্ল্যানচেটের আসরে গিয়েছিলাম। বরেণ্য সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষের একটি ছবি মিডিয়ামদের সামনে রেখেছিলাম। আমি ছিলাম দর্শক। মিডিয়াম ছিলেন সিনহা ও তাঁর দুই বন্ধু। এখানেও একটা তিনকোনা প্ল্যানচেট-টেবিলকে একটা সাদা কাগজের ওপর চাপানো হয়েছিল। টেবিলের ফুটোয় গুঁজে দেওয়া হয়েছিল পেন্‌সিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে পেনসিলটিকে চলতে দেখে প্রশ্ন করলাম, "আপনি কে?"

উত্তরে লেখা হলো, "সন্তোষ ঘোষ।"

আমি বললাম, "আপনি নিজের নাম ভুল লিখলেন কেন? আপনি কি সন্তোষ ঘোষ লিখতেন? যেমনভাবে নিজের নামের বানান লিখতেন, তেমনভাবে লিখুন।"

এবার লেখা হলো, "সন্তোষকুমার ঘোষ।"

শ্রীসিনহাকে বললাম, "এই লেখাটা কিন্তু সন্তোষকুমার ঘোষের লেখা নয়। আপনারা গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে জোর দিয়ে যা ভাবছেন, সেই ভাবনাকে রূপ দিতেই আপনারা নিজেদের অজ্ঞাতে প্ল্যানচেট-টেবিলের পেন্‌সিলকে দিয়ে তা লিখিয়ে নিচ্ছেন। সন্তোষদা তাঁর নামের বানান লিখতেন সন্তোষকুমার ঘোষ, অর্থাৎ সন্তোষ ও কুমার থাকত একসঙ্গে। আপনারা কিন্তু লিখেছেন আলাদা আলাদাভাবে দুটি পৃথক শব্দ হিসেবে, সন্তোষ, কুমার। ওঁর বানান লেখার পদ্ধতি জানতেন না বলেই আপনারা ভুল করছেন।

আমার এক বন্ধু তপন চৌধুরী থাকেন যাদবপুরে। একদিন খবর দিলেন, তাঁর কয়েকজন বন্ধু প্ল্যানচেট করে বিদেহী আত্মাদের নিয়ে আসছেন বলে দাবি করছেন। তপন তাঁর বন্ধুদের প্ল্যানচেটের ব্যাপারে আমার অবিশ্বাসের কথা বলায় ওই বন্ধুরা নাকি আমার দিকে প্ল্যানচেটকে মিথ্যে বা জালিয়াতি প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন।

আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলাম। বলেছিলাম, আমার পকেটে একটি কাগুজে টাকা থাকবে। সর্বত্রগামী, সূক্ষ্মদেহী, বিদেহী আত্মাদের সহায়তায় মিডিয়ামরা যদি আমার নোটটির নম্বর লিখে দিতে পারেন, তবে পঁচিশ হাজার টাকা ওদের দেব। হেরে গেলে পাঁচ হাজার টাকা ওদের দিতে হবে, রাজি আছেন কি?"

শেষ পর্যন্ত ওরা রাজি হননি। জানি, রাজি না হওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ পাঁচ হাজার টাকা তো কম নয়!

এক মার্কসবাদী খুদে নেতা তাঁর বাড়িতে এক প্ল্যানচেট-চক্রে আমাকে ও আমার বন্ধু শম্ভুনাথ চক্রবর্তীকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। খুদে নেতাটির দাদা সেই সময় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রভাবশালী সচিব। ঠিক হলো চক্রে উপস্থিত থাকব আমি, শম্ভু এবং নেতা ও তাঁর স্ত্রী। শম্ভু কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে কাজ করে এবং একটি বামপন্থী ইউনিয়নের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হলেও সাহিত্য ও সাহিত্য সৃষ্টিতে যথেষ্ট আগ্রহী।

চক্রে বসার দিন সময়ও ঠিক করে ফেললাম নেতা, আমি ও শম্ভু। শম্ভু সর্বজনশ্রদ্ধেয় এক সাহিত্যিকের নাম করে বললেন, "ওঁর আত্মাকে সেদিন নিয়ে আসতে হবে।"

নেতাটি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসিটি মুখের চারপাশে ছড়িয়ে বললেন, "ওঁকে অনেকবার আমরা এনেছি। কোনও প্রবেলম নেই।"

শম্ভু এবার বললেন, "ওঁর এক অবৈধ সন্তান ছিল। সন্তানটির নাম গবেষক ছাড়া কারওরই খুব একটা জানার কথা নয়। লেখকের আত্মা নিজের অবৈধ

সন্তানটির নাম লিখে দিলেই আমি চূড়ান্তভাবে প্ল্যানচেটকে স্বীকার করে নেব।”

আমাদের সেই প্ল্যানচেটের আসর আজ পর্যন্ত বসেনি। সম্ভবত নেতাটি এখনও সাহিত্যিকের অবৈধ সন্তানটির নাম জেনে উঠতে পারেননি।

মাঝে মধ্যে প্ল্যানচেট-চক্র বসত প্রতিষ্ঠিত এক সঙ্গীতশিল্পীর বাড়িতে। শিল্পীর নামটি তাঁরই অনুরোধে এখানে উল্লেখ করলাম না। আমার বোঝাবার সুবিধের জন্যে ধরে নিলাম তাঁর নাম 'সত্যবাবু'। '৮৩-র মার্চের একদিন সত্যবাবুকে আমিই

বৃত্ত এঁকে প্ল্যানচেট করা হচ্ছে

ফোন করে জানালাম তাদের পরবর্তী চক্রে দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকতে চাই। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্তী চক্রের তারিখ ও সময় জানিয়ে দিলেন।

চক্র বসল রাত দশটা নাগাদ। উপস্থিত ছিলেন দু'জন মহিলা সমেত সাতজন, এঁদের মধ্যে চারজনেরই প্ল্যানচেট মিডিয়াম হওয়ার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে।

কার্পেট গুটিয়ে মেঝেতে ঘড়ির বৃত্ত আঁকা হলো। বৃত্তের ভিতরে লেখা হলো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। বৃত্তের বাইরে লেখা A থেকে Z পর্যন্ত। নিয়ন নিভিয়ে জ্বেলে দেওয়া হলো একটা মোটা মোম। বৃত্তের মাঝখানে বসানো হলো একটা ধূপদানি। ধূপদানিতে তিনটে চন্দন ধূপ গুঁজে জ্বেলে দেওয়া হলো। তিনজন মিডিয়াম বৃত্তের বাইরে বসে ডানহাতের তর্জনী দিয়ে ছুঁয়ে রইলেন ধূপদানিটা।

একজন বসলেন একটা খাতা ও কলম নিয়ে, ধূপদানি যেই যেই অক্ষরে বা সংখ্যায় যাবে সেগুলো লিখে রাখবেন।

প্রথমেই ওরা যাঁর ছবি সামনে রেখে আত্মাকে আহ্বান করেছিলেন, তিনি একজন সঙ্গীতজগতেরই খ্যাতিমান পুরুষ। আত্মা এলো, ধূপদানিটাও তৎপরতার সঙ্গে এক-একটি অক্ষরে ঘুরতে লাগল। একসময় আমাকে প্রশ্ন করতে অনুরোধ করলেন সঙ্গীতশিল্পী। বিদেহী আত্মাকে আমার পরিচয় দিলেন, আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হিসেবে।

বিদেহী আত্মা বললেন, "YOUR QU."

অর্থাৎ, আমার প্রশ্ন কি?

বললাম, "আমার বুকপকেটে একটা একটাকার নোট আছে, নোটটার নম্বর কত?"

ধূপদানিটা বার কয়েক এদিক ওদিক ঘুরে লিখল, "NONSENCE"।

পরবর্তী বিদেহী আত্মা হিসেবে আমি আমার মায়ের ছবি পেশ করেছিলাম, সঙ্গে নাম।

মায়ের বিদেহী আত্মাও কিন্তু উত্তর দিয়েছিলেন। মা জীবিত শোনার পর সেদিনের মতো প্ল্যানচেট-চক্রের বৈঠক ভেঙে গিয়েছিল। আমি যতদূর জানি, সঙ্গীতশিল্পীর ঘরে আর কোনও দিন প্ল্যানচেট-চক্র বসেনি। ভুল করাটা বড় কথা নয়। ভুলটা বুঝতে পেরে নিজেকে সংশোধন করে নেওয়াটাই বড় কথা।

যুগে যুগে ধাপ্পাবাজেরা তাদের প্রচারের ও সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে বিখ্যাত ব্যক্তিদেরই বেছে নিয়েছে। ওরা জানে মওকা বুঝে ঠিকমতো কৌশল অবলম্বন করতে পারলে মোটা বুদ্ধির চেয়ে সূক্ষ্মবুদ্ধির লোকেদের কব্জা করা অনেক বেশি সহজ।

প্রতিটি পাঠক-পাঠিকার কাছে একটি বিনীত অনুরোধ—যে-ঘটনা আপনার অলৌকিক বলে মনে হচ্ছে, তার পেছনে রয়েছে আপনার অজানা কোনও কারণ, এই বিশ্বাস অনুসন্ধান করুন। প্রয়োজনে অপরের সাহায্য নিন। নিশ্চয়ই আপনার নেতৃত্বে অলৌকিকত্বের রহস্য উন্মোচিত হবে।

আপনার অনুসন্ধানে আমার কোনও সহযোগিতার প্রয়োজন হলে নির্দ্বিধায় আমার অথবা এই বইটির প্রকাশকের ঠিকানায় আমাকে জবাবী খামসহ চিঠি দিন বা যোগাযোগ করুন। নিশ্চয়ই সাধ্যমতো সবরকম সহযোগিতা করব।

অধ্যায় : কুড়ি

‘অলৌকিক’ শক্তিধরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ

২৫ লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ

আজ এই বইটি প্রকাশের দিন থেকে আমি প্রবীর ঘোষ, পিতা- মৃত প্রভাতচন্দ্র ঘোষ, নিবাস- ৭২/৮ দেবীনিবাস রোড, কলকাতা- ৭০০ ০৭৪ এই বইটির লেখক নিম্নলিখিত ঘোষণা রাখছি— বিশ্বের যে কোনও ব্যক্তি কোনও কৌশলের সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা আমার নির্দেশিত স্থানে ও পরিবেশে নিম্নলিখিত যে কোনও একটি ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে পারেন, তবে তাঁকে ২৫ লক্ষ ভারতীয় টাকা দিতে বাধ্য থাকব।

আমার এই চ্যালেঞ্জ আমার মৃত্যু পর্যন্ত অথবা প্রথম অলৌকিক ক্ষমতাবানকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত বলবত থাকবে।

● **এই ঘটনাগুলোর যে কোনও একটি অলৌকিক ক্ষমতায় দেখাতে হবে :**

১। যোগের সাহায্যে যে কোনও রোগীকে রোগমুক্ত করার কোনও দাবিদার যদি আমার দেওয়া রোগীকে ১ বছরের মধ্যে রোগমুক্ত করতে পারেন।

২। যোগ পদ্ধতির সাহায্যে টাকে চুল গজিয়ে দিতে হবে।

৩। যোগের সাহায্যে পাখির মতো শূন্যে উড়ে দেখাতে হবে।

৪। যোগের সাহায্যে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করতে হবে।

৫। যোগের সাহায্যে জরাকে আটকে রাখতে হবে।

৬। যোগের সাহায্যে মৃত্যুকে প্রতিরোধ করে দেখাতে হবে। *(ট্রেনে কাটা পড়েও বেঁচে থাকলে বেশ দেখার মতো ব্যাপার হবে।)*

৭। রেইকি ক্ষমতায় অথবা অলৌকিক ক্ষমতায় আমার তরফ থেকে হাজির করা রোগীকে ১৮০ দিনের মধ্যে রোগমুক্ত করতে হবে। মৃত্যুর দায় পুরোপুরি বহন করতে হবে রেইকি মাস্টার বা অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারকে।

৮। অচল টেপ রেকর্ডারকে, রেডিওকে রেইকি ক্ষমতার দ্বারা বা অলৌকিক উপায়ে সচল করতে হবে যেমনটা দাবি করে থাকেন কিছু রেইকি গ্র্যান্ডমাস্টার।

৯। 'ফেং-শুই'-এর অভ্রান্ততা প্রমাণ করতে হবে।

১০। 'বাস্তুশাস্ত্র'-এর সাহায্যে লকআউট কারখানা খুলে লাভের মুখ দেখাতে হবে।

১১। জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে বা অলৌকিক ক্ষমতাবলে আমার দেওয়া দশটি ছক বা হাতের ছাপ দেখে প্রত্যেক ছক বা হাতের অধিকারীর অতীত সম্বন্ধে পাঁচটি করে প্রশ্নের মধ্যে অন্তত চারটি করে সঠিক উত্তর দিতে হবে।

১২। আমার তরফ থেকে হাজির করা ছবির মেয়েটিকে ১৮০ দিনের মধ্যে বশীকরণ করে প্রমাণ করতে হবে 'ফটো সম্মোহন'-এর অস্তিত্ব।

১৩। আমার দেওয়া কোনও ছেলে বা মেয়েকে 'সরস্বতী কবচ' দিয়ে বা অলৌকিক উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম করাতে হবে।

১৪। প্রজাপতি কবচে বা অলৌকিক ক্ষমতায় আমার দেওয়া ছেলে বা মেয়েকে ১৮০ দিনের মধ্যে বিয়ে দিতে হবে।

১৫। আমার তরফ থেকে হাজির করা মামলা জেতাতে হবে।

১৬। তন্ত্রের দ্বারা বা অলৌকিক উপায়ে সন্তানহীনাকে জননী করতে হবে। সন্তানহীনাকে হাজির করব আমি।

১৭। তন্ত্রের দ্বারা বা অলৌকিক উপায়ে যৌন-অক্ষমকে যৌনক্ষমতা দিতে হবে।

১৮। আমার দেওয়া চারজন ভারতবিখ্যাত মানুষের মৃত্যু সময় আগাম ঘোষণা করতে হবে।

১৯। প্ল্যানচেটে আত্মা আনতে হবে।

২০। সাপের বিষ কোনও কুকুর বা ছাগলের শরীরে ঢুকিয়ে দেবার পর তাকে অলৌকিক উপায়ে সুস্থ করতে হবে।

২১। বিষপাথরের বিষশোষণ ক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে।

২২। কঞ্চি চালান, বাটি চালানের সাহায্যে চোর ধরে দিতে হবে।

২৩। থালা পড়ার সাহায্যে বিষ নামাতে হবে।

২৪। নখদর্পণ প্রমাণ করে চোর ধরে দিতে হবে।

২৫। চালপড়া খাইয়ে চোর ধরে দিতে হবে।

২৬। যোগবলে শূন্যে ভাসতে হবে।

২৭। যোগবলে ১০ মিনিট হৃদস্পন্দন বন্ধ রাখতে হবে।

২৮। একই সঙ্গে একাধিক জায়গায় আবির্ভূত হতে হবে।

২৯। টেলিপ্যাথির সাহায্যে অন্যের মনের খবর জানতে হবে।

৩০। জলের ওপর হাঁটা।

৩১। এমন একটি বিদেহী আত্মাকে হাজির করতে হবে, যার ছবি তোলা যায়।

৩২। যা চাইব, শূন্য থেকে তা সৃষ্টি করতে হবে।

৩৩। মন্ত্রে দু'ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি নামাতে হবে।

৩৪। মানসিক শক্তির সাহায্যে কঠিন কোনও বস্তুকে বাঁকাতে হবে বা সরাতে হবে।

৩৫। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় আমার বা আমার মনোনীত কোনও ব্যক্তির চালানো গাড়ি থামাতে হবে।

৩৬। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির সাহায্যে একটি খামে বা বাক্সে রাখা জিনিসের সঠিক বর্ণনা দিতে হবে।

● **চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীদের নিম্নলিখিত শর্তগুলো মানতে হবে :**

১। আমার চ্যালেঞ্জের অর্থ গ্রহণ করুন, বা না করুন, আমার চ্যালেঞ্জ যিনি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাঁকে আমার কাছে, আমার মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে আমানত হিসেবে কুড়ি হাজার টাকা জমা দিতে হবে। তিনি জিতলে আমার চ্যালেঞ্জের টাকাসহ তাঁর জামানতের টাকাও ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

জামানতের ব্যবস্থা রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য আমার সময় ও অকারণ শ্রম বাঁচানো, সেইসঙ্গে যাঁরা শুধুমাত্র সস্তা প্রচারের মোহে অথবা আমাকে অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলার জন্য এগোতে চান, তাঁদের প্রতিহত করা।

২। যাঁর নামে জামানতের অর্থ জমা হবে, একমাত্র তিনিই চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী হিসেবে গণ্য হবেন।

৩। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী ছাড়া আর কারও সঙ্গে চ্যালেঞ্জ বিষয়ে কোনও রকম আলোচনা চালানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

৪। কেবলমাত্র চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী চ্যালেঞ্জ বিষয়ে পরবর্তী আলোচনায় আমার সঙ্গে অথবা আমার মনোনীত ব্যক্তির সঙ্গে বসতে পারবেন বা যোগাযোগ করতে পারবেন।

৫। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীকে আমার মনোনীত ব্যক্তিদের সামনে দাবির প্রাথমিক পরীক্ষা দিতে হবে।

৬। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীদের প্রাথমিক পরীক্ষায় কোনও কারণে হাজির না হলে, অথবা দাবি প্রমাণ করতে না পারলে, তাঁর জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৭। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী দাবির প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আমি সর্বসমক্ষে চূড়ান্ত এবং শেষ পরীক্ষা গ্রহণ করব।

৮। পরীক্ষায় চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ রাখলে, আমি পরাজয় স্বীকার করে নেব।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আমি সেই অলৌকিক ক্ষমতাগুলোই দেখাতে বলেছি, যেগুলোকে নিয়ে বিভিন্ন যোগী, রেইকি-গ্র্যান্ডমাস্টার, ফেং শুই বিশেষজ্ঞ, বাস্তুবিশেষজ্ঞ, জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, ওঝা, গুণীন ও উপাসনা-ধর্মের গুরুরা দাবি করেন। পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে হেঁকে-ডেকে দাবি করেন।

<u>গ্রন্থটির সাহায্যকারী সূত্র</u> :

১। যাদু কাহিনি : অজিতকৃষ্ণ বসু
২। Illustrated History of Magic : Mailbourme Christopher.
৩। The Great Book of Magic : George Gilbert
৪। D. H. Rawcliffe : Illusions and Delusions of the Supernatural and the Occult : Dover 1959.
৫। Gods, Demons and Spirits : Dr, A. T. Uavur.
৬। Begone Godmen : Dr A. T. Kavur.
৭। পাভলভ পরিচিতি : ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৮। The Lancit : R. L. Moody.
৯। The World as a Physiological & Therapentic Factor : Platanov.
১০। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র : অনুবাদ—ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক।
১১। ভারতবর্ষের ইতিহাস : রোমিলা থাপার; অনুবাদ—কৃষ্ণা গুপ্তা।
১২। Physics for Entertainment : ya Perelman. Mir Publishers, Moscow
১৩। Handbook of Parapsychology–Edited by wolman.
১৪। Truth about E. S. P; Hans Holzer.
১৫। New Scientist
১৬। Nature
১৭। Science Digest
১৮। আনন্দবাজার
১৯। যুগান্তর
২০। আজকাল
২১। পরিবর্ত্তন
২২। Statesman
২৩। নবভারত
২৪। মানব মন
২৫। উৎস মানুষ

২৬। Bermuda Triangle Mystery Solved; Lawrence D. Kusche.
২৭। মরণের পারে : স্বামী অভেদানন্দ
২৮। রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা : অমিতাভ চৌধুরী
২৯। My Story; Uri Geller
৩০। সত্যযুগ
৩১। প্রসাদ
৩২। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ : মৈত্রেয়ী দেবী
৩৩। ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৩৪। বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র
৩৫। মন ও তার নিয়ন্ত্রণ : স্বামী বুধানন্দ
৩৬। সত্য দর্শন : পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ কালিকানন্দ স্বামী

প্রবীর ঘোষ www.prabirghosh.tk

বার্মুডা ট্রায়াঙ্গেলে কত জাহাজ ও প্লেন রহস্যজনক ভাবে হারিয়ে গেল!
আদ্যা মা মাটি ফুঁড়ে উঠে এলেন! এমনি পৃথিবীর বিখ্যাত বিভিন্ন
স্থান রহস্যের কিনারা জানতে চান? জানতে চান সাঁইবাবা থেকে
ডাইনি সম্রাজ্ঞী ঈপ্সিতার মত বহু 'অলৌকিক'-ক্ষমতাবানদের
ক্ষমতার গোপন রহস্য? প্যারাসাইকোলজি কী?
টেলিপ্যাথি কী? মানসিক শক্তিতে কীভাবে চামচ বাঁকানো যায়?
জাতিস্মররা কি আজও আছেন? এসব জানতে চান?
এমনি হাজারও প্রশ্নের উত্তর পাবেন এই গ্রন্থে
সঙ্গে বহু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার সত্য ঘটনা।
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ।

Cover Design: www.copywriter.tk